শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী

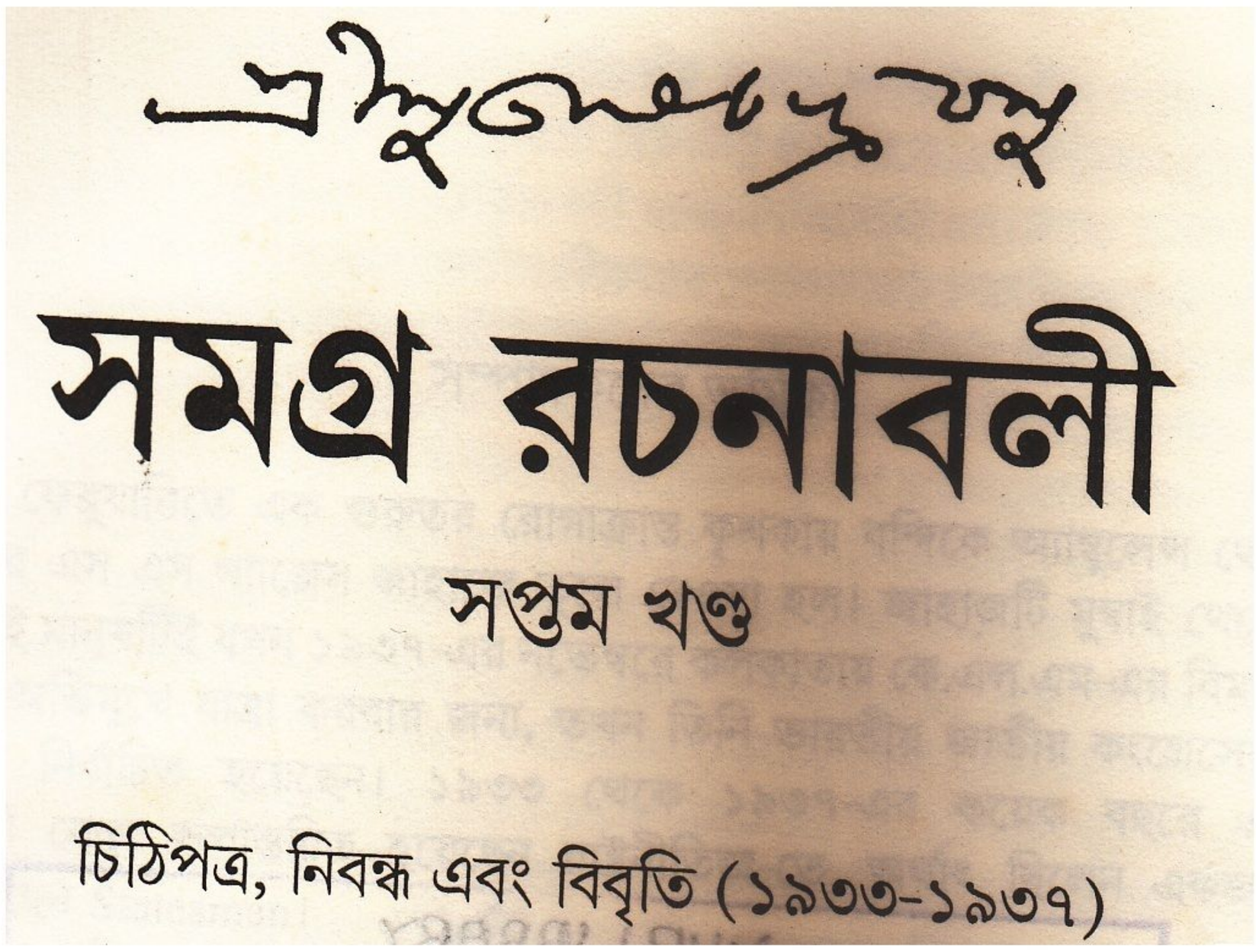
সমগ্র রচনাবলী

সপ্তম খণ্ড



সুভাষচন্দ্র বসু

সমগ্র রচনাবলী



আনন্দ
আনন্দ

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৮

সম্পাদনা শিশিরকুমার বসু ও সুগত বসু
অনুবাদ ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

© নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো, কলিকাতা ২০০৮

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 978-81-7756-726-7

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৯
থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদকদের ভূমিকা

১৯৩৩-এর ফেব্রুয়ারিতে এক গুরুতর রোগাক্রান্ত কৃশকায় বন্দিকে অ্যাম্বুলেন্স থেকে নামিয়ে স্ট্রেচারে করে এস এস গ্যাঞ্জেস জাহাজে তুলে দেওয়া হল। জাহাজটি মুম্বাই থেকে ইউরোপ যাচ্ছিল। সেই মানুষটিই যখন ১৯৩৭-এর নভেম্বরে কলকাতায় কে.এল.এম-এর বিমানে উঠলেন ইউরোপের অভিমুখে যাত্রা করবার জন্য, তখন তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৭-এর কয়েক বছরে এক আমূল পরিবর্তনপন্থী নেতা রূপান্তরিত হয়েছেন রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ-তে, অর্থাৎ ছিলেন একজন radical leader, হয়েছেন Statesman।

এই খণ্ডে সংগৃহীত হয়েছে সুভাষচন্দ্র বসুর কর্মজীবনের এক অতীব আকর্ষক, যদিও কতকটা অন্য ধরনের এবং কতকটা অবহেলিত, একটি পর্যায়ের চিঠিপত্র, প্রবন্ধ এবং বিবৃতি। এই সময়কার লেখায় যত রকম বিষয়ের কথা উল্লিখিত হয়েছে, তার ব্যাপকতা বিস্ময়কর— সাম্রাজ্যবাদ, জাতীয়তাবাদ, ফ্যাসিবাদ, সাম্যবাদ, মনস্তত্ত্ব, দর্শন, অধ্যাত্মতত্ত্ব, নাগরিক পরিকল্পনা, ভ্রমণ, গান্ধী, আয়ারল্যান্ড, প্রেম এবং আরও অনেক কিছু।

যে ক' বছর তিনি বাধ্য হয়ে ইউরোপে নির্বাসনে কাটিয়েছিলেন, তার অধিকাংশ (বিশেষত মার্চ ১৯৩৩ থেকে মার্চ ১৯৩৬) তাঁর কেটেছিল ইউরোপে ভারতের স্বাধীনতার বেসরকারি দূত হিসাবে। ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও, ভিয়েনাতে পিত্তাশয়ের অস্ত্রোপচার করাতে বাধ্য হওয়া সত্ত্বেও, সুভাষচন্দ্র বসু অক্লান্তভাবে ইউরোপ পরিভ্রমণ করেছেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে দ্বিপাক্ষিক মৈত্রী সঙ্ঘ গড়ে তুলেছেন এবং বিভিন্ন শহরে ভারতীয় ছাত্রদের সংগঠন তৈরি করে বা কোথাও সংগঠিত ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেখানে বক্তৃতা করেছেন। তিনি গিয়েছেন অস্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, মিশর, ফ্রান্স, জার্মানি, হাঙ্গেরি, আয়ারল্যান্ড, ইতালি, পোলান্ড, রুমানিয়া, সুইজারল্যান্ড, তুরস্ক, এবং যুগোস্লাভিয়াতে। তাঁর ভ্রমণসূচি তৈরি করা যায় নাওমি সি. ভেটার-কে লেখা তাঁর প্রচুর সংখ্যক চিঠি থেকে।

১৯৩৪ সালে পিতার সঙ্কটজনক অসুস্থতার খবর পেয়ে অল্পকালের জন্য তিনি ভারতে ফিরে আসেন। কিন্তু তার আগেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরেই তিনি ইউরোপে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৩৬-এর মার্চ মাসে সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মুম্বাইতে তাঁর পদার্পণের সঙ্গে-সঙ্গে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। এক বছর কারাবাসের পর, ১৯৩৭-এর এপ্রিলে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন (Government of India Act) অনুযায়ী প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর (যে আইনের তিনি তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন) সুভাষচন্দ্র আবার সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরে আসেন। মহাত্মা গান্ধী যে সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেসের সভাপতি পদের জন্য মনোনীত করেছেন, সেটা জানা যায় অক্টোবর ১৯৩৭-এ কলকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের সময়ে। পরের বছর স্বেচ্ছায় গান্ধীর আশীর্বাদ নিয়ে, তিনি ইউরোপ ভ্রমণে যাত্রা করেন। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৬-এর মধ্যে সুভাষচন্দ্রের মনে ধারণা জন্মে দেওয়া হয়েছিল যে তাঁর ব্রিটেনে যাওয়া বারণ। এই উপলক্ষে তিনি লন্ডনেও গেলেন এবং ব্রিটেনের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে, বিশেষ করে যাঁরা শ্রমিক দলের, তাঁদের সঙ্গে তিনি দেখা করলেন।

সুভাষচন্দ্র বসু-র এই সময়কার লেখা দুটি বই Collected Works-এর ১ম ও ২য় খণ্ড হিসাবে আগেই প্রকাশিত হয়েছে। সে দুটি হল, ১৯৩৭ সালে অস্ট্রিয়ার ব্যাডগাসটেন-এ দশ দিন থাকার সময়ে লেখা An Indian Pilgrim — এই বইটি তাঁর অসম্পূর্ণ আত্মজীবনী এবং ১৯৩৪-এ লেখা ১৯২০ সাল থেকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সম্পর্কে আলোচনা, The Indian Struggle।১ এই বইটিতে, তাঁর প্রায় দু'শো চিঠিতে ব্যক্ত রাজনৈতিক মতামত ছাড়াও আছে তাঁর বেশ কয়েকটি প্রধান প্রধান রাজনৈতিক প্রবন্ধ। হরিপুরাতে কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে তাঁর বক্তৃতার আগে তাঁর রাজনৈতিক দর্শন সবচাইতে সবিস্তারে বিবৃত হয় 'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম এবং সাম্যবাদ' (The Anti-Imperialist Struggle and Samyabad) শীর্ষক বক্তৃতায়। এই বক্তৃতাটি (প্রায়ই উল্লেখ করা হয় The London Thesis yM~) ১৯৩৩-এর ১০ জুন তারিখে তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রদত্ত হয়েছিল লন্ডনে এক রাজনৈতিক সম্মেলনে। তাতে আছে গান্ধীপন্থী সত্যাগ্রহের সপ্রশংস সমালোচনা এবং সাম্যবাদের আদর্শের ব্যাখ্যা। ইউরোপে সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুভাষচন্দ্রকে আকৃষ্ট করলেও তিনি সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর নিজের আদর্শ প্রকাশ করতে প্রাচীন ভারতীয় বৌদ্ধ শব্দটিই ব্যবহার করতে পছন্দ করেছিলেন। এই আদর্শ ভারতের অবস্থার উপযোগী, তাতে সাম্যবাদের আবাহন করা হয়েছে সামঞ্জস্য এবং সমন্বয়ের আবহাওয়ার মধ্যে।

সুভাষচন্দ্র যতদিন ইউরোপে ছিলেন, আন্তর্জাতিক রাজনীতি তাঁর বিশেষ অনুধাবনের বিষয় ছিল। ফ্যাসিবাদী (এবং সাম্যবাদী) দলগুলির সাংগঠনিক শক্তি এবং তাদের আন্দোলন তাঁকে খানিকটা চমৎকৃত করলেও, জার্মানির নাৎসিদের সম্পর্কে তাঁর মনে এক গভীর বিতৃষ্ণা জন্মেছিল। কিটি কুর্টি যাকে বর্ণনা করেছেন 'গভীর ঘৃণা' বলে। জার্মানিতে জাতিবাদ, বিশেষত ভারতীয় বিরোধী জাতিবাদের বিরুদ্ধে তিনি বারে-বারে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ ব্যক্ত করেছেন। জার্মানি ছেড়ে চলে আসবার সময়ে ১৯৩৬-এর প্রথম দিকে এই নবজাতীয়তাবাদকে তিনি ড. থিয়েরফিল্ডারকে লেখা একটি চিঠিতে শুধু সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতার জন্যে নয়, তার হামবড়াইয়ের জন্যও নিন্দা করেন। ১৯৩৭ সালে কিটি কুর্টিকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি জাপানিদের নাম দেন 'প্রাচ্যের ব্রিটিশ'! গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের মতো মুসোলিনি শাসিত ইতালি সম্পর্কে তাঁর ধারণা আরেকটু ভাল ছিল, "সেই মানুষটি সম্পর্কে আমরা যাই মনে করি না কেন" (নাওমি ভেটার-কে লেখা চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন) তবে, ইতালির শাসন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ঘটেছিল। ১৯৩০ নাগাদ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দ্রুত পটপরিবর্তনের তাৎপর্য তিনি যা ব্যাখ্যা করেছিলেন, সেটা পাওয়া যাবে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা তাঁর চিঠিতে এবং Europe—Today and Tomorrow এবং Japan's Role in the Far East ইত্যাদি প্রবন্ধে। এই অনমনীয় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধীর মনের মধ্যে কোথাও এই একটা ভাব সর্বদাই ছিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্বব্যাপী আধিপত্যে কোথায় একটু দুর্বলতার সন্ধান পাওয়া যায়।

তাঁর ইউরোপ প্রবাসের একটি প্রধান ঘটনা তাঁর আয়ারল্যান্ড পরিদর্শন। সে সময়ে ডাবলিনে ইমন ডি ভালেরার সঙ্গে তাঁর তিন বার সাক্ষাৎ হয়েছিল। আয়ারল্যান্ড সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ই. উডসকে লেখা তাঁর চিঠিতে, এবং The Visit to Dublin: A Note এবং Impressions of Ireland, এই দুটি প্রবন্ধে। নিঃসন্দেহে ইউরোপে সুভাষচন্দ্রের প্রিয় শহর ছিল ভিয়েনা, এবং সেই শহরের সমাজতন্ত্রবাদী পুরসভা তাঁর বিশেষ আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের বিষয় ছিল। পুর-সেবা সংক্রান্ত বিষয় এবং কলকাতার উন্নয়ন তাঁর কতখানি চিন্তার বিষয় ছিল সেটা দেখতে পাওয়া যায় সন্তোষকুমার বসু ও এ. কে ফজলুল হককে লেখা তাঁর চিঠিতে, এবং "ভিয়েনা, প্রাগ, ওয়ারস এবং বার্লিন" প্রবন্ধে। যে দেশটি তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল সেটি হল চেকোস্লোভাকিয়া। চেক প্রেসিডেন্ট এডোয়ার্ড বেনেস-এর সঙ্গে এবং ভারত বিষয়ে

পণ্ডিত অধ্যাপক ভি. লেসনির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল। চেকোস্লোভাকিয়ায় বিভিন্ন স্বাস্থ্য-পুনরুদ্ধার কেন্দ্রে থাকতে তাঁর ভাল লাগত। Karlsbad and Other Watering Places of Czechoslovakia নামে তিনি একটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন।

অক্লান্তভাবে যেমন তিনি ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্যে প্রচার চালিয়েছেন, তেমনি নতুন জায়গায় ভ্রমণ করে, নতুন-নতুন লোকের কথা জানতে পেরেও তিনি প্রচুর আনন্দ লাভ করেছেন। তিনি সময় করে নিয়েছেন নানাবিধ বিষয় নিয়ে চিন্তা করবার, নানাবিধ বিষয় নিয়ে লেখার, তিনি ধর্মের বিষয় নিয়ে চিঠি লিখেছেন দিলীপকুমার রায় এবং অনিলচন্দ্র গাঙ্গুলিকে এবং মনোবিকলন, ইয়ুং এবং ফ্রয়েডের সম্পর্কে লিখেছেন কিটি কুর্টি-কে। রোমাঁ রলাঁর সঙ্গে তাঁর পত্র বিনিময় হয়েছে রাজনীতি ও দর্শন নিয়ে। পত্নী কমলার কঠিন অসুখের সময়ে তিনি জওহরলাল নেহরুকে শক্তি ও সাহস জুগিয়েছেন। আবার ভ্রাতৃবধূ বিভাবতী বসু এবং শ্রী ও শ্রীমতী ধর্মবীরকে ও তাঁদের কন্যা সীতা ধর্মবীরকে লেখা চিঠিতে হালকা কৌতুকবোধের এবং গভীর মানবিকতাবোধের পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৩৭ সালে বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে ভারতীয় রাজনীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে সোজাসুজি বলতে এবং লিখতে আরম্ভ করেন। আধুনিক ইতিহাস এবং রাজনীতি যাঁদের বিশেষ চর্চার বিষয় তাঁরা বিশেষভাবে আগ্রহী হবেন The Pros and Cons of Office Acceptance শীর্ষক নিবন্ধে এবং বঙ্গদেশ এবং পঞ্জাব বিষয়ে তাঁর বিভিন্ন বিবৃতিতে।

সুভাষচন্দ্র বসুর দেশান্তরের বছরগুলি তাঁর ব্যক্তিত্বের এবং এক জন নেতার যে সব গুণ থাকা দরকার সে সব গুণের বিকাশে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ভারতে এবং বঙ্গদেশে তাঁর অনুপস্থিতি জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট ক্ষতিও করেছিল। সেই ক্ষতি আরও প্রবল হয়েছিল ১৯৩২ থেকে ১৯৩৬-এ, যখন তাঁর ভ্রাতা এবং ঘনিষ্ঠতম রাজনৈতিক সহযোদ্ধা শরৎচন্দ্র বসুও কারাবাস করেছিলেন। ১৯৩২ থেকে ১৯৩৪ যে আইন অমান্য আন্দোলন এবং বিপ্লবী আন্দোলন চলছিল, তাতে তাঁদের সাহসিকতাপূর্ণ স্বপ্ন ও কল্পনারই অভাব শুধু যে অনুভূত হয়েছিল তাই নয়, সেই সঙ্কটের কালে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের যে অবনতি ঘটেছিল সেটা রোধ করার মতো মানসিক উদারতা ও দূরদৃষ্টি আর কোনও নেতার ছিল না। যতদিনে বসু-ভ্রাতৃদ্বয় আবার ভারতীয় রাজনীতির মঞ্চের কেন্দ্রে ফিরে এলেন এবং ঘটনার মোড় ঘোরাবার চেষ্টা করলেন, তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি ক্ষতিকর ব্যাপার ঘটে গেছে।

সুভাষচন্দ্রের জীবনের ও রাজনীতির অন্যান্য পর্ব নিয়ে যতটা নিবিড়ভাবে চর্চা হয়েছে, তাঁর বাধ্যতামূলক ইউরোপ প্রবাস নিয়ে তেমন কিছু হয়নি। আগ্রহী পাঠকেরা ১৯৩৩-৩৭, এই সময়কার সম্পর্কে তথ্য ও বিশ্লেষণ পেতে পারেন এই সব সূত্র থেকে: Leonard A. Gordon, *Brothers against the Raj: A Biography of Indian Nationalists Sarat and Subhas Chandra Bose* (Delhi and New York, ১৯৩০), Chapter 7 entitled 'Ambassador of India in Bondage'; Krishna Bose, *Itihaser Sandhane* [In search of History, in Bengali] (Calcutta, ১৯৭৩), and Sisir K. Bose et. al. (eds.) *A Beacon across Asia: A Biography of Subhas Chandra Bose* (Calcutta, ১৯৭৩), Chapter 2, তা ছাড়া আছে ১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে সাক্ষাৎ এবং কথোপকথনের কিটি কুর্টির প্রাণবন্ত বিবরণ: *Subhas Chandra Bose As I Knew Him* (Calcutta, ১৯৬৯).

এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়নি ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৭-এর মধ্যে লেখা সুভাষচন্দ্রের একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ পত্র। ১৯৩৪-এর প্রথম দিকে তাঁর দেখা হয় সেই নারীর সঙ্গে যাঁকে তিনি পরে বিবাহ করেন। এমিলি শেঙ্কল ১৯৩৪-এ 'The Indian Struggle' লিখবার সময়ে, এবং ইউরোপে ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপে সুভাষচন্দ্রকে সাহায্য করেছিলেন।

ইউরোপে যখন তিনি ভ্রমণ করছিলেন তখন সুভাষচন্দ্র এমিলি শেঙ্কল-এর সঙ্গে নিয়মিত পত্র বিনিময় করেছিলেন, এবং ভারতে ফিরে আসার পরে খুব ঘন-ঘন তাঁকে চিঠি লিখতেন। সে সব পত্র এবং ১৯৩৭-এর পরে এমিলি শেঙ্কলকে লেখা অন্য সব চিঠি নিয়ে Collected Works-এর বিশেষ ৭ম খণ্ড গ্রন্থিত।

সুভাষচন্দ্রের যে-সব বন্ধু এবং সহকর্মী তাঁদেরকে লেখা তাঁর চিঠিপত্র *Netaji Research Bureau*-র লেখশালায় জমা দিয়েছেন সম্পাদকদ্বয় তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চান। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় প্রয়াত নাওমি সি. ভৈটার-এর, যাঁর সংগ্রহ ব্যুরো কর্তৃক সংরক্ষিত সবচেয়ে প্রাচীন এবং সবচেয়ে মূল্যবান নথিপত্রের অন্যতম। ইউরোপের অনেক বন্ধু সংগ্রহের কাজে সহায়তা করেছেন। চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সম্পর্কে বিশেষ সাহায্য পাওয়া গিয়েছে প্রাগ-এর Oriental Institute-এর প্রাক্তন ডিরেক্টর ড. মিলোস্লাভ ক্রাসার কাছ থেকে। জার্মানিতে বহুমূল্য সহায়তা দান করেছেন প্রয়াত ড. আলেকজান্ডার ওয়র্থ এবং ড. লোথার ফ্র্যাঙ্ক। কৃষ্ণা বসু এবং লেনার্ড এ. গর্ডন, যাঁরা সুভাষচন্দ্রের জীবনের এই পর্বটির বিষয়ে সকলের চেয়ে বেশি জানেন, তাঁরা তাঁর রচনাবলীর এই খণ্ডটির প্রামাণিকতা যতদূর সম্ভব সুনিশ্চিত করেছেন, লেখশালা প্রভৃতি সম্পর্কে শ্রীনাগসুন্দরমের পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানের পূর্ণ সুযোগ সম্পাদকেরা গ্রহণ করেছেন। শ্রীকার্তিক চক্রবর্তী পাণ্ডুলিপির অনেক খসড়া অতিশয় যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে টাইপ করে দিয়েছেন। সে কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে সহায়তা করেছেন শর্মিলা বসু ও সুমন্ত্র বসু। নেতাজির স্ত্রী এমিলি শেঙ্কল ও তাঁদের কন্যা অনিতা পাফ-কে সম্পাদকেরা আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছেন সুভাষচন্দ্রের সমস্ত রচনার গ্রন্থস্বত্ব ব্যুরোকে দান করার জন্য। এবং ব্যুরোর কাজে তাঁরা সর্বদা যে উৎসাহ দান করেছেন সে জন্য। Collected Works-এর এই খণ্ড এবং অন্যান্য খণ্ড পরিবেশনের জন্য দিল্লির অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস-এর যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তার জন্য ব্যুরো বিশেষভাবে আনন্দিত, এবং ও-ইউ-পি'র শ্রীরুকুন আদভানিকে তাঁর আগ্রহ এবং সহায়তার জন্য ব্যুরো ধন্যবাদ জানাতে চায়। পরিশেষে উল্লেখ্য, এই গ্রন্থের প্রকাশে ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রক মঞ্জুরি দিয়ে সহায়তা করেছে।

নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো
কলিকাতা
মার্চ ১৯৯৪

শিশিরকুমার বসু
সুগত বসু

সূচি

চিঠিপত্র

১. দিলীপকুমার রায়-কে ১
২. কান্তিলাল পারেখ-কে ২
৩. কান্তিলাল পারেখ-কে ৩
৪. কান্তিলাল পারেখ-কে ৪
৫. কান্তিলাল পারেখ-কে ৫
৬. সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার-কে ৬
৭. সন্তোষকুমার বসু, কলিকাতার মেয়র-কে ৭
৮. জে. টি. সান্ডারল্যান্ড-কে ৮
৯. সন্তোষকুমার বসু, কলিকাতার মেয়র-কে ৯
১০. আলফ্রেড টিরনয়ার-কে ১১
১১. নাওমি সি. ভেটার-কে ১১
১২. নাওমি সে ভেটার-কে ১২
১৩. সন্তোষকুমার বসু, কলিকাতার মেয়র-কে ১২
১৪. বিভাবতী বসু-কে ১৩
১৫. নাওমি সি. ভেটার-কে ১৪
১৬. সন্তোষকুমার বসু, কলিকাতার মেয়র-কে ১৪
১৭. নাওমি সি. ভেটার-কে ১৫
১৮. নাওমি সি. ভেটার-কে ১৬
১৯. নাওমি সি. ভেটার-কে ১৭
২০. নাওমি সি. ভেটার-কে ১৮
২১. নাওমি সি. ভেটার-কে ১৯
২২. নাওমি সি. ভেটার-কে ১৯
২৩. নাওমি সি. ভেটার-কে ২০
২৪. নাওমি সি. ভেটার-কে ২০
২৫. নাওমি সি. ভেটার-কে ২১
২৬. নাওমি সি. ভেটার-কে ২২
২৭. নাওমি সি. ভেটার-কে ২৩
২৮. কান্তিলাল পারেখ-কে ২৩
২৯. নাওমি সি. ভেটার-কে ২৪
৩০. নাওমি সি. ভেটার-কে ২৫

৩১. ই. উডস-কে	২৬
৩২. সন্তোষকুমার বসু, কলিকাতার মেয়র-কে	২৭
৩৩. সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার-কে	২৭
৩৪. নাওমি সি. ভেটার-কে	২৮
৩৫. নাওমি সি. ভেটার-কে	২৯
৩৬. অধ্যাপক ভি. লেসনি-কে	২৯
৩৭. নাওমি সি. ভেটার-কে	৩০
৩৮. অধ্যাপক ফ্রান্সিস জাজতি-কে	৩১
৩৯. ই. উডস-কে	৩১
৪০. সুনীল মোহন ঘোষ মৌলিক-কে	৩৩
৪১. নাওমি সি. ভেটার-কে	৩৪
৪২. নাওমি সি. ভেটার-কে	৩৫
৪৩. নাওমি সি. ভেটার-কে	৩৫
৪৪. বিভাবতী বোস-কে	৩৭
৪৫. সুরমা দে-কে	৩৮
৪৬. নাওমি সি. ভেটার-কে	৩৮
৪৭. নাওমি সি. ভেটার-কে	৩৯
৪৮. সুনীল মোহন ঘোষ মৌলিক-কে	৪০
৪৯. নাওমি সি. ভেটার-কে	৪১
৫০. ই. উডস-কে	৪১
৫১. সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার-কে	৪২
৫২. কিটি কুর্টি-কে	৪৪
৫৩. সন্তোষকুমার বসু, কলিকাতার মেয়র-কে	৪৫
৫৪. কান্তিলাল পারেখ-কে	৪৭
৫৫. নাওমি সি. ভেটার-কে	৪৮
৫৬. সি. আর. প্রুয়েফার্র-কে	৪৮
৫৭. সন্তোষকুমার বসু, কলিকাতার মেয়র-কে	৫০
৫৮. নাওমি সি. ভেটার-কে	৫২
৫৯. নাওমি সি. ভেটার-কে	৫২
৬০. নাওমি সি. ভেটার-কে	৫৩
৬১. নাওমি সি. ভেটার-কে	৫৪
৬২. নাওমি সি. ভেটার-কে	৫৪
৬৩. নাওমি সি. ভেটার-কে	৫৫
৬৪. অজিতকুমার দে-কে	৫৬
৬৫. সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার-কে	৫৬
৬৬. এ. সি. এন. নাম্বিয়ার-কে	৫৭
৬৭. ভি. লেসনি-কে	৫৮
৬৮. সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র-কে	৫৯
৬৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-কে	৬০
৭০. নাওমি সি. ভেটার-কে	৬২

৭১. অজিতকুমার দে-কে	৬২
৭২. এ. সি. এন. নাম্বিয়ার-কে	৬৪
৭৩. নাওমি সি. ভেটার-কে	৬৪
৭৪. সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র-কে	৬৫
৭৫. ভি. লেসনি-কে	৬৬
৭৬. নাওমি সি. ভেটার-কে	৬৭
৭৭. ভি. লেসনি-কে	৬৮
৭৮. নাওমি সি. ভেটার-কে	৬৯
৭৯. নাওমি সি. ভেটার-কে	৬৯
৮০. সি. আর. প্রুয়েফার-কে	৭০
৮১. ই. উডস-কে	৭১
৮২. জে. টি. সান্ডারল্যান্ড-কে	৭১
৮৩. রোমাঁ রলাঁ-র পত্র, সুভাষচন্দ্র বোস-কে লিখিত	৭২
৮৪. অমিয় চক্রবর্তী-কে	৭৩
৮৫. নাওমি সি. ভেটার-কে	৭৪
৮৬. নাওমি সি. ভেটার-কে	৭৪
৮৭. নাওমি সি. ভেটার-কে	৭৫
৮৮. নাওমি সি. ভেটার-কে	৭৫
৮৯. এ. কে. ফজলুল হক-কে	৭৬
৯০. নাওমি সি. ভেটার-কে	৭৬
৯১. নাওমি সি. ভেটার-কে	৭৭
৯২. নাওমি সি. ভেটার-কে	৭৮
৯৩. নাওমি সি. ভেটার-কে	৭৮
৯৪. নাওমি সি. ভেটার-কে	৭৯
৯৫. অমিয় চক্রবর্তী-কে	৭৯
৯৬. ই. উডস-কে	৮০
৯৭. সুনীল মোহন ঘোষ মৌলিক-কে	৮১
৯৮. জে. টি. সান্ডারল্যান্ড-কে	৮২
৯৯. নাওমি সি. ভেটার-কে	৮২
১০০. নাওমি সি. ভেটার-কে	৮৩
১০১. নাওমি সি. ভেটার-কে	৮৪
১০২. ভি. লেসনি-কে	৮৫
১০৩. জওহরলাল নেহরু-কে	৮৬
১০৪. নাওমি সি. ভেটার-কে	৮৭
১০৫. নাওমি সি. ভেটার-কে	৮৭
১০৬. ড. থিয়েরফেল্ডার-কে	৮৮
১০৭. সন্তোষকুমার বসু-কে	৯০
১০৮. এন. বি. সাকলাতওয়ালা-কে	৯২
১০৯. নাওমি সি. ভেটার-কে	৯৫
১১০. ড. থিয়েরফেল্ডার-কে	৯৫

১১১. সুনীল মোহন ঘোষ মৌলিক-কে ৯৬
১১২. ই. উডস-কে ৯৭
১১৩. কিটি কুর্টি-কে ৯৮
১১৪. অমিয় চক্রবর্তী-কে ৯৯
১১৫. সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার-কে ১০০
১১৬. সন্তোষকুমার বসু-কে ১০১
১১৭. ভি. লেসনি-কে ১০২
১১৮. ই. উডস-কে ১০৩
১১৯. সন্তোষকুমার সেন-কে ১০৪
১২০. সন্তোষকুমার সেন-কে ১০৫
১২১. ই. উডস-কে ১০৬
১২২. নাওমি সি. ভেটার-কে ১০৬
১২৩. ই. উডস-কে ১০৭
১২৪. নাওমি সি. ভেটার-কে ১০৮
১২৫. নাওমি সি. ভেটার-কে ১০৮
১২৬. অমিয় চক্রবর্তী-কে ১১১
১২৭. নাওমি সি. ভেটার-কে ১১১
১২৮. সন্তোষকুমার সেন-কে ১১২
১২৯. জওহরলাল নেহরু-কে ১১২
১৩০. সন্তোষকুমার সেন-কে ১১৩
১৩১. সন্তোষকুমার সেন-কে ১১৪
১৩২. নাওমি সি. ভেটার-কে ১১৫
১৩৩. ই. উডস-কে ১১৬
১৩৪. সন্তোষকুমার সেন-কে ১১৭
১৩৫. সন্তোষকুমার সেন-কে ১১৭
১৩৬. অমিয় চক্রবর্তী-কে ১১৮
১৩৭. অমিয় চক্রবর্তী-কে ১২০
১৩৮. জওহরলাল নেহরু-কে ১২১
১৩৯. ই. উডস-কে ১২৩
১৪০. নাওমি সি. ভেটার-কে ১২৪
১৪১. সুনীল মোহন ঘোষ মৌলিক-কে ১২৫
১৪২. রোঁমা রলাঁ-র পত্র, সুভাষচন্দ্র বোস-কে লিখিত ১২৬
১৪৩. সন্তোষকুমার সেন-কে ১২৬
১৪৪. রোঁমা রলাঁ-কে ১২৭
১৪৫. অধ্যাপক লেসনি-কে ১২৮
১৪৬. সন্তোষকুমার সেন-কে ১২৯
১৪৭. ড. থিয়েরফেল্ডার-কে ১২৯
১৪৮. নাওমি সি. ভেটার-কে ১৩২
১৪৯. ই. উডস-কে ১৩২
১৫০. ই. উডস-কে ১৩৪

১৫১. সন্তোষকুমার সেন-কে ১৩৪
১৫২. নাওমি সি. ভেটার-কে ১৩৫
১৫৩. কংগ্রেস সভাপতি (রাজেন্দ্রপ্রসাদ)-কে ১৩৬
১৫৪. তুষারকান্তি ঘোষ-কে ১৩৭
১৫৫. জওহরলাল নেহরু-কে ১৩৭
১৫৬. নাওমি সি. ভেটার-কে ১৩৯
১৫৭. সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার-কে ১৪০
১৫৮. কিটি কুর্টি-কে ১৪০
১৫৯. জর্জ ডি সিলভা-কে ১৪২
১৬০. কলিকাতায় এক বন্ধু-কে ১৪৩
১৬১. সন্তোষকুমার সেন-কে ১৪৩
১৬২. জর্জ ডি সিলভা-কে ১৪৪
১৬৩. অমরকৃষ্ণ ঘোষ-কে ১৪৫
১৬৪. তুষারকান্তি ঘোষ-কে ১৪৫
১৬৫. শরৎচন্দ্র বোস-কে ১৪৬
১৬৬. সীতারাম সাকসেরিয়া-কে ১৪৭
১৬৭. কিটি কুর্টি-কে ১৪৮
১৬৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-কে ১৪৯
১৬৯. নাওমি সি. ভেটার-কে ১৪৯
১৭০. সুনীল মোহন ঘোষ মৌলিক-কে ১৫১
১৭১. কিটি কুর্টি-কে ১৫১
১৭২. নাওমি সি. ভেটার-কে ১৫৩
১৭৩. সীতা ধর্মবীর-কে ১৫৪
১৭৪. ই. উডস-কে ১৫৫
১৭৫. ভি. লেসনি-কে ১৫৬
১৭৬. সীতা ধর্মবীর-কে ১৫৬
১৭৭. নাওমি সি. ভেটার-কে ১৫৭
১৭৮. সন্তোষকুমার সেন-কে ১৬০
১৭৯. কিটি কুর্টি-কে ১৬১
১৮০. রামমনোহর লোহিয়া-কে ১৬২
১৮১. সুধীরকুমার বসু-কে ১৬৩
১৮২. সুনীল মোহন ঘোষ মৌলিক-কে ১৬৩
১৮৩. সীতা ধর্মবীর-কে ১৬৪
১৮৪. কিটি কুর্টি-কে ১৬৫
১৮৫. সীতা ধর্মবীর-কে ১৬৬
১৮৬. সন্তোষকুমার বসু-কে ১৬৭
১৮৭. রামমনোহর লোহিয়া-কে ১৬৮
১৮৮. অনিলচন্দ্র গাঙ্গুলি-কে ১৬৯
১৮৯. ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-কে ১৭০
১৯০. কলিকাতা পুরসভার একজন কর্মী-কে ১৭১

১৯১. সন্তোষকুমার বসু-কে ১৭২
১৯২. সীতা ধর্মবীর-কে ১৭৩
১৯৩. শ্রীশচন্দ্র চ্যাটার্জি-কে ১৭৩
১৯৪. সীতা ধর্মবীর-কে ১৭৪
১৯৫. ভি. লেসনি-কে ১৭৫
১৯৬. ই. উডস-কে ১৭৫
১৯৭. জওহরলাল নেহরু-কে ১৭৬
১৯৮. সুনীল মোহন ঘোষ মৌলিক-কে ১৭৭
১৯৯. এ. সি. ব্যানার্জি-কে ১৭৮
২০০. সীতা ধর্মবীর-কে ১৭৮
২০১. শ্রীমতী জে. ধর্মবীর-কে ১৭৮
২০২. ওরিয়েন্টুরিস্ট লিমিটেড-কে ১৭৯
২০৩. নাওমি সি. ভেটার-কে ১৮০
২০৪. ম্যাগিওরি র‍্যাপিকাভোলি-কে ১৮০
২০৫. মারকুইস অব জেটল্যান্ড-কে ১৮১
২০৬. শ্রীমতী জে. ধর্মবীর-কে ১৮২
২০৭. ই. উডস-কে ১৮৪
২০৮. ই. উডস-কে ১৮৪
২০৯. ম্যাগিওরি র‍্যাপিকাভোলি-কে ১৮৫

ভাষণ, বিবৃতি ও নানা রচনা

১. দেশবাসীর উদ্দেশে বাণী ১৮৭
২. সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম ও সাম্যবাদ ১৮৮
৩. ভিয়েনা, প্রাগ, ওয়ারস এবং বার্লিনের অভিজ্ঞতা ২০২
৪. কলকাতা পুরসভা ২০৩
৫. অস্ট্রিয়ার ধাঁধা ২০৪
৬. ভিঠলভাই প্যাটেলের উইল ২১৫
৭. রুমানিয়াতে এক ভারতীয় কর্নেল ২১৬
৮. এক নজরে এডেন ২১৮
৯. ইতালি ২১৯
১০. কায়রোর মধ্যে দিয়ে যাত্রা ২২১
১১. বিদেশে ভারতীয় ছাত্রদের ব্যবহারিক শিক্ষা ২২৫
১২. রঁমা রলাঁ কী ভাবছেন ২২৮
১৩. আবিসিনিয়ার রহস্য ও তার শিক্ষা ২৩৩
১৪. ভারতের ভবিষ্যৎ ২৪৫
১৫. জামসেদপুরের শ্রমজীবী—অন্য আরেক ছবি ২৪৫
১৬. পোল্যান্ডে ভারতের এক বন্ধু ২৫৪
১৭. জার্মানিতে ভারতীয় ২৫৬

১৮. ডাবলিন ভ্রমণ: একটি নোট ২৫৬
১৯. সাংবাদিক বৈঠক: ভারতের পরিস্থিতি, ভারত এবং জার্মানি, জাতিসঙ্ঘ ২৫৮
২০. ভারতীয় পরিস্থিতি ও বিশ্ব জনমত ২৫৯
২১. আয়ারল্যান্ডের অভিজ্ঞতা ২৬১
২২. স্বাধীনতা ও নতুন সংবিধান ২৬৩
২৩. পঞ্জাব ২৬৪
২৪. কংগ্রেসের দৃষ্টিতে ২৬৫
২৫. বিদেশে ভারত ২৬৭
২৬. ভারত-ব্রিটিশ বাণিজ্যের পঞ্চাশ বছর (১৮৭৫-১৯২৫) ২৭৩
২৭. মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি ২৮২
২৮. কলকাতায় অভ্যর্থনা সভায় বক্তৃতা ২৮৮
২৯. প্রগতিশীল আদর্শবাদের অভাব ২৯১
৩০. ভারতীয় স্থাপত্য এবং কলকাতা পুরসভা ২৯৩
৩১. ইউরোপ আজ ও আগামীকাল ২৯৪
৩২. বিজয়কুমার বসু ৩০৩
৩৩. দূর প্রাচ্যে জাপানের ভূমিকা ৩০৪
৩৪. ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে হস্তক্ষেপ ৩১৭
৩৫. পঞ্জাবের পরিস্থিতি বিষয়ে ৩১৭
৩৬. কৃষিজীবী সম্প্রদায় ও ভারতের জাতীয়তা ৩১৯
৩৭. বঙ্গদেশের পরিস্থিতি ৩১৯
৩৮. সম্পাদক, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড ৩২১
৩৯. কার্লসবাড এবং চেকোস্লোভাকিয়ায় অন্যান্য উষ্ণ প্রস্রবণে জল চিকিৎসা কেন্দ্র ৩২১

নির্ঘণ্ট ৩২৭-৩৩৪

দিলীপকুমার রায়-কে[১]
[মূল বাংলায়]

এস. এস. গঙ্গে
৫ মার্চ ১৯৩৩

প্রিয় দিলীপ,

আমি অনেক দিন তোমায় চিঠি লিখিনি, যদিও তুমি তা সত্ত্বেও আমাকে চিঠি লিখেছ। জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে আমি নিরন্তর মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছি। তার কারণ গভর্নমেন্ট বারেবারে আমাকে উত্যক্ত করেছে। চিকিৎসার জন্য ইউরোপ যেতে পারব কি না শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত হতে পারিনি। গভর্নমেন্টের এই প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোভাবের জন্যে আমি বাবা-মা'র সঙ্গে কিংবা বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা করতে পারিনি, শুধু মাত্র গুটিকয়েক নিকট আত্মীয় জব্বলপুর জেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে পেরেছেন। অনেক বন্ধু দূর-দূরান্ত থেকে বম্বে এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে, কিন্তু তাঁদের হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হয়। যে-পুলিশ অফিসারেরা জাহাজ পর্যন্ত আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যান, জাহাজ বন্দর যতক্ষণ না ছাড়ল, তাঁরা আমাকে এক ঝাঁক কুকুরের মতো ঘিরে থাকলেন। এই ভাবে আমাকে উত্যক্ত করা চলল যতক্ষণ না জাহাজ বন্দর ছেড়ে গেল, এবং তার ফলে আমি তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করলাম।

যাই হোক এই সব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে তোমাকে ব্যতিব্যস্ত করা উচিত নয়। বন্দি অবস্থায় আমি যতদিন ছিলাম, আমার জন্য তোমার যে গভীর সহানুভূতি সেটা তোমার সহৃদয়তার পরিচয়, এবং এতটা আমি আশাও করিনি, কেননা সংসার ত্যাগ করে তুমি যোগ অবলম্বন করেছ বলে আমি শুনেছি। সত্যি কথা বলতে কী, প্রিয় দিলীপ, যোগ এবং আধ্যাত্মিকতার কথা বাদ দিলে আমার জন্য তোমার যে গভীর মানবিক অনুভূতি তাতে আমি অভিভূত, যে-তুমি নাকি সব জাগতিক ব্যাপার ভুলে গেছ, তোমার আগেকার বন্ধুদের ত্যাগ করেছ, সেই তুমি যে আমার মতো অবস্থার একজন লোকের প্রতি এত তীব্র সহানুভূতি বোধ করবে, এ ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

তোমার একটি চিঠিতে তুমি শিব সম্পর্কে আমার মনোভাব জানতে চেয়েছ। কিংবা ওই রকম কিছু একটা, সত্যি কথা বলতে, শিব, কালী এবং কৃষ্ণের প্রতি আমার ভালবাসা আমাকে বিভিন্ন দিকে টানে। তাঁরা যদিও আসলে এক, একটি প্রতীক কেউ হয়তো অন্য প্রতীকের চেয়ে বেশি পছন্দ করে। আমি দেখেছি, আমার মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হয়, এবং যখন আমার মনের যে-অবস্থা সেই অনুযায়ী তিনটির মধ্যে একটি রূপ বেছে নিই। এই তিনটির মধ্যে আবার সংঘাত শিব ও শক্তিতে। শিব, যিনি আদর্শ যোগী, তাঁর একটা আকর্ষণ আছে আমার কাছে, এবং কালী যিনি মা, তাঁকেও আমার ভাল লাগে। দেখো, সম্প্রতি (অর্থাৎ গত চার-পাঁচ বছর) আমি মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছি। অর্থাৎ বিশ্বাস করি, যে মন্ত্রের ভিতরে একটা শক্তি আছে। তার আগে আমি সাধারণ যুক্তি সিদ্ধ মত পোষণ করতাম, যে মন্ত্রগুলো প্রতীকের মতো,

---

[১] এই পত্রটি বাংলায় লিখিত ছিল। মূল বাংলা পত্র এখন আর পাওয়া গেল না বলে ইংরাজি অনুবাদ থেকে বাংলায় পুনরনূদিত হল।

তাতে মনোসংযোগে সহায়তা করে। কিন্তু তান্ত্রিক দর্শন নিয়ে পড়াশোনা করার ফলে আমার ক্রমে-ক্রমে বিশ্বাস হয়েছে যে কোনও-কোনও মন্ত্রের অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, এবং প্রত্যেকটি মানসিক গঠনের উপযুক্ত এক-একটি মন্ত্র আছে। সেই থেকে, আমার মানসিক গঠন কী রকম এবং কোন মন্ত্রটি আমার উপযুক্ত তা জানবার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করে আসছি, কিন্তু এ পর্যন্ত কৃতকার্য হতে পারিনি। কেননা আমার মনের অবস্থার পরিবর্তন হয়, এবং কখনও আমি শৈব, কখনও শাক্ত, কখনও বৈষ্ণব। আমার মনে হয়, এইখানেই গুরুর প্রয়োজন, কারণ একজন প্রকৃত গুরু আমরা যা জানি তার চেয়ে আমাদেরকে ভাল জানেন, এবং তিনি তৎক্ষণাৎ বলে দিতে পারেন আমাদের কোন মন্ত্র গ্রহণ করা উচিত, এবং কী ভাবে পূজা করা উচিত।

সাংসারিক কথায় ফিরে আসি। কাল আমি ভেনিস পৌঁছব। সেখান থেকে ভিয়েনা যাব ডাক্তার দেখাতে। তারপর সম্ভবত আমি সুইজারল্যান্ডের কোনও স্যানাটোরিয়ামে যাব।

সৈদ বন্দর পর্যন্ত জাহাজে ভালই আসছিলাম, কেননা সমুদ্র শান্ত ছিল। সৈদ বন্দর পেরোতেই ঝড়ের খারাপ আবহাওয়ার কবলে পড়লাম। আমার যে ব্যাধি (অর্থাৎ পেটের যন্ত্রণা), সেটা থেকেই গেছে, তবে একটু ভাল বোধ করছি। সৈদ বন্দর-এ পৌঁছন পর্যন্ত রীতিমতো ভাল ছিলাম, কিন্তু ভূমধ্যসাগরে প্রবেশের পর থেকে আমার শরীরের গোলযোগ আরম্ভ হয়েছে।

আজ এইখানেই থামি, কারণ ঢেউয়ের জন্যে লিখতে অসুবিধা হচ্ছে।

গভীর ভালবাসা নিও,

তোমার প্রীতিভাজন
সুভাষ

কান্তিলাল পারেখ-কে

হোটেল রয়াল দানিয়েলি
ভেনেজিয়া
৭ মার্চ ১৯৩৩

প্রিয় কান্তিলাল,

আমি কাল বিকেলে এখানে পৌঁছেছি। জাহাজ থেকে আমরা মোটর বোটে হোটেলে এলাম। জেটিতে আমাকে নিতে এসেছিল আমার ভাইপো (শরৎবাবুর ছেলে)। সে দেড় বছর মিউনিকে পড়াশোনা করছে।

গতকাল থেকে কুয়াশা জমছে আর বৃষ্টি হচ্ছে। এখনঁ পর্যন্ত আমাদের ইতালীয় সূর্যকিরণ দেখা হয়নি। এ যাত্রায় আমার ভেনিস কিংবা তার শিল্পকলার কিছুই দেখা হবে না। আমার শরীর না সারা পর্যন্ত সে সব মুলতুবি রাখতে হবে।

তোমার ২৭ ফেব্রুয়ারির চিঠি আমি পেয়েছি।

তুমি জান ভেনিস খালের শহর, যাতায়াতের রাজপথ হল খাল, আর মোটর বোট এবং গণ্ডোলা এখানকার গাড়ি-ঘোড়া।

তোমার ২৭ তারিখের চিঠি, যে চিঠি আমি আজ পেলাম, তাতে তুমি শ্রীঅরবিন্দের ফুল ইত্যাদি পাঠাওনি। খবরের কাগজের কাটিংও পাঠাওনি (ফ্রি প্রেস এবং অন্যান্য কাগজ থেকে)। ভারতীয় সংবাদপত্রের জন্য আমি খুব ব্যস্ত হয়ে থাকি। কাটিং তুমি বিমানডাকে পাঠাতে পারো, কিন্তু প্রধান প্রধান ভারতীয় সংবাদপত্র কমপ্লিমেন্টারি কপিও নিয়মিত পেতে চাই, আমাকে এই

ঠিকানায় চিঠি লিখবে: C/O The American Express Company, 14 Kaerntnerring, Vienna.

গতকাল ইতালির সংবাদপত্রের কয়েকজন প্রতিনিধিকে আমায় সাক্ষাৎকার দিতে হয়েছিল। ইতালির খবরের কাগজের মধ্যে কয়েকটি আমি যথাসময়ে তোমাকে পাঠাব। সেগুলো একটু ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়ে নিয়ে ভারতীয় সংবাদপত্রে বের কোরো, অনুবাদের কাজে বম্বের ইতালীয় কনসুলেট কিংবা লয়েড ট্রিয়েসটিনোর এজেন্টরা সানন্দে সাহায্য করবেন।

ইতালীয় সরকারের নির্দেশে লয়েড ট্রিয়েসটিনো-র এজেন্টরা ভেনিসে আমাদের জাহাজ থেকে নামবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন। জাহাজেও তাঁরা আমার প্রতি খুব সহৃদয় ব্যবহার করেছেন। আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

তোমার চিঠি পেয়ে আমি তোমাকে একটা তার করব ভাবছিলাম, কিন্তু এখন ঠিক করেছি তোমার টেলিগ্রাফের ঠিকানা পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তত দিন আমি বিমানডাকে কিংবা সাধারণ ডাকে তোমায় চিঠি পাঠাব।

জাহাজে ওঠার পর আমি ফ্রি প্রেস এবং অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস-কে কয়েকটি বার্তা পাঠিয়েছি। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে পাঠিয়েছি ২৪, ২৫ আর ২৭ ফেব্রুয়ারি এবং ২ মার্চে বেতারে কিংবা তার-এ। ফ্রি প্রেসে আমি পাঠিয়েছি ২৩ ফেব্রুয়ারি ও ৬ মার্চে। একটু খোঁজ করে দেখো সে-সব বার্তাগুলো তারা ব্যবহার করেছে কি না। কাগজে প্রকাশ করেছে কি না।

রয়টার-এর প্রতিনিধি শুধু এডেনেই আমার সাক্ষাৎকার নেয়। তিনি আমায় জিজ্ঞেস করেন আমি মিশর যাব কি না, এবং যদি না যাই, আমি কোন পথে যাব এবং কোথায় যাব। আর কোথাও রয়টারের কোনও প্রতিনিধি এ পর্যন্ত আমার সাক্ষাৎকার নেয়নি। এ থেকে যা বোঝার তুমি বুঝতে পারবে। সেই অনুযায়ী ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাকে পরামর্শ দেবে।

আর্থিক ব্যাপারে আমি আশা করি তুমি যথাসাধ্য করবে।

ত্যাগমোহনকে বোলো তোমার চিঠির সঙ্গে তার চিঠি পেয়ে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। আমি তাকে আলাদা করে চিঠি না দেওয়ায় আশা করি সে কিছু মনে করবে না।

আমাকে নিয়মিত চিঠি দেবে। ডাক্তারেরা আমাকে পরীক্ষা করবার জন্য এবং রোগনির্ণয়ের জন্যে যতদিন চাইবেন আমি আশা করি ততদিন ভিয়েনায় থাকব। তাঁরা যে স্যানাটোরিয়ামে আমাকে যেতে বলেন, সেখানে যাব।

আশা করি ওখানে সবাই ভাল আছেন।

তোমার
সুভাষ

কান্তিলাল পারেখ-কে

C/o American Express Company
14 Kaerntnerring
Vienna-1
৮ মার্চ ১৯৩৩

প্রিয় কান্তিলাল,

তোমার ২৭.২.৩৩ তারিখের চিঠি ভেনিসে আমার হাতে এসেছে। ভেনিস থেকে আমি সাধারণ ডাকে জবাব দিয়েছি। এ চিঠি বিমান ডাকে পাঠাচ্ছি।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে আমি ২৪, ২৫, ২৭ ফেব্রুয়ারি এবং ২ মার্চে তার করে বার্তা

পাঠিয়েছি। ২৩ ফেব্রুয়ারি এবং ৬ মার্চ তারিখে পাঠিয়েছি ভেনিস থেকে আর আজ ভিয়েনা থেকে। সেগুলো নিয়ে তারা কী করেছে আমি জানবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে আছি।

তোমার টেলিগ্রাফিক ঠিকানার জন্য আমি অপেক্ষা করে আছি।

সৈদ বন্দরে রয়টারের প্রতিনিধি এসেছিল আমার গন্তব্যস্থল এবং কোন পথে যাব সে সম্পর্কে খোঁজ নিতে। অন্য কোথাও রয়টার আমার সম্পর্কে কোনও খোঁজ খবর নেয়নি। ৬ তারিখে ভেনিসে ইতালির সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা আমার কাছে এসেছিল। ভবিষ্যতে ভারতীয় সংবাদপত্র সম্পর্কে আমার কী করা উচিত সে বিষয়ে আমাকে পরামর্শ দাও। যদি সম্ভব হয় আমাকে চিঠি এইভাবে লিখবে:

Bose care TRAVAMEX
Vienna

পরের চিঠিতে আরও লিখব।

তোমার
সুভাষ

কান্তিলাল পারেখ-কে

Lloyd Triestino
C/o The American Express Co.
14 Kaerntnerring
Vienna-1
১৫ মার্চ ১৯৩৩

প্রিয় কান্তিলাল,

আমি তোমাকে গত সপ্তাহে ভিয়েনা থেকে বিমানডাকে এবং ৭ তারিখে ভেনিস থেকে সাধারণ ডাকে চিঠি দিয়েছি, তোমার ২৭ ফেব্রুয়ারির চিঠি পেয়ে।

১১ তারিখে আমাকে হোটেল থেকে শহরের ফুয়ের্থ স্বাস্থ্যোদ্ধার কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়।

আমাকে এখন একস্-রে এবং সবরকম ডাক্তারি পরীক্ষা করা হচ্ছে। পরীক্ষা শেষ হলে আমি তিন-চার জন বিশেষজ্ঞকে ডাকব পরামর্শের জন্য, এবং তাঁরা যদি বলেন, আমি শহরের বাইরে, খুব সম্ভব সুইজারল্যান্ডে কোনও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাব মনে করেছি।

তুমি কোনও অর্থ সংগ্রহ করতে পেরেছ কি না আমি জানি না, যদি পেরে থাকো এই চিঠি পেয়ে তারযোগে কিছু টাকা পাঠিয়ে দাও। এখানে আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানির টেলিগ্রাফের ঠিকানা হল:

Travamex, Vienna। এখানে থাকার খরচ আমি যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে বেশি, বিশেষত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে থাকতে গেলে। আমি বিমানযোগে এ চিঠি পাঠাচ্ছি, যাতে তুমি তাড়াতাড়ি পাও।

আমার খবর আমি কোথায় পাঠাব, ফ্রি প্রেসে, না অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসে, সে বিষয়ে তোমার মত জানতে আমি আগ্রহী। অবিলম্বে তোমার টেলিগ্রাফের ঠিকানা পাঠাও।

এত দিন আমি তোমাকে কোনও কেবল পাঠাইনি। কেননা, দীর্ঘ ঠিকানার দরুন পাঠানোর খরচ খুব বেশি হয়।

চিঠিতে তুমি লিখেছ খবরের কাগজের কাটিং পাঠাচ্ছ, কিন্তু আমি সে-সব কিছুই পাইনি। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের কাছ থেকে ফুল-টুলও কিছু পাইনি।

আগের চিঠিতেই লিখেছি, রয়টার একমাত্র সৈদ বন্দর ছাড়াও কোথাও আমার কোনও খোঁজ নেয়নি। আমি ফ্রি প্রেস আর অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস, দু'-জায়গাতেই বার্তা পাঠিয়েছি। সে-সব তারা ব্যবহার করেছে কি না জানতে আমি আগ্রহী। ফ্রি প্রেসকে আমি কেবল পাঠিয়েছি ২৩ ফেব্রুয়ারি, ৬ মার্চ এবং ৮ মার্চ (ভেনিস থেকে)। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে পাঠিয়েছি ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২৭ ফেব্রুয়ারি এবং ২ মার্চ তারিখে।

যদি তুমি কোনও অর্থ সংগ্রহ করতে পেরে থাকো, এখনই কেবল করে পাঠিয়ে দাও।

সকলকে আমার ভালবাসা জানাই।

তোমার
সুভাষ

কান্তিলাল পারেখ-কে

C/o American Express Co.
14 Kaerntnerring
Vienna-1
৩০.৩.৩৩

প্রিয় কান্তিলাল,

তোমার ২১ তারিখের চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছি। ২২, ২৩, এবং ২৪ তারিখের ফ্রি প্রেস জর্নাল আমি পেয়েছি। দেখো যেন আমি পত্রিকাটি নিয়মিত পাই। ক্রনিকল-ও যেন পাই।

টাকার ব্যাপারে কী করলে? যদি কিছু সংগ্রহ করতে পেরে থাক তার করে এখানে American Express-এ পাঠিয়ে দাও। যদি পাঠাতে না পার কোনও দ্বিধা-সংকোচ না করে আমাকে জানিয়ে দাও। এ সব ব্যাপারে তোমার কোনও সংকোচ করা উচিত নয়। আমাকে অনিশ্চয়তার মধ্যে রেখো না, ঠিক করে জানিয়ে দাও তোমার কাছ থেকে কিছু পাবার আশা করতে পারি কি না।

তোমার শরীর ভাল হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মি. হ্যারিম্যানের সঙ্গে দেখা করে কী হল আমাকে জানাও।

বম্বে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের শ্রীনিখিল সেনকে বোলো যেন তিনি শীঘ্র আমার চিঠির জবাব দেন।

ইউরোপে রয়টারের প্রতিনিধিদের তালিকা তোমার কাছ থেকে পাবার অপেক্ষায় আছি। প্রত্যেক ডাকে আমাকে পত্র দেবার চেষ্টা করো, দু-এক লাইন হলেও।

সকলকে প্রীতি জানাই।

তোমার
সুভাষ

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার-কে
[মূল বাংলায়]

C/o American Express Co.
14 Kaerntnerring
Vienna
28/4/33

বন্ধুবরেষু

আপনার চিঠিগুলি যথাসাধ্য পাইয়াছি। উত্তর দিতে পারি নাই বলিয়া ক্ষমা করিবেন। কত কথা বলিতে ও লিখিতে ইচ্ছা করে— কিন্তু শারীরিক সামর্থ্য কম— তা ছাড়া বলিবার সময় এখনও আসে নাই। এখন যদি বলিতে আরম্ভ করি— তা হইলে আপনারা শুনিবেন কি?

আমার জীবনে এক অধ্যায় শেষ হইয়া গিয়াছে। নতুন অধ্যায় আরম্ভ করিবার চেষ্টা করিতেছি। সেই সাধনায় আজ আমি ব্যাপৃত। আজ আমি সমুদ্র পারে, বিদেশে ভিয়েনা নগরে, অবস্থান করিতেছি বটে— কিন্তু সমস্ত প্রাণ মন আপনাদের কাছে পড়িয়া রহিয়াছে। প্রতি মুহূর্তে শুধু একই চিন্তা, একই প্রচেষ্টা, একই সাধনা আমাকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে— কী উপায়ে, কী শক্তি বলে— কী কৌশলে এই অর্ধজাগ্রত জাতিকে আত্মপ্রতিষ্ঠ ও জয়যুক্ত করা যাইতে পারে।

আমাদের জাতির ইতিহাসেও পুরাতন অধ্যায় শেষ হইয়াছে। ১৯২০ খ্রিস্তাব্দে যে অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছিল— সে অধ্যায় আজ সমাপ্ত। সত্যেনবাবু। বিশ্বাস করুন যে এই পুরাতন অধ্যায় আর ফিরিয়া আসিবে না। এখন চাই নূতন পন্থা— নূতন মন্ত্র— নূতন বীর্য। সে মন্ত্র— সে বীর্য আমরা পাইব নিজের অন্তরে— যদি অনুসন্ধান করি।

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে যে দিন নিজের অন্তরের শক্তির উপর ভর করিয়া সর্বপ্রকার পদগৌরব পরিহার করি, সেইদিনই আমার জীবনে পুরাতন অধ্যায় শেষ হইয়া গিয়াছে। একজন বন্ধু সেদিন আমার আচরণে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন— "ওঃ— এটা তো একটা political stunt।" ব্যথিত হইয়া আমি উত্তরে বলিয়াছিলাম— "the future will show।" আমি জানিতাম যে, যিনি যাহাই বলুন না কেন— যে অধ্যায় সমাপ্ত হল তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না।

আজ যেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি সেখানে আমি একা— নিঃসঙ্গ। চারিদিকে যখন তাকাই তখন মনে হয় চারিদিকে যেন ধূ ধূ করিতেছে নির্জন প্রান্তর। সেই নির্জনপ্রান্তরের মধ্যে আমি চলিয়াছি— নিঃসঙ্গ যাত্রীর মতো— মুখে শুধু ওই গান— "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলরে।"

কিন্তু এ নিঃসঙ্গ ভাব চিরকালের জন্য নয়। জীবনের প্রাচুর্য ও পরিপূর্ণতা লাভ করিতে হইলে নিজেকে একেবারে রিক্ত ও নিঃসঙ্গ করিতে হয়। তাই এই নিঃসঙ্গ ভাব। যদি মানুষ তৈরি করিতে হয়— যদি বজ্রাদপি কঠোর সঙ্ঘ সৃষ্টি করিতে হয় তাহা হইলে একেবারে নিঃসঙ্গ অবস্থা থেকে আরম্ভ করা নিতান্ত আবশ্যক। যেখানে Loaves and fishes লইয়া কাড়াকাড়ি— যেখানে স্বার্থ লইয়া অবিরাম দ্বন্দ্ব— সেখানে মনুষ্যত্ব, চরিত্রবল— কোনও প্রকার সার বস্তু সৃষ্টি হয় না বা টিকিতে পারে না।

Cromwell জয়যুক্ত হইয়াছিলেন কারণ তিনি Ironsides সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আমাদের Inside সেনানী কোথায়? আমরা এখনও স্বরাজ্যপ্রাপ্ত হই নাই কারণ আমাদের দেশে মানুষের মতো মানুষ এখনও তৈরি হয় নাই এবং বজ্রদপি কঠোর সেনাবাহিনী আমাদের নাই। যাহা নাই

তাহা সৃষ্টি করিতে হইবে— তা হলে আমরা জয়যুক্ত হইব— নতুবা নয়। আজ আমি তাই নূতনের সন্ধানে বাহির হইয়াছি—। সঙ্গে কি কেহ আসিবে? আসিলে কিন্তু পদে পদে বিপদ ও বিঘ্ন। সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া— একেবারে নিঃসঙ্গ ও রিক্ত হইয়া পথে নামিতে হইবে। কোনও প্রকার পুরস্কার বা পারিতোষিক পাইবার আশা নাই। Garibaldi-র ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে— "I shall give you hunger, thirst privation, forced marches and death."

যদি এইরকমের পুরস্কার কেহ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকে— তাহা হইলেই সে সহযাত্রী হইতে পারে। এমন যে যাত্রী— তার কপালে— হয় মৃত্যু না হয় মুক্তি ও অমৃতত্ত্ব। বাঙ্গলার পলিটিক্স— এখন কলুষিত। প্রচণ্ড ত্যাগ— বাঙ্গলার আবহাওয়াকে আবার পূত ও বিশুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। কাজটা অত্যন্ত কঠিন কিন্তু অসাধ্য নয়। বিশ্বাস করুন দুই বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশের এক অত্যাশ্চর্য পরিবর্তন আসিবে। বর্তমানের স্বার্থপূর্ণ কলহ আর বেশি দিন বাঙ্গলার আকাশবাতাশকে মুখরিত করিবে না। আসন্ন সুপ্রভাতের জন্য এখন থেকে যেন সর্বপ্রকার আয়োজন আরম্ভ হয়— ইহাই আমার একান্ত কামনা ও প্রার্থনা।

আশাকরি আপনারা সকলে ভাল আছেন আমার আন্তরিক ভালবাসা জানিবেন।

ইতি
ভবদীয়
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

সন্তোষকুমার বসু-কে

সন্তোষকুমার বসু
মেয়র, কলিকাতা
সমীপেষু

১১ মে ১৯৩৩

মহাশয়,

ভিয়েনার লর্ড মেয়র (Burgermeister) আমাকে অনুগ্রহ করে Rathaus (পুরসভার অফিস)-এ গতকাল ১০ মে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আপনার পত্র তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া আমি স্বয়ং তাঁকে, এবং ভিয়েনার মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনকে কলকাতার মেয়র এবং পুরসভার আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছি। আমার নিজের সাধুবাদও তাঁকে জানিয়েছি সমাজবাদী দলের নিয়ন্ত্রণে পৌর প্রশাসন বিগত কয়েক বছরে যে অগ্রগতি করেছে তার জন্য।

লর্ড মেয়র প্রত্যুত্তরে তাঁর ধন্যবাদ জানিয়েছেন, এবং কলকাতার মেয়র ও পুরসভাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন। ১৯২৪ সালে কংগ্রেসিরা প্রথম পুরসভায় প্রবেশ করার পর থেকে কলকাতা যে উন্নতি করেছে তার কথা আমার কাছে শুনে তিনি খুব আগ্রহান্বিত হয়েছেন।

লর্ড মেয়রকে আমি ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট-এর দুটি কপি দিয়েছি (একটি জয়ন্তী সংখ্যা, এবং সাম্প্রতিক "স্বাস্থ্য" সংখ্যা)। তিনি পেয়ে খুব খুশি হয়েছেন। ভিয়েনার পৌর প্রশাসন আমি ভাল করে জানতে চাই, এ কথা তাঁকে জানাতে তিনি সে বিষয়ে আমাকে সর্বপ্রকার সাহায্য করতে চেয়েছেন। আমার দ্রুত আরোগ্যও তিনি কামনা করেছেন, এবং আমি ভিয়েনার সবচেয়ে ভাল ডাক্তারদের চিকিৎসায় আছি শুনে তিনি আনন্দিত হয়েছেন।

আপনি সম্ভবত জানেন, মেয়র মহাশয়, যে প্রায় বারো বৎসর ভিয়েনা পুরসভা

সমাজতন্ত্রবাদীদের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই সময়ে তাঁরা বাসস্থান নির্মাণ, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং সাধারণভাবে সামাজিক কল্যাণে বিশেষ উন্নতি করেছেন। তাঁদের সবচেয়ে বড় সাফল্য এই সময়ের মধ্যে দু' লক্ষ লোকের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, এবং সে-কাজ তাঁরা করেছেন কোনও ঋণের বোঝা ঘাড়ে না নিয়ে। সমস্ত অর্থটা এসেছে বিলাসদ্রব্য এবং আমোদ-প্রমোদের ওপর কর ধার্য করে।

পুরসভার সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন অস্ট্রীয় বন্ধু আমাকে পুরসভার নির্মিত নতুন বাড়িগুলো এবং তাঁর সঙ্গে ছোট ছেলেমেয়েদের কল্যাণ ও শিক্ষার কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন। যতটুকু দেখেছি তাতেই আমি চমৎকৃত। আমার মনে হয় এইসব অভিজ্ঞতা কলিকাতা পুরসভার কাজে লাগা উচিত। ভিয়েনার Burgermeister Seitz-কে আমি আমাদের প্রথম মেয়রের কর্মসূচির কথা বলেছি। সেও প্রকৃতপক্ষে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি। এবং রাশিয়ার বাইরে সমগ্র ইউরোপে ভিয়েনাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক পুরসভা। এখানে আমি যা দেখছি ও শিখেছি তা নিয়ে একখানি বই যদি আমি ভিয়েনা সম্বন্ধে কষ্ট করে লিখতে পারি (যদি কলিকাতা পুরসভা চায়), আর পুরসভা যদি সে বই প্রকাশ করতে সম্মত হয়, তা হলে আমি খুব খুশি হব। ভিয়েনার ওপরে একখানি বই আমি এমনিতেই লিখব, তবে পুরসভার কাউন্সিলার ও সদস্যদের জন্য লিখলে সে বই আরও বেশি বিশদ হতে হবে। পুরসভা যদি চায় আমি এ কাজ হাতে নিই, আপনি আমাকে সে কথা জানালে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব, প্রয়োজন হলে আপনি এ পত্র পুরসভার সামনে দাখিল করতে পারেন।

ধন্যবাদান্তে এবং পুরসভার প্রতি এবং মাননীয় মেয়র, আপনার প্রতি উষ্ণ অভিনন্দন সহকারে

আন্তরিকভাবে আপনার
সুভাষচন্দ্র বোস

জে. টি. সাণ্ডারল্যাণ্ড-কে

C/o The American Express Co
14 Kaerntnerring
Vienna-1 (Austria)
১৮ মে ১৯৩৩

প্রিয় মি. সান্ডারল্যান্ড,

আপনার কাছ থেকে ও-রকম সদয় একখানি পত্র পেয়ে আমি কত আনন্দিত ও সম্মানিত বোধ করেছি আপনাকে বলতে পারব না। আমার শুধু এই দুঃখ, যে সঙ্গে-সঙ্গে আপনার চিঠির উত্তর দিতে পারিনি। আশা করি আমার স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থার কথা বিবেচনা করে আপনি আমায় ক্ষমা করবেন।

আমি আরও বিস্মিত এবং আনন্দিত হয়েছি আপনার স্বাক্ষরযুক্ত আপনার বইখানি পেয়ে। বইখানি আসামাত্র আমার বন্ধুদের মধ্যে তাকে নিয়ে রীতিমতো কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছে। বইখানি, আপনি ভালই জানেন, ভারতে পাওয়া যায় না, ভারত সরকার সেটিকে নিষিদ্ধ করেছে। সেই কারণে বইটি এখন মহামূল্যবান বলে গণ্য হয়।

শ্রী ভি. জে. প্যাটেল এখন ভিয়েনায় একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আছেন, এবং প্রায়ই আমাদের দেখা হয়। আপনি হয়তো শুনেছেন, আমেরিকা থেকে ফিরে তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাক্তারেরা

বলছেন তিনি সেখানে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতেন। যাই হোক এখানে এসে যখন পৌঁছলেন তখনকার চেয়ে এখন তিনি খানিকটা সুস্থ হয়েছেন। আমরা আশা করি বিশ্রাম এবং চিকিৎসার ফলে ধীরে-ধীরে তিনি তাঁর আগেকার শক্তি ফিরে পাবেন। শ্রীপ্যাটেলের কাছে আমি তাঁর আমেরিকার অভিজ্ঞতার কথা শুনেছি।

আপনার চিঠিতে আমার সম্পর্কে আপনি যে শুভেচ্ছা ব্যক্ত করেছেন, তার জন্য আমি কতদূর কৃতজ্ঞ বলে বোঝাতে পারি না। আপনি যখন দয়া করে এই পত্রালাপের সূত্রপাত করেছেন, আমি আশা করি ভবিষ্যতেও চালিয়ে যাবেন।

আপনার বই আমি গভীর কৃতজ্ঞতা সহকারে বহুমূল্য জ্ঞানে আমার কাছে রেখে দেব। আবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

শ্রদ্ধাসহকারে
সুভাষচন্দ্র বোস

পুঃ আমি এখানে আসার পরে আমার স্বাস্থ্যের খানিকটা উন্নতি হয়েছে, তবে উন্নতির গতি একটু ধীর।

সু. চ. ব.

সন্তোষকুমার বসু, কলিকাতার মেয়র-কে

C/o The American Express
14 Kaerntnerring
Vienna-1
২৩ মে ১৯৩৩

মেয়র
কলিকাতা পুরসভা
সমীপেষু,

প্রিয় মহাশয়,

গত সপ্তাহে আপনাকে আমি যে পত্র প্রেরণ করেছিলাম তাতে জানিয়েছিলাম ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ভিয়েনা মিউনিসিপ্যালিটি সম্পর্কে আমি একখানি বই লিখতে ইচ্ছুক। আমি আরও বলেছিলাম কলিকাতা পুরসভা সেই গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করার কথা বিবেচনা করতে পারে। তা হলে আমি বইখানিকে বিস্তৃততর রূপ দেবার চেষ্টা করতে পারি। অন্যথায় তা সম্ভব হবে না।

ভিয়েনায় মেয়র (Burgermeister) আমাকে টাউন হল (Rathaus)-এ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আমন্ত্রণ করার পর থেকে, গত বারো বছরে মিউনিসিপ্যালিটি যে-সব প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছে তার কয়েকটি পরিদর্শন করবার সুযোগ পেয়েছি। মিউনিসিপ্যালিটি নির্মিত বাসস্থানগুলির কিছু-কিছু আমি এ পর্যন্ত দেখতে পেরেছি। সেগুলোর পরিকল্পনায় চমৎকার বৈচিত্র্য আছে। এক দিকে, শহরের কেন্দ্রস্থলে আছে বিরাট-বিরাট ফ্ল্যাটবাড়ি, আরেক প্রান্তে আদর্শ উদ্যান নগরী রূপে নির্মিত শহরের উপকণ্ঠে স্বয়ংসম্পূর্ণ কুটির, সঙ্গে বাগান। এই দুই

সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের বাসস্থান মধ্যবর্তী অনেক মিশ্রধরন নিয়ে স্থপতিরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন।

আমি আরও দেখবার সুযোগ পেয়েছি কিন্ডারগার্টেন গৃহ, যে-সব বাড়িতে গরিবদের ছেলেমেয়েরা, তাদের বাবা-মা'রা সারাদিন কাজ করেন, তাদের যত্ন নেওয়া হয়, লেখাপড়া শেখানো হয়। দরিদ্রদের সন্তানদের জন্য যে-সব ব্যবস্থা তা এমন যে ধনীরাও তাতে ঈর্ষা বোধ করবে।

তা ছাড়া আমি যুদ্ধের পরে নির্মিত জনসাধারণের স্নানাগারগুলি দেখেছি। এই সব পৌর স্নানাগারগুলির কল্যাণে ভিয়েনাবাসীগণ এখন স্নানের ও রোদ পোহানোর এমন সুযোগ পেয়ে থাকেন যে তার ফলে ক্ষয় রোগের হার রীতিমতো কমে গেছে। এই সব স্নানাগারের অভ্যন্তরের ব্যবস্থা এত সুন্দর যে হাজার-হাজার লোক দিনের পর দিন স্নান করতে পারে, কোনও বিঘ্ন, কোনও অসুবিধা ছাড়াই। জল অনবরত পরিস্রুত হয়ে চলেছে, ফলে বড়-বড় জলাশয়গুলির জল অতি নির্মল, অত্যন্ত অকলুষ।

তা ছাড়া, আরামের জন্যে যতটা প্রয়োজন জল সেই তাপমাত্রায় রাখা হয়। শুধু ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য আলাদা জলাশয় আছে।

এই সপ্তাহে আমি বিশাল-বিশাল বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করব। মিউনিসিপ্যালিটিই সেগুলোর মালিক ও তারাই পরিচালনা করে। এ-ভাবে আমার স্বাস্থ্যে যতটা কুলোয় আমার সমস্ত বিভাগগুলিই ঘুরে-ঘুরে দেখবার ইচ্ছা আছে, বিশেষ করে যেগুলোতে আমরা পিছিয়ে আছি। পুরসভা কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে যে-যে প্রতিষ্ঠান আমি দেখতে চাই, তার প্রত্যেকটি পরিদর্শনের সুযোগ আমি পাচ্ছি।

সবশেষে অর্থ বিভাগের কথা বলি। গত বারো বছরের অসাধরণ সাফল্য অর্থবিভাগেরই সু-পরিচালনার ফল। আপনি শুনলে বিস্মিত হবেন, মাননীয় মেয়র, নতুন-নতুন উৎপাদন কেন্দ্রগুলির অধিকাংশ নির্মিত হয়েছে পুরসভার আয় থেকে। তার জন্য কোনও ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন হয়নি। এ-কাজ সম্ভব হয়েছে আমোদ-প্রমোদ, বিলাস-দ্রব্য ইত্যাদির ওপর কর বসিয়ে, যার উদ্দেশ্য ধনীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে তা দিয়ে দরিদ্রদের অতীতের চেয়ে উন্নত পরিষেবা প্রদান।

আপনি হয়তো জানেন, মাননীয় মেয়র মহাশয়, যে সমাজতান্ত্রিক পুরসভার একটি কার্যকর উদাহরণ ভিয়েনা, এবং সে হিসাবে ইউরোপে তার স্থান অনন্য। আমার বিবেচনায় কলিকাতার প্রথম মেয়র যে কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন সেটি একটি সমাজতান্ত্রিক কার্যক্রম, এবং আমার কোনও সন্দেহ নেই, ভিয়েনা মিউনিসিপ্যালিটির পরিচালনা থেকে শিক্ষণীয় আমার অনেক কিছু আছে।

মেয়র মহোদয়, আপনি যদি অনুগ্রহ করে অবিলম্বে বিষয়টি পুরসভার সামনে পেশ করেন, এবং তাঁদের সিদ্ধান্ত আমাকে জানান, আমি বাধিত হব।

ধন্যবাদান্তে

আপনার

সুভাষচন্দ্র বোস

আলফ্রেড টিরনয়ার-কে

হোটেল ডি ফ্রান্স
২৭ মে ১৯৩৩

প্রিয় মি. টিরনয়ার

আমি এই সঙ্গে এমন কিছু খবর পাঠাচ্ছি যাতে অনেকে আগ্রহ বোধ করতে পারেন। এই খবরের যতদূর সম্ভব ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা যদি আপনি করতে পারেন, আমি আনন্দিত হব। ভাল হয়, এ খবর যদি আপনি অস্ট্রিয়ার সরকারি এজেন্সিকে দিতে পারেন, যাতে ভিয়েনার সংবাদপত্রগুলিতে এটি প্রকাশিত হয়। তা ছাড়া ইতালি, ফরাসি এবং জার্মান সংবাদপত্রে এবং আমেরিকান সংবাদপত্রেও দয়া করে এ খবর পাঠানোর চেষ্টা করুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ খবর ব্যাপকভাবে প্রচারিত হলে ওরা আমাকে ইংল্যান্ড যাবার জন্য পাসপোর্ট দিতে বাধ্য হবে, অতএব, দয়া করে আমার জন্য এই কষ্ট স্বীকার করুন।

ধন্যবাদান্তে

আপনার
সুভাষ সি. বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

হোটেল ডি ফ্রান্স, উইয়েন
২৮ মে ১৯৩৩

প্রিয় মিসেস ভেটার

আমার এক বন্ধু ভারত থেকে আমাকে কিছু আম এনে দিয়েছেন। ড. ভেটার এবং আপনার জন্য দুটি আম কি পাঠাতে পারি? আরও কয়েকটি বেশি পাঠাতে পারলে খুশি হতাম।

আপনি তো জানেন, আম একটি ভারতীয় ফল, আমাদের শ্রেষ্ঠ ফলগুলির অন্যতম। আমার আশা এই জাতের আম মিষ্টি।

আপনাকে এবং ড. ভেটারকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই।

আপনার
সুভাষ সি. বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

হোটেল ডি ফ্রান্স
৩১ মে ১৯৩৩

প্রিয় মিসেস ভেটার,

আজ অপরাহ্নে আমি যে ভাষণটি দেব তার একটি অনুলিপি আমি এই সঙ্গে পাঠালাম। আমি অবশ্য লিখিত ভাষণ পড়ব না, তবে সঙ্গের নোটটি পেলে আপনি আমার বক্তব্য খানিকটা জানতে পারবেন। তার ফলে ভাষণটিকে সঙ্গে-সঙ্গে জার্মান ভাষায় তর্জমা করতে আপনার কোনও অসুবিধা হবে না।

ধন্যবাদান্তে

আপনার
সুভাষ সি. বোস

সন্তোষকুমার বসু, কলিকাতার মেয়র-কে

C/o American Express Co.
14 Kaerntnerring
Vienna-1(Austria)
১৮ জুন ১৯৩৩

মেয়র
কলিকাতা পুরসভা
সমীপেষু,

মহাশয়, আমার দ্বিতীয় পত্রটি আপনাকে পাঠানোর পর আমি ভিয়েনার পুরসভার কয়েকটি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছি। আমাকে ঘুরিয়ে দেখাবার জন্য ভিয়েনার মেয়র অনুগ্রহ করে একজন ইংরেজিভাষী অফিসারকে সঙ্গে দিয়েছিলেন, এবং একটি গাড়িও আমাকে দেওয়া হয়েছিল। বিগত পক্ষকালে আমি বিদ্যুৎ এবং গ্যাস উৎপাদন কেন্দ্র এবং জল সরবরাহ কেন্দ্র পরিদর্শন করেছি। প্রতিটি বিভাগীয় কর্তা সমান সৌজন্য প্রদর্শন করেছিলেন, এবং কলিকাতার জন্য প্রয়োজন যাবতীয় তথ্য এবং পরামর্শ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। আগামী সপ্তাহে আমি ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা পরিদর্শন করব, এবং রাস্তা-নির্মাণ এবং রাস্তা পরিষ্কার করার ব্যবস্থাদি দেখব। বাসস্থানের ব্যবস্থা, সামাজিক কল্যাণের ব্যবস্থা এবং সাধারণের জন্য স্নানাগারগুলি পুরসভা নির্মাণ করেছেন এবং পরিচালনা করেন, তার কিছু-কিছু আমি আগেই দেখেছি। আমার ইচ্ছা শুধু এই, যে আমি এখানে যা দেখলাম, আমার যা অভিজ্ঞতা হল, তা যেন কাজে লাগে।

আপনি সম্ভবত জানেন, মেয়র মহোদয়, যে ভিয়েনার জনসাধারণের ব্যবহার্য সমস্ত সুযোগ-সুবিধাদি, বিদ্যুৎ-সরবরাহ, গ্যাস-সরবরাহ, ট্রাম ইত্যাদির মালিক এবং পরিচালক ভিয়েনা পুরসভা। ইউরোপের অন্যত্র বিদ্যুৎ এবং গ্যাসের যা দাম, তার তুলনায় এখানে দাম অনেক সস্তা।

গত বারো বছরে, পুরসভা প্রায় দু' লক্ষ লোককে বাসস্থান দিয়েছে, এবং তার জন্য কোনও ঋণ নেয়নি। বিলাসদ্রব্য এবং আমোদ-প্রমোদের ওপর কর বসিয়ে অর্থ সংগ্রহ করেছে।

আমার এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে কলিকাতার করদাতাদেরকে সুলভে গ্যাস এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রয়োজন সম্পর্কে পুরসভা সজাগ থাকবে। এই সমস্যার এবং অন্যান্য অনেক সমস্যার সুরাহা করবার জন্য ভিয়েনার মিউনিসিপ্যালিটির কাজ এবং অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের অনেক কিছু শিখবার থাকতে পারে।

আপনাকে, মেয়র মহোদয়, এবং পুরসভা আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

আপনার
সুভাষ চন্দ্র বোস

বিভাবতী বসু-কে[১]

[মূল পত্র বাংলায়]

ভিয়েনা
২১.৬.৩৩

প্রিয় মেজ বউদিদি,

দীর্ঘদিন তোমাকে কোনও চিঠি লিখিনি বলে তুমি নিশ্চয়ই আমার ওপর খুব রাগ করে আছ। আমি অপরাধ স্বীকার করছি। চিঠি লেখার সময় এলেই এক আশ্চর্য আলস্য আমাকে পেয়ে বসে। ফলে কোনও চিঠিই লেখা হয় না। এভাবেই বেশ কয়েকটি সপ্তাহ কেটে গেল।

আমার স্বাস্থ্য খুব ধীরে ধীরে ভাল হয়ে উঠছে। অবশ্য ওজন সেরকম বাড়েনি। কিন্তু সে-নিয়ে আমার কোনও দুঃখ নেই। পেটমোটা হওয়ার কোনও মানেই হয় না। শরীরে আগের চেয়ে অনেক বেশি বল পাচ্ছি। আমি এখনও চিকিৎসাধীন এবং খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে প্রচুর নিষেধ মেনে চলতে হচ্ছে। এর মধ্যে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, লোকে আমার বয়স আন্দাজ করতে গিয়ে বলে, বত্রিশের বেশি হতেই পারে না। অনেকেই বলেছে, আমার বয়স আঠাশ। সুতরাং, আগে আমার প্রায়ই যে মনে হত, আমি বেশ বুড়োটে দেখতে হয়ে যাচ্ছি, সে ধারণা পুরোপুরি ভেঙে গেছে।

মেজদাদা আগের চেয়ে ভাল আছেন শুনে খুব ভাল লাগছে। তুমি কেমন আছ? নাড়া-নেড়িগুলো সব কেমন আছে? ওদের চিঠি দিচ্ছি না বলে বোধহয় সব রেগে আছে। অশোকের চিঠিতে জানলাম সে ভাল আছে। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিয়ো।

তোমার
সুভাষ

---

১. এই পত্রটি বাংলায় লিখিত ছিল। মূল পত্র এখন আর পাওয়া গেল না বলে ইংরাজি অনুবাদ থেকে বাংলায় পুনরুদিত হল।

নাওমি সি. ভেটার-কে

প্যালেস হোটেল
ইনড্রিসক
প্রাগ
২৯ জুন ১৯৩৩

প্রিয় মিসেস ভেটার,

আমি আজ বিমানযোগে এখানে পৌঁছেছি, আমার হোটেল থেকে এখনও বেরোইনি। বিমানযাত্রা আমার আরামের হয়নি, একটু গা-বমি করছিল। যাই হোক, এখানে পৌঁছে এখন ভাল আছি। এখনও শহরের কিছুই দেখিনি।

প্রেসিডেন্ট ভেটার ও আপনার প্রতি শুভেচ্ছা সহ,

আপনার
সুভাষ সি. বোস

সন্তোষকুমার বসু-কে

সন্তোষকুমার বসু
মেয়র
কলিকাতা
সমীপেষু,

প্যালেস হোটেল
প্রাগ
৯ জুলাই ১৯৩৩

প্রিয় মেয়র মহাশয়,

আমি সপ্তাহখানেক আগে এখানে (প্রাগে) পৌঁছেছি। পৌঁছবার পর প্রাগের Primator (মেয়র) আমাকে টাউন হলে তাঁর অফিসে অভ্যর্থনা জানান। আমাদের মধ্যে অনেকক্ষণ বেশ উৎসাহোদ্দীপক কথা-বার্তা হয়। তিনি কলকাতা এবং প্রাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগে আনন্দ প্রকাশ করেন।

প্রাগের Primator কলকাতার মেয়র এবং নাগরিকদের উদ্দেশে তাঁর অভিনন্দন পাঠিয়েছেন। তাঁর নিজের ফোটো, এবং স্বাক্ষরও পাঠিয়েছেন। সে-সব এই সপ্তাহে পাঠানো হচ্ছে।

পুরসভার অফিস আমাকে ঘুরিয়ে দেখানো হয়। তার কোনও-কোনও অংশ অতি প্রাচীন ও অতিশয় শিল্পশোভামণ্ডিত। পরে আমাকে বিভিন্ন সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া হয়। তার মধ্যে সব চাইতে বিখ্যাত অক্ষম এবং শিশুদের ম্যাসারিক হোম। জল-সরবরাহ কেন্দ্র, ভূগর্ভস্থ পয়ঃ-প্রণালী কেন্দ্র এবং গ্যাস সরবরাহকেন্দ্রগুলিও ঘুরে দেখলাম। আবার বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রগুলিও দেখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কিন্তু সে-সব দেখবার সময় পাইনি। যে যে বিষয়গুলি সম্পর্কে আমি বেশি আগ্রহ বোধ করেছি, আপনাকে পরের চিঠিতে জানাব। ইতিমধ্যে আপনাকে জানাই, এখানকার পুরসভা জঞ্জাল দূরীকরণের জন্য

একটি নতুন চুল্লি বসাচ্ছে, এবং সেই চুল্লি থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। এ কাজ নিয়েছে স্কোডা ওয়ার্কস।

Primator (মেয়র) আমার বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় গাড়ির ব্যবস্থা করেছেন, এবং ঘুরিয়ে দেখাবার জন্য ইংরেজিভাষী অফিসারও আমার সঙ্গে দিয়েছেন।

মেয়র মহোদয়, প্রাগের Primator-এর আপনাকে পাঠানো অভিনন্দনের যে উত্তর আপনি দেবেন, তা পেয়ে তিনি নিঃসন্দেহে আনন্দিত হবেন। কলকাতা পুরসভার, কিংবা পুরসভার কোনও অফিসার প্রাগের পুরসভার কাজ সংক্রান্ত কোনও সমস্যা সম্পর্কে কোনও তথ্য জানতে চান, এখানকার পুরসভা-কর্তৃপক্ষ সানন্দে তা জানাবেন।

প্রাগ পুরসভা বর্তমানে এক নতুন ধরনের টার-ম্যাকাডাম রাস্তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। এই ধরনের রাস্তা পিচের রাস্তার চেয়ে কোনও অংশে নিকৃষ্ট নয়, অথচ এর খরচ অনেক কম। যে ইঞ্জিনিয়ার আমাকে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন, তাকে আমি বললাম, এই পরীক্ষাতে কলকাতাও খুব আগ্রহ বোধ করবে।

মেয়র মহোদয়, আপনার প্রতি ও পুরসভার প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন সহ

আপনার

সুভাষচন্দ্র বোস

শ্রীমতি সি. ভেটার-কে

হোটেল ব্রাল
ফ্রেডরি নং ১২
ওয়ারস
পোল্যান্ড
১০.৭.১৯৩৩

প্রিয় মিসেস ভেটার,

ওপরের ঠিকানা দেখলেই আপনি বুঝবেন আমি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা গড়িয়ে-গড়িয়ে বেড়াচ্ছি।

প্রাগে অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে আমার সময় কাটল, সারাদিন ঘোরাঘুরির পরে আমার এত ক্লান্ত লাগছিল যে আর চিঠি লিখবার মতো জোরও পাচ্ছিলাম না। তাই, এর আগে আপনাকে চিঠি না দিতে পারার জন্য ক্ষমা করবেন।

আপনার দু' খানি চিঠিই পেয়ে আমি খুব আনন্দিত হলাম। ভিয়েনাতে আপনাদের কাছে বিদায় নিয়ে আসবার সময়ে আমি গভীর বেদনা বোধ করেছিলাম। ড. ভেটার এবং আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার ছিল না। জাতি হিসাবে আমরা অতিশয় আবেগপ্রবণ, তবুও সবাই বলে বাইরে থেকে আমাকে ভাবলেশহীন মনে হয়। অন্তত আমার কয়েকজন বন্ধু আছেন যাঁরা ওই কথা বলেন।

আপনারা যে আমাদের দেশের সম্পর্কে আগ্রহী, সেটা আমার অপরিসীম আনন্দের কারণ এবং আপনাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতাবোধ তাতে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আপনারা জানেন, আমার নগণ্য জীবন আমার দেশের সেবায় আমি উৎসর্গ করেছি। তাই, কেউ আমার দেশ

সম্পর্কে কোনও আগ্রহ দেখালে আমার আনন্দের সীমা থাকে না।

আমি নিশ্চিত জানি, আপনারা চাইলে ভারতের জন্য অনেক কিছু করতে পারেন। আপনারা যে ইউরোপের পাঠকদের পাঠের উপযোগী একখানি বই ভারত সম্বন্ধে লিখবার কথা ভাবছেন, এ অতি উত্তম এবং অতিশয় প্রয়োজনীয় প্রস্তাব। এই ব্যাপারে আপনারা সর্বদাই যে আমার সাহায্য পাবেন, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

আমি সদ্য ওয়ারসতে পৌঁছেছি এবং এখানকার লোকজন এবং বিভিন্ন স্থান একটু দেখা হলে আবার আপনাদেরকে চিঠি দেব।

প্রাগের একটা নিজস্ব আকর্ষণ আছে—বিশেষত তার প্রাচীন সৌধগুলির এবং মধ্যযুগীয় নানা ধ্বংসাবশেষের, তবে ভিয়েনার কোনও তুলনা নেই। আমি প্রাগে যত দিন ছিলাম সেটা দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব স্থাপনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। কিন্তু যাঁদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে তাঁরা প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে খুব সদয় ব্যবহার করেছেন। গভর্নমেন্ট (অর্থাৎ বিদেশ দপ্তর ও বাণিজ্য মন্ত্রক) আমার কার্যসূচি ঠিক করে দিয়েছিল, এবং আমি কোথায়-কোথায় যাব, কোন-কোন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করব, তার ব্যবস্থা করেছিল। কাজেই, আমার নানা জায়গায় যেতে কোনও অসুবিধা হয়নি। বিদেশমন্ত্রী ড. বেনেস-এর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল এবং আগ্রহজনক নানা বিষয়ে কথাবার্তা হয়েছিল। মোটের উপর আমার প্রাগে যাওয়ায় ভালই কাজ হয়েছে। চেকোস্লোভাকিয়া ও ভারতের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য প্রাগে আমরা একটি সমিতি গঠন করতে পারব।

আশা করি দিন আষ্টেক এখানে থাকব। এখান থেকে আমি যাব বার্লিন এবং সেখানে দিন দশেক থাকব। বার্লিনে আমার কার্যসূচি কী হবে আমি এখনও ঠিক করিনি। স্থির হলে আপনাকে জানাব।

শুভেচ্ছা সহ,

আপনার
সুভাষ সি. বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

হোটেল ব্রাল
ওয়ারস
১৫. ৭. ১৯৩৩
শনিবার রাত্রি

প্রিয় মিসেস ভেটার,

আপনি দয়া করে যে চিঠিগুলো আমাকে পাঠিয়েছেন তার জন্য উপযুক্ত ধন্যবাদ দেবার ভাষা আমার জানা নেই। আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে যত কথা আমার মনে জমে আছে সেগুলো লিখতে বসার সময়ও পাচ্ছি না। আজ রাতে, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আপনাকে এটুকু জানাই যে আমার দীর্ঘ ভিয়েনাবাসের বিনিময়ে, আমার দেশ পেয়েছে আপনাদের মতো সত্যিকারের এবং চিরকালের চমৎকার বন্ধু। আমি আশা করি, আপনারা চিরকালই ভারতের প্রতি আগ্রহী থাকবেন। আমি ভারতবর্ষের একজন সামান্য প্রতিনিধি মাত্র। আমার মধ্যে যদি কিছুমাত্র ভাল থাকে, তা হলে জানবেন, তা আমার দেশেরই গুণ। আর আমার মধ্যে যা-কিছু খারাপ, তার জন্য দায়ী কেবল আমি-ই। অন্য কেউ-ই নয়।

সোমবার সকাল (১৭ই জুলাই) আমি বার্লিনের উদ্দেশে যাত্রা করছি, আশা করছি ওখানে সামান্য বিশ্রাম পাবো। প্রাগ আর ওয়ারসতে আমি সারাক্ষণ ঘুরেছি। তবে এটা বলতে ভাল লাগছে যে এই দুটো জায়গাতেই আমার উপস্থিতির উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

স্পেনের রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে আপনি দয়া করে চিঠিগুলো সংগ্রহ করে আপনার কাছে রেখে দেবেন। স্পেনে যাবার আগে আমি আপনার কাছ থেকে নিয়ে নেব।

আমার বার্লিনের ঠিকানা হল—প্রযত্নে: আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানি।

আমি বার্লিন থেকে আপনাকে দীর্ঘ পত্র দেব। আমার কাজগুলো গুছিয়ে নিতে একটু অসুবিধে হচ্ছে—তাই এখুনি নির্দিষ্ট করে কিছু জানাতে পারলাম না। আমি দারুণ সম্মানিত এবং গভীর কৃতজ্ঞতা বোধ করছি, যখন আপনি জানালেন যে আমি ভিয়েনায় ফিরে এলে আপনি থেকে যাবেন। আমার সবকিছু মোটামুটি গুছিয়ে নিয়েই সব কাজকর্মের পরিকল্পনা আপনাকে জানিয়ে দেব।

প্রেসিডেন্ট ভেটার এবং আপনার প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।

আপনার
সুভাষ সি. বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

Grand Hotel am Knie
Berlin
২২. ৭. ১৯৩৩

প্রিয় মিসেস ভেটার,

আপনাকে কথা দিয়েছিলাম বার্লিনে পৌঁছে দীর্ঘ চিঠি দেব। সে-কথা না রাখতে পেরে আমি অতিশয় দুঃখিত।

আমার মনে হয়, প্রাগ এবং ওয়ারস-তে আমি অতিরিক্ত পরিশ্রম করেছিলাম। তার ফল এখন বুঝতে পারছি। অবসন্ন লাগছে, জ্বর-জ্বর ভাব হয়েছে। তবে আশা করি দু-তিন দিনের মধ্যে সেরে উঠব।

এখনও বার্লিন আমার ভাল করে দেখা হয়নি। তাই ভাবছি আরেক সপ্তাহ এখানে থাকব। আপনি আমাকে যে পরিচয়-পত্রগুলি পাঠিয়ে দিয়েছেন সে জন্য অনেক ধন্যবাদ।

ওয়ারসতে যে-সব বন্ধুর সঙ্গে আপনি পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁরা আমার চিঠির জবাব দেননি। আমার মনে হয় গ্রীষ্মকালের ছুটিতে তাঁরা ওয়ারস-এর বাইরে গিয়েছেন। তাঁদের বাড়িতে গিয়ে দেখা করবার সময় পাইনি।

সোম কি মঙ্গলবার আবার আমি আপনাকে চিঠি দেব। পরের চিঠিতে আরও খবর দেব।

ড. ভেটার ও আপনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

আপনার
সুভাষ সি. বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

Grand Hotel am Knie
Berlin
৪. ৮. ১৯৩৩
শুক্রবার

প্রিয় মিসেস ভেটার,

আপনি অনুগ্রহ করে যে সুন্দর ফুলগুলো আমাকে পাঠিয়েছেন, তার জন্য আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ দেব জানি না। আপনি আমাকে যে উপহার পাঠালেন, তার চেয়ে ভাল, আনন্দদায়ক কোনও উপহারের কথা আমি নিজেও ভাবতে পারি না। ফুলগুলো খুব টাটকা অবস্থায় আমার কাছে পৌঁছেছে। আমার সামনে টেবিলে এখন সেগুলো রয়েছে। আরও কয়েকদিন ফুলগুলো তাজা থাকবে।

ফুলগুলো আমাকে কী বলছে সে বিষয়ে আপনার কথাই ঠিক। মঙ্গলবার থেকে আমার শরীর আগেকার চেয়ে ভাল আছে। কাজেই আমি এখানে কিছু-কিছু কাজ আরম্ভ করেছি। এখন আমি বিভিন্ন পৌর প্রতিষ্ঠানে যাচ্ছি। মঙ্গলবারে বার্লিনের Oberburgermeister-এর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

বার্লিন দেখে আমার কেমন লাগল, কী মনে হল, এখনও বলার সময় আসেনি। তবে আমি এটুকু বলতে পারি যে প্রাগ এবং ওয়ারস দু'-জায়গাতেই পদাধিকারীরা আমাকে সাদর অভ্যর্থনা করেছেন। এটাও দেখলাম, ভারত সম্পর্কে তাদের প্রচুর আগ্রহ।

এই সঙ্গে আমি কলকাতার মেয়র ও ডেপুটি মেয়রের চিঠি পাঠালাম। তাঁরা দু'জনেই আমার বন্ধু। মনে হয়, ভিয়েনা সম্পর্কে তাঁদের প্রকৃত আগ্রহ জন্মেছে। দয়া করে আপনার সুবিধে মতো চিঠি দুটো ফেরৎ পাঠিয়ে দেবেন, কেননা আমাকে চিঠির উত্তর দিতে হবে।

আমার নিজের পাহাড় খুব ভাল লাগে এবং এই আমার একটা দুঃখ যে বঙ্গদেশে আমাদের বেশি পাহাড়-পর্বত নেই। পাহাড়ে যেতে গেলে আমাদের একদম উত্তরে চলে যেতে হয়, হিমালয়ে। কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তুষার দৃশ্য আমাদের আছে, ২৭,০০০ ফুট উঁচু কাঞ্চনজঙ্ঘা। আপনার সর্বশেষ ২ আগস্টের চিঠিতে আপনি পর্বত এবং ফুলের কথা যা লিখেছেন, পড়ে আমি খুব আনন্দ পেলাম। চিঠিটি আমি আজ সকালে পেয়েছি।

ড. ভেটার এবং আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার নেবেন।

আপনার
সুভাষ সি. বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

Grand Hotel am Knie
Berlin
১০. ৮. ১৯৩৩

প্রিয় মিসেস ভেটার,

আমার বন্ধু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. হরিশচন্দ্র সিংহ এখন বার্লিনে আছেন। ১৩ তারিখ সকালে তিনি বার্লিন থেকে মিউনিক যাবেন। আমার খুব ইচ্ছে, ভিয়েনাতে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সৌভাগ্য ও আনন্দ যেন তিনি লাভ করেন।

ড. সিংহ অর্থশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং কলকাতায় তিনি অর্থবিদ্যা এবং ব্যাঙ্কিং বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। অল ইন্ডিয়া স্ট্যাটিসটিক্যাল সোসাইটি-রও তিনি সেক্রেটারি।

আমি চাই ড. সিংহ Rathaus-এ Dr. Neurath-র মিউজিয়ামটি দেখুন। দেখে তাঁর ভাল লাগবে এবং সেটা তাঁর পক্ষে লাভজনকও হবে। আপনি কি দয়া করে তার ব্যবস্থা করতে পারবেন?

আমি একটু ভাল আছি।

পরের চিঠিতে আরও খবর দেব।

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

বার্লিন
২৫. ৮. ১৯৩৩
শুক্রবার রাত্রি

প্রিয় মিসেস ভেটার,

অনেক দিন আপনাকে চিঠি লিখিনি বলে আমি দুঃখিত।

ড. সিংহ এখানে কয়েক দিন ছিলেন। আপনি যে ওখানে থাকবার সময়ে তাঁকে সাহায্য করতে পেরেছেন তাতে আমি খুশি হয়েছি।

রবিবার আমি ফ্র্যানজেনসবাড যাচ্ছি। কয়েকদিন সেখানে থাকব। সেখান থেকে কৃষ্ণঅরণ্যে যাবার ইচ্ছে আছে।

যত শীঘ্র সম্ভব দয়া করে আমাকে জানান চার-পাঁচ দিন পরে আপনারা কোথায় থাকবেন। আপনার উত্তর পেলে আমি আপনাদের জানাব ফ্র্যানজেনসবাড যাওয়ার পথে আমি ভিয়েনা যাব কি না।

এই ঠিকানায় চিঠি দেবেন:
Villa Dr. Steinsberg
Franzensbad
C S R

ড. ভেটারের ও আপনার প্রতি শুভেচ্ছা সহকারে

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

ফ্র্যানজেনসবাড সিএসআর
৩১. ৮. ১৯৩৩
বৃহস্পতিবার

প্রিয় মিসেস ভেটার,

গত রবিবার আমি বার্লিন থেকে এখানে এসেছি। কাল (শুক্রবার) আমি ভিয়েনা যাব শ্রীপ্যাটেলের সঙ্গে। উনি এখন এখানে আছেন।

এখানে আসার আগে আমি বার্লিন থেকে আপনাকে চিঠি দিয়েছিলাম। বোধ হয় আপনি এখন ভিয়েনায় নেই। তাই জবাব পাইনি।

ভিয়েনায় কয়েকদিন থাকব। তারপর সম্ভবত আমি Schwarzwald, কিংবা অন্য কোনও স্বাস্থ্যকর জায়গায় যাব। এখন মনে করছি সপ্তাহখানেক ভিয়েনায় থাকব।

আমার সঙ্গে দেখা করতে ভিয়েনায় এসে আপনার ছুটি নষ্ট করবেন না। এখনই আমি ভারতে ফিরে যাচ্ছি না। কয়েক মাস আমি ইউরোপে থাকব আশা করছি এবং আবার নিশ্চয় ভিয়েনা আসব, হয় নভেম্বরের শেষে কিংবা ডিসেম্বরের প্রথমে।

বার্লিনে প্রায় তিন সপ্তাহ আমার শরীর ভাল ছিল না। যাই হোক, এখন আমি ভাল আছি। আশা করি আপনারা সবাই ভাল আছেন, আপনি ও ড. ভেটার আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন।

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস

নাওমি সি. ভেটার

জুরিখ
১৬. ৯. ১৯৩৩

প্রিয় মিসেস ভেটার,

আজ সকালে আবহাওয়া কী চমৎকার! আকাশে মেঘের কোনও চিহ্ন নেই। আর কী মনোরম ঠাণ্ডা।

অস্ট্রিয়া এবং সুইজারল্যান্ড-এর যে অংশ দিয়ে আমি এসেছি, সেখানকার দৃশ্য সত্যিই মনোহর। কোথাও-কোথাও পাহাড়ের চূড়া বরফে ঢাকা।

এক দিনের জন্য যাত্রা বিরতি করেছি। জেনেভায় আমার ঠিকানা হবে:

C/o American Express Co.
Geneva.

কাল সন্ধ্যায় জেনেভা পৌঁছচ্ছি।

প্রেসিডেন্ট ভেটার এবং আপনি আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

সুভাষ সি. বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

পেনসন সার্জি
চেমিন ক্রেগ
জেনেভা
২১. ৯. ১৯৩৩

প্রিয় মিসেস ভেটার,

আপনার ১৮ তারিখের চিঠি পেয়ে খুব খুশি হয়েছি।

এখানে আসার পর থেকে আমার সময় খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটছে। সম্মেলন খুব ভাল হয়েছে। সন্ধ্যায় আমাদের জনসভায় খুব ভিড় হয়েছিল। বক্তাদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। লোকে বলছে ভারতকে নিয়ে আজ পর্যন্ত জেনেভায় যত জনসভা হয়েছে এটিই তার মধ্যে বৃহত্তম।

এখানে আসার পর থেকে আমার স্বাস্থ্য একটু ভাল হয়েছে। দু'-দিন খুব রোদ ছিল, তার পরই মেঘলা আবহাওয়া আর বৃষ্টি আরম্ভ হয়।

শ্রীপ্যাটেল অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এখানে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি হয়েছেন।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের নকল এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি।

কত দিন এখানে থাকব এখনও স্থির করিনি। যদি আবহাওয়া পরিষ্কার হয় কিছুদিন থাকব মনে করছি।

আপনার বইটি কবে থেকে লিখতে শুরু করবেন? ড. ভেটার ও আপনার প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।

ওখানে আবহাওয়া কেমন?

হ্যাঁ, আপনারা অবশ্যই আমাকে ভিয়েনায় আবার পাবেন।

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

Establissament Physic therapique du Laman
'Le Ligniere'
Gland (near Geneva)
২৫. ৯. ১৯৩৩
সোমবার সন্ধ্যা

প্রিয় মিসেস ভেটার,

আমি এই চিঠি লিখছি শ্রীপ্যাটেল এখন যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আছেন, সেখানে থেকে। ভিয়েনা থেকে যাওয়ার পর তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছে। এখন তাঁর অবস্থা সঙ্কটজনক। হৃদরোগের এই আক্রমণ তিনি কাটিয়ে উঠতে পারবেন কি না একমাত্র ভগবানই জানেন। আমরা শুধু প্রার্থনা করতে পারি, আর আশা করতে পারি।

আগামী কয়েক দিন হয়তো আপনাদেরকে চিঠি দিতে পারব না, তাই কয়েক লাইন তাড়াতাড়ি লিখছি।

জেনেভায় আমার ঠিকানা:

Pension Sergy, Chemin Krieg, Geneva. আগামী কয়েক দিন আমাকে এখানে থাকতে হতে পারে শ্রীপ্যাটেলের কাছে থাকবার জন্য, কিন্তু আপনার চিঠি আমার জেনেভার ঠিকানায় দেবেন।

আপনাদের আগেই জানিয়েছি, ভারত সম্মেলন বেশ সফল হয়েছিল। আমাদের জনসভাও সফল হয়েছিল।

আমাদের ভারতীয় চা আপনাদের পছন্দ হয়েছে জেনে আমি খুশি হলাম। আমার মনে হচ্ছে, ওই চা যদি আমার কাছে আরও থাকত!

জেনেভায় যতদিন আছি, তার মধ্যে অনেকের সঙ্গে দেখা হবে আশা করি, যাঁদের সঙ্গে পরিচয় হলে ভাল লাগবে। এখানকার আবহাওয়া যদি আমার পক্ষে অনুকূল হয়, আরও ভিতরে না গিয়ে আমি জেনেভাতেই থাকতে চাইব।

রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া উধাও হয়ে গিয়ে এখন বৃষ্টি পড়ছে।

প্রেসিডেন্ট ভেটার ও আপনি আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

পেনসন সার্জি
চেমিন ক্রেগ
জেনেভা
৩০. ৯. ১৯৩৩

প্রিয় মিসেস ভেটার,

দু'-এক লাইন লিখছি শুধু আপনাকে জানানোর জন্য যে শ্রীপ্যাটেল এখন একটু ভাল আছেন। যদিও তাঁর সঙ্কট এখনও কাটেনি।

আপনার সব চিঠিই আমি পেয়েছি। একটু সময় করতে পারলেই বিস্তারিতভাবে উত্তর দেব।

শ্রীপ্যাটেল সুস্থ হলে আমি বোধ হয় কোনও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি হব, একটা অস্ত্রোপচারের জন্য। যন্ত্রণাটা থেকেই গেছে।

তাড়াহুড়ো করে লিখলাম বলে ক্ষমা চাইছি।

আপনার
সুভাষ সি. বোস

কান্তিলাল পারেখ-কে

প্রযত্নে: আমেরিকান এক্সপ্রেস কোং
জেনেভা
৩. ১০. ১৯৩৩

প্রিয় কান্তিলাল,

অনেকদিন তোমাকে চিঠি দিইনি বলে আমি দুঃখিত। জুনের শেষে আমি অল্প কয়েক দিন বেড়ানোর জন্য ভিয়েনা গিয়েছিলাম। তখন আমার যন্ত্রণাটা ছিল না। চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড আর জার্মানি গিয়েছিলাম। প্রত্যেক দেশেই আমাকে খুব আন্তরিক অভ্যর্থনা জানানো হয় এবং ভারতের জন্য প্রচুর সমবেদনা দেখতে পাই।

এই সব ঘোরাঘুরির ফলে আমার পুরনো ব্যাধিটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। বার্লিনে আমি তিন সপ্তাহ শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলাম। অগাস্টের শেষে আমি বার্লিন ত্যাগ করি। চেকোস্লোভাকিয়ার ফ্র্যানজেনসবাড-এ এক সপ্তাহ কাটিয়ে, ভিয়েনায় পৌঁছই। সেখানে আবার আমার ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করি।

আবার ১৫ সেপ্টেম্বর ভিয়েনা থেকে বেরিয়ে জুরিখে একবার থেমে জেনেভায় পৌঁছলাম। ১৯ সেপ্টেম্বর জেনেভায় ভারত সম্পর্কে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হল, তাতে আমরা যোগ দিলাম। একটি জনাকীর্ণ জনসভাও হয়েছিল।

গত বারো দিন আমি শ্রীযুক্ত প্যাটেলের অবস্থা নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম। এখন তিনি একটু ভাল আছেন, যদিও বিপদ এখনও কাটেনি। কয়েক দিন দিবা-রাত্র আমি ওঁর পাশে থাকতাম।

তিনি Gland-এ Clinique La Legniere-এ আছেন। জায়গাটা জেনেভা থেকে ট্রেনে এক ঘন্টার পথ। আগামী কাল আমি রোগী হিসাবে ওই একই ক্লিনিকে ভর্তি হচ্ছি। বার্লিনে সেই যে আমার ব্যাধিটা আবার উৎপাত শুরু করল, তারপর থেকে যন্ত্রণাটা যেতে চাইছে না। সম্প্রতি আবার সেটা বেড়ে গেছে। ক্লিনিকে যদি আমার অবস্থার উন্নতি হয়, দু'-মাস সেখানে থাকব। শীতকালে ভিয়েনার চেয়ে সুইজারল্যান্ডের আবহাওয়া ভাল।

তোমরা সবাই কেমন আছ? তোমাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাই, আমি যদি নিয়মিত চিঠি নাও দিই, তোমরা মাঝে-মাঝে আমাকে চিঠি দিও।

তোমার
সুভাষ

নাওমি সি. ভেটার-কে

Clinique 'La Ligniere'
Gland
Suisse
৫. ১০. ১৯৩৩

Frau President Vetter
Wehringer Strasse 41
Wien-IX
(Oesterreich)

প্রিয় মিসেস ভেটার,

এই ক্লিনিকে আমি দর্শনার্থী ছিলাম, এখন রোগী হয়েছি। দেখা যাক এখানকার চিকিৎসায় আমার কোনও উপকার হয় কি না।

আপনারা শুনে খুশি হবেন, শ্রীপ্যাটেল এখন আগেকার চেয়ে একটু ভাল আছেন, যদিও তাঁর বিপদ সম্পূর্ণ কাটেনি। এক একটা করে দিন যায়, আমার আশা হয়, তিনি ভাল হয়ে উঠতে পারেন। আশা করি আপনারা সবাই বেশ ভাল আছেন। প্রেসিডেন্ট ভেটার ও আপনি আমার শুভেচ্ছা নেবেন।

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

Clinique 'La Ligniere'
Gland
Schweiz
১০. ১০. ১৯৩৩

প্রিয় মিসেস ভেটার,

আপনার এ মাসের ২৭ তারিখের দীর্ঘ পত্র, সেই তারিখেরই পোস্ট কার্ড এবং ২ অক্টোবরের চিঠি, সবই আমি ঠিকমতো পেয়েছি।

ভারত থেকে পাঠানো যে চিঠিগুলি আপনি পাঠিয়েছেন সেগুলো আমি খুব আগ্রহ সহকারে পড়েছি। শ্রীযুক্ত শ্রী কৃষ্ণর চিঠিটি আমি ফেরৎ পাঠাচ্ছি, কিন্তু শ্রীঅগ্নিহোত্রীর চিঠিটি আপনি ফেরৎ চাননি বলে পাঠাচ্ছি না। শ্রীঅগ্নিহোত্রীর ঠিকানা:

K-B.L. Agnihotri Esq.
Bilaspur
C. P.
India.

Burgermeister Seitz-এর চিঠি একদম ঠিক আছে, এবং তার একটি নকল পেয়ে আমি খুশি হয়েছি।

একটা কথা। ইংল্যান্ডে হেস্টিংসে শ্রমিক দলের অধিবেশনে যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছে, অস্ট্রিয়ার সমাজবাদী গণতান্ত্রিক পার্টিকে ভিয়েনাতে তাদের পনেরো বছরের গঠনমূলক কাজের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে, সে প্রস্তাবটি কি আপনি দেখেছেন?

Pandit কিংবা Pundit বলতে আক্ষরিক অর্থে বোঝায় আমাদের (সংস্কৃত) দর্শন এবং সাহিত্যে যাঁর জ্ঞান আছে। আমাদের আধুনিক হাইস্কুল এবং কলেজে সংস্কৃতের শিক্ষককেও পণ্ডিত বলা হয়। ভারতের কোনও-কোনও অংশে, যেমন কাশ্মীরে, ব্রাহ্মণেরা সকলেই নিজেদের 'পণ্ডিত' বলতে ভালবাসেন। সাধারণভাবে পণ্ডিত বলতে শুধু বোঝায় ব্রাহ্মণ—সংস্কৃত সাহিত্য কিংবা আমাদের দর্শনে জ্ঞান থাকুক আর না-ই থাকুক।

Zuricher Zeitung-এ ভারত সম্বন্ধে যে লেখাগুলো বেরিয়েছে আমি জানতে চাই সেগুলো ব্রিটিশ দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা হয়েছে কি না। আমার সন্দেহ, যে ভারত-বিরোধী প্রচার মাঝে-মাঝে জার্মানির পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, ওগুলো হয়তো তারই অংশ।

আপনাদের ওখানে আবহাওয়া এখন অমন চমৎকার জেনে আমি খুব খুশি হলাম। এখানে আকাশ তেমন পরিষ্কার নয়, প্রায়ই বৃষ্টি হচ্ছে।

শ্রীপ্যাটেলের হৃদযন্ত্র আবার বিকল হয়ে পড়েছে। আমি আশা করেছিলাম তিনি আস্তে-আস্তে সেরে উঠবেন। সত্যিই, কী যে হবে বুঝতে পারছি না। তবে এখনও আশা ছাড়িনি যে তিনি হয়তো ভাল হয়ে যাবেন।

আমার যে যন্ত্রণাটা (খাওয়ার পরে) হয়, সেটা এখনও হচ্ছে। কী করব জানি না। আমার রোগ ওরা ঠিকমতো ধরতে পেরেছে কি না আমার সন্দেহ। যাই হোক, যন্ত্রণা ভোগ করা ছাড়া আর কিছুই করবার নেই। এখানকার লোকেদের একটা সুযোগ দিই, দেখি সুইজারল্যান্ডের

ডাক্তারেরা আমায় সারাতে পারে কি না। এখন আমি এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগী হয়ে আছি।

এই সঙ্গে আমেরিকা থেকে পাঠানো ড. সান্ডারল্যান্ডের একটি চিঠি পাঠাচ্ছি। পড়া হয়ে গেলে ফেরৎ পাঠাবেন। আশা করি তাঁর বইটি এর মধ্যে পেয়েছেন, চিঠিও পেয়েছেন, কাজেই এখন আপনি অনুবাদ শুরু করতে পারেন।

ড. ভেটার ও আপনি আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস

ই. উডস-কে

Clinique 'La Ligniere'
Gland
Switzerland
১২. ১০.১৯৩৩

প্রিয় মিসেস উডস,

আপনার ৪ তারিখের চিঠি শ্রীভি. জে. প্যাটেল পেয়েছেন। আপনি যে সদয় বার্তা পাঠিয়েছেন তাতে তিনি অতিশয় আনন্দিত এবং আমাকে বলেছেন তাঁর গভীর কৃতজ্ঞতা আপনাকে জানাতে। দুঃখের বিষয়, তিনি নিজের হাতে লিখবার মতো সুস্থ এখনও হননি।

তাঁর অবস্থার বিষয়ে দুঃখের সঙ্গে জানাই, এখনও তাঁর বিপদ কাটেনি। আমরা আশা করছি তিনি সেরে উঠবেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ-যাত্রা তিনি উদ্ধার পাবেন কি না ঈশ্বরই জানেন।

তাঁর বর্তমান অসুখ তিনি কাটিয়ে উঠতে পারবেন কি না, ডাক্তারেরা এখনও বলতে পারছেন না।

আন্তরিক শুভেচ্ছা সহকারে,

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস

কলিকাতার মেয়র সন্তোষ কুমার বসু-কে

S. C. Bose
C/o American Express Co.
rue du Mont Blanc
Geneva
La Ligniere, Gland
Switzerland
১৭ অক্টোবর, ১৯৩৩

প্রিয় মেয়র মহোদয়,

ভিয়েনার মেয়র (Burgermeister) আপনাকে যে পত্র দিয়েছিলেন, গত সপ্তাহে সেটি ভিয়েনা থেকে পাঠানো হয়েছিল। তার সঙ্গে একটি ফোটোও পাঠানো হয়েছে। সে চিঠির একটি প্রতিলিপি আমি এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। আমি নিশ্চিত, পুরসভা সেই আন্তরিকতাপূর্ণ বার্তার মূল্য আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করবে। কলকাতার নাগরিকেরা এবং তাঁদের প্রধান হিসাবে আপনিও উপলব্ধি করবেন এবং যথাযোগ্য একটি উত্তর যত শীঘ্র সম্ভব পাঠানো হবে।

আন্তরিক শুভেচ্ছা সহকারে।

আপনার
সুভাষ সি. বোস

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার-কে
[মূল বাংলায়]

C/o American Express Co.
Geneva
১৯. ১০. ৩৩

প্রিয় সত্যেনবাবু

অনেকদিন আপনাকে চিঠি লিখি নাই, তাই আপনিও হতাশ হয়ে লেখা বন্ধ করেছেন। দোষ আপনার নয়—আমারই। যা হোক ঁবিজয়ার সাদর সম্ভাষণ ও প্রীতি আলিঙ্গন ও ভালবাসা গ্রহণ করুন।

শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের অকালপ্রয়াণে ব্যথিত ও স্তম্ভিত হইয়াছি। হতভাগ্য বাঙ্গলা।

রাজনীতি ক্ষেত্রে একে ২ সকলকে গ্রাস করিতেছেন আমাদের ভাগ্য বিধাতা। সেনগুপ্তের স্থান পূর্ণ হবে না।

আমি এখন Geneva-র নিকট Gland নামক শহরে (বা গ্রামে)—Ligniere নামক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আছি। শ্রীযুক্ত প্যাটেল এখানে আছেন। তার শরীর খুবই খারাপ—বোধ হয় শেষ পর্যন্ত বাঁচানো যাবে না।

আমার পেটের যন্ত্রণা আবার বর্ধিতরূপে দেখা দিয়াছে। কী করব বুঝিতে পারিতেছি না। এক এক সময়ে ভাবি অস্ত্র চিকিৎসার সাহায্য লই। যা হোক আপাততঃ নিজের অপেক্ষা শ্রীযুক্ত প্যাটেলের জন্য বিশেষ চিন্তিত আছি।

আপনারা সকলে কে কেমন আছেন? বিস্তৃত সংবাদ চাই। মহাত্মা গান্ধীকে অন্ধভাবে আর কতদিন অনুসরণ করবেন? দেশ তো একেবারে ডুবিল বলিয়া মনে হইতেছে—সময় থাকিতে একটা নতুন বাণী প্রচার করুন ও নতুন আন্দোলন জাগাইয়া তুলুন। নতুবা পরে আবার জাগানো খুব সময়সাপেক্ষ হইবে।

ইহা ব্যতীত বাঙ্গলাকে একবার ভাল করে সংহত করে তুলুন। এ বিষয়ে শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা চেষ্টা করিলে হয়তো ফল হইবে। আমি মনে করিতেছি তাঁহাকে এ বিষয়ে লিখিব। সম্প্রতি তাঁহার চিঠি পাইয়াছি।

আজ এই পর্য্যন্ত। সকলকে ঁবিজয়ার ভালবাসা দিবেন।

ইতি
ভবদীয়
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

নাওমি সি. ভেটার-কে

La Ligniere
Gland
Schweiz
২২. ১০. ১৯৩৩

প্রিয় মিসেস ভেটার,

অনেক দিন আপনার কোনও চিঠি না পেয়ে একটু চিন্তিত আছি। রোজ ভাবছি আপনার চিঠি পাব, আমি শেষ আপনাকে যে চিঠিটি দিয়েছিলাম, যার সঙ্গে আমি, আমাকে আপনি যে চিঠিগুলো পাঠিয়েছিলেন এবং ড. সান্ডারল্যান্ড-এর চিঠিটিও ফেরৎ পাঠিয়েছিলাম, সে চিঠি কি আপনি পাননি?

শ্রীপ্যাটেলের অবস্থা এখনও খুব সংকটজনক। এখানে আমার চিকিৎসা চলছে, কিন্তু এ পর্যন্ত বিশেষ কোনও উপকার হয়নি। শরীরের মধ্যে যে যন্ত্রণা, এখনও তাতে কষ্ট পাচ্ছি।

প্রেসিডেন্ট ভেটার ও আপনি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস

পুঃ- আপনি নিশ্চয়ই জানেন, ড. সান্ডারল্যান্ডের বই আপনি অনুবাদ করবেন, সে সম্পর্কে ওঁর অমত নেই।

এস. সি. বি

নাওমি সি. ভেটার-কে

পেনসন সার্জি
চেমিন ক্রেগ
জেনেভা
১ নভেম্বর ১৯৩৩

প্রিয় মিসেস ভেটার,

আপনার ২৩ অক্টোবরের চিঠি আমাকে নিরতিশয় সান্ত্বনা ও প্রবোধ দান করেছে। সে জন্য ড. ভেটারকে ও আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

শ্রীপ্যাটেলের শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী সৎকারের জন্য তাঁর দেহ আমাদের ভারতে পাঠাতে হয়েছে, আমি মার্সাই গিয়েছিলাম। সেখানে থেকে ফিরে তাঁর মরদেহ পাঠানোর ব্যবস্থা করে ফিরে এসেছি।

এখন আমি ওপরের ঠিকানায় আছি, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা এখনও কিছু করিনি।

আপনার ওয়ারস-র বন্ধুর কাছ থেকে আমি একটি চিঠি পেয়েছি। এই সঙ্গে চিঠিটি পাঠিয়ে দিলাম। তার নাম এবং ঠিকানা আমায় দয়া করে জানাবেন? তিনি চিঠিটি ভারতে পাঠিয়েছিলেন, সেখান থেকে ঠিকানা কেটে এখানে পাঠানো হয়েছে।

একটি টেলিগ্রামও পাঠাচ্ছি, তার প্রেরকের নামের আমি পাঠোদ্ধার করতে অক্ষম। নামটি মনে হয় চিনা। আমি ভাবছি, ইনি কি ভিয়েনার সেই চিনা রাষ্ট্রদূত, যিনি শ্রীপ্যাটেলকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন? এ বিষয়ে আপনি আমাকে অবহিত করতে পারেন?

ড. সান্ডারল্যান্ডে-র কাছ থেকে বইগুলো এবং তাঁর চিঠি কি আপনি পেয়েছেন? ওখানকার আবহাওয়া বর্তমান কেমন? এখানে এখন বৃষ্টি চলছে।

ড. ভেটার ও আপনি আন্তরিক শুভেচ্ছা নেবেন।

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস

অধ্যাপক ভি. লেসনি-কে

প্রযত্নে: আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানি
জেনেভা
১০ নভেম্বর ১৯৩৩

মাননীয় সভাপতি
ওরিয়েন্টাল ইন্সটিটিউট
প্রাগ
সমীপেষু,

মহাশয়,

আমি আপনার ৩ নভেম্বর ১৯৩৩-এর ১৩৯৭/৩৩ সংখ্যাযুক্ত পত্র পেয়েছি। ওরিয়েন্টাল ইন্সটিটিউট-এর ইন্ডিয়ান সার্কল-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমাকে নিমন্ত্রণ করার জন্য আমি আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে আমার এখন চিকিৎসা চলছে এবং অল্প দিনের মধ্যেই আমি এখান থেকে দক্ষিণ ফ্রান্সে যাব। এই অবস্থায় নভেম্বরের মধ্যভাগে প্রাগে আসা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। সেই কারণে আপনার নিমন্ত্রণ পাওয়া মাত্র একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে ডিসেম্বরের মধ্যভাগে একটি দিন নির্ধারণ করবার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। সেই সময়ে দিন স্থির করা যদি আপনাদের পক্ষে সম্ভব হয়, আমি সানন্দে আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে প্রাগে আসব।

এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন, আমাদের দুই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাবে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। আপনার জানতে আগ্রহ হবে, শেষবার আমি যখন প্রাগে গিয়েছিলাম, তার পরে এই উদ্দেশ্যে আমি ভারতে কিছু প্রচারও চালিয়েছি। আবার যখন প্রাগে যাব, আমাদের উভয় পক্ষেরই এই উদ্দেশ্য পূর্তিতে সহায়তার জন্য সানন্দে যথাসাধ্য চেষ্টা করব এবং সে-জন্য যে কোনও সভা আয়োজিত হলে সেখানে বক্তৃতা করব। আপনাকে আবার ধন্যবাদ জানাই।

আপনার একান্ত বিশ্বস্ত
সুভাষচন্দ্র বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

প্রযত্নে: আমেরিকান এক্সপ্রেস কোং
জেনেভা
১৩.১১.১৯৩৩

Frau President Vetter
Wahringer Str. 41
Wien-IX
(Oesterreich)

প্রিয় মিসেস ভেটার,

অনেক দিন আপনাকে চিঠি না দেওয়ার জন্য আমি দুঃখিত। আপনি নিশ্চয় ভাবছেন আমার কী হল।

আপনার শেষ দু' খানি পত্র আমি ঠিকমতো পেয়েছি। আপনাকে ধন্যবাদ। তিন-চার দিনের মধ্যে আমি বিস্তারিত উত্তর দেব। দু'-এক দিনের মধ্যে আমি দক্ষিণ ফ্রান্সের উদ্দেশে রওনা হচ্ছি।

আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা প্রায়ই একই রকম। এখন আমি ভিয়েনার অধ্যাপক নিউমান-এর ব্যবস্থা কঠোর ভাবে মেনে চলছি।

আপনারা সবাই কেমন আছেন? প্রেসিডেন্ট ভেটার ও আপনি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস

অধ্যাপক ফ্রান্সিস জাজতি-কে

Hôtel de Luxembourg
Promenade des Anglais
Nice
Tel 839.45-839-46
(France)
৬.১২.১৯৩৩

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয়,

আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ভিয়েনার মি. এবং মিসেস ফিউলোপ মিলার-এর কাছ থেকে আপনার কথা এবং ভারত ও হাঙ্গেরির জন্য আপনি যে ভাল ভাল কাজ করেছেন, তার কথা শুনেছি।

ভারত ও হাঙ্গেরির মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক যাঁরা চান আমি তাঁদের একজন, তাই সেই উদ্দেশ্যে যে ভাল কাজ আপনি করছেন, আমি তাকে আন্তরিক স্বাগত জানাই। আপনার সঙ্গে পরিচয়ের আনন্দ ও সৌভাগ্য লাভ করার জন্য আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। আগামী বছর গ্রীষ্মকালের আগে কোনও একটা সময়ে আমি বুডাপেস্ট যেতে পারব, আশা করছি।

এ বছর আমি কয়েক মাস ভিয়েনায় ছিলাম। সম্প্রতি আমি সুইজারল্যান্ড ও ফ্রান্স ভ্রমণ করেছি।

আন্তরিক শুভেচ্ছা সহকারে

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস

ই. উডস-কে

প্রযত্নে: আমেরিকান এক্সপ্রেস কোং
নিস (ফ্রান্স)
৭.১২.৩৩

প্রিয় মিসেস উডস,

আপনার ৩ নভেম্বরের চিঠির জন্যে অনেক ধন্যবাদ। উত্তর দিতে দেরি হওয়ায় আমি দুঃখিত।

আইরিশ বন্ধুদের ভারতের সংবাদপত্র সমূহের জন্য সহৃদয় বার্তাটি পাঠিয়ে আপনি কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। আমি নিশ্চিত জানি বার্তাটি সকলের খুব ভাল লাগবে। আমার মনে পড়ছে, ১৯২৯-এর সেপ্টেম্বরে টেরেনস ম্যাকসুইনি-র পরিবার লাহোর জেলে যতীন দাসের অনশন সত্যাগ্রহের পর মৃত্যুতে একটি ক্ষুদ্র হলেও অপূর্ব বার্তা পাঠিয়েছিলেন। সেই বার্তাটি কৃতজ্ঞচিত্তে গৃহীত হয়েছিল।

আয়্যারল্যান্ডে আসার জন্য আমাকে যে নিমন্ত্রণ করেছেন, সে জন্য ধন্যবাদ। অনেক বছর ধরে আয়ারল্যান্ডে যাবার ইচ্ছে পোষণ করছি, আশা করছি ভারতে ফিরবার আগে যেতে

পারব। ভারতের যে প্রদেশে আমার বাড়ি (বঙ্গদেশ) সেখানে আয়ারল্যান্ডের সাম্প্রতিক ইতিহাস স্বাধীনতা-প্রিয় পুরুষ ও নারীরা অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেন, এবং অনেকের বাড়িতে কয়েকজন আইরিশকে প্রকৃতই পুজো করা হয়। বর্তমানে আমার সংযুক্ত রাষ্ট্রে (U.K.) যাওয়া নিষেধ। তা হলেও আইরিশ ফ্রি স্টেট গভর্নমেন্ট আমাকে আয়ারল্যান্ড (ফ্রি স্টেট) যাবার অনুমতি দেবে। কিন্তু এই ব্যাপারটা আমি কঠোরভাবে গোপন রাখতে চাই। লন্ডনে আমার কয়েকজন বন্ধু আমার ইংল্যান্ডে যাবার জন্য অনুমতি আদায়ের চেষ্টা করছেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার যদি জানতে পারে আমি আয়ারল্যান্ড যাবার পরিকল্পনা করছি, তারা বেঁকে বসবে এবং আমাকে ইংল্যান্ডে যাবার ছাড়পত্র কখনওই দেবে না। যতক্ষণ না আমার ইংল্যান্ডে যাওয়ার প্রশ্নটির 'হ্যাঁ' কি 'না' কোনও একটি মীমাংসা হচ্ছে, আমার ইচ্ছে আমার আয়ারল্যান্ড যাবার বাসনাটি গোপন থাক।

Madame Gonne MacBride-এর জন্য আমি একটি বার্তা নিয়ে এসেছি আমার ভাইয়ের কাছ থেকে। ইউরোপের উদ্দেশে রওনা হওয়ার ঠিক আগে জেলখানায় তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। ১৯১৪ সালে প্যারিসে মাদামের সঙ্গে আমার ভাইয়ের দেখা হয়েছিল। সেই থেকে সে তাঁর গুণগ্রাহীদের অন্যতম। আমার মনে হয়, হয়তো মাদামের তাকে মনে নেই। ১৯৩২-এর ফেব্রুয়ারি থেকে সে অন্তরীণ হয়ে আছে। আমার ভাই তার এক ভারতীয় বন্ধু মুখার্জির সঙ্গে মাদামের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।

আপনাদের বুলেটিনের কপি আমি ঠিকমতো পেয়েছি। বুলেটিনটি আমার ভাল লেগেছে। আপনি কি নিয়মিত কোনও ভারতীয় সংবাদপত্র (ইংরেজিতে) পান? যদি পান, তার মধ্যে থেকে উল্লেখযোগ্য খবরগুলি কি আপনি বেছে নিতে পারবেন, না কি সে-সব খবর একদম তৈরি করে আপনাকে দেওয়া দরকার? কতদিন অন্তর আপনারা বুলেটিনটি প্রকাশ করেন? ভারতের খবর আপনাদের হয়তো পৌঁছে দিতে আমি অতিশয় আগ্রহী।

দয়া করে জানান, আয়ারল্যান্ডের কোন কোন পত্রিকা উল্লেখযোগ্য খবর ছাপতে চায়, যাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত চরিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়। ডাবলিনের আইরিশ প্রেস, আমার মনে হয়, ডেভ-এর কাগজ। আই. আর. এ.-র মুখপত্র কোনটি? বন্ধুভাবাপন্ন আইরিশ পত্র-পত্রিকার একটি তালিকা যদি আপনি পাঠান, আমরা সময়ে-সময়ে খবর পাঠাতে চেষ্টা করব।

আশাকরি আজকাল আয়ারল্যান্ডে চিঠিপত্র গোপনে সেন্সর করা হয় না, যা ভারতে হয়। আমার সেটা জানা দরকার।

আন্তরিক শুভেচ্ছা সহকারে।

আপনার
সুভাষ সি. বোস

সুনীল মোহন ঘোষ মৌলিক[১]-কে
[মূল বাংলায়]

স্থায়ী ঠিকানা:
The American Express Company
14 Kaerntnerring
Vienna
Nice (France)
৭. ১২. ৩৩

প্রিয় সুনীল,

তোমার বেশ কয়েকটি চিঠি পেয়েছি। উত্তর দিতে পারিনি বলে মাপ কোরো। সম্প্রতি, তোমার ঁবিজয়ার চিঠিটি পেয়ে খুব ভাল লাগছে।

এর আগের চিঠিতে তুমি লিখেছিলে, বঙ্গে দলাদলি কমানোর প্রচেষ্টা চলছে। এর পরবর্তী সংবাদ জানার জন্য আমি উদগ্রীব হয়ে আছি।

সম্প্রতি আমি ফ্রান্সের দক্ষিণে এসেছি। ইউরোপের অধিকাংশ জায়গাতেই এখন বৃষ্টি আর কুয়াশা। পরিষ্কার আকাশ আর ঝকঝকে রোদের আশায় এখানে এলাম। মাঝে মাঝে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলগুলোয় ঘুরে বেড়াতে খুব ভাল লাগে।

আমার যেটা প্রধান অসুখ—তলপেটের ব্যথা—এখনও খুব কষ্ট দিচ্ছে। জুনের শেষের দিকে ব্যথাটা চলে গিয়েছিল। জুলাইতে আবার ফিরে এল এবং সেই থেকে চলছে। সম্প্রতি ব্যথাটা অসম্ভব বেড়েছিল। এখন একটু কম কিন্তু সারছে খুব ধীরে ধীরে। জানি না কবে, কতদিন পরে সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারব। প্রায় আটমাস হল ইউরোপে এসেছি কিন্তু এখনও বিশেষ উপকার কিছু হয়নি। সুস্থ হতে না পারলে বাড়ি ফেরার পরে কী করব? ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে কোনও কাজই করা সম্ভব হয় না।

এসব নিয়ে বেশি চিন্তা কোরো না। আশা করি তোমরা সবাই ভাল আছ। ভালবাসা ও শুভেচ্ছা নিয়ো।

তোমার
সুভাষচন্দ্র বোস

---

১. এই পত্রটি বাংলায় লিখিত ছিল। মূল বাংলা পত্র এখন আর পাওয়া গেল না বলে ইংরাজি অনুবাদ থেকে বাংলায় পুনরনূদিত হল।

নাওমি সি. ভেটার-কে

হোটেল দ্য লুক্সেমবুর্গ
নিস (ফ্রান্স)
৯.১২.১৯৯৩

প্রিয় মিসেস ভেটার,

যখন আমি ভিয়েনায় ছিলাম, মি. রোচোয়ানস্কি-র সঙ্গে আমার অস্ট্রিয়া ও ভারতের নানা সমস্যা নিয়ে নিয়মিত দীর্ঘ আলোচনা হত। পরে মি. রোচোয়ানস্কি আমাকে কর্মাধ্যক্ষ ওটো ফ্যালটিস-এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। মি. ওটো ফ্যালটিস-কে আমার খুব সক্ষম কাজের লোক বলে মনে হল। আমরা দু'জনে মিলে আমাদের দু' দেশকে কাছাকাছি নিয়ে আসার জন্য কার্যকর পরিকল্পনা রচনা করি। তিনি কাজ করবেন এই প্রান্তে, আর আমি কাজ করব, ফিরে যাওয়ার পর, ভারতে। ব্যবসা-বাণিজ্য আমরা করব, এমন কোনও কথা হয়নি; আমাদের দু'-দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ও অন্যান্য সম্পর্কের বিষয়ে আমরা সাহায্য করব। পরে যদি আমরা ব্যবসা করতে চাই, সেটা অন্য ব্যাপার, নতুন করে ভেবে দেখতে হবে। সম্প্রতি কর্মাধ্যক্ষ ওটো ফ্যালটিস আমাকে নতুন অ্যাসোসিয়েশনের একটি খসড়া পাঠিয়েছেন। গতবার আমি ড. ভেটার কিংবা আপনার পরামর্শ চাইনি, কেননা তখন তার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু এখন আমাদের পরিকল্পনা কার্যোপযোগী হয়ে উঠেছে, এবং ঠিকমতো তা নিয়ে কাজ করলে উপকার হবে মনে হচ্ছে। এখন নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে আপনাদের পরামর্শ চাইছি।

১) যাঁদের সঙ্গে আমাকে কাজ করতে হবে, তাঁরা কি নির্ভরযোগ্য?

২) মোটের ওপর পরিকল্পনাটি কি ঠিক আছে?

বলতেই হবে, মি. ফ্যালটিস-এর সঙ্গে আমার যত কথাবার্তা এবং পত্রালাপ হয়েছে তাতে আমি দেখেছি তিনি এক জন প্রকৃত ভদ্রলোক, নির্ভরযোগ্য। তা সত্ত্বেও, আপনি যেহেতু তাঁর একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আমার মনে হয়, আর অগ্রসর হওয়ার আগে আমার উচিত আপনার পরামর্শ নেওয়া। দয়া করে ব্যাপারটি গোপন রাখবেন, এবং যত শীঘ্র সম্ভব চিঠির উত্তর দেবেন।

একটি কাটিং এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি, মেষচর্মাবৃত ব্রিটেনের প্রকৃত নৃশংসতার আরেকটি নিদর্শন।

আমি আগেই একটি দীর্ঘ চিঠি আপনাকে পাঠিয়েছি, এতদিনে নিশ্চয় পেয়েছেন, আপনারা দু' জনই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা নেবেন।

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

হোটেল এক্সেলসিয়র
রোম
২১.১২.১৯৩৩

প্রিয় মিসেস ভেটার,

রোম থেকে এই চিঠি পেয়ে আপনি অবাক হবেন। ১৯ তারিখ আমি হঠাৎ ইতালিয়ান ওরিয়েন্টাল ইন্সটিটিউট-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে একটি নিমন্ত্রণ পাই। ব্যস্ত হয়ে আমি ১৯ তারিখ সন্ধ্যায় নিস থেকে রওনা হয়ে কষ্টদায়ক ভ্রমণের পর গতকাল এখানে পৌঁছেছি। গতকাল এবং আজ আকাশ সম্পূর্ণ নির্মেঘ, রৌদ্রোজ্জ্বল, কাজেই রোম এখন তার সর্বোৎকৃষ্ট রূপ ধারণ করেছে।

ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা ভিয়েনায় থাকেন, বাইশ জনের মতো, তারাও এসে গেছেন। সব মিলিয়ে ৯০ জনের মতো ভারতীয় ছাত্র ইউরোপের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে এসেছেন, আর এসেছেন ১৫০ জনের মতো চিনা ছাত্র।

আজ সকালে ওরিয়েন্টাল ইন্সটিটিউটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল; আমরা সবাই সেখানে ছিলাম। আগামীকাল থেকে চলবে রোমে এশিয়াটিক স্টুডেন্টস কংগ্রেস এবং ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টস কনফারেন্স-এর সম্মেলন। সেনর মুসোলিনি আগামীকাল সকালে এশিয়াটিক স্টুডেন্টস কংগ্রেস-এ ভাষণ দেবেন।

আমার স্বাস্থ্য নিস-এ এসে পৌঁছনোর সময় যা ছিল তার থেকে এখন একটু ভাল, তাই এখানে আসতে পেরেছি। আপনার দুটি চিঠি আমি নিস-এ পেয়েছি। আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ। পরের চিঠিতে আরও খবর দেব। আপনি ও ড. ভেটার দু'জনেই আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

Hotel
Principe 7 Savola

মিলান
১২.১.১৯৩৪

প্রিয় মিসেস ভেটার,

আপনি হয়তো ভাবছেন, রোমে আসার পর আমার কী হল। এতদিনে সম্পূর্ণ বিবরণ আপনি নিশ্চয় প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে পেয়ে গেছেন। কাজেই রোমে কী হয়েছে, আমি সংক্ষেপে জানাচ্ছি।

১) ২১ ডিসেম্বর ওরিয়েন্টাল ইন্সটিটিউট অব্ রোম-এর (আমার বলা উচিত ছিল ইতালির) উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হল।

২) এশিয়াটিক স্টুডেন্টস কংগ্রেস চলল ২২ থেকে ২৮ ডিসেম্বর। তাতে উপস্থিত ছিলেন ইউরোপের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে আগত ৬০০ জন ছাত্র-ছাত্রী। তাদের জন্য বিনা শুল্কে ইতালিয়ান রেলে ভ্রমণের ব্যবস্থা ছিল, সেই সঙ্গে এক সপ্তাহের জন্য বিনা মূল্যের থাকা ও খাওয়ার আয়োজন। ২২ তারিখ মুসোলিনি সম্মেলনে ভাষণ দিলেন। বক্তৃতাটি চমৎকার হয়েছিল, বক্তার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যাই হোক না কেন। তিনি বললেন, "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন কখনও হবে না, এ বাজে কথা। রোম অতীত কালে ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছে, আবার করবে। এই মিলনের ওপর নির্ভর করে পৃথিবীর পরিত্রাণ। রোম অতীতে ইউরোপে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে, কিন্তু এশিয়ার সঙ্গে বরাবর তার বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল, তার ভিত্তি ছিল পারস্পরিক সহযোগিতা।"

৩) ভারতীয় ছাত্রদের অধিবেশন তৃতীয়বার বসে রোমে। অন্য দুটি অধিবেশন হয়েছিল ১৯৩১ সাল লন্ডনে এবং ১৯৩২-এ মিউনিকে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টস ইন ইউরোপ-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় লন্ডন থেকে ভিয়েনায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। এই প্রস্তাব আমি আন্তরিক ভাবে সমর্থন করি। আপনাদের মতো প্রকৃত বন্ধু ভিয়েনায় আছেন, এই চিন্তা আমাকে প্রভাবিত করেছিল। তা ছাড়া সিদ্ধান্ত হয়, ভারতীয় ছাত্রদের পরবর্তী সম্মেলন ১৯৩৪ সালে ভিয়েনায় করা হবে। এই যে-সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, এর ফলে একটা মস্ত বড় দায়িত্ব এসে পড়বে শুধু ভিয়েনার ভারতীয় ছাত্রদের ওপর নয়, তাঁদের যাঁরা বন্ধু তাঁদের ওপরেও। আমাদের এই সব পদক্ষেপের বিষয়ে আপনাদের কী মত, জানতে আমি খুব আগ্রহী।

কংগ্রেস এবং সম্মেলন শেষ হওয়ার পর আরও এক পক্ষকাল আমি রোমে থেকে যাই। উদ্দেশ্য ছিল, সমীক্ষা করে দেখব, ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টায় কোনও বন্ধু ওখানে পাই কি না। তাতে আমার যা অভিজ্ঞতা হল, জানাচ্ছি:

১) রোমে এমন কিছু ব্যক্তি আছেন, যাঁরা ভারত সম্পর্কে প্রকৃতই আগ্রহী,

২) সাধারণভাবে এখানকার লোকে ভারত সম্বন্ধে কিছুই জানে না, কিন্তু জানার ইচ্ছা আছে। ভারতের প্রতি কোনও বিরূপ মনোভাব নেই, বিরুদ্ধ সংস্কার নেই, বরং সহানুভূতি আছে।

৩) সামাজিকভাবে ইতালীয়রা সাধারণত নিজেদের আলাদা করে রাখতে চায়। বিদেশিদের, খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় না হওয়া পর্যন্ত, তারা নিজেদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে না। শুনেছি, ফরাসিরাও ওই রকম। কিন্তু জার্মান-ভাষী, যাদের আমি ইউরোপের বিভিন্ন অংশে দেখছি, তারা এ রকম নয়।

৪) রোমে যে কয়েকজনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, মনে হয় তাদের মনে ভারত সম্পর্কে গভীর আগ্রহ আমি সৃষ্টি করে দিতে পেরেছি। কিন্তু তাঁরা সত্যিকারের কাজ কত দূর করবেন এখনও বলার সময় আসেনি। সরকারের মনোভাব এখন খুবই অনুকূল এবং তাঁরা প্রাচ্যের সঙ্গে এখন ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক চান। এই রকম মনোভাব যদি ভিয়েনা, এমনকী বার্লিনের মতো জায়গাতে থাকত, আমার কোনও সন্দেহ নেই আমরা এখানে সত্যিকারের কাজ অনেক করতে পারতাম।

নববর্ষে আমাকে যে সুন্দর উপহার পাঠিয়েছেন, তার জন্যে ধন্যবাদ। তার চেয়ে ভাল উপহার কিছু হতে পারে না।

আগেকার চিঠিতে দেশে ফিরে আমার কী হবে, তা নিয়ে আপনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। চিন্তার কোনও কারণ নেই। আমার মুম্বই পৌঁছনো ওরা আটকাতে পারবে না এবং পৌঁছনোর পর যদি আমাকে জেলে দেয়, দিক, আমি তা নিয়ে ভাবি না। বর্তমান অবস্থা ভারতে যত দিন বজায় থাকবে, ততদিন কোনও সন্দেহ নেই, আমি বম্বে পৌঁছলেই ওরা আমাকে কারারুদ্ধ করবে। সেটা আটকাবার কোনও উপায় নেই। অতএব ইউরোপে যত দিন আছি আমার স্বাধীনতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার আমাকে করতে হবে।

কয়েক সপ্তাহ আগে শ্রী এবং শ্রীমতী এন. কে. বোস ভিয়েনায় গিয়েছিলেন। তাদেরকে আপনার নিশ্চয় মনে আছে। শ্রীমতী বোসের জন্ম যে পরিবারে তাঁরা একটু অন্য রকম। তাঁর এক বোন ন' বছর ধরে জেলে আছেন, ১৯৩২ সালে এক সমাবর্তন উৎসবে বাংলার রাজ্যপালকে গুলি করে হত্যা করার চেষ্টার অপরাধে। তিনি সমাবর্তনে গিয়েছিলেন তাঁর বি.এ. ডিগ্রি নিতে কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট কয়েকটি গুলি চালানর পর তাঁকে ধরে ফেলে। মেয়েটি খুব শান্ত এবং লাজুক প্রকৃতির। আরেক বোন এম. এ. পাশ করার পর কোনও বিচার ছাড়াই জেলে আছেন। এরাই আমাদের নতুন প্রজন্ম! আজ এই পর্যন্ত, আমি জেনেভা পৌঁছচ্ছি, ১৮ জানুয়ারি। জেনেভায় আমার ঠিকানা হবে: C/o Mrs. Horup, 23 Avenue Beau Sejour, Genf, Schweiz।

শুভেচ্ছা সহকারে

আপনার একান্ত
সুভাষ সি. বোস

বিভাবতী বোস[১]-কে
[মূল বাংলায়]

মিলান, ইতালি
১৬. ১. ৩৪

প্রিয় মেজবউদিদি,

২০ ডিসেম্বর আমি রোমে গিয়েছিলাম। প্রায় তিন সপ্তাহ সেখানে কাটিয়েছি। অশোক এসে আট-ন'দিন আমার সঙ্গে ছিল। রোম থেকে বিমানডাকে মেজদাদাকে একটি সবিস্তার পত্র দিয়েছি।

এখন আমি জেনেভার পথে। তিন-চারদিন আগে মিলানে পৌঁছেছি, আগামী পরশু জেনেভার উদ্দেশে যাত্রা করব। ওখানে আমার ঠিকানা হবে, C/o American Express Company.

বাড়িতে বারবার প্যারাটাইফয়েড হচ্ছে কেন কিছু বুঝতে পারছ? আমার বিশ্বাস, এ বিষয়ে ভালরকম চিন্তাভাবনা এবং অনুসন্ধান চালানো জরুরি। বাড়ির একজনও বাদ গেল না, এই পরিস্থিতির পেছনে কোনও কারণ নিশ্চয়ই রয়েছে। পুতুল এখন কেমন আছে? মিলানে তোলা দুটো ছবি পাঠাচ্ছি। তার একটা মেজদাদাকে পাঠিয়ো। গোপালী ও মেজদাদাকে লেখা দুটি চিঠিও সঙ্গে দিলাম। ঠিকমতো পাঠিয়ে দিয়ো।

তোমার
সুভাষ

পুনশ্চ: মি. পি. সি. বসু লেখা বন্ধ করলেন কেন?

---

* এই পত্রটি বাংলায় লিখিত ছিল। মূল বাংলা পত্র এখন আর পাওয়া গেল না বলে ইংরাজি অনুবাদ থেকে বাংলায় পুনরনূদিত হল।

সুরমা দে[১]-কে
[মূল বাংলায়]

প্রযত্নে: আমেরিকান এক্সপ্রেস কোং
জেনেভা
২১. ২. ৩৪

শ্রদ্ধেয় মহাশয়া,

আপনার ৫-ই অক্টোবরের পত্র আমি যথাসময়ে পেয়েছিলাম। কিন্তু এতদিন উত্তর দিতে পারিনি। এই ত্রুটি মার্জনা করবেন।

ইতোমধ্যে, বুদাপেস্টের চিঠিগুলো আপনাকে পাঠানো হয়ে গেছে। জানি না আপনি পেয়েছেন কিনা। আশাকরি পেয়ে গেছেন। যদি না পান, আমাকে দয়া করে জানাবেন—যাতে আমি এ বিষয়ে খোঁজখবর করতে পারি।

আমার শরীর আগের চেয়ে একটু ভাল। তলপেটের ব্যথা একটু কম। ওজনও বেড়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ সেরে উঠতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে। যাই হোক না, আমি এখন খুব ভাল করে নিজের যত্ন-আত্তি করছি।

এই চিঠির সঙ্গে অমিয়কে লেখা একটি চিঠিও পাঠাচ্ছি। ওকে একথা বলবেন এবং চিঠিটি ওর হাতে দেবেন।

আশাকরি আপনারা সকলে ভাল আছেন। আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানবেন।

আপনার
সুভাষ সি. বোস

নাওমি সি. ভেটার -কে

23 Avenue Beau Sejour
Geneva
6. 2. 1934

প্রিয় মিসেস ভেটার,

কিছুদিন আপনার কোনও চিঠি পাইনি। মনে হয়, আমিই শেষ চিঠি দিয়েছিলাম।

সপ্তাহ তিনেক আগে আমি ইতালি থেকে এখানে পৌঁছেছি। রোম থেকে আসার পথে মিলানে কয়েকদিন কাটালাম। এক দল ভারতীয় ছাত্র এখন মিলানে পড়াশোনা করছেন।

এখানে আসার পর থেকে মিসেস হোরাপ-কে ভারত সম্বন্ধে তাঁর মাসিক বুলেটিন বের করার কাজে সাহায্য করায় আমি ব্যস্ত আছি। ওঁরা মাসিক বুলেটিন বের করবেন তিনটি ভাষায়,

* এই পত্রটি বাংলায় লিখিত ছিল। মূল বাংলা পত্র এখন আর পাওয়া গেল না বলে ইংরাজি অনুবাদ থেকে বাংলায় পুনরনূদিত হল।

ইংরেজি, ফরাসি এবং জার্মান। গতকাল আমি জার্মান ভাষায় জানুয়ারির বুলেটিনের একটি কপি আপনাকে পাঠিয়েছি। এ মাসে বুলেটিনটি আপনি একটু তাড়াতাড়ি পাবেন, আশা করছি।

আমার দাদা, যিনি এখন ভারতে অন্তরীণ হয়ে আছেন, আট বছর কলকাতা পুরসভার অল্ডারম্যান ছিলেন। তিনি সম্প্রতি আমাকে একটি চিঠি লিখে জানতে চেয়েছেন ভিয়েনা মিউনিসিপ্যালিটির কাজকর্ম নিয়ে ইংরেজিতে কোনও বই আছে কি না। আমি সদ্য মি. কাটিয়ারকে একটি চিঠি দিয়ে বলেছি আপনার কাছ থেকে বইটির নাম জেনে নিয়ে আমাকে এক কপি পাঠাতে। আমি আমার দাদার কাছে পাঠিয়ে দেব।

মি. সান্ডারল্যান্ড-এর India in Bondage (শৃঙ্খলিত ভারত)-এর অনুবাদের কাজ আপনার খানিকটা এগিয়েছে তো?

আপনাকে আমার আরও অনেক কথা লিখবার আছে। পরের চিঠিতে লিখব। ইতিমধ্যে আপনার চিঠির আশা করছি। প্রেসিডেন্ট ভেটার ও আপনি আমার শুভেচ্ছা নেবেন।

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস।

নাওমি সি. ভেটার-কে

23 Avenue Beau Sejour
Geneva
১৪. ২. ১৯৩৪

প্রিয় মিসেস ভেটার,

আজকের লন্ডনের সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকায় অস্ট্রিয়া সম্পর্কে সাংঘাতিক খবর বেরিয়েছে। আমি টাইমস থেকে একটি খবর কেটে এই সঙ্গে পাঠালাম। সেটা থেকেই আপনি আন্দাজ করতে পারবেন অস্ট্রিয়ার বাইরে কী খবর বেরোচ্ছে।

এই অবস্থায় আপনাদের মানসিক অবস্থা আমি উপলব্ধি করতে পারছি। অস্ট্রিয়ায়, বিশেষত ভিয়েনায় আমার যে বন্ধুরা আছেন তাঁদের জন্য আমার দুশ্চিন্তার কথা আর কী বলব!

অনেকদিন আপনার কোনও চিঠি না পেয়ে আমায় খুবই চিন্তা হচ্ছিল, এবং চিন্তা আরও বেড়ে গেল যখন মি. রোচোয়ানস্কি-র চিঠিতে জানলাম আপনার শরীর খারাপ। আমি একটা টেলিগ্রাম করতে যাচ্ছিলাম, এখন আপনার চিঠি পেয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।

আজ আর আপনার বেশি সময় আমি নেব না। দয়া করে একটি লাইন লিখে আমাকে জানান আপনারা সবাই কেমন আছেন। আমার বিশেষ চিন্তা প্রেসিডেন্ট ভেটারকে নিয়ে।

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস

সুনীলমোহন ঘোষ মৌলিক-কে
[মূল বাংলায়]

C/o, American Express Co,
Geneva,
15. 2. 34

স্নেহাষ্পদেষু
সুনীল,

তোমার শেষ পত্র আমি ২৪/১/৩৪ তারিখে এখানে ফিরে পেয়েছি। আমি "নীস্" থেকে "রোম" ও মিলান্" হয়ে এখানে ১৮/ ১/ ৩৪ তারিখে ফিরি। আমার শরীর এখন পূর্বাপেক্ষা কিছু ভাল এবং ওজন কিছু বেড়েছে। তবে উপকার বড় ধীরে ধীরে হচ্ছে এবং কোনও প্রকার অনিয়ম হলে পেটের যন্ত্রণা খুব বেড়ে ওঠে। পেটের যন্ত্রণা এখন পূর্বাপেক্ষা কম—কিন্তু একটা "dull pain" এখনও রয়েছে। কবে যে একেবারে সুস্থ হব কিছু বুঝতে পারছি না।

তুমি দলাদলি নিবারণের প্রয়োজন সম্বন্ধে যা লিখেছ তা পড়ে অত্যন্ত সুখী হয়েছি। এ বিষয়ে মিসেস সেনগুপ্তা মহাশয়ার মনোভাব ও মতামত কী? আমি কিছু কাল পূর্বে তাঁকে একটা চিঠি দিই এবং তাতে বিশেষ করে অনুরোধ করি যেন তিনি দলাদলি নিবারণের কাজে অগ্রণী হন। কিন্তু এই চিঠির কোনও উত্তর এখনও পাই নাই। সকলকে মেলাবার জন্য যে conference হবে বলে তুমি লিখেছ—সে সম্বন্ধে বিস্তৃত সংবাদ পাবার জন্য আমি খুব উৎসুক হয়ে আছি।

তুমি যে বইয়ের কথা লিখেছ তা পাঠাবার চেষ্টা করব। কিন্তু বোধহয় বিলম্ব হবে—কারণ আমার কাছে এখানে space Copy নেই।

সঙ্গে একটা ফটো পাঠাচ্ছি—এটা গতমাসে Milan-তোলা হয়েছিল।

আমি নিজে তোমাকে অনেকদিন কোনও চিঠি দিই নাই। বোধহয় ৫/৬ মাস।

American Express Company-র telegraphic address সর্বত্র হচ্ছে AMEXCO। কেবল Vienna-র telegraphic address হচ্ছে TRAVAMEX । অধিকাংশ বড় শহরে American Express-এর শাখা আছে।

আমার আর এখন কোনও দল নেই। নূতন করে নূতন দলের ভিত্তি স্থাপন করতে হবে। ভীরুদের নিয়ে কাজ করতে পারব না। ভীরু আর স্বার্থপর—এই দুই শ্রেণীর লোককে বাদ দিয়ে দল গঠন করতে হবে।

আমি operation-এর প্রস্তাব এখন বাদ দিয়েছি এবং গত তিনমাস ভিয়েনার Professor Neumann-এর চিকিৎসায় আছি এবং তার ফলে কিছু উপকার পেয়েছি। এ ছাড়া এখন মকরধ্বজ খাচ্ছি—শ্যামাদাস কবিরাজ মহাশয়ের উপদেশ অনুসারে।

"রোম" ও "মিলানে" কয়েকদিন বেশ কাটল। সেখানে বড় বড় কাগজে ভারতের সম্বন্ধে প্রবন্ধ দিয়েছি এবং "মিলানে" (Milan) ওখানকার সবচেয়ে বড় সমিতিতে (Cicolo Filologico Soceity) "Italy and India"—এই বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছি। ওখানকার গণ্যমান্য লোক সকলে এসেছিলেন।

আশা করি তুমি ভাল আছ।

ইতি
শুভার্থী
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

নাওমি সি. ভেটার-কে

23, Avenue Benu Sejour
Geneva
১৭. ২. ১৯৩৪

প্রিয় মিসেস ভেটার,

গত কয়েকদিন ধরে ভিয়েনায় যা হচ্ছে সে-সব শুনে আমি অত্যন্ত শঙ্কিত। আপনার কোনও চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত আমার উদ্বেগ যাবার নয়। অনুগ্রহ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে জানান, আপনারা কেমন আছেন।

একান্ত আপনার
সুভাষচন্দ্র বোস

Mrs. N. C. Vetter
c/o President Dr Vetter
Wehringer Strasse 41
Wien IX
(Autriche)

ই. উডস-কে

23 Avenue Beau Sejour
Geneva
২০.২.১৯৩৪

প্রিয় মিসেস উডস,

আপনার ১২ জানুয়ারির পত্রটি পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। উত্তর দিতে যে দেরি হল তার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি আশা করি এর মধ্যে আপনার ছেলে সম্পূর্ণ সেরে উঠেছেন।

দয়া করে আমাকে জানান আপনি ভারত থেকে কোন কোন জাতীয়তাবাদী দৈনিক পত্রিকা পেয়ে থাকেন। আপনার কাছে যাতে পত্রিকাগুলি নিয়মিত পৌঁছয় সে বিষয়ে সম্ভবত আমি সাহায্য করতে পারব।

মাদাম ম্যাকব্রাইডের চিঠির উত্তর দিতে অত্যন্ত দেরি হওয়ায় আমি দুঃখিত। এখনই তাঁকে সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে একটা চিঠি দিলাম।

আমাকে যে বুলেটিনটি পাঠিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ। বুলেটিনটি অতিশয় চিত্তাকর্ষক। কয়েকদিন আগে এখান থেকে প্রকাশিত বুলেটিনের একটি কপি আমরা আপনাকে পাঠিয়েছি। প্রতি মাসে আমরা একটি বুলেটিন প্রকাশ করব, তিন ভাষায়, ইংরেজি, ফরাসি ও জার্মান।

আমার খুবই ইচ্ছে, আপনি যে বিষয়গুলির কথা বলেছেন, অর্থাৎ ভারতে ব্রিটিশ দমননীতির বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখার— আগেই লিখতাম, কিন্তু গত মাসে নানা ব্যাপারে আমি এখানে

খুবই ব্যস্ত ছিলাম। তবে আশা করছি শীঘ্রই লিখতে পারব। প্রবন্ধটি আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব, আপনি সবচেয়ে ভাল জায়গায় প্রকাশের জন্য দিতে পারেন। আমায় মনে হয় প্রচারের স্বার্থে "আইরিশ প্রেস"-ই সবচেয়ে ভাল হবে।

মিসেস কাজিনস-এর তাঁর কারাবাসের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে প্রবন্ধটির, যে-দ্রুত জবাব আপনি দিয়েছেন, তার জন্য আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ। তাঁর প্রবন্ধটি পড়ে আমি হতবুদ্ধি হয়েছি। কী যে তাঁর মনোভাব, আমি বুঝতেই পারলাম না।

দয়া করে আয়ারল্যান্ডের বন্ধুভাবাপন্ন পত্র-পত্রিকার একটি তালিকা আমায় পাঠিয়ে দেবেন। আমরা আমাদের বুলেটিন সোজা তাদের কাছে পাঠাব। জানুয়ারি সংখ্যা শুধু আইরিশ প্রেস ও An Phoblacht -কে পাঠানো হয়েছে।

আপনি লিখেছেন দৈনিক পত্রিকাগুলোর মধ্যে আপনি শুধু 'হিন্দুস্তান টাইমস,' 'ফ্রি প্রেস জার্নাল' এবং 'অমৃতবাজার পত্রিকা' পান। আপনি কি ওগুলো নিয়মিত পান? প্রতি সপ্তাহে? আপনি কি দৈনিক সংস্করণটি পান, না সাপ্তাহিক সংস্করণ?

মাদাম ম্যাকব্রাইড আমাকে লিখেছেন, অর্থের অভাবে আই. আই. লিগ-এর কাজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আমি আশা করছি, আপনারা যে-কোনও পরিস্থিতিতেই কাজটা চালিয়ে যেতে পারবেন। আমার দিক থেকে, এই যোগাযোগটি যাতে বজায় থাকে সেজন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

এখানে ইন্ডিয়া কমিটির সেক্রেটারি একজন ডেনিশ মহিলা, মাদাম হোরাপ। তাঁর সঙ্গে আমি আই. আই. লিগ ও আয়ারল্যান্ডে আমাদের বন্ধুদের বিষয়ে কথা বলেছি। তাঁর এ বিষয়ে খুবই আগ্রহ।

আন্তরিক শুভেচ্ছা সহকারে
একান্ত আপনার
সুভাষচন্দ্র বোস

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার-কে
[মূল বাংলায়]

C/o American Express Company
Geneva
22/ 2/ 34

প্রিয়বরেষু সত্যেনবাবু,

আপনার ২৩/১১ তারিখের পত্র আমি ১১/১২ তারিখে পাই এবং পাঠ করিয়া তৃপ্ত হই। আপনার মন্তব্য সব আমি গ্রহণ করি না, কিন্তু আপনি যে তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করেন ইহাই আমাকে আনন্দ দেয়।

দেশের বর্তমান অবস্থা আপনি যে ছবি দিয়াছেন তাহা বোধহয় খাঁটি সত্য। কিন্তু কারণ নির্দেশ কি ঠিক করিয়াছেন? আপনি লিখিয়াছেন—"দেশের চরিত্র দৌর্বল্য দায়ী—না সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স-এর ত্রুটি দায়ী—তাহা বলা শক্ত।" আমি বলি যে সাফল্যের গৌরব যদি নেতা দাবি করিতে পারেন তা হইলে নিষ্ফলতার কলঙ্কও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। একথা বলিলে

চলিবে না—"দেশের লোক সাড়া দিল না—দেশের লোকের চারিত্র্যবল নেই" ইত্যাদি। নেতা যখন "প্রোগ্রাম" নির্দেশ করিবেন তখন human material-এর বিষয় চিন্তা ও বিবেচনা করিয়াই তাঁকে প্রোগ্রাম দিতে হইবে। আমার অভিযোগ এই—

(১) নেতারা যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন তার দ্বারা সাফল্য লাভ হইতে পারে না।

(২) তাঁরা আত্মত্যাগের আদর্শটা দেশের সামনে খাটো করিয়া ধরিয়াছিলেন।

আপনি বলিতে পারেন যে দেশ-কাল-পাত্র বুঝিয়া নেতারা সজ্ঞানত আদর্শটা খাটো করিয়া ধরিয়াছিলেন এবং সজ্ঞানত অপেক্ষাকৃত নরম পন্থা নির্দেশ করিয়াছিলেন। তার উত্তরে আমি বলিব—"তথাস্তু, অতীত লইয়া আমি ঝগড়া করিতে চাহি না। এখন নেতারা এগিয়ে এসে দেশবাসীকে জোরের সঙ্গে বলুন যে আরও মহান আদর্শ চাই এবং আরও নরম পন্থা চাই। আমি নেতাদের সমালোচনা করি—তাঁদের খাটো করিবার জন্য নয়—ভবিষ্যৎ কর্তব্য নির্ধারণ করিবার জন্য। এবং আপনারা অনেক সময় মনে করেন যে সমালোচনা করিলেই আমরা তাদের (নেতাদের) যাবতীয় কাজের নিন্দা করিতেছি এবং সমস্ত আন্দোলনটাকে হেয় জ্ঞান করিতেছি। কিন্তু যে আন্দোলনটার সঙ্গে আমার নিজের অস্তিত্ব এমন নিবিড় ভাবে জড়িত—সে আন্দোলনটাকে আমি কী করিয়া অস্বীকার করিতে পারি?

আপনি লিখিয়াছিলেন, "মহাত্মা গান্ধীকে আমরা নিশ্চয়ই অন্ধভাবে অনুসরণ করি না।" কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি যে, যে-কোনও ব্যক্তি প্রত্যহ আনন্দবাজার পাঠ করিলে কী ধারণা পোষণ করিবে? কোনও দিন কি আপনারা মহাত্মা গান্ধীর বা তাঁর আন্দোলনকে কোনও প্রকার সমালোচনা করিয়াছেন? পাঠকবর্গ তো আপনার মনের খবর রাখে না—তারা আনন্দবাজারের লেখাই পাঠ করে। এরকম blind support পাইলে নেতার চোখ কোনও দিন খুলিবে না।

তারপর আপনি লিখিয়াছেন—" বাঙ্গলাদেশে আজ এমন একজন রাজনৈতিক নেতা নাই যিনি বাঙ্গলাকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া নিখিল ভারতীয় নেতৃমণ্ডলীতে বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিবেন।" কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি—আপনারা—অর্থাৎ বাঙ্গলার সাংবাদিক সম্প্রদায় কি এমন একজন লোককে public-এর সামনে দাঁড়াইতে সাহায্য করিয়াছেন? বাঙ্গলার Public men বাঙ্গলার Press-এর কাছে যে রকম ব্যবহার পেয়ে থাকেন—ভারতবর্ষের অন্য কোনও province-এ তেমন হয় না। আমাদের লোককে আমরাই খাটো করি এবং তারপর আমরাই নালিশ করি। অন্য সমস্ত province-এ আপনি দেখিবেন যে সেখানকার press সেখানকার public men দের কীরকম ভাবে সাহায্য করে থাকে আমার নিজের কথা বলিতে পারি যে বাঙ্গলার press-এর কাছে তেমন support আমি ১৯২৭ এবং ১৯২৮ এর কয়েক মাস ব্যতীত আর কখনও পাই নাই। এবং আমার ১২/ ১৩ বৎসরের public life-এর ভিতর আমি বাঙ্গলার nationalist press-এর দ্বারা যেরকম নির্যাতিত হইয়াছি এবং বোধহয় ইংরাজের কাছে হই নাই। ইংরাজের নির্যাতন আমাকে খাটো না করিয়া দেশবাসীর সামনে বড় করিয়াছে—কিন্তু nationalist press-এর নির্যাতন প্রকৃতপক্ষে দেশবাসীর সম্মুখে আমাকে ছোট করিয়াছে। তার জন্য আমি দুঃখ করি না। আমি শুধু বলি যে আনন্দবাজার যেরকম consideration মাহাত্মা গান্ধীর জন্য রাখে তেমন consideration কেন বাঙ্গলার লোকেদের জন্য রাখে না? যাক—

আর একটা কথা বলে আজকার বক্তব্য শেষ করব। জহরলাল নেহরুকে আমি বুঝি না—তিনি কী করে একসঙ্গে "গান্ধীবাদ" ও "কম্যুনিজম্" সমর্থন করেন তা আমার পক্ষে বোধগম্য নয়। আমার মতামত আমি লন্ডনের বক্তৃতায় বলেছি গত বৎসর জুন মাস। এবং সম্প্রতি একটা ছোট statement দেশের press-এর জন্য পাঠিয়েছি, জানি না তা প্রকাশিত হবে কি না। জানি না আপনি আমাকে অহংকারী বলবেন কি না—তবে আমার দৃঢ় ধারণা যে যে পন্থা আমি নির্দেশ করেছি—সে পন্থা ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নেই। এই পন্থাকে দেশবাসী একদিন গ্রহণ করবেই করবে।

সাম্যবাদী সঙ্ঘ গঠন করা এবং সাম্যবাদ নীতি প্রচার করাই আমার প্রধান কর্তব্য হবে। এর দ্বারা ভবিষ্যতে যে দল গড়িয়া উঠিবে—সেই দলই দেশকে স্বাধীন করিবে। আমার আন্তরিক ভালবাসা গ্রহণ করিবেন। আমার শরীর পূর্বাপেক্ষা কিছু ভাল। আশা করি আপনাদের কুশল।

"দেশ" কি প্রকাশিত হচ্ছে?

আমি কিন্তু পাই নাই।

আনন্দবাজার নিয়মিত রূপে পাইতেছি।

ইতি

ভবদীয়

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

কিটি কুর্টি-কে

23 Avenue Beau Sejour
Geneva
২৩. ২. ১৯৩৪

প্রিয় মিসেস কুর্টি,

ভিয়েনা থেকে পাঠানো আপনার কার্ড পেয়ে খুশি হলাম। আসলে, আমি অবাক হয়েছিলাম, কেননা আমি ভাবিনি আপনি ওখানে থাকবেন।

আপনার ২২ ডিসেম্বরের দীর্ঘপত্র ঠিকমতো পেয়েছি। পত্রটি খুবই চিত্তাকর্ষক। আরও আগেই আপনার পত্রের উত্তর দিতে না পারার জন্য আমি দুঃখিত।

সাম্য মানে 'equality' সাম্যবাদী অর্থ one who believes in equality'। সঙ্ঘ অর্থ Society কিংবা Association। ভারতীয় চিন্তাধারায় সাম্যের ধারণা অতি প্রাচীন। সাধারণের মধ্যে এই ধারণাটির প্রচলন বৌদ্ধেরা করেছিলেন খ্রিস্টের ৫০০ বছর আগে। সেই কারণে ইউরোপে বর্তমানে জনপ্রিয় আধুনিক নামগুলির চেয়ে ওই নামটিই আমার বেশি পছন্দ।

ভারতে তরুণ প্রজন্ম সবাই অধীর হয়ে উঠেছে। আমার মতো তারাও মনে করে গান্ধী বড় বেশি ভাল, তাঁর ধ্যান-ধারণা ও কাজকর্ম বড় বেশি নরমপন্থী। আমরা চাই আরও বিপ্লবাত্মক ও উগ্রপন্থী নীতি। নেহরুর চিন্তা-ভাবনা আমাদের পক্ষে বেশি অনুকূল। কিন্তু কাজে তিনি গান্ধীকে পূর্ণ সমর্থন দান করেন। তাঁর মস্তিষ্ক একদিকে যায়, আর তাঁর হৃদয় আরেক দিকে। তাঁর হৃদয় গান্ধীর সঙ্গে।

ইউরোপের পত্র-পত্রিকায় ভারত সম্বন্ধেও যত প্রবন্ধাদি আপনি পড়েন, যদি আমাকে পাঠিয়ে দেন আমি খুব খুশি হব।

জাপানিরা আমার মতে প্রাচ্যের 'ব্রিটিশ'। জাতি হিসাবে চিনাদের অবশ্য ভাল লাগে। তাদের মানবিক গুণ, দয়ামায়া, ধর্মাধর্ম জ্ঞান আছে।

আপনি জানতে চেয়েছেন আমি পড়াশোনা কোন বিষয় নিয়ে করেছি। আমি প্রথমে পড়ি দর্শন, ইংল্যান্ডে যাকে বলে 'mental and moral Sciences'। তারপর আমি প্রশাসনিক কর্মের জন্য পরীক্ষায় পাশ করি, এবং তার জন্য আমাকে অনেকগুলো বিষয় পড়তে হয় যেমন—

অর্থনীতি, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ভূগোল, আইন ইত্যাদি। পরে আমি এই কর্ম থেকে ইস্তফা দিই, কেননা আমি বিদেশি সবকারের কাজ করতে অনিচ্ছুক।

আমার নিজের মনস্তত্ত্ব খুব ভাল লাগে এবং কিছুদিন আমি Experimental psychologyও পড়েছিলাম। রাজনৈতিক জীবন যদি আমি বেছে না নিতাম, বোধহয় মনস্তত্ত্ববিদ হতাম।

অ্যাগনেস স্মেডলি-র কোন বইয়ের কথা আপনি বলছেন? উনি খুব ভাল, খুব বুদ্ধিমতী লেখিকা।

আর. আর-এর সঙ্গে শীঘ্রই আমার দেখা হবে। তাঁর বোনের সঙ্গে অল্পদিন আগে আমার দেখা হয়েছিল। এখানে জেনেভায় তিনি ইন্ডিয়া কমিটি-র হয়ে কাজ করেন।

আর, আপনি এখন কেমন আছেন? সান্ডারল্যান্ডের বই India in Bondage কি আপনি পড়েছেন?

আমার স্বাস্থ্য আগেকার চেয়ে ভাল, কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাময় এখনও অনেক দূর। শুভেচ্ছা সহকারে

আপনার
সুভাষ সি. বোস

পুঃ দয়া করে আমাকে ভিয়েনার কথা কিছু জানান। চেক পত্র-পত্রিকার জন্য আমি কী বিষয় নিয়ে লিখব?

কলিকাতার মেয়র সন্তোষকুমার বসু-কে

১৪. ৩. ৩৪

প্রিয় মি. মেয়র,

সুইজারল্যান্ডের Clinique La Ligniere থেকে ১৯ অক্টোবর তারিখের যে চিঠি আমি পাঠিয়েছিলাম, আশা করি আপনি তা ঠিকমতো পেয়েছেন। তার সঙ্গে পাঠিয়েছিলাম ওয়ারস-র মেয়র (প্রেসিডেন্ট)-এর কলকাতার মেয়র ও নাগরিকদের উদ্দেশে প্রেরিত বার্তাটি এবং তিনি ওয়ারস-র সম্বন্ধে যে পুস্তিকাটি দিয়েছেন, সেটিও।

গত জুলাইয়ে প্রাগে যাওয়ার পর আমি ওয়ারস গিয়েছিলাম। মেয়রের পক্ষ থেকে ভাইস-প্রেসিডেন্ট (ডেপুটি মেয়র) আমাকে সিটি হল-এ—অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। মেয়র তখন তাঁর গ্রীষ্মকালীন অবকাশে শহরের বাইরে ছিলেন। আন্তরিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর তাঁর ঘরে একটি ফোটো তোলা হয়েছিল। পরে পোল্যান্ডের সংবাদপত্রে ফোটোটি ছাপা হয়। তার এক কপি আমি গত ১৯ অক্টোবর আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছি।

ওয়ারস আগে ছিল রুশ পোল্যান্ডের রাজধানী। গত মহাযুদ্ধের পর স্বাধীন এবং অখণ্ড পোলিশ প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ওয়ারস নতুন পোল্যান্ডের রাজধানী । শহরটির প্রগতিতে অসাধারণ অনুপ্রেরণা দান করেছে পোল্যান্ডের স্বাধীনতা। গত চোদ্দো বছর ধরে শহরটি দ্রুত বেড়ে উঠছে। সর্বত্র নতুন নতুন চমৎকার বাড়ি তৈরি হচ্ছে । পোল্যান্ডের রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে আমি নতুন জীবনের স্পন্দন অনুভব করছিলাম।

শহরের দ্রুত বৃদ্ধি ও অগ্রগতির ফলে পুরসভার বিভিন্ন বিভাগের ওপর অত্যধিক আর্থিক চাপ পড়েছে। মেয়র দয়া করে পুরসভার ভিতরকার কাজকর্মের কিছু দেখবার সুযোগ আমায় করে দিয়েছেন, সঙ্গে ইংরেজিভাষী অফিসার দিয়েছেন।

দেখে অতিশয় আনন্দিত হয়েছি, পুরসভা ও সরকার ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় একসঙ্গে কাজ করছে। প্রথমেই যে জিনিসটি আমার খুব উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছে, তা হল শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য জল সরবরাহের যে বৃদ্ধি প্রয়োজন, তার জন্য যন্ত্রপাতি নির্মাণের বিরাট-বিরাট কাজ চলছে। সে উদ্দেশ্যে ভিসতুলা নদী (যাকে আমি বলতে পারি ওয়ারস-র জননী), সেখান থেকে জল টানা হচ্ছে। ইউরোপের অন্য সব শহরের মতোই এখানেও দেখলাম বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি সাধারণের প্রয়োজনের বস্তু এবং যানবাহনের ব্যবস্থা, মালিকানা এবং পরিচালনা পুরসভার হাতে। শহরের অতিরিক্ত প্রয়োজন মেটাবার জন্য নতুন গ্যাস প্রস্তুত কারখানার সম্প্রতি প্রসার ঘটানো হয়েছে, তা দেখে আমি চমৎকৃত। সবকিছুই চালাচ্ছেন পোলিশ অফিসার ও ইঞ্জিনিয়ারেরা এবং যন্ত্রপাতি যতদূর সম্ভব পোল্যান্ডেই তৈরি হচ্ছে। পুরসভার অফিসারদের নিজেদের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা আছে দেখে আমার খুবই ভাল লেগেছে।

যুদ্ধের পর ওয়ারস-র জনসংখ্যা ১০ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে, এবং এখন তা ১৫ লক্ষের কাছাকাছি। অর্থাৎ জনসংখ্যা কলকাতার কাছে পৌঁছে গেছে। কিন্তু ওয়ারস-র আয় কলকাতার চেয়ে অনেক বেশি। পুরসভায় কয়েকজন অফিসার আমাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে, আমাকে বলতে হয় কলকাতার সর্বসাধারণের ব্যবহার্য ব্যবস্থাদির মালিকানা পুরসভার হাতে নেই বলে, কলকাতার বার্ষিক আয় ওয়ারস-র চেয়ে কম মনে হয়।

ওয়ারস-তে আমাকে একটি পৌর বেকারিতে নিয়ে যাওয়া হয়। ওই ধরনের কারখানার মধ্যে পোল্যান্ডে, সম্ভবত ইউরোপেও, এটিই বৃহত্তম। সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত এই বেকারিতে প্রতিদিন যে-পরিমাণ রুটি তৈরি হতে পারে তাতে শহরের এক তৃতীয়াংশ লোকের চাহিদা মিটবে, এবং আপৎকালীন পরিস্থিতিতে সেই সরবরাহ বাড়িয়ে অর্ধেক শহরবাসীকে যোগান দেওয়া যেতে পারে। তার মানে, বিশেষ কোনও কষ্ট না করে এই পৌর বেকারি সাধারণভাবেই পঞ্চাশ লক্ষ মানুষের জন্য রুটি তৈরি করতে পারে।

আর যে প্রতিষ্ঠান আমার খুব ভাল লেগেছে সেটি হল ওয়ারস-র ফিজিক্যাল কালচার ইনস্টিটিউট, ইউরোপের বৃহত্তম। যত কম সময়ে সম্ভব নতুন প্রজন্মের স্বাস্থ্য এবং পেশিসমূহ গড়ে তোলার যে প্রয়োজন তার জন্যই এই বিশাল প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হয়েছে। শরীর-শিক্ষার সমস্ত ব্যবস্থাটি ডাক্তারি এবং বৈজ্ঞানিক এই যৌথ নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হয়। একটি বৃহৎ ল্যাবরেটরি ও গবেষণা বিভাগও আছে। এ ছাড়া কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা তৈরি আছে। একটি বড় স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হবে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সহ, যাতে অদূর ভবিষ্যতে তাঁরা আন্তর্জাতিক অলিম্পিক করতে পারেন। এ সব দেখে আমার মনে পড়ে গেল, কলকাতাতেও আমাদের একটি পৌর স্টেডিয়াম ও শরীরচর্চা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের পরিকল্পনা আছে।

আমার ওয়ারসতে অবস্থানের পরিসমাপ্তি হয় ওয়ারস-র ওরিয়েন্টাল ইন্সটিটিউটের আয়োজিত একটি সম্বর্ধনায়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রভাবশালী ব্যক্তিরা। তাঁদের অভ্যর্থনা ও সম্ভাষণের আমি যথাযোগ্য উত্তর দিয়েছিলাম। সকলের কাছে আমি যে অভ্যর্থনা পেয়েছি তার আন্তরিকতায় এবং ভারত সম্পর্কে ভারতের সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁদের যে আগ্রহ দেখেছি তাতে আমি অভিভূত। সংস্কৃত-র সর্বজনমান্য অধ্যাপক মিচালস্কি-র সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমি লাভ করেছি। ওয়ারস-র কয়েকজন বন্ধু ভদ্রভাবে আমার কাছে এই অনুযোগ করেন যে ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পোলিশ ভাষার চেয়ে সংস্কৃতে বেশি আগ্রহ প্রদর্শন করে থাকে।

সব মিলিয়ে আমার এখানে আসা আমাকে প্রচুর অনুপ্রেরণা দিয়েছে। বহু শতাব্দী যারা পদানত ছিল সে-রকম একটি জাতি কেমন করে প্রয়োজনে উঠে দাঁড়াতে পারে, নিজেদের নাগরিক দায়িত্ব পালনে কত সক্ষম হতে পারে, তা দেখাও আমার কাছে একটা শিক্ষা। ওয়ারস এখন দাবি করতে পারে, যে ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ শহরগুলির সে অন্যতম। যখন একটি আধুনিক শহর বেড়ে উঠতে আরম্ভ করে যেমন কলকাতা বেড়ে উঠছে, তখন কী কী সমস্যার উদ্ভব হয়, এবং কী উপায়ে সবচেয়ে ভাল করে সে সব সমস্যার সমাধান করা যায়, অন্য কোনও জায়গার চেয়ে ওয়ারসতেই তা সবচেয়ে ভাল করে অনুধাবন করা যায়। উচ্চতম পৌর কর্তৃপক্ষ আমাকে জানিয়েছেন যে তাঁরা কলকাতা পুরসভার যে কোনও পৌর সমস্যার সমাধানে সাহায্য করতে প্রস্তুত, যদি তাদের বলা হয়।

আশা করি, শ্রীযুক্ত মেয়র মহোদয়, কলকাতা শহরের প্রতি এবং আপনার প্রতি পাঠানো ওয়ারস মিউনিসিপ্যালিটির অভিনন্দন বার্তার আপনি যথাযোগ্য উত্তর যথাসময়ে পাঠাবেন।

আন্তরিক অভিনন্দন সহ

১৪ মার্চ ১৯৩৪

আপনার
সুভাষ সি. বোস

কান্তিলাল পারেখ-কে

মিউনিক
২৪. ৩. ১৯৩৪

প্রিয় কান্তিলাল,

অনেকদিন তোমার কাছ থেকে কোনও খবর পাইনি। এখন তুমি কেমন আছ? আমি শুনেছি তুমি এখন আমেদাবাদে আছ। শীঘ্র চিঠির উত্তর দেবে, c/o American Express Company, Vienna (কিংবা জেনেভা)

আমি ২১ মার্চ এখানে এসেছি। এপ্রিলের মাঝামাঝি আমি ভিয়েনায় থাকব।

আগেকার চেয়ে আমার শরীর একটু ভাল আছে, যদিও উন্নতি হচ্ছে খুব ধীরে।

আশা করি তুমি ভাল আছ।

তোমার
সুভাষ

নাওমি সি. ভেটার-কে

Eden Hotel
Budapester Str.
Berlin
৩০. ৩. ১৯৩৪

Frau President Vetter
Wahringer Strasse 41
Wien IX
(Oesterreich)

প্রিয় মিসেস ভেটার,

ইস্টারের উষ্ণ শুভেচ্ছা ও অভিবাদন গ্রহণ করুন। প্রেসিডেন্ট ভেটারকেও আমার অভিবাদন জানাবেন।

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস

সি. আর. প্রুয়েফার-কে

ইডেন হোটেল
বার্লিন,
৫ এপ্রিল ১৯৩৪

Ministieriealrat Syckhoff
Auswatiges Amt.,
Wilhelmstr 74-76

প্রিয় মহাশয়,

আমি এই সঙ্গে জার্মান-ভারত সম্পর্কের বিষয় আপনাকে যা বলেছিলাম তার একটি স্মারকলিপি পাঠাতে চাই। আশা করি আপনি বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবেন।

আন্তরিক শ্রদ্ধা সহকারে।

আপনার
সুভাষ সি. বোস

জার্মানি এবং ভারত

জার্মানিতে জাতীয় সমাজবাদী পার্টি ক্ষমতায় আসার পর থেকে কিছু-কিছু নতুন বিষয়ের উদ্ভব হয়েছে, জার্মানি এবং ভারতের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের খাতিরে ওই বিষয়গুলির

প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। বিষয়গুলি হল:

১) গত বারো মাস ভারতের প্রতি জার্মান সংবাদপত্রগুলির মনোভাব;

২) ভারত সম্পর্কে জার্মান নেতৃবৃন্দের বিভিন্ন বিবৃতি;

৩) জার্মানির বর্তমান জাতি-বৈষম্যমূলক প্রচার।

১) জাতীয় সমাজবাদী বিপ্লবের আগে জার্মান সংবাদপত্রে ভারতের প্রতি ও তার স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতি বন্ধুত্বব্যঞ্জক প্রচুর সংখ্যক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হত। সে-সব প্রবন্ধ এখন বন্ধ হয়ে গেছে। সম্ভবত জার্মান কর্তৃপক্ষ এখন মনে করেন, জার্মান পত্র-পত্রিকায় ভারতের পক্ষপাতী প্রবন্ধাদি গ্রেট ব্রিটেন, যার সঙ্গে জার্মানি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক জোরদার করে তুলতে চায়, তাকে অসন্তুষ্ট করবে। যদিও ভারতের পক্ষপাতী প্রবন্ধাদি বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু ভারত-বিরোধী প্রবন্ধ জার্মান পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েই চলেছে। Muenchener Neuste Nachrichten, Koralle, Kolnische Zeitung, Kolnische Illustrierte, Das Haus এবং অন্যান্য অনেক পত্র-পত্রিকা মাঝে-মাঝে এমনসব প্রবন্ধাদি প্রকাশ করে যাতে জার্মান জনসাধারণের মনে ভারতের প্রতি অশ্রদ্ধার মনোভাব জন্মাতে পারে। এবং এই ঘটনা ঘটছে যখন আজ, জার্মান সংবাদপত্রসমূহ পুরোপুরি সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন।

২) গত বছর আমি যখন বার্লিনে ছিলাম, ভারত সম্পর্কে যে-সব বিবৃতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা দিচ্ছেন তার দুর্ভাগ্যজনক প্রতিক্রিয়ার কথা কর্তৃপক্ষের নজরে এনেছিলাম; যেমন হের হিটলার (তাঁর 'Mein Kampf' গ্রন্থে), হের আনাফ্রেড রোজেনবার্গ তাঁর ('Mythos of the Twentieth Century' গ্রন্থে), এবং অন্যান্য রচনায়। সম্প্রতি জেনারেল গোয়েরিং ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪-এ প্রকাশিত লন্ডনের ডেলি মেল-এ এক সাক্ষাৎকারে যে কথা মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে বলেছেন, তার ফলে অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। সেই সাক্ষাৎকারে জেনারেল গোয়েরিং এম. গান্ধীকে বলেছেন ব্রিটিশ বিরোধী, বলশেভিক-চর, এবং বলেছেন অনেক বছর আগে তিনি এম. গান্ধীর এক সহকর্মীর সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করেন। এম. গান্ধী একজন বলশেভিক-চর এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা সবাই জানে। ভারতে ও ভারতের বাইরে কমিউনিস্টরা সবাই এম. গান্ধীকে ঘৃণা করেন। প্রভাবশালী ভারতীয়েরা অনবরত চিঠি লিখে আমার কাছে জানতে চাইছেন, হের হিটলার এবং অন্যান্য প্রধান-প্রধান জার্মান ব্যক্তিবর্গ কেন এমন ভারত-বিরোধী, যখন ভারত জার্মানির কোনও ক্ষতি করেনি। এ-সব প্রশ্নের কোনও উত্তর আমি দিতে পারিনি, কারণ জার্মান নেতৃবর্গ নিজেরাই ভারতের প্রতি তাঁদের মনোভাবের কোনও ব্যাখ্যা দেননি।

৩) ভারত এবং জার্মানির মধ্যে মৈত্রীর সম্পর্ক সবচেয়ে বড় যে বিপদের মুখে পড়েছে, তা হল জার্মানিতে বর্তমান জাতিবাদী প্রচার। এক সপ্তাহ আগে আমি যখন মানচেন-এর রাস্তায় হাঁটছিলাম জার্মান ছেলে-মেয়েরা আমাকে বলছিল 'negér'। মানচেন-এর ভারতীয় ছাত্রেরা আমাকে বলেছেন, তাঁরা সবাই জার্মান ছেলে-মেয়েদের দ্বারা 'neger' আখ্যায় সম্বোধিত হয়েছেন। তা ছাড়া, সাধারণভাবে ভারতীয়দের প্রতি লোকের মনোভাব আর আগেকার মতো বন্ধুত্বপূর্ণ নেই। বার্লিনের অনেক ভারতীয়েরও এই একই অভিজ্ঞতা। কিন্তু মানচেন-এ অবস্থা অনেক বেশি খারাপ। সেখানে কখনও-কখনও ভারতীয়দের ইট, পাটকেলও মারা হয়েছে। ভারতীয়েরা দেখেছেন, জার্মান ছেলেমেয়েরা যখন এ-রকম অন্যায় আচরণ করে, তাদের বাবা-মায়েরা, কিংবা অভিভাবকেরা তাদেরকে তিরস্কার করার বদলে উৎসাহ দেন। সমস্ত ভারতীয়ই এ বিষয়ে একমত যে বিদ্যালয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে যে জাতিবাদী প্রচার চলছে তার ফলে সমস্ত ভারতীয়দের প্রতি সৃষ্টি হচ্ছে একটা ঘৃণার ভাব। এ রকম আবহাওয়া জার্মানিতে আগে কোনও দিন ছিল না।

আরও উল্লেখ করা দরকার, National Sozialistische Strafrecht-এ অন্তর্ভুক্ত খসড়া প্রস্তাব, ন্যায়াধিকার মন্ত্রক যেটি প্রকাশ করেছে, তাতে বলা হয়েছে, ইহুদি, নিগ্রো এবং অন্যান্য অশ্বেতকায় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইন পাশ করার প্রস্তাব বিবেচনা করা হচ্ছে। জার্মানির সমস্ত ভারতীয়দের মতে এই খসড়া আইন যদি আইনে পরিণত হয়, জাতি হিসাবে ভারতীয়রা স্থায়ীভাবে নিম্ন শ্রেণিভুক্ত বলে চিহ্নিত হয়ে যাবে। সেই কারণে এই খসড়া প্রস্তাব ভারতীয়দের মধ্যে রীতিমতো উদ্বেগ ও ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে।

আমার প্রস্তাব, জার্মানি এবং ভারতের মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক যদি বজায় রাখতে হয়, নিম্নলিখিত কাজগুলি করতে হবে:

১) জার্মান পত্র-পত্রিকায় ভারত-বিরোধী প্রচার বন্ধ করা হোক।

২) অতীতে প্রদত্ত বৈরীভাবাপন্ন বিবৃতিগুলোর যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে, তার প্রশমনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নেতৃস্থানীয়রা ভারতের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ একটি বিবৃতি দিন।

৩) ভারত বিরোধী আইন পাশের প্রস্তাব পরিত্যাগ করা হোক। জার্মান বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতিবাদী প্রচার এমনভাবে চালিয়ে যেতে দেওয়া যাতে ভারতীয়দের প্রতি ঘৃণার মনোভাব জন্মায়।

সুভাষ সি. বোস

কলিকাতার মেয়র সন্তোষকুমার বসু-কে

৭ এপ্রিল ১৯৩৪

মহাশয়,

আমার বার্লিন পরিদর্শন এবং সেখানকার মেয়র (Oberburgermeister)-কর্তৃক আমার অভ্যর্থনা প্রসঙ্গে, সেখানকার পৌর প্রশাসন আমি যত দূর দেখেছি, সে সম্পর্কে আপনাকে ও পুরসভাকে জ্ঞাত করা আমার কর্তব্য।

বার্লিন যদিও সমতলভূমিতে অবস্থিত এবং সেখান থেকে চতুষ্পার্শস্থ দৃশ্যাবলি ভিয়েনা ও প্রাগের মতো চোখের সামনে অমন উন্মুক্ত নয়, কিন্তু তার বদলে সেখানে আছে সুন্দর-সুন্দর সরোবর যাতে সন্তরণ, নৌকা-বিহার ইত্যাদির সুন্দর বন্দোবস্ত। সকলেই বলেন, বার্লিন ইউরোপের সর্বাপেক্ষা পরিচ্ছন্ন শহরগুলির অন্যতম; সম্ভবত পরিচ্ছন্নতম। তার একটি মাত্র কারণ, সেখানকার নাগরিকেরা পরিচ্ছন্নতার নিয়মকানুন যথাযথ পালন করে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করে।

যদিও শহরের লোকসংখ্যা চল্লিশ লক্ষের বেশি এবং প্রায় পঞ্চাশ লক্ষের কাছাকাছি স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত জনসমাকীর্ণতার জন্য যে চাপ সেখানে থাকতে পারত, বার্লিনে তা নেই। তার কারণ শহরটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক, পরিকল্পনা রচনার সময়ে শহরটিকে বিস্তীর্ণ এলাকার ওপর প্রসারিত করা হয়েছিল। অধিক লোকসংখ্যার কারণে জল, গ্যাস, বিদ্যুৎ ইত্যাদির সরবরাহ একটি কেন্দ্র থেকে না করে শহরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত কয়েকটি কেন্দ্র থেকে করা হয়। জনসাধারণের সুবিধার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা, যেমন পরিবহনের মালিকানা এবং পরিচালনা পুরসভার হাতে।

কলকাতার সমস্যাগুলির দৃষ্টিকোণ থেকে আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল চারটি বিভাগে, জল, পয়ঃপ্রণালী, রাস্তা ও বিদ্যুৎ। জল সরবরাহের জন্য, আমি দেখলাম, বার্লিনের নিকটবর্তী বৃহৎ সরোবরগুলি থেকে জল টেনে নেওয়া হয় এবং তার সঙ্গে আমাদের নলকূপের মতো ব্যবস্থায় ভূ-নিম্নস্থ জলও প্রচুর পরিমাণে তোলা হয়। আমাকে বলা হয়েছে, মোট তেরোটি জল সরবরাহ কেন্দ্র শহরে আছে। ময়লা জল নিষ্কাষণের জন্য আমি লক্ষ করলাম, একটি নয়, কয়েকটি পথ রয়েছে। শহরের বাইরে বড়-বড় কেন্দ্রে তরল আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ হয় আধুনিক পদ্ধতিতে, যার মধ্যে আছে activated sludge পদ্ধতি। নিষ্কাষিত ময়লা জল এবং sludge (থকথকে আঠালো কাদা), যা ওই প্রক্রিয়াকরণের ফলে বেরিয়ে আসে, এই দুই-ই কৃষিকাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। একটি বড় শহর কী ভাবে তার আবর্জনা ময়লা জল নিষ্কাষণ করতে পারে, তাকে নদী কিংবা সমুদ্রে না ফেলে, সেটা অতিশয় শিক্ষণীয়। আবর্জনা-নিষ্কাষণ ব্যবস্থা থেকে তারা প্রতিদিন ৮,০০০ কিউবিক মিটার গ্যাস পাচ্ছে। আমি শুনলাম মিথেন গ্যাস CH4 পাওয়া যাচ্ছে।

রাস্তার উপরিতল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বার্লিনের আধুনিকতম পরীক্ষাগার আছে। তার কয়েকটি জায়গায় গিয়ে এবং সেখানকার কাজ দেখে আমার ভাল লেগেছে। গবেষণাগারগুলি দেখার পর সম্প্রতি নির্মিত কয়েকটি রাস্তা দেখতে গিয়েছিলাম। দেখলাম প্রধানত কংক্রিটের ওপর অ্যাসফল্টের আস্তরণ হচ্ছে। কংক্রিটের ওপর অ্যাসফল্টের এই রাস্তার জন্যে খরচ পড়ছে প্রতি বর্গমিটার ১১ মার্ক (১ মার্ক ১ টাকার কাছাকাছি)। তার মধ্যে পাঁচ বছর মেরামতির খরচও ধরা আছে।

আমি সাধারণের স্নানাগারগুলিও দেখেছি (বিশেষ করে Wannsee—Lake-এর পাবলিক বাথগুলি) এবং শহরের প্রধান হাসপাতালগুলিও দেখেছি। অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখেছি মানসিক প্রতিবন্ধী বালক-বালিকাদের আশ্রম এবং বিকলাঙ্গদের আশ্রম। দেখেছি, তাদের শিক্ষা এবং তত্ত্বাবধানের আধুনিক পদ্ধতিগুলি।

ওখানে অন্তত সাতটি বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র রয়েছে। বৃহত্তম কয়েকটি আমি দেখতে গিয়েছিলাম। ওখানকার বৈদ্যুতিক চুল্লিতে শুধু যে কাঠের আগুন রয়েছে তাই নয়, কয়লার গুঁড়োও ব্যবহৃত হচ্ছে। ওঁরা আমাকে জানালেন, কয়লার গুঁড়োর ব্যবহারই এখন ব্যাপক কারণ এর ব্যবহারে সুবিধা বেশি।

সব মিলিয়ে আমার বার্লিন পরিদর্শন খুবই শিক্ষাপ্রদ হয়েছে। মেয়র অনুগ্রহ করে আমার বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন এবং মি. ভন হাভে-কে আমার সঙ্গে দিয়েছিলেন। আমাকে ওঁরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কলকাতার যে কোনও পৌর সমস্যার ব্যাপারে চাইলেই সাহায্য করবেন।

আপনাকে এবং কলকাতাকে বার্লিনের মেয়র যে আন্তরিক শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন, আপনারা অবশ্যই তার প্রত্যুত্তর দিয়ে থাকবেন।

সুভাষ সি. বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

হোটেন এক্সেলসিয়র
রোমা
বুধবার
২৫.৪.১৯৩৪

Frau President Vetter
Wahringer Str. 41
Wien-IX
(Oesterreich)

প্রিয় মিসেস ভেটার,

আমি গমনপথের মাঝখানে ফ্লোরেন্সে এসেছি এবং আজ সকালে এখানে পৌঁছেছি। আমি শুক্রবারে ভিয়েনা পৌঁছতে পারব না, তার আগে আমার কাজ শেষ হবে না। সোমবার সকালের মধ্যে অবশ্যই ভিয়েনা পৌঁছব। ড. ভেটার এর মধ্যে ভিয়েনা থেকে চলে গেছেন কি না জানি না। যদি গিয়ে থাকেন, আপনি সম্পূর্ণ একা। আপনাদের কন্যা লন্ডন থেকে কবে ফিরছেন?

শুভেচ্ছা সহকারে

আপনার একান্ত
সুভাষ সি. বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

বুডাপেস্ট
১১.৫.১৯৩৪

গ্র্যান্ড হোটেল
হাঙ্গারিয়া
বুডাপেস্ট

প্রিয় মিসেস ভেটার,

আপনাদের চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছি। অতি শীঘ্র চিঠি দিয়ে এবং আমার কথা ভেবে, আপনি সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছেন।

এখানে আসার পর আমি এক মিনিট বিশ্রাম করার সময় পাইনি। আবহাওয়া অত্যন্ত গরম এবং আমার শরীরও মোটেই ভাল বোধ হচ্ছে না। এই রকমই যদি চলে, আমার মনে হয় না আমি আমার ভ্রমণ সম্পূর্ণ করতে পারব। আমার খুব অবসন্ন লাগছে এবং দিনের কাজ শেষ করে আমার আর এমন শক্তি থাকে না যে শুয়ে পড়া ছাড়া আর কিছু করি।

কাল আমি বুখারেস্ট রওনা হব। সেখানে হোটেল কন্টিনেন্টাল-এ পাঁচ-ছয় দিন থাকব।

বুডাপেস্ট আমার খুব ভাল লেগেছে। শহরটি ছবির মতো সুন্দর এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যও অতি মনোহর। এখানকার অধিবাসীদের সম্পর্কে এত তাড়াতাড়ি ঠিক করে কিছু বলা যায় না।

আপনাদের পরিকল্পনা কী? জুনের প্রথম পর্যন্ত ভিয়েনায় থাকবেন?

আমার সব কাজ যদি শেষ করতে পারি, ২৫ মে-র আগে ভিয়েনা পৌঁছতে পারব না, কয়েক দিন দেরি হতে পারে।

আন্তরিক শুভেচ্ছা সহকারে।

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

বুখারেস্ট
১৮.৫.১৯৩৪
শুক্রবার রাত্রি

অ্যাথেনি প্যালেস হোটেল
৯৪ কাবা ভিক্টোরিয়েল
বুখারেস্ট

প্রিয় মিসেস ভেটার,

আমি গত রবিবার বুডাপেস্ট থেকে এখানে পৌঁছেছি। এখানে আমার সময় খুব ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে। এখানেও বুডাপেস্টের মতো বেশ গরম। ফলে আমার খুব ক্লান্ত লেগেছে। এ চিঠি যখন পৌঁছবে তখন আপনি ভিয়েনায় থাকবেন কি না জানি না।

আগামীকাল আমি বিমান যোগে কনস্ট্যানটিনোপল (ইস্তানবুল) যাচ্ছি। রেলে যোগাযোগ বেশ অসুবিধাজনক, তাই দেখলাম বিমানে যাওয়াই ভাল। সেখানে আমি পেরা পালাস হোটেল, ইস্তানবুল-এ থাকব। যখন ভিয়েনা থেকে চলে আসি, তখন আমার ইস্তানবুল যাবার কোনও ইচ্ছা ছিল না, ইচ্ছা ছিল জুলাই মাসে সেখানে যাব। কিন্তু বুখারেস্টে এসে আমি দেখলাম ইস্তানবুল কত কাছাকাছি এসে পড়েছি। পরে ইউরোপের এই দিকটাতে আবার আসা কত কঠিন হবে। কাজেই আমি আমার পরিকল্পনা বদলে ফেললাম। এখন ঠিক করেছি, ইস্তানবুল থেকে সোফিয়া (বুলগেরিয়া) যাব। আর সেখান থেকে যাব বেলগ্রেড এবং জাগ্রেব।

আশা করছি, ইস্তানবুল গিয়ে আপনার চিঠি পাব। সেখান থেকে আবার আপনাকে চিঠি দেব। এখনকার মতো, বিদায়। শুভেচ্ছা নেবেন।

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

পেরা পালাস হোটেল
ইস্তানবুল
২১.৫.১৯৩৪

পেরা পালাস ওটেলি
ইস্তানবুল (টার্কি)

প্রিয় মিসেস ভেটার,

আমি ১৯ তারিখ বিমানযোগে বুখারেস্ট থেকে এখানে পৌঁছেছি। হঠাৎ আমি এখানে আসা ঠিক করি, কেননা আমার মনে হল এ দিকে আর আসতে পারব না।

ইস্তানবুল সম্পর্কে আমার এমন উচ্চ প্রত্যাশা ছিল, যে আমি অতিশয় হতাশ হলাম। দেখে মনে হল, এ দেশটি ভেঙে পড়ছে। প্রাচ্যের রোমান্স এখানে নেই, আবার পাশ্চাত্যের সমৃদ্ধিও নেই। তবে, আমি আশা করি অ্যাঙ্গোরা (অ্যাঙ্কারা) অন্য রকম হবে। অন্তত নতুন রাষ্ট্র তুরস্কের প্রতীক অ্যাঙ্গোরা, কনস্টানটিনোপল নয়।

আমি ঠিক করেছি অ্যাঙ্গোরা যাব এবং সোফিয়া ও বেলগ্রেড হয়ে ভিয়েনা ফিরব। মনে হয়, আমার ভিয়েনায় ফিরে যেতে দেরি হচ্ছে।

আপনাদের পরিকল্পনা কী? ভিয়েনায় কত দিন থাকবেন? ওপরের ঠিকানায় দয়া করে দু' লাইন লিখবেন।

শ্রদ্ধা সহকারে,

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

সোফিয়া
২৯. ৫. ১৯৩৪

গ্র্যান্ড হোটেল
বুলগেরিয়া
সোফিয়া-বুলগেরিয়া

প্রিয় মিসেস ভেটার,

গত বুধবার আমি ইস্তানবুল থেকে এখানে পৌঁছেছি। এখানে এক সপ্তাহ আমার কাজের মধ্যে কেটেছে। সোফিয়া আমার ভাল লাগছে। শহরটি বেশ ভাল, ইস্তানবুলের মতো নোংরা নয়। লোকজনও অত্যন্ত সহৃদয়।

আজ রাত্রিতে আমি বেলগ্রেড যাচ্ছি। সেখানে আমার ঠিকানা হবে—

Hotel Srbski Kralj

Belgrade.

সেখানে আমি সপ্তাহ খানেক থাকব। বুডাপেস্ট থেকে আসার পর আপনার কোনও চিঠি পাইনি।

আপনার চিঠি, যেটি বুডাপেস্টে ঠিকমতো ডাকে দেওয়া হয়েছিল, তার প্রাপ্তি-সংবাদ এই সঙ্গে পাঠালাম।

শ্রদ্ধা সহকারে—

আপনার
সুভাষ সি. বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

Hotel Srbski Kralj
Belgrade
৩. ৬. ১৯৩৪
রবিবার

প্রিয় মিসেস ভেটার,

আমি বুধবার সোফিয়া থেকে এখানে পৌঁছেছি। সোফিয়াতে এবং এখানে, দু'-জায়গাতেই আমার সময় বেশ অন্যরকমভাবে কেটেছে। বলকানের দেশগুলি খুব আকর্ষণীয় লাগছে আমার।

৬ তারিখ সকালে আমি জাগ্রেব রওনা হব। সেখানে হোটেল এসপ্ল্যানেড-এ চার-পাঁচ দিন থাকব। সেখান থেকে আমি ভিয়েনায় আসব। জাগ্রেব-এ যদি আপনার কোনও বন্ধু-বান্ধব থাকে তাঁদের কাছে আমাকে পরিচিত করিয়ে দিতে পারেন।

প্রেসিডেন্ট ভেটার এখন কেমন আছেন এবং কোথায় আছেন? ভিয়েনায় তিনি কবে ফিরবেন? ডালমেশিয়ান উপকূলে তাঁর সময় ভালভাবে কেটেছে তো? আপনার কী ইচ্ছে? কত দিন ওখানে থাকবেন?

মনে হচ্ছে আমার চিঠিপত্র ডাকে হারিয়ে যাচ্ছে, কেননা বুদাপেস্ট থেকে আসার পর আপনার কোনও চিঠি পাইনি।

আশা করি আপনি ভাল আছেন। মিস ভেটার কি লন্ডন থেকে ফিরেছেন?

শ্রদ্ধা সহকারে,

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস

অজিতকুমার দে-কে

প্রযত্নে: আমেরিকান এক্সপ্রেস কোং
ভিয়েনা
১২.৬.১৯৩৪

প্রিয় অজিতবাবু,

আপনার ১৭ মে-র চিঠি এবং তার সঙ্গে প্রভুদয়ালের লেখা কয়েকটি ছত্র পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি। আমি প্রথম সুযোগেই ভোলানাথ দত্তকে একটি বার্তা পাঠাচ্ছি। আপনি যদি সেটি অনুমোদন করেন, তাঁকে দিয়ে দেবেন। এই মুহূর্তে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ওই কথাটি ওঁকে লেখা উচিত কি না। যদি লেখাটা ঠিক না হয়ে থাকে, আপনি একটি খসড়া করে আমার কাছে পাঠান, আর নয় তো আমাকে একটু জানান আমার কী লেখা উচিত।

জুলাইয়ের শেষ পর্যন্ত আমি ভিয়েনায় থাকব। আমার ডাক্তার বলছেন গত এক বছরে আমার স্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি হয়েছে, কিন্তু চিকিৎসা আরও কয়েক মাস চালাতে হবে।

অমি প্রথম বিভাগে পাশ করেছে জেনে খুশি হলাম। আমি আশা করি সে বি.এস.সি-তেই ভর্তি হবে, ভুল করে বি. এ.-তে যাবে না।

প্রভুদয়ালবাবুকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানাবেন, আপনিও জানবেন। গত দু' মাস আমি দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করেছি, গিয়েছি চেকোস্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, যুগোস্লাভিয়া ইত্যাদি দেশে। মিসেস দে-কে শ্রদ্ধা জানাবেন। বাবা-মা'কে আমার প্রণাম দেবেন।

আপনার
সুভাষ

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার-কে
[মূল বাংলায়]

c/o American Express Co.
Vienna
৫.৭.৩৪

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

প্রিয়বরেষু

অনেকদিন হইল আপনাকে কোনও চিঠি লিখিতে পারি নাই। তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। আমি প্রায় তিন মাস নানা দেশ ঘুরিয়া, তিন সপ্তাহ হইল এখানে আসিয়াছি। এখানে অগাস্টের শেষ পর্যন্ত থাকিব। আমার শরীর পূর্বাপেক্ষা ভাল হইলেও এখনও আরোগ্য লাভ করিতে পারি নাই। পেটের যন্ত্রণা এখনও মধ্যে ২ দেখা দেয়। তাই আগামী ২/৩ মাস "চিকিৎসার শ্রাদ্ধ" করাইব।

এক সপ্তাহ হইল short-wave treatment করাইতেছি—সঙ্গে ২ অন্যান্য চিকিৎসাও চলিতেছে—কিন্তু এখনও বিশেষ উপকার পাই নাই।

দেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে লিখিতে ও বলিতে ইচ্ছা করে কিন্তু দূরে থাকাতে, নিজের ভাব প্রকাশ করা সহজ নহে। আপাতত সে চেষ্টা হইতে বিরত হইলাম।

আমি এখন একটি পুস্তক লিখিতেছি—১৯২০-৩৩-এর ঘটনাবলী সম্বন্ধে। লন্ডনে তাহা প্রকাশিত হইবে এবং ভাল প্রকাশক পাইয়াছি। এই সময়ের ঘটনাবলী সম্বন্ধে কি কোনও বই আছে? সকল ঘটনা ও তারিখ ইত্যাদি আমার ঠিক স্মরণ নাই—তাই ২/১টি বইয়ের প্রয়োজন বোধ করিতেছি। যদি আপনি কোনও বইর নাম করিতে পারেন তাহা হইলে সুখী হইব। আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। কর্পোরেশনের ঝগড়া আর কতদূর গড়াইবে? মফস্‌সলের কংগ্রেস কর্মীরা কী করিতেছেন? তাঁরা কি বিদ্রোহ করিতে পারেন না? থাক। প্রীতি সম্ভাষণ জানিবেন।

ইতি
ভবদীয়
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

এ. সি. এন. নাম্বিয়ার-কে

Peter Jordan Str. 28/1
Wien XIX
১০.৭.৩৪

প্রিয় নাম্বিয়ার,

আপনার দীর্ঘ নৈঃশব্দ্যের কারণ বুঝতে পারছি না। কয়েক দিন আগে আমি ওপরের ঠিকানা থেকে আপনাকে চিঠি দিয়েছি। অগাস্টের শেষ পর্যন্ত আমি এখানে থাকব। এখানে আমার একটা চিকিৎসা চলবে (short-wave therapy) এবং একটি বইও লিখতে হবে, ভারতে ১৯২০ থেকে ১৯৩৩-এর ঘটনাবলি নিয়ে, লন্ডনের একটি প্রকাশকের জন্য। সেই উদ্দেশ্যে আমি এক ভারতীয় বন্ধুর সঙ্গে একটি ফ্ল্যাট নিয়েছি ওপরের ঠিকানায়।

এক পাঞ্জাবি বন্ধু, মি. শের সিং আগামীকাল সকালে প্রাগ যাচ্ছেন। আমি তাঁকে বলেছি আমার নাম করে একটি টেলিগ্রাম আপনাকে পাঠাতে, আপনাকে স্টেশনে তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য। কাল দুপুর একটায় উনি ওখানে পৌঁছবেন। তাঁকে আমি প্যালেস হোটেলে থাকতে বলেছি। তিনি মোটে এক দিন ওখানে থাকবেন।

ড্রেসডেন-এর বন্ধুরা দুটি অনুরোধ পাঠিয়েছেন। মি. এস. সি রায় একটি এবং মি. চ্যাটার্জি একটি।

১) মি. এস. সি. রায় (ইঞ্জিনিয়ারিং)

তিনি ড্রেসডেন-এ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র। তিনি একটি বস্ত্র কারখানায় এবং পরে একটি কৃত্রিম রেশমের কারখানায় ঢুকতে চান শিক্ষানবিশ হিসাবে। বস্ত্রশিল্পে চেকোস্লোভাকিয়া খুবই উন্নত ও আধুনিক। আপনি কি তার ব্যবস্থা করতে পারেন? যাই হোক, মি. রায়কে চিঠি দিয়ে জানাবেন। তাঁর ঠিকানা, মি. এস. সি. রায়, Nurnberger str, 31, Dresden A. 24.

২) এন. সি চ্যাটার্জি (পদার্থবিদ্যা)।

তিনি মিউনিকের ডয়েশ অ্যাকাডেমি থেকে একটি বৃত্তি পাচ্ছিলেন। তিনি ভারতে এম. এস. সি পাশ করেছেন এবং ড্রেসডেন-এ পি. এইচ. ডি'র জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। তাঁর অধ্যাপক, ড. ...(দুষ্পাঠ্য) ইহুদি বলে বরখাস্ত হন এবং নতুন অধ্যাপক Dr. Tomaschek [?] তাঁর আগেকার কাজ খারিজ করে দিয়ে নতুন করে গবেষণা আরম্ভ করতে বলেছেন। তার অর্থ, ড্রেসডেন-এ তাঁকে অন্তত আরও দেড় বছর থাকতে হবে। তার ওপরে, ডয়েশ অ্যাকাডেমি থেকে তাঁর বৃত্তিও বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

(১) প্রাগে তিনি কি পড়াশোনা ও গবেষণার সুযোগ-সুবিধা পাবেন?

(২) কোনও রকম বৃত্তি পাবার কিংবা বিনা খরচে পড়াশোনা করার, থাকার, খাওয়ার কি আদৌ কোনও সম্ভানা আছে? মি. চ্যাটার্জি খুব চমৎকার মানুষ। তাঁর ঠিকানা:

N. C. Chatterjee, Lindenan str. 32/1, Dresden.

যথাশীঘ্র সম্ভব উপরোক্ত বিষয়গুলির দিকে একটু মনোযোগ দেবেন।

যখন আমি প্রাগে ছিলাম আপনাকে বলেছিলাম আমার ফোটোর সাতটি কপি (ছ'টি আমার এবং একটি ড. শর্মার জন্য) অর্ডার দিতে বলেছিলাম এবং বোধ হয় আমার ছ' কপির জন্য 150 Kr. আপনার কাছে রেখে এসেছিলাম, সে বিষয়ে আপনি কী করেছেন?

আপনার
সুভাষ সি. বোস

ভি. লেসনি-কে

Peter Jordan Strasse 28/1
Wien XIX
২৫.৭.৩৪

প্রিয় অধ্যাপক,

জার্মানি থেকে কয়েকজন ভারতীয় ছাত্র প্রাগের বিষয়ে খোঁজখবর করছেন। আমার মনে হয় তাঁরা ইতিমধ্যে আপনাকে চিঠি লিখেছেন। জার্মানির যে-যে জায়গা আমি গিয়েছি, আমি প্রাগে আমাদের সমিতির কথা বলেছি, আর আপনার ঠিকানা দিয়েছি। সম্প্রতি ড্রেসডেন থেকে তিন জন ছাত্র আমাকে লিখেছেন প্রাগে যেতে চান। মনে হয় তারা ইতিমধ্যে আপনাকে কিংবা মি. নাম্বিয়ারকে চিঠি দিয়েছেন। এঁরা সবাই ভাল ছেলে।

(১) কলকাতার মি. চ্যাটার্জি, এম. এস. সি, পদার্থবিদ্যায় ডক্টরেট করতে চান। আগে ওঁকে মিউনিকের ডয়েশ অ্যাকাডেমি থেকে একটা বৃত্তি দেওয়া হত, কিন্তু সেটা এখন বন্ধ রয়ে গিয়েছে।

(২) ড্রেসডেনের মি. কে. পি. ঝা প্রাগে মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডক্টরেট করতে চান। তিনি তিন বছর জার্মানিতে পড়াশোনা করছেন। ড্রেসডেনে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি অত্যন্ত ভদ্র এবং পরিশ্রমী। কিছুদিন আগে পর্যন্ত তিনি দ্বারভাঙ্গার মহারাজার কাছ থেকে

একটা বৃত্তি পাচ্ছিলেন, সেটা এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তিনি বিনা খরচে শিক্ষা এবং বাসস্থান চান।

(৩) ড্রেসডেনের মি. এস. সি. রায় ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছেন। তিনি এখন কোনও বস্ত্র কারখানায় এবং চেকোস্লোভাকিয়ার কোনও কৃত্রিম রেশমের কারখানায় বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষানবিশ হিসেবে প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং চান। যদি কৃত্রিম রেশম কারখানায় ঢুকতে নাও পারেন, কোনও বস্ত্র কারখানায় ঢুকতে চান। চেকোস্লোভাকিয়ায় অজস্র বস্ত্র কারখানা, কাজেই আমার মনে হয় বিনা বেতনের শিক্ষানবিশ হিসাবে তাঁকে একটা কাজ জোগাড় করে দেওয়া কষ্টকর হবে না।

আপনার মূল্যবান সময় আর বেশি আমি নিতে চাই না। আশা করি আমাদের ছেলেদের জন্য আপনি কিছু করতে পারবেন।

অগাস্ট, সেপ্টেম্বর কোথায় থাকবেন মনস্থ করেছেন? আমি অগাস্টের শেষ পর্যন্ত ওপরের ঠিকানায় থাকব।

আপনার
সুভাষ সি. বোস

অধ্যাপক ড. লেসনি
প্রাগ

সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র-কে

প্রযত্নে: আমেরিকান এক্সপ্রেস কোং
ভিয়েনা
২৫.৭.১৯৩৪

প্রিয় সত্যেনবাবু,

আপনার ৬ তারিখের চিঠি যথা সময়ে পেয়েছি। আপনাকে আমি কী সাহায্য করতে পারি? আমার নিজের বলতে এখন কোনও দল নেই এবং আমার মনে হয় না আজ বঙ্গদেশে আমার কথার কেউ গুরুত্ব দেয়। আমার অবস্থা আমি খুব ভাল করেই জানি—কিন্তু আমি তা নিয়ে মাথা ঘামাই না। নিজের মতো করে, নিজের সাধ্য অনুযায়ী আমার দেশের সেবা করতে পারলেই আমি সন্তুষ্ট, যদি আমি এই বিপুল বিশ্বে একাও হই। কলকাতায় যে দুটি পার্টি এখন খুদ-কুঁড়ো নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে, তারা দুটিই সমান। হায়, ১৯২৯ সালে যদি আমি এটা জানতাম, আমার অনেক পরিশ্রম বাঁচত।

অখিলবাবুও আমার কথার বেশি মূল্য দেবেন বলে আমি মনে করি না। অখিলবাবুকে আপনি ভালই চেনেন। একবার তিনি মনস্থির করে ফেললে তাঁকে কিছু বোঝানো খুব কঠিন। এমনকী দেশবন্ধু যখন ১৯২৩ সালে চেয়েছিলেন অখিলবাবু বিধানসভায় যান, তিনি তাঁকে বোঝাতে পারেননি।

বঙ্গদেশের রাজনৈতিক বন্দিদের জন্য আপনি বিধানসভায় যা করেছেন, সে সম্বন্ধে আমি খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করি। ঈশ্বর আপনাকে সে জন্য আশীর্বাদ করুন।

আপনার জন্য আমি সব কিছু করতে প্রস্তুত, কিন্তু কলকাতার দলীয় রাজনীতির সঙ্গে আমি কোনও সম্পর্ক রাখতে চাই না। এমতাবস্থায় আপনাকে এক প্রকৃত বন্ধুর আন্তরিক শুভেচ্ছা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

শ্রীমতী মিত্রকে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন এবং আপনি আমার আন্তরিক ভালবাসা নেবেন। আপনাদের কন্যা এতদিনে কত বড় হল?

আমার শরীর এখন আগেকার চেয়ে অনেক ভাল, কিন্তু অসুখটা সমূলে সারছে না। যন্ত্রণাটা হঠাৎ-হঠাৎ ফিরে আসে এবং কেউ তার কারণ ধরতে পারছে না। ভাবছি একটা অস্ত্রোপচার করাব, যাতে যন্ত্রণাটা চিরতরে দূর হয়।

অবসর সময়ে আমি লন্ডনের এক প্রকাশকের জন্য ভারতে গত চোদ্দো বছরের ঘটনা সম্পর্কে একটি বই লিখছি। অগাস্ট মাসে বইটি শেষ হবে।

আপনার
সুভাষ সি. বোস

পুঃ বাবু প্রিয়নাথ সেনও তাঁর প্রার্থীপদ সমর্থন করবার জন্য চিঠি দিয়েছেন। একই ভাবে তাঁকে আমি চিঠি দিয়েছি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-কে
[মূল বাংলায়]

C/o American Express Company
Vienna
৩রা অগাস্ট, ১৯৩৪

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

একটা বিশেষ কারণে আপনাকে বিরক্ত করিতেছি, আশা করি তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করিবেন।

লন্ডনের জনৈক প্রকাশকের অনুরোধে আমি এখন একটি পুস্তক লিখিতেছি। পুস্তকের বিষয়— "The Indian Struggle, 1920-34।" প্রকাশকের নাম Wishart and Company, 9 John Street, adelphi, London, W.C. 2। অগাস্ট মাসের মধ্যেই আমার লেখা শেষ হইবে এবং অক্‌টোবরের মধ্যে বই প্রকাশিত হইবে। যে সময়ে Joint Select Committeeর রিপোর্ট সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত হইবে, ঠিক সেই সময়ে আমার বইটিও প্রকাশিত হইবে। পুস্তকের গোড়ায় "Historical Background" শীর্ষক এক অধ্যায় থাকিবে এবং একেবারে শেষে "Coming Events" শীর্ষক এক অধ্যায় থাকিবে। প্রকাশকদের আশা যে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় খুব বেশী বিক্রী হইবে এবং তাঁহারা জার্ম্মাণ ও ফরাসী অনুবাদেরও চেষ্টা করিতেছেন। আমি এখন চাই কোনও বিশিষ্ট ইংরাজী লেখকের কাছ থেকে আমার পুস্তকের জন্য সূচনা বা Foreword.

আমি নিজে খুব সুখী ও সন্তুষ্ট হইব যদি Bernard Shawর লেখনী হইতে কয়েকটী ছত্র পাই। এ বিষয়ে হয় তো আপনি সাহায্য করিতে পারিবেন। আপনি যদি Mr. Bernard Shaw

মহাশয়কে এ বিষয়ে লিখিতে পারেন তাহা হইলে বড় উপকৃত হইব। তবে আপনি যদি কোনও প্রকার সঙ্কোচ বা অনিচ্ছা বোধ করেন তাহা হইলে আমি আপনাকে অনুরোধ করিতে চাই না। এবং আপনি যদি লেখা স্থির করেন, তাহা হইলে এমন ভাবে অনুগ্রহ করিয়া লিখিবেন যাহাতে প্রকৃত পক্ষে কিছু কাজ হয়। কেবল আমার অনুরোধ রক্ষার জন্য লিখিয়া কোনও লাভ নাই। আমি যখন ইয়ুরোপে আসি, আপনি তখন অনুগ্রহ করিয়া Romain Roland মহাশয়কে আমার সম্বন্ধে পরিচয় পত্র দিয়াছিলেন কিন্তু সে পরিচয় পত্র যেন অনুরোধ রক্ষার জন্য লেখা। সুতরাং সে পত্রের আমি সদ্ব্যবহার করিতে পারি নাই এবং নিজেই Roland মহাশয়ের সহিত পত্র ব্যবহার আরম্ভ করি। Bernard Shaw মহাশয় বোধহয় আমার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না সুতরাং তাঁহাকে ভাল করিয়া লেখা দরকার হইবে।

আমি ভরসা করি যে আমার পুস্তকের আদর হইবে। কারণ প্রকাশক মহাশয় আমার সহিত contract করিয়াছেন এবং royaltyর টাকা লইয়া আমি লেখা আরম্ভ করিয়াছি।

Bernard Shaw ব্যতীত আর একজনের কাছ থেকে Foreword পাইলেও কাজ হইতে পারে— H. G. Wells¥ Rolland মহাশয়ের কথা আমার মনে হইয়াছিল কিন্তু তিনি প্রচণ্ড রকমের "গান্ধীভক্ত", অথচ আমি তাহা নহি এবং তাঁহাকে সেকথা আমি জানাইয়াছি। সুতরাং Rolland মহাশয় যে আমার পুস্তকের সূচনা লিখিতে রাজি হইবেন সে আশা আমি করিতে পারি না। Bernard Shaw বা Wells মহাশয় মহাত্মাজী সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন কিন্তু তাঁহারা অন্ধভক্ত নন— সুতরাং তাঁহারা হয়তো রাজি হইতে পারেন। আপনার কথাও আমার মনে হইয়াছিল কিন্তু আমি জানি না আপনি রাজনীতি বিষয়ক পুস্তকের জন্য কিছু লিখিতে ইচ্ছুক হইবেন কি না। তদ্ব্যতীত আপনি নিজে সম্প্রতি মহাত্মাজীর অন্ধভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন— অন্ততঃ পক্ষে আপনার লেখা পাঠ করিলে সেরূপ ধারণা মানুষ স্বভাবতঃ পোষণ করিতে পারে। এরূপ অবস্থায় মহাত্মাজীর সমালোচনা আপনি বরদাস্ত করিতে পারিবেন কি না আমি জানি না। আমার পুস্তকটা হইবে— "an objective study of the Indian movement from the standpoint of an Indian nationalist."

Bernard Shaw মহাশয়ের ঠিকানা— 4 whitehall court, London, S.W.— আপনি ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে লিখিতে পারেন অথবা চিঠিটা আমার নিকট পাঠাইতে পারেন।

আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

ইতি আপনার অনুগত
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

পুনঃ আমার ব্যক্তিগত মতামত শেষ অধ্যায়ে লিখিব। ঐ অধ্যায়ে ভবিষ্যতে ভারতের আন্দোলন যে আকার ও রূপ ধারণ করিবে সে বিষয়ে আমার মত ও ধারণা প্রকাশ করিব।

সুভাষ

নাওমি সি. ভেটার-কে

Peter Jordan Str. 28/1
Wien XIV
১৪.৮.১৯৩৪

প্রিয় মিসেস ভেটার,

আপনার ১০ তারিখের কার্ড পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি। আশা করি পাহাড়ে আপনার সময় বেশ ভাল কেটেছে। তারপর আপনারা কী করবেন ভাবছেন?

আমার নতুন বিশেষ কিছু লিখবার নেই। আলাদা করে আমি টাইমস-এর এক কপি পাঠাচ্ছি। আপনাদের পড়তে ভাল লাগতে পারে।

আমি আমার কাজ করে যাচ্ছি, কিন্তু যা লিখছি সেটা আমার খুব পছন্দ হচ্ছে না। কিন্তু কী আর করব? অগাস্টের পর আমি অসুখ সারাবার জন্য কার্লসবাড যেতে পারি। এখন আমার আলট্রা ভায়োলেট চিকিৎসা চলছে। ("শর্ট ওয়েভ" চিকিৎসা আমি অধ্যাপক নিউমান-এর কথায় বন্ধ করে দিয়েছি।) এতে যদি কাজ না হয় আমাকে কার্লসবাড-এ যেতে হবে। কিংবা এখানে অস্ত্রোপচার করিয়ে দেখতে হবে। প্রথমটিই আমার পছন্দ।

এখানে রোদ নেই, প্রায়ই মেঘ করে থাকছে। মাঝে-মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে। শ্রদ্ধা সহকারে—

আপনার
সুভাষ সি বোস

অজিতকুমার দে-কে

প্রযত্নে: আমেরিকান এক্সপ্রেস
ভিয়েনা
২৯.৮.৩৪

প্রিয় অজিতবাবু

আপনার ১২ জুলাইয়ের চিঠি কিছুদিন আগে পেয়েছি।

আমার একটি ব্যক্তিগত ব্যাপারে আপনাকে একটু কষ্ট দেব। বোধ হয় আপনি জানেন, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্পর্কে আমি এখন একখানি বই লিখছি। আমার লন্ডনের প্রকাশক বইটির জন্য কয়েকখানি ফোটো চান। সম্ভব হলে প্রথমত তাঁরা চান, স্বেচ্ছাসেবীদের নেতা হিসেবে ইউনিফর্ম-পরিহিত আমার একটি ছবি।

১৯২৮ কিংবা ১৯২৯-এ ফরওয়ার্ড কিংবা লিবার্টি বিশেষ সংখ্যায় সে-রকম একটি ছবি ছাপা হয়েছিল। সেই সংখ্যাটি যদি আপনি খুঁজে পান, আমাকে পাঠিয়ে দিলে আমি খুব উপকৃত হব। হয়তো গোপাল সান্যাল সেই সংখ্যাটি খুঁজে বের করতে পারবেন কিন্তু আমার জন্য তাঁকে আমি ব্যস্ত করতে চাই না। লিবার্টি-র প্রকাশ আরম্ভ হয় মে (?) ১৯২৯-এ এবং ওই ফোটোটি তোলা হয়েছিল ১৯২৮-এর ডিসেম্বর মাসে। কাজেই 'ফরওয়ার্ড' কিংবা

'লিবার্টি'-র বিশেষ সংখ্যায় ছবিটি ছাপা হয়েছিল ১৯২৮ কিংবা ১৯২৯-এর ডিসেম্বরে।

আমার আর একটি ইউনিফর্ম-পরিহিত ফোটো (বড় আকারের) কংগ্রেস অফিসে ছিল। ফোটোটিতে আমি অশ্বপৃষ্ঠে। ফোটোটি যদি আপনি দেখতে পান এবং তার একটি প্রতিলিপি আমাকে পাঠাতে পারেন, আমি অতিশয় কৃতজ্ঞ থাকব। অন্য ফোটোর চেয়ে এটি ভাল ছিল। কিন্তু যেহেতু কংগ্রেস অফিসের মূল ফোটোটি বেশি বড় তার একটা প্রতিলিপি করিয়ে নিতে হবে।

অশোককে আমি আগেই লিখেছি আমাকে মহাত্মা গান্ধী, মি. সি. আর. দাশ এবং অন্য বড় বড় নেতা, যেমন লালাজি, পণ্ডিত মতিলাল প্রমুখ ব্যক্তির কয়েকটি ফোটো একটু চেষ্টা করে যেন পাঠিয়ে দেয়। এই ছবিগুলো পাঠানোর ক্ষেত্রেও যদি আপনি সাহায্য করেন তা হলে আমি খুব কৃতজ্ঞ বোধ করব। যখন চিঠি দিয়েছিলাম তখন জানতাম না প্রকাশকেরা আমারও একটি ফোটো চাইবেন, সেই জন্য আমি তাকে সে কথা লিখিনি। যাই হোক, আমার ফোটোর ব্যাপারে আপনি যদি কিছু করতে পারেন তাতেই আমার চলবে।

বইটি অক্টোবর মাসে বেরোবে, কাজেই আপনাকে ফোটোগুলি এয়ার মেলে পাঠাতে হবে, যাতে সেপ্টেম্বরের শেষ দিকের মধ্যে পৌঁছয়, ফরওয়ার্ড কিংবা লিবার্টি-র বিশেষ সংখ্যাটি যদি পান ওই পাতাগুলি কেটে সাবধানে প্যাক করে এয়ার মেলে পাঠিয়ে দিন। গোটা পত্রিকাটি এয়ার মেলে পাঠাবার দরকার নেই।

ফোটোর ব্যাপারে যদি একদম কিছু করতে নাও পারেন, দয়া করে এয়ার মেলে আমাকে জানান, কেন না আমি উদ্বেগের মধ্যে থাকব। আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি বলে আমার খারাপ লাগছে। এ ধরনের কাজ আপনার জন্য নয়। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, আপনাকে লিখলে কাজ হবে।

আমার শরীরের কথা জানাই। আগেকার চেয়ে অনেক ভাল আছি। কিন্তু শরীরের ভিতরে যন্ত্রণাটা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত অস্ত্রোপচার একটা করতেই হবে, নভেম্বর মাসে। তার আগে আমি চেকোস্লোভাকিয়ায় কার্লসবাড-এ গিয়ে এক মাস সেখানকার জল-চিকিৎসা করাতে চাই। সবাই বলে কার্লসবাড-এর প্রাকৃতিক উৎসগুলির জল পেটের এবং অন্ত্রের অসুখের পক্ষে খুব ভাল। আমি ২ সেপ্টেম্বর কার্লসবাড যাবার ব্যবস্থা করেছি। তবু আমাকে C/o American Express Company, Vienna, এই ঠিকানাতেই চিঠি দেবেন।

প্রভুদয়ালবাবুকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাবেন এবং আপনার বাবা-মা'কে আমার প্রণাম দেবেন। শ্রীমতী দে-কে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন, রেবাকে ভালবাসা দেবেন।

আপনার
সুভাষ

পুঃ অশোক এখন কেমন আছে? মেজদার নির্বাচনের খবর কী?

এস. সি. বি.

পুঃ মি. সি. আর. দাশের একটি ভাল ফোটোর জন্য অশোক যেন শ্রীমতী দাশের সঙ্গে কথা বলে। তিনি ভাল একটি ফোটো দিতে পারতে পারেন।

এ. সি. এন. নাম্বিয়ার-কে
[পোস্টকার্ড]

Poste Restante
Karlsbad
৬.৯.৩৪

গত রবিবার আমি এখানে পৌঁছেছি। Schlossberg-এ একটা বোর্ডিং হাউস-এ দেখছি কেমন লাগে। যদি ভাল লাগে এক মাস থাকব না হলে অন্য কোথাও চলে যাব। ইতিমধ্যে ওপরের ঠিকানাতে চিঠি দেবেন।

ফিলজফিক্যাল কংগ্রেস থেকে আমি কোনও আমন্ত্রণ পাইনি, যদিও অধ্যাপক লেসনি লিখেছিলেন ওরা আমাকে আমন্ত্রণ জানাবে।

Herrn A.C. Nambiar
Cestimirova 863/V
Prag XIII
CSR

এস. সি. বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

Kurhaus Koinigin Alexandra
Schlossberg
Karlsbad
কিংবা
C/o Poste Restant
C.S.R.
২৪.৯.৩৪

প্রিয় মিসেস ভেটার,

ভিয়েনা থেকে উধাও হয়ে যাওয়ার পর আপনাকে যে কোনও চিঠি দিইনি, সে জন্য আমি দুঃখিত। যখন আমি প্রথম এখানে এলাম আবহাওয়া ছিল অতি চমৎকার, বাতাস ছিল প্রফুল্ল। আমার খুব ভাল লাগছিল। গত কয়েকদিন আকাশ মেঘলা গেল। আজ আবার পরিষ্কার। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ আমার খুব ভাল লাগে, কেননা এক ঘণ্টা কিংবা আধ ঘণ্টাতেই একটা পাহাড়ের উপর উঠে টাটকা বায়ু উপভোগ করা যায়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে এই শহর নিশ্চয়ই অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। রাস্তায় তখন অজস্র লোক, মনে হয় কোনও বড় শহরে আছি। সে দিক থেকে, এখনই আমি অনেক ভাল আছি। আমার অদ্ভুত পোশাকের জন্য আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবার লোক এখন কম।

দুঃখের বিষয়, আমার বইটি আমি এখনও লেখা শেষ করতে পারিনি, এবং সে জন্য দুশ্চিন্তায় আছি। এ মাসের শেষ পর্যন্ত আমার সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে শেষ করতেই হবে। ৩০ সেপ্টেম্বরের পর ভাল করে নিশ্বাস নিতে পারব।

ভিয়েনা থেকে ফিরে আপনি কেমন আছেন? এবং ড. ভেটার কেমন আছেন? পাহাড় থেকে

বেড়িয়ে এসে আপনাদের দু'জনেরই শরীর রীতিমতো ভাল দেখে আমার খুব ভাল লাগল।

আপনাদের পাঠানো ছবিগুলো এত ভাল, যে আগামী গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত আমি যদি ইউরোপে থাকি, আমাকে দক্ষিণ অস্ট্রিয়ায় গিয়ে হিমবাহগুলি দেখতেই হবে। দেখতে চাই বিশেষ করে আরও এই জন্য, যে হিমালয়ের হিমবাহ দেখা আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব বললেই হয়।

মাঝে-মাঝে দেশে ফিরে আসার জন্য মনটা ব্যাকুল হয়, কিন্তু আমার শরীর এখনও পুরোপুরি সেরে ওঠেনি। দ্বিতীয়ত, দেশে পা দিলে ওরা আমাকে ছেড়ে কথা বলবে না। আমার দাদা এখনও অন্তরীণ। আমাদের পরিবার তাই নিয়ে খুব মনোকষ্টে আছে।

আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বলতে গেলে, আমি আরও কয়েক সপ্তাহ এখানে থাকতে চাই। তারপর আবার ভিয়েনা ফিরে যাব, এবং সার্জেনের ছুরির কাছে আত্মসমর্পণ করব। শীতকালে আমি কোথায় কাটাব জানি না, দক্ষিণে কোথাও যেতে পারলে ভাল হত, সেখানে সূর্যের দেখা পাওয়া যায়। কিন্তু যাবার আগে আমার যিনি সার্জেন তাঁর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে হবে।

আশা করি আপনারা সবাই ভাল আছেন। শ্রদ্ধা সহকারে,

আপনার একান্ত
সুভাষ সি. বোস

সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র-কে[১]

প্রযত্নে: আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানি
ভিয়েনা
কার্লসবাড
১৮.১০.৩৪

প্রিয় সত্যেনবাবু,

আপনার ৩ তারিখের চিঠি ১৬ তারিখে পেয়েছি। আপনি আমার কাছে খুব সামান্য কিছুই চেয়েছেন, কিন্তু তাও আমি আপনাকে দিতে পারছি না। অথচ আমি আপনার জন্য অনেক বেশি, অনেক, অনেক বেশি করতে চাই।

উত্তর না দিলেই বোধ হয় সবচেয়ে ভাল হত, কিন্তু আমি চিরকাল বিশ্বাস করে এসেছি, খোলাখুলি কথা বলাই সব চাইতে ভাল, যদি তাতে বন্ধুবিচ্ছেদ হয়, তবুও।

মহাত্মা গান্ধীর অনুচরদের যেখানে আধিপত্য, সেই ওয়ার্কিং কমিটির ওপর আমার কোনও আস্থা নেই। যে পার্লামেন্টারি বোর্ডের প্রধান সদস্যরা ১৯৩২-৩৩ সালে দেশের সংকটের সময়ে নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়েছিলেন, সেই পার্লামেন্টারি বোর্ডের ওপর আমার আস্থা আরও কম। আমার যে-প্রাক্তন সহকর্মীরা নিজেদের স্থান মজবুত করবার জন্য বঙ্গদেশের রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীকে টেনে এনেছেন, তাঁদের জন্য আমার কোনও সহানুভূতি নেই। সবশেষে (এটাও খুব তুচ্ছ বিষয় নয়), যে-দল ইউরোপীয়দের সমর্থনে শক্তিবৃদ্ধি করতে শ্রীযুত নলিনী সরকারকে কলকাতার মেয়র হিসাবে চান, তাঁদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখতে আমি লজ্জা বোধ করি।

---

১. এই চিঠিটি প্রকাশের জন্যে নয় বলে চিহ্নিত ছিল

প্রিয় বন্ধু হিসেবে আমি আপনাকে ভালবাসি, যে-সব দামি মানুষ এত দুর্ভোগ সহ্য করেছেন এবং বন্ধু বলতে জগতে যাঁদের খুব কমই আছেন, তাঁদের জন্য আপনি যা করেছেন, তাঁর জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। দেশপ্রেমী হিসেবে আমি আপনাকে সম্মান করি। কিন্তু আমি আপনাকে সাহায্য কীভাবে করতে পারি? যে-সংগঠন আপনাকে প্রার্থী হিসাবে মনোনীত করেছে, তাদের ওপরে আমার কোনও আস্থা নেই এবং অখিলবাবুকে পেলে তাঁরাও আপনাকে দাঁড় করাত কি না আমার সন্দেহ। যে অবস্থাগতিকে আপনার এবং অখিলবাবুর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়েছে সেটাকে আমি দুঃখজনক মনে করি। কিন্তু আমি অসহায়। যে-সংগঠন আপনাকে প্রার্থী করেছে তাদের থেকে আপনাকে আলাদা করি কী করে?

সত্যেনবাবু, আমি জানি আমি আজ সম্পূর্ণ নির্বান্ধব, কিন্তু তাতে আমার দুঃখ নেই। আমি যা ঠিক মনে করি তাই বলব, তাই করব, যতই তাতে আমি অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করি, যতই জনসাধারণ আমাকে অপছন্দ করুক।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নিয়ে না-গ্রহণ না-বর্জনের নীতি আমি গ্রহণ করতে পারি না, বুঝতেও পারি না। ড. বি. সি. রায়ের দল এই প্রশ্নে মহাত্মা গান্ধীকে সমর্থন করে বাংলার অপরিমেয় ক্ষতি করেছে। এই প্রশ্নে বাংলার সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ থাকা উচিত ছিল।

কথাগুলো আমি খুব প্রবল ভাষায় লিখলাম, কেন না এ বিষয়ে আমার অনুভূতি খুব প্রবল; স্পষ্ট কথাই বললাম, কারণ আমি স্পষ্টবাদী মানুষ, সোজা কথা বলি, 'কোদাল'কে সোজাসুজি 'কোদাল' বলবার সাহস আমি রাখি। এমনই যদি আমার দুরবস্থা হয় যে আমার সঙ্গে আর কেউ থাকল না, তবু আমি বাংলার জন্য, ভারতের যাতে সবচাইতে ভাল হয়, তার জন্য সংগ্রাম করে যাব। আপনার এই কঠিন সময়ে আপনাকে সাহায্য করতে পারলাম না বলে আমি দুঃখিত। আমি নিশ্চিত জানি আপনি আমার অবস্থা বুঝতে পারবেন, এবং আমাকে মার্জনা করবেন। আমি আশা করি এমন দিন আসবে যখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমি দেখাতে পারব আমি আপনার প্রকৃত বন্ধু, সু-সময়ের বন্ধু নই সত্যিকারের বন্ধু।

আমার বিজয়ার ভালবাসা ও আলিঙ্গন গ্রহণ করুন।

আপনার
সুভাষ সি. বোস

শ্রীযুক্ত সত্যেন সি. মিত্র

ভি. লেসনি-কে

কার্লসবাড
১.১১.৩৪

অধ্যাপক ড. লেসনি
Zborovska 66
Praha XVI

প্রিয় অধ্যাপক,

আগামীকাল (শুক্রবার) সকালে আমি ভিয়েনা রওনা হচ্ছি। কয়েক ঘণ্টার জন্য প্রাগে যাত্রা বিরতি করব। অপরাহ্নে পৌঁছব, আবার রাত্রির ট্রেনে ভিয়েনা রওনা হব। যদি আপনি সময়

পান, বিকাল কিংবা সন্ধ্যায় আপনার সঙ্গে দেখা হলে খুশি হব। আমার ট্রেন রাত্রি দশটায়, সন্ধ্যা ছ'টার পর যে-কোনও সময়ে আমার সুবিধা হবে। আমি মি. নাম্বিয়ারকে লিখছি আপনার সঙ্গে কথা বলে সাক্ষাতের সময় স্থির করার জন্য।

সান্ধ্যভোজনের কোনও ব্যবস্থা দয়া করে করবেন না, যা আমি যখনই প্রাগে যাই আপনি করে থাকেন। আমার কিছু-কিছু অন্য কাজ আছে। আর, তা ছাড়া, আজকাল আমি সন্ধ্যাবেলা অতি সামান্য কিছু আহার করি। আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারলে আমি খুশি হব। তা হলে ইন্দো-চেকোস্লোভাক সোসাইটি সম্পর্কে এবং আমাদের দু'-পক্ষেরই যাতে আগ্রহ আছে এমন অন্যান্য বিষয় আলাপ-আলোচনা করতে পারতাম।

আপনার
সুভাষ সি. বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

সংশোধিত এবং অনুমোদিত
স্বাক্ষর অস্পষ্ট
১০/১২
ডি. সি. এস. বি-র পক্ষে

৩৮/২ এলগিন রোড
অথবা
১ উডবার্ন পার্ক
কলিকাতা
৭.১২.৩৪

প্রিয় মিসেস ভেটার,

আমি এখানে ৪ ডিসেম্বর পৌঁছেছি, ভিয়েনা ছেড়েছিলাম ২৯ নভেম্বর। কিন্তু আমি পৌঁছেছি বড় দেরিতে। আমার বাবা ২ ডিসেম্বর প্রায় মধ্যরাত্রিতে, অর্থাৎ আমার পৌঁছবার প্রায় ৪০ ঘণ্টা আগে ইহলোক ত্যাগ করেছেন।

বিমানযাত্রা আমি উপভোগ করতাম যদি না সর্বক্ষণ একটা উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা থাকত। কোনও-কোনও প্রভাতে সূর্যোদয় ছিল এক কথায় রাজকীয়। প্রাচ্যে সূর্যোদয়ের যে ঔজ্জ্বল্য, যে বর্ণবৈচিত্র, পাশ্চাত্যে তা অজানা। সে-সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল আমরা আকাশের উঁচুতে উঠে যাওয়ার জন্য। বেশিরভাগ সময়েই আমরা উড়ছিলাম ২০০০ মিটার উচ্চতায় এবং ঝাঁকানি ছিল খুবই সামান্য। একমাত্র উঁচুতে উঠবার ও নীচে নামবার সময়ে আমাদের অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হচ্ছিল। আওয়াজ আর বায়ুর চাপেও কানে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হচ্ছিল। তা হলেও, মোটের ওপর ভ্রমণটা খারাপ ছিল না।

ভবিষ্যতে আপনার সঙ্গে পত্রালাপ চালিয়ে যেতে পারব কি না জানি না। বর্তমানে আমি নিজের বাড়িতে বন্দি জীবনযাপন করছি। এই যে, যাকে ভারতে বলে গৃহে অন্তরীণ সে আদেশ আমার ওপর জারি করা হল আমি এরোপ্লেন থেকে নামা মাত্র। এখন আমাকে মায়ের সঙ্গে এক সপ্তাহ থাকতে দিচ্ছে, সপ্তাহ শেষ হলে আমার ওপর কী আদেশ হবে আমি জানি না। (...২টি

লাইন সেন্সর কেটে দিয়েছে), আর হয়তো আপনাকে চিঠি দিতে পারব না। তাই যদি হয়, দয়া করে আমাকে ভুল বুঝবেন না।

আমি যখন ভিয়েনায় ছিলাম, আমার প্রতি আপনাদের অনুগ্রহের জন্য কতৃজ্ঞতা প্রকাশের আমার ভাষা নেই। প্রেসিডেন্ট ভেটারকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাবেন, আপনিও জানবেন।

আমার মা শোকে ভেঙে পড়েছেন, আমরা ভাই-বোনেরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি মা'কে সান্ত্বনা দিতে, কিন্তু তাতে কোনও কাজ হচ্ছে না। একজন হিন্দু স্ত্রীর জীবন তাঁর স্বামীর জীবনের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে যায় যে স্বামীর অবর্তমানে তাঁর জীবন অসহনীয় হয়ে ওঠে। ইউরোপের জীবন অন্যরকম।

আমার বাড়ির ঠিকানা ৩৮/২ এলগিন রোড, কিংবা ১ উডবার্ন পার্ক। এখন আমি আমার মায়ের কাছে প্রথম ঠিকানায় আছি।

আবার আপনাকে কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধা জানাই,

আপনার
সুভাষ সি. বোস

ভি. লেসনি[১]-কে

পেনশন কসমোপোলাইট
অলসারসট্রাসে ২৩
ভিয়েনা VIII
২ জানুয়ারি ১৯৩৫

প্রিয় অধ্যাপক লেসনি,

কিছু দিন আগে আপনার চিঠি পেয়ে আমি খুশি হয়েছি। আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের কবির[২] ৭৫তম জন্মদিন আপনারা পালন করবেন জেনে আমি খুব আনন্দিত। আশা করি সে অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হবে। ইতিমধ্যে আমি ইন্দো চেকোস্লোভাক সোসাইটি-কে একটি উপহার পাঠিয়েছি। ইংরেজিতে কবির চারখানি বই।

আপনি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও নববর্ষের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আপনার একান্ত
সুভাষ সি. বোস

---

১. এই চিঠিটি সুভাষচন্দ্রের অনুপস্থিতির সময়ে এমিলি শেঙ্কল টাইপ করেছিলেন।
২. আমাদের কবি, বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

লাইন সেন্সর কেটে দিয়েছে), আর হয়তো আপনাকে চিঠি দিতে পারব না। তাই যদি হয়, দয়া করে আমাকে ভুল বুঝবেন না।

আমি যখন ভিয়েনায় ছিলাম, আমার প্রতি আপনাদের অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আমার ভাষা নেই। প্রেসিডেন্ট ভেটারকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাবেন, আপনিও জানবেন।

আমার মা শোকে ভেঙে পড়েছেন, আমরা ভাই-বোনেরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি মা'কে সান্ত্বনা দিতে, কিন্তু তাতে কোনও কাজ হচ্ছে না। একজন হিন্দু স্ত্রীর জীবন তাঁর স্বামীর জীবনের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে যায় যে স্বামীর অবর্তমানে তাঁর জীবন অসহনীয় হয়ে ওঠে। ইউরোপের জীবন অন্যরকম।

আমার বাড়ির ঠিকানা ৩৮/২ এলগিন রোড, কিংবা ১ উডবার্ন পার্ক। এখন আমি আমার মায়ের কাছে প্রথম ঠিকানায় আছি।

আবার আপনাকে কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধা জানাই,

আপনার
সুভাষ সি. বোস

ভি. লেসনি[১]-কে

পেনশন কসমোপোলাইট
অলসারসট্রাসে ২৩
ভিয়েনা VIII
২ জানুয়ারি ১৯৩৫

প্রিয় অধ্যাপক লেসনি,

কিছু দিন আগে আপনার চিঠি পেয়ে আমি খুশি হয়েছি। আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের কবির[২] ৭৫তম জন্মদিন আপনারা পালন করবেন জেনে আমি খুব আনন্দিত। আশা করি সে অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হবে। ইতিমধ্যে আমি ইন্দো চেকোস্লোভাক সোসাইটি-কে একটি উপহার পাঠিয়েছি। ইংরেজিতে কবির চারখানি বই।

আপনি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও নববর্ষের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আপনার একান্ত
সুভাষ সি. বোস

---

১. এই চিঠিটি সুভাষচন্দ্রের অনুপস্থিতির সময়ে এমিলি শেঙ্কল টাইপ করেছিলেন।
২. আমাদের কবি, বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নাওমি সি. ভেটার-কে

সংশোধিত এবং অনুমোদিত
স্বাক্ষর অস্পষ্ট
৯/১
ডি. সি. এস. বি-র পক্ষে

৩৮/২ এলগিন রোড
কলিকাতা
৮ জানুয়ারি ১৯৩৫

প্রিয় মিসেস ভেটার

আপনার সব চিঠি পেয়েছি এবং পড়েছি। আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ।

আপনি জেনে হয়তো অবাক হবেন, আমি আজ বম্বে রওনা হচ্ছি, ইউরোপের পথে। ১০ জানুয়ারি আমি বম্বেতে জাহাজ ধরব লয়েড ট্রিয়েসটিনো কোম্পানির এম. ভি. ভিক্টোরিয়া। জেনোয়া (ইতালি)-তে আমি ২১ জানুয়ারি পৌঁছব, অর্থাৎ ১১ দিন ভ্রমণের পর।

আমার অসুখ এখানে আসার পর বেড়ে গেছে। অস্ত্রোপচার করাতে হবে।

(সেন্সর কেটে দিয়েছে)...

বন্ধুদের সকলকে দয়া করে আমার যাত্রার কথা জানিয়ে দেবেন। আমার আশা, আমি পৌঁছবার আগেই এই চিঠি জেনোয়ায় পৌঁছে যাবে। দয়া করে খবরটা শ্রীমতী ফিউলোপ মিলার-কে জানাবেন। তাঁকে বলবেন আমি তাঁর সব চিঠি পেয়েছি। আলাদা করে আর তাঁকে চিঠি দিলাম না। আশা করি তিনি সে জন্য কিছু মনে করবেন না।

প্রেসিডেন্ট ভেটার ও আপনি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানবেন।

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

Albergo Palazzoand Ambasciatori
Roma
২৩.১.১৯৩৫

Frau President C Vettor
Wahringer Str. 41
Wien-EX
Autriche

প্রিয় মিসেস ভেটার

কলকাতা থেকে রওনা হওয়ার আগের দিন বিমান ডাকে আপনাকে যে-চিঠি দিয়েছিলাম আশা করি পেয়েছেন। আমি নেপলস-এ ২০ তারিখ অবতরণ করি এবং সঙ্গে-সঙ্গে ড. কাটিয়ার একটি চিঠি দিয়ে বন্ধুদেরকে আমার পৌঁছনর খবর দিয়ে দেন। আমি ২/৩ দিন এখানে থেকে

ভিয়েনা যাব। ওখানে আবহাওয়া এখন কেমন? নেপলস-এ আমরা ভীষণ তুষারপাত পেয়েছিলাম। ভাবতে পারেন? এখানেও কাল তুষারপাত হয়েছে, কিন্তু অত নয়। আজ আবহাওয়া ঝকমকে পরিষ্কার। সত্যি, ইটারনাল সিটি অপূর্ব! কলকাতা পুলিশ আপনার চিঠিতে আপনার নাম পড়তে না পেরে খুব ভাবনায় পড়েছিল। আমাকে পাঠোদ্ধার করে দিতে হয়। আপনারা দু'জনে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন।

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস

পুঃ আমাকে এখানে ২/৩ দিনের বেশি থাকতে হতে পারে।

সি. আর. প্রুয়েফার-কে

Hotel de France
Wien I
Schottenring 3
২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫

Hon. Dr. Curt Pruefer
Auswartiges Amt.
Wilhelmstrasse 75
Berlin

প্রিয় ড. প্রুয়েফার,

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সম্পর্কে 'দি ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল ১৯২০-৩৪' নামে আমার একখানি বই সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। বইখানি লন্ডনে প্রকাশ করেছেন Wishart and Co. ইংল্যান্ডের পত্র-পত্রিকা বইখানির অনুকূল সমালোচনা করেছে এবং বলেছে কোনও ভারতীয় রাজনীতিকের লেখা ভারত সম্পর্কে এটি সবচাইতে ভাল বই। আমার মনে হয় জার্মান পাঠকদেরও বইটি ভাল লাগবে, তাই বইটির একটি জার্মান অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন। আপনি কি কোনও জার্মান প্রকাশক সংস্থার কাছে বইটির পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন, যাতে তারা বইটির জার্মান অনুবাদ চালু করতে পারে?

আমার প্রকাশককে আমি বলছি আপনাকে এক কপি বই পাঠিয়ে দিতে। ইতিমধ্যে আপনাকে আমি একটি বিজ্ঞপ্তি পাঠাচ্ছি, যাতে বইটির বিষয়সূচি আছে।

আশা করি আপনাকে যে কষ্ট দিচ্ছি তার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনার উত্তরের প্রতীক্ষায় থাকব।

আপনার
সুভাষ সি. বোস

ই. উডস-কে

Hotel de France
Schottenring 3
Vienna 1
৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫

প্রিয় মিসেস উডস,

আমি ইউরোপে ফিরেছি দিন পনেরো আগে এবং ভিয়েনায় ফিরেছি সপ্তাহখানেক হল। এখানে পৌঁছে আপনার ৫ জানুয়ারির চিঠি পেলাম। আপনার সানুগ্রহ সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদ দেবার উপযুক্ত ভাষা আমার জানা নেই।

দুঃখের বিষয়, যদিও আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে, এখনও তা মোটেই সন্তোষজনক নয়। আমি এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেরে উঠতে চেষ্টা করছি। বলা বাহুল্য, শরীর যথেষ্ট পরিমাণে সুস্থ হলে আয়ারল্যান্ডে যাবার আশায় আছি।

মাদাম ম্যাকব্রাইড এখন কোথায় আছেন এবং কেমন আছেন? তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাবেন। আমার দাদা শরৎ (যিনি এখন অন্তরীণ), মাদাম ম্যাকব্রাইড-এর সঙ্গে যাঁর প্যারিসে দেখা হয়েছিল, তিনি আমাকে তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁকে জানাতে বলেছেন। ভারতে থাকার সময়ে যদিও আমার উপর কঠোর বাধা-নিষেধ জারি করা হয়েছিল, তবু আমি বাড়িতে থাকবার অনুমতি পেয়েছিলাম, আমার পরিবারের সকলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতও করতে পেরেছিলাম।

ইন্দো-আইরিশ লিগ-এর কাজ কেমন চলছে দয়া করে আমাকে এক লাইন লিখে জানান।

আন্তরিক শ্রদ্ধা সহকারে

আপনার
সুভাষ সি. বোস

জে. টি. সান্ডারল্যান্ড-কে

Hotel de France
Schottenring 3
Vienna 1
১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫

ড. জে. টি. সান্ডারল্যান্ড
১৫১০, কেমব্রিজ রোড
অ্যান আরবর
মিশিগান

প্রিয় ড. সান্ডারল্যান্ড,

আপনি শুনে সুখী হবেন 'দি ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল, ১৯২০-৩৪' নামে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে আমার একখানি বই প্রকাশিত হয়েছে। বইটি একজন বামপন্থী জাতীয়তাবাদীর দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত। আমি দেখে অবাক হয়েছি এবং খুশি হয়েছি যে

ইংল্যান্ডের পত্র-পত্রিকা বইখানির অনুকূল সমালোচনা করেছে। আমার লন্ডনের প্রকাশককে বলছি বইখানির একটি কপি আপনার কাছে পাঠিয়ে দিতে। আপনি অনুগ্রহ করে বইখানি গ্রহণ করলে আমি অতিশয় বাধিত হব।

আমার গভীর শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন।

আপনার
সুভাষ সি. বোস

রোমাঁ রলাঁ-র পত্র

Villeneuve (Vaud)
Villa Olga
২২ ফ্রেব্রুয়ারি ১৯৩৫

প্রিয় মি. সুভাষ সি. বোস,

আপনি দয়া করে আমাকে 'দি ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল, ১৯২০-৩৪' শীর্ষক যে বইখানি পাঠিয়েছেন আমি তা ঠিকমতো পেয়েছি। আপনাকে সে জন্য ধন্যবাদ জানাই এবং বইখানি লেখার জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাই। বইখানি এত কৌতূহলোদ্দীপক যে আমি আরেক কপির অর্ডার দিয়েছি যাতে আমার স্ত্রী এবং আমার ভগ্নী দু'জনেই এক কপি করে পান। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস বিষয়ে বইখানি অপরিহার্য। একজন ঐতিহাসিকের যেগুলি সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ, চিন্তার স্বচ্ছতা ও ন্যায়বোধ, এই বইয়ে তার পরিচয় পাওয়া যায়। কার্যক্ষেত্রে যিনি আপনার মতো ক্রিয়াশীল, তিনি যে বিচারেও দলগত সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে থাকবেন, এমন সচরাচর দেখা যায় না।

আমরা যারা চিন্তার জগতের মানুষ, ক্লান্তির, অস্থিরতার সময়ে তাদের লোভ হয় সংঘর্ষের ওপারের জগৎ, অর্থাৎ ঈশ্বর কিংবা শিল্প, কিংবা, চিত্তের স্বাধীনতা, কিংবা আত্মার যেসব সুদূর রহস্যময় প্রদেশ, সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিই। কিন্তু সে-লোভের কাছে আত্মসমর্পণ করলে চলবে না। সংগ্রাম আমাদেরকে করতেই হবে, সমুদ্রের এই পারেই মানুষের রণাঙ্গনে।

আমার আন্তরিক কামনা, আপনার স্বাস্থ্য আপনি শীঘ্র ফিরে পান, ভারতের উপকারের জন্য। ভারতের আপনাকে প্রয়োজন। দয়া করে বিশ্বাস করুন, আমার সহানুভূতি আন্তরিক।

রোমাঁ রলাঁ

অমিয় চক্রবর্তী-কে

ভিয়েনা XVIII
কটেজ গাসে ২১
৭ মার্চ ১৯৩৫

প্রিয় অধ্যাপক চক্রবর্তী,

রোম পৌঁছে যাঁর কথা আমি প্রথম শুনি তিনি আপনি। আপনি ইউরোপে এসেছিলেন শুনে প্রথমটায় আমি একটু অবাক হয়েছিলাম। আমি শুনে খুশি হলাম এখানে ভারতীয় ছাত্রদের সম্মেলনে আপনি সভাপতিত্ব করেছেন।

এখানে ড. সেলিগ-এর সঙ্গে আমার দেখা হয় এবং কথাবার্তা হয়। এক দিন আমি তাঁকে চায়ে নিমন্ত্রণ করি। আরেক দিন তাঁর সঙ্গে আমার বিস্তারিত আলোচনা হবে। ওঁর সঙ্গে কথা বলতে আমার ভাল লাগল, কেননা ওঁর চিন্তার গভীরতা আছে। উনিই প্রথমে আমাকে চিঠি দিয়েছিলেন, (আপনার চিঠিটি তার সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন); তারপর এক দিন ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করে দেওয়া হয়, এবং এখানে একটি সভায় ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। (কয়েক দিন আগে এখানে মহিলা সমিতির এক জনসভায় আমি 'ভারতীয় নারী'-র বিষয়ে বক্তৃতা করেছিলাম)।

আমার বইয়ের সম্পর্কে আপনার মন্তব্যে আমি যার-পর-নাই আনন্দিত। মঁসিয়ে রোমাঁ রলাঁ-ও আমাকে একটি সুন্দর চিঠি দিয়েছেন।

আপনার শান্তিনিকেতন ছেড়ে আসাতে আমি একটু অবাক হয়েছিলাম। তবে, আমার মনে হয় কোনও গাছ অন্য গাছের আওতায় বেশি বড় হতে পারে না। অন্তত মহাত্মা গান্ধীর অনুগামীদের দেখে আমার তাই মনে হয়। সেই কারণেই স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর শিষ্যদের বেশি দিন নিজের কাছে রাখেননি। আর বেশি কিছু এখন বলব না।

আপনি ওখানে কত দিন থাকবেন? আপনি যে বইটি লিখছেন, কী বিষয়ে?

আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

একান্ত আপনার
সুভাষ চন্দ্র বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

প্রযত্নে: আমেরিকান এক্সপ্রেস কোং
জেনেভা
২১.৩.১৯৩৫

Frau N. C. Vetter
Wahringer Str. 41
Wiein-IX
(Antriche)

প্রিয় মিসেস ভেটার,

এক লাইন লিখছি শুধু আপনাকে জানাবার জন্য যে আমি আজ দুপুরে নিরাপদে এখানে পৌঁছেছি। স্মরণসভা কাল হবে। এসে ভালই করেছি।

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

প্রযত্নে: আমেরিকান এক্সপ্রেস কোং
জেনেভা
২৫.৩.১৯৩৫

Mrs. N. C. Vetter
Wahringer Str. 41
Wien IX
(Autriche)

প্রিয় মিসেস ভেটার,

এখানে পৌঁছে সে দিন তাড়াতাড়ি আপনাদের এক লাইন লিখে দিয়েছিলাম।

এখানকার অনুষ্ঠান খুব ভাল হয়েছে। আমি না এলে খারাপ হত, কেননা অনেকে তা হলে হতাশ হতেন। আরও কয়েকদিন আমি এখানে থাকব, চেনা জায়গাগুলো দেখব, চেনা মানুষজনের সঙ্গে দেখা করব। তারপর ভিয়েনা ফিরে যাব।

ভিয়েনা যাত্রা খুব উপভোগ্য হয়েছিল, বিশেষ করে আমরা যখন টাইরল-এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম। যদি সম্ভব হয় আমি ইনসব্রুক-এ এবং সালজবুর্গ-এ দু'-একদিন থাকব।

আপনি কি ওই বিষয়ে পড়াশোনা আরম্ভ করতে পেরেছেন?

আশা করি আপনারা সবাই ভাল আছেন।

শ্রদ্ধা সহকারে,

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

Hotel Suisse
Geneva
২৯.৩.১৯৩৫

প্রিয় মিসেস ভেটার,

আপনার ২৪ মার্চের চিঠি গতকাল পেয়েছি। তার সঙ্গে Dr. V-এর পাঠানো বিষয়টিও আগ্রহ সহকারে পড়েছি।

এই সঙ্গে আমি ভারতের সর্বপ্রধান বেসরকারি সংবাদ এজেন্সির পাঠানো একটি নিউজলেটার পাঠাচ্ছি। পত্রটির প্রাসঙ্গিক অংশগুলো লাল দাগ দিয়ে চিহ্নিত করে দিয়েছি। আপনি দেখবেন, Bengali ফিলমটি নিয়ে ভারতে আগেই প্রচার আরম্ভ হয়ে গিয়েছে; এবং ব্যবস্থাপক সভাতেও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। (অবশ্য সরকারকে কোনও বিষয়ে বাধ্য করার কোনও ক্ষমতা ব্যবস্থাপক সভার নেই।)

তারা যে-সব তথ্য জানতে চায় আপনার পক্ষে কিংবা অন্য কোনও বন্ধুর পক্ষে কি তা সংগ্রহ করা সম্ভব হবে? চিঠিতে দেখবেন, তাঁরা চান—

ক) ফিল্মটি—কাহিনি

খ) ছবি—যে-সব ছবিতে আছে সবচাইতে আপত্তিজনক দৃশ্যগুলি।

আমি অবশ্য ছবিগুলোর খরচ দেব।

কলকাতায় এবং বঙ্গ প্রদেশে আনন্দবাজার পত্রিকা সবচেয়ে অধিক প্রচারিত সংবাদপত্র (দৈনিক, বাংলা)।

সঙ্গে পাঠানো চিঠিটি এখন আপনার কাছে রাখবেন। আমাকে আরও সপ্তাহখানেক এখানে থাকতে হবে। ডঃ ভেটার এবং আপনি আমার শ্রদ্ধা জানবেন।

একান্ত আপনাদের
সুভাষ সি. বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

রেজিনা প্যালেস্ত হোটেল
মানচেন
৮.৪.১৯৩৫

Frau N. C. Vetter
Wahringer Str. 41
Wien-IX
(Oesterreich)

প্রিয় মিসেস ভেটার,

জুরিখে অল্প কিছুকালের জন্য যাত্রা বিরতি করে আমি গত রাত্রে এখানে পৌঁছেছি। আমি কয়েকদিন এখানে থেকে ভিয়েনা যাব, আমি আশা করি যাত্রাপথে আর কোথাও আমাকে

থামতে হবে না, তবে সালজবুর্গ-এর কথা ঠিক বলতে পারি না।

আশা করি আপনি আমার আগেকার চিঠিটি পেয়েছেন। তাতে আমি Bengali ফিল্মটি সম্বন্ধে ভারতথেকে আসা একটি চিঠি পাঠিয়েছিলাম।

জেনেভা পরিত্যাগের আগে মঁসিয়ে রমাঁ রোলাঁ-র সঙ্গে আমার খুব চমৎকার কথাবার্তা হয়েছে।

শ্রদ্ধা সহকারে

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস

এ. কে. ফজলুল হক-কে

Sanatorium Rudolfinerhaus
Billroth Strasse
Vienna
১০মে ১৯৩৫

প্রিয় মি. ফজলুল হক,

লন্ডন টাইমস পড়ে আমি জানলাম আপনি আমাদের শহরের মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। আপনার নির্বাচন অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল; তবু, মোটেই না হওয়ার চেয়ে দেরিতে হওয়া ভাল। আমি নিশ্চিত জানি এক সাফল্যপূর্ণ কার্যকাল আপনার জন্য অপেক্ষা করছে এবং আপনার মেয়র-পদে থাকবার সময়ে কলকাতার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ পরস্পরের আরও কাছে আসবে এবং তার ফলে পুরসভার মধ্যেও সম্মিলিত কাজ আমরা দেখতে পাব। আপনার কাছ থেকে হাজার-হাজার মাইল দূরে থেকেও, মনে-প্রাণে যে আপনার সঙ্গেই আছে, এমন একজনের আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

Rudolfinerhaus
১৫.৫.১৯৩৫

Fran Dr. N. C. Vetter
Wien-IX
Wahringer Str. 4

প্রিয় মিসেস ভেটার,

আমি আশা করি, আপনার আগেকার চিঠিটি আমি পাওয়ার পর ইতিমধ্যে আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। আগামীকাল আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। যাব Sanatorium Westend, Purkersdorf b/Wien-এ। আমি নিরবচ্ছিন্নভাবে সেরে উঠছি, যদিও ধীর গতিতে। বর্তমানে

আমি নিম্নোদর বন্ধনী পরে অল্পস্বল্প হাঁটতে পারছি। পুরনো যন্ত্রণাটা মনে হয় আর নেই, তবে অস্ত্রোপচারের পর পেটের যে অস্বস্তির ভাব সেটা এখনও সারেনি। তার জন্য হয়তো কিছু সময় লাগবে। আমি সর্বান্তঃকরণে আপনার দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।

শ্রদ্ধা সহকারে,

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

Kurhaus Konigin Alexandra
Karlsbad
১৭.৬.১৯৩৫

Fran N. C. Vetter
Wien-IX
Wahringer Str. 41
(Oesterreich)

প্রিয় মিসেস ভেটার,

আমি কাল রাত্রে ভিয়েনা থেকে এখানে এসে পৌঁছেছি। শ্রীমতী নেহরু প্রাগ পর্যন্ত যাবার সময়ে মোটামুটি ভালই ছিলেন, প্রাগ থেকে আমি অন্য একটা ট্রেন ধরলাম এবং ড. কাটিয়ার তাঁর সঙ্গে বার্লিন গেলেন। ইন্দো-চেক সোসাইটি-র অধ্যাপক লেসনি স্টেশনে তাঁকে নিতে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে তিন ঘণ্টা কাটিয়ে আমি কার্লসবাড রওনা হই। গত রাতে, আমার অস্ত্রোপচারের পর প্রথম আমি একটানা সাত ঘণ্টা ঘুমিয়েছি। আরম্ভটা ভালই হল—আশা করি। ভিয়েনার কষ্টদায়ক গরমের পর এখানে বেশ ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে। বছরের এই সময়টাতে যেরকম থাকা উচিত, এখানে সেরকম ভিড় নেই।

সে রাত্রের বেড়ানো ড. ভেটারের কেমন লাগল? আপনারা দু'জনেই আমার শ্রদ্ধা জানবেন।

একান্ত আপনাদের
সুভাষ সি. বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

Kurhaus Konigin Alexandra
Karlsbad
২১.৬.১৯৩৫

প্রিয় মিসেস ভেটার

আপনার ১৮ জুনের চিঠি পেয়ে খুব খুশি হলাম।

Bengali প্রসঙ্গে আমি তাগাদা দিয়ে ভিয়েনা থেকে একটি পত্র দিয়েছিলাম। তাঁর সেক্রেটারি আমাকে জানান, তাঁর কর্তা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়েছেন, কিন্তু এখনও কোনও উত্তর পাননি। আমি চাইলে সরাসরি তাঁদেরকে চিঠি লিখতে পারি। ওই পর্যন্তই।

আমি জেনে দুঃখিত হলাম, সেই অন্ধকার ঝোড়ো রাত্রিতে ওখানে ড. ভেটারকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য কয়েকটি ব্যাং ছাড়া আর কেউ ছিল না।

আপনি আমাকে Kossuth-এর সম্পর্কে বইটির কথা বলছিলেন। ভারতে প্রকাশিত একটি ইংরেজি (জাতীয়াতাবাদী) পত্রিকার জন্যে কি আপনি একটি প্রবন্ধ লিখতে পারবেন? আমাদের পাঠকেরা সেটা পড়তে আগ্রহী হবেন।

আমি এই সঙ্গে একটি চিঠি পাঠালাম। চিঠিটি ফরাসি ভাষায় লিখে পাঠাতে হবে। আপনি কি সেটি দয়া করে অনুবাদ করতে পারবেন? আপনার স্মরণ থাকতে পারে, Professor Nasch-এর একটি চিঠি আপনি আমাকে অনুবাদ করে দিয়েছিলেন।

এখানে আবহাওয়া ভালই চলছে। ওখানে কেমন?

আপনার শরীর যদি এখন ভাল বোধ হয় আর হাতে যদি সময় থাকে আপনি Professor Hauer-এর মতামতের বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখতে পারেন।

শ্রদ্ধা সহকারে

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস।

নাওমি সি ভেটার-কে

Karlsbad
Kurhaus Konigin Alexndra
২৭.৬.১৯৩৫

Frau N.C. Vetter
Wien-IX
Wahringer Str. 41
(Oesterreich)

প্রিয় মিসেস ভেটার

আশা করি আপনি আমার আগেকার চিঠিটি ঠিকমতো পেয়েছেন। একজন ভারতীয় ভদ্রলোক, মি. গোকুলচাঁদ (GUKUL-CHAND), ডোজেন্ট পিল্লাট-কে দিয়ে তাঁর স্ত্রীকে পরীক্ষা, (এবং দরকার হলে চিকিৎসা) করাতে চান। তিনি চান ডোজেন্ট-এর সঙ্গে কেউ তাঁর পরিচয় করিয়ে দিন। দয়া করে ডোজেন্ট পিল্লাট-কে টেলিফোন করে জানিয়ে দেবেন যে আমার

এক বন্ধু তাঁর স্ত্রীর চোখের অসুখ নিয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করবেন। আমার মনে হয়েছিল ড. পিল্লাট-কে দিয়ে তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসা করানর কথা ভদ্রলোককে বলা ঠিক হবে। আশা করি আপনারও তাই মত। ভদ্রলোক এখন ভিয়েনায় আছেন।

এখানে ক্রমে গরম পড়ছে—বেশ গরম। ওখানে কেমন? আমার বোধহয় গরমটা তেমন সহ্য হবে না।

শ্রদ্ধা সহকারে,

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

Kurhaus Konigin Alexndra
Karlsbad
৮.৭.১৯৩৫

Fran N.C. Vetter
Wien-IX
Wahringer Srt. 41
(Oesterreich)

প্রিয় মিসেস ভেটার,

আপনার ২৬ জুনের চিঠি এবং তার সঙ্গে ফরাসি অনুবাদটি আমি ঠিকমতো পেয়েছি। অনেক ধন্যবাদ।

মিসেস হারগ্রোভ, যিনি এখন টাইরল-এ আছেন, তাঁর কাছ থেকে আমি একটি দীর্ঘ এবং কৌতূহলোদ্দীপক পত্র পেয়েছি। প্রসঙ্গত বলি, তিনি লিখেছেন তিনি কয়েক দিন পরে হফগাসটেইন-এ গেলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারেন।

কেমন আছেন?

শ্রদ্ধা সহকারে

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস

অমিয় চক্রবর্তী-কে
[মূল বাংলায়]

সবিনয় নিবেদন,

২৩/৭/৩৫

আপনার ও প্রোঃ লেস্‌নীর পোস্ট-কার্ড পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আপনি যে কষ্ট করিয়া এখানে আসিয়াছিলেন তার জন্য আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। আপনার সহিত অন্তরঙ্গ ভাবে দুই তিন দিন আলাপ করিবার যে সুযোগ পাইয়াছিলাম তাহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আশা করি মধ্যে ২ পত্র দিবেন।

আপনি একদিন বলিয়াছিলেন যে বিলাতে অনেক মনীষী মনে করেন যে ব্যক্তির জীবনে যেরূপ শৈশব, যৌবন ও বার্দ্ধক্য আছে— জাতির জীবনেও যে সেইরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্তি ঘটে তাহা মনে করা ভুল। এ বিষয়ে আপনি কি কোন বইর নাম আমাকে পাঠাইতে পারেন? আমার নিজের ধারণা যে জাতির জীবনে শৈশব, যৌবন ও বার্দ্ধক্য আছে। সুতরাং ইহার বিপরীত মতবাদ ও তার যুক্তি পাঠ করিতে আমি বিশেষ উৎসুক।

আজ H.G. Wells-এর "The New America: The New World" পড়িলাম। আপনি কি পড়িয়াছেন?

লন্ডনে এখনও চিঠি পাঠাই নাই। আপনার গতিবিধি ও ঠিকানা জানাইবেন।

ইতি
ভবদীয়
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

ই. উডস-কে

Kurhaus Konigin Alexandra
Karlsbad
(Czecho slovakia)
২৪ জুলাই ১৯৩৫

মিসেস এম. ই. উডস
১৩১, মোরহ্যাম্পটন রোড
ডনিব্রুক
ডাবলিন

প্রিয় মিসেস উডস,

কয়েক মাস আপনাকে চিঠি দিতে পারিনি বলে আমি দুঃখিত। ডিসেম্বর মাসে আমি ভারতে গিয়েছিলাম, জানুয়ারিতে ইউরোপে ফিরে আসি। এপ্রিলের শেষে আমার একটা অস্ত্রোপচার হয়। চিকিৎসার জন্য এখন কার্লসবাড-এ আছি। আশা করছি আরও কয়েক মাস এখানে থাকব।

আমার এক বন্ধু মি. চালিহা, যিনি ১৯২০ থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কাজ করছেন, কয়েক দিন আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি ডাবলিন যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন।

তাঁকে আমি আপনার ঠিকানা দিয়ে বলেছি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। মি. চালিহা চমৎকার মানুষ, কয়েকবার জেলে গিয়েছেন। অহিফেনের অভিশাপ সম্পর্কে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ। আপনি জানেন, অহিফেন হল ব্রিটিশ শাসনের অনন্য "আশীর্বাদ"। আমি চাই মি. চালিহা নতুন আয়ারল্যান্ডের খানিকটা দেখুন, এবং আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতার জন্যে যাঁরা কাজ করছেন,

তাঁদের কয়েকজনের সঙ্গে তাঁর দেখা হোক। ইন্দো-আইরিশ লিগ যে কাজ করছে তার কথাও আপনি কিছু বলবেন।

আপনার এবং মাদাম ম্যাকব্রাইড-এর সর্বশেষ খবর জানাবেন।

শ্রদ্ধা সহকারে,

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস

সুনীলমোহন ঘোষ মৌলিক-কে
[মূল বাংলায়]

Kurhaus Konigin
Alexandra
(চেকোস্লোভাকিয়া)
৫.৮.৩৫

প্রীতিভাজনেষু,

তোমার দুইখানা চিঠি আমি যথাসময়ে পেয়েছি—একখানি ফেব্রুয়ারী মাসে এবং অপরখানি জুন মাসে। উত্তর দিতে পারি নি বলে কিছু মনে করো না।

একমাসের উপর হ'ল আমি এখানে এসেছি— operation এর পর। এখন শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল, তবে ভিতরে দুর্ব্বলতা আছে (যেখানে অস্ত্রোপচার হয়েছিল) এবং তার ফলে মধ্যে২ বেদনা হয়। পূর্ব্বেকার বেদনা আর হয় না তবে হজম এখনও ভাল হয় না। মোটের উপর বলতে পারা যায় যে শরীরটা আস্তে২ সারছে।

তোমার প্রথম চিঠি এমনভাবে লিখেছিলে যেন তৃতীয় পক্ষ ও চিঠি পড়ে না। তোমার মনে রাখা উচিত যে আমার চিঠিগুলি তৃতীয় পক্ষের চোখ এড়াতে পারে না।

তোমার শরীর কেমন আছে? আজ কাল কি করছ? মুর্শিদাবাদেরই বা খবর কি?

সম্প্রতি আমি আর একখানি পুস্তক লিখবার চেষ্টা করছি। প্রথম পুস্তকটীর আশাতীত সমাদর হওয়াতে আমি এই কাজে হাত দিয়েছি। আমি চাই আমাদের জাতীয় আন্দোলনের একটা ব্যাপক ইতিহাস লিখতে— বিদেশীদের জন্য।

তুমি একখানি ছবি চেয়েছ—সঙ্গে পাঠাচ্ছি।

আমার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হলেই আমি দেশে ফিরিব— এইরূপ আমার অভিপ্রায়।

তোমার বাবার শরীর অসুস্থ— একথা তুমি লিখেছিলে। এখন তিনি কেমন আছেন জানাবে।

আশা করি তুমি ভাল আছে। আমার ভালবাসা জানবে।

ইতি
তোমাদের
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

জে. টি. সান্ডারল্যান্ড-কে

Kurhaus Konigin Alexndra
Karlsbad
(Czechoslovakia)
৬ অগাস্ট ১৯৩৫

প্রিয় ড. সান্ডারল্যান্ড,

আমি আপনার ১২ মার্চের চিঠি পাওয়ার পর অনেক দিন হয়ে গিয়েছে। উত্তর দিতে দেরি হল বলে আমি দুঃখিত। এপ্রিলের শেষে আমার একটা বড় অস্ত্রোপচার হয়েছে। এখন আমার শরীর আগেকার চেয়ে ভাল। যদিও এখনও মোটেই সম্পূর্ণ সুস্থ নয়। আরও কয়েক মাস আমি ইউরোপে থাকব। ভারত সম্পর্কে আমি আরেকখানি বই লিখতে চেষ্টা করছি, আমাদের জাতীয় আন্দোলনের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। দয়া করে জানান আপনার স্বাস্থ্য এখন কেমন আছে।

নতুন সংবিধান পাশ হয়েছে, এটি ভারতের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হবে। মাদ্রাজের শ্রীসত্যমূর্তির নেতৃত্বে কংগ্রেসের কয়েকজন প্রদেশগুলিতে সংবিধানটি কার্যকর করতে চান। তবে, কংগ্রেস এখনও বিষয়টি বিবেচনা করেনি, আমি জেনে খুশি হলাম আপনি সংবিধানটি গ্রহণের সম্পূর্ণভাবে বিরোধী।

গভীর শ্রদ্ধা সহকারে,

একান্ত আপনার
সুভাষচন্দ্র বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

Kurhaus Konigin Alexndra
Karlsbad
১৭.৮. ১৯৩৫

Frau N.C. Vetter
Wien IX
Wahringer Str. 41
(Oesterreich)

প্রিয় মিসেস ভেটার,

আপনার শেষের চিঠিটির উত্তর আমি যথা সময়ে দিয়েছি এবং আপনার টাইরল-এর ঠিকানায় পাঠিয়েছি। তারপর আর আপনার কোনও চিঠি পাইনি। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম, আপনি বিশ্রাম নিচ্ছেন এবং আপনার চিঠির বিষয়ে আপনাকে বিরক্ত করতে চাইনি। তারপরে মিসেস হারগ্রোভ আমাকে চিঠিতে জানালেন আপনি ভিয়েনা থেকে চলে গেছেন। তারপর আর আপনার কোনও খবর না পেয়ে আমি চিন্তিত।

আপনাকে দেবার খবর বিশেষ কিছু নেই, শুধু এইটে ছাড়া যে আমার দাদা সাড়ে তিন বছর

অন্তরীণ থাকার পর মুক্তি পেয়েছেন। আমার শরীর এখন মোটের ওপর ভালই আছে। শুধু আমার কাজটাই এগোচ্ছে না। আপনি ও ড. ভেটার আমার শ্রদ্ধা জানবেন।

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

কার্লসবাড
৬.৯.১৯৩৫

প্রিয় মিসেস ভেটার,

আপনার ২৭ অগাস্টের পত্র আমি যথা সময়ে পেয়েছি, কিন্তু তাতে আপনার মনের যে ভাব প্রকাশ পেয়েছে তা দেখে আমি দুঃখিত। আমি বুঝতে পারছি না, আপনার সঙ্গে পত্রালাপে আমার কোনও আগ্রহ নেই, এ ধারণা আপনার কী করে হল, যদিও আমার নিজের কাজ নিয়ে অনেক সময়ে আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে এবং মাঝে-মাঝে নানা দুশ্চিন্তার মধ্যেও থেকেছি। আমাকে দীর্ঘ পত্র ভ্রমণ করে ব্যাডগাসটেন যেতে হয়েছে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবার জন্য। তাঁরা দেশে ফিরে যাচ্ছিলেন, এখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আবার নতুন এক দুশ্চিন্তা হাজির হল দিন পনের আগে। শ্রীমতী নেহরুর অবস্থা খুব সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ল। ইউরোপ এবং ভারতের মধ্যে অনেক টেলিগ্রাম আদান-প্রদানের পর দু'দিন আগে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু জেল থেকে ছাড়া পেলেন। সম্ভবত তিনি বিমানযোগে ইউরোপে তাঁর স্ত্রীকে দেখতে আসবেন।

এখানে থাকায় আমার উপকার হয়েছে, কিন্তু অস্ত্রোপচারের পরের যে অস্বাচ্ছন্দ্য সেটা এখনও যায়নি। ফলে আমাকে বেল্ট পরতেই হচ্ছে, কঠিন পরিশ্রম পরিহার করতে হচ্ছে। আমি অধ্যাপক ডেমেল-কে চিঠি দিয়ে তাঁর পরামর্শ চেয়েছিলাম, তিনি 'গাসটেন'-এ চিকিৎসা করতে বলেছেন। ব্যাডগাসটেন-এ থাকবার সময়ে আমি মিসেস হারগ্রোভকে বলেছিলাম বোর্ডিং হাউসের খোঁজ নিতে। বোধহয় আমি ব্যাডগাসটেন-এর বদলে হফগাসটেন-এ যাব। আগামী কাল আমি শ্রীমতী নেহরুকে দেখতে ব্যাডেনউইলার (Schwarzwald Germany) রওনা হচ্ছি। বোধহয় কয়েক দিন পরে সেখানে পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে আমার দেখা হবে। সেখান থেকে আমি হফগাসটেন যাব। কিন্তু এখন জানি না ব্যাডেনউইলার-এ আমাকে কত দিন থাকতে হবে। সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে শ্রীমতী নেহরুর অবস্থার ওপর। সেখানে আমার ঠিকানা হবে: C/o Post Legernd, Bandenweiler.

মিসেস হারগ্রোভ আমাকে বলেছেন, সেখানে থাকবার সময়ে আপনার পর্বতারোহণের খুব সুন্দর অভিজ্ঞতা হয়েছে। এই বেড়ানোর ফলে আশা করি আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। ড. ভেটার কেমন আছেন? আপনারা দু'জনেই আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করবেন।

একান্ত আপনার
সুভাষ সি বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

হফগাসটেন
পোস্ট ল্যাগার্নড
১.১০.১৯৩৫

প্রিয় মিসেস ভেটার,

এতদিন আপনাকে চিঠি না দেওয়ার জন্য আমি দুঃখিত। আপনার চিঠি দুটো আমি পেয়েছি, একটি ব্যাডেনউইলার-এ। আরেকটি সে দিন পেলাম। শ্রীমতী নেহরুকে আপনার শুভেচ্ছাবার্তা এখান থেকে আবার পাঠিয়েছি। তাঁর শরীরের তেমন উন্নতি না হওয়ায় আমি দুঃখিত। সঙ্কটটা অবশ্য কেটে গেছে, তবে বেশি রকম জ্বর, ফুসফুসের প্রদাহ, ইত্যাদি লক্ষণ এখনও যাচ্ছে না। এই সব লক্ষণ যদি থেকেই যায়, শেষ পর্যন্ত ওঁকে বাঁচানো যাবে না। তবে, খানিকটা সান্ত্বনা, ওঁর স্বামী এখন ওঁর কাছে আছেন। হয়র্তো এ মাসের শেষ দিকে আমি আবার ওঁর কাছে যেতে পারি। নভেম্বরের শুরুতে আমি পূর্ব ইউরোপে এক দীর্ঘ ভ্রমণে বেরোব মনে করছি। তবে ব্যাপারটা যেহেতু এখনও স্থির হয়নি, দয়া করে কাউকে জানাবেন না।

এখানে এখন আমার চিকিৎসা চলছে, এ মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত চলবে। আমার কাজ মোটেই ভাল এগোচ্ছে না; তা নিয়ে প্রথম-প্রথম আমার মন খুব খারাপ হত। এখন আমার চেষ্টা, কাজের ক্ষতি করেও যাতে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে পারি, কারণ আমার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য সুস্থ থাকা আমার আরও বেশি প্রয়োজন। আমি তো স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্যেই ইউরোপে এসেছিলাম। একটাই কথা। ইউরোপে যত দিন আছি তার মধ্যে আমার এখনকার কাজ শেষ করতে না পারলে ভারতে ফিরে গিয়ে আর সময় পাব না।

আমার দাদার বক্তৃতা আপনার অত ভাল লেগেছে জেনে আমি খুব খুশি হলাম। ভিয়েনা সম্পর্কে তাঁর প্রথম আগ্রহ জন্মায় কলকাতার মেয়রকে লেখা আমার চিঠিগুলো পড়ে। চিঠিগুলো সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিল। তিনি আমাকে আরও তথ্য পাঠাতে লেখেন; পরে ভিয়েনা মিউনিসিপ্যালিটি সম্পর্কে ইংরেজি বইটি আমি তাঁকে পাঠাই (কিংবা, বলা উচিত, আপনিই বোধহয় পাঠিয়ে দেন)। যতদূর মনে হচ্ছে, আমার দাদাই পরবর্তী মেয়র নির্বাচিত হবেন, যদি চান। এখন পর্যন্ত তিনি অন্তরালে থাকাই পছন্দ করেছেন। উচ্চ পদ, উচ্চ সম্মান, এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন, কেননা, তাঁর মতে যাঁরা পূর্ণ সময়ের দেশকর্মী, রাজনীতিক শুধু তাঁদেরই উচ্চ ক্ষমতা কিংবা সম্মানের পদ গ্রহণ করা উচিত। এ সপ্তাহে তাঁকে যখন চিঠি লিখব, আপনি তাঁর বক্তৃতার সম্পর্কে যা বলেছেন তাঁকে জানাব। তাঁর নিশ্চয় খুব ভাল লাগবে।

আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এখনও স্থির করিনি, তবে আগামী ফেব্রুয়ারি বা মার্চে দেশে ফিরে যেতে চাই। জাতীয়তাবাদী দলের বার্ষিক সম্মেলন (ভারতে সেটা একটা বড় ঘটনা) বসবে মার্চ মাসে। আমার কাছে সেটা একটা মস্ত বড় আকর্ষণ। সম্প্রতি ভারতের বিধানসভায় আমাকে নিয়ে কিছু-কিছু প্রশ্ন উঠেছিল। গভর্নমেন্ট বলেছে আমার ভারতে প্রত্যাবর্তনে কোনও বাধা নেই। (তা আমি প্রথম থেকেই জানতাম) তবে, বম্বেতে, আমি পদার্পণ করার পর আমাকে নিয়ে কী করা হবে সে বিষয়ে গভর্নমেন্ট মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে। যদি এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ না থাকে যে পৌঁছন মাত্র ওরা আমাকে সোজা জেলখানায় পাঠিয়ে দেবে, তা হলে আমাকে ভাল করে ভেবে দেখতে হবে, কী করব। না হলে আমি দেশে ফিবে যাব, এবং...

সে যাই হোক, এ মাসের শেষ নাগাদ আমি আশা করি ভিয়েনায় থাকব, তার পর যদি পূর্বে দীর্ঘ ভ্রমণে বেরোই, সেটা হবে বড় জোর এক মাসের জন্য। তার পরে আমি ভিয়েনায় ফিরে আসব—এবং তখন, যদি আমার শরীর ঠিক থাকে, খানিকটা স্কিইং করতে চাই।

আপনার শরীর কেমন আছে? ডঃ ভেটার কেমন আছেন? আপনারা দু'জনেই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা গ্রহণ করবেন।

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস

ভি. লেসনি-কে

প্রযত্নে : পোস্ট ল্যাগার্নড
হফগাসটেন (অস্ট্রিয়া)
২ অক্টোবর ১৯৩৫

অধ্যাপক লেসনি
সভাপতি, ইন্দো-চেকোস্লোভাকিয়ান সোসাইটি
প্রাহা

প্রিয় অধ্যাপক,

আমার ধারণা আপনাদের সোসাইটির আগামী অধিবেশনের আর দেরি নেই। নতুন সেশনের এইটিই বোধহয় হবে প্রথম অধিবেশন। আপনাদের সোসাইটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যর প্রতি আমার সপ্রশংস সমর্থন জানাই এবং সোসাইটি পরিচলনায় আপনাদের যে সাফল্য তার জন্য আমার আন্তরিক অভিনন্দন পাঠাচ্ছি। এ কথা অবশ্য স্বীকার করতেই হয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি সম্পর্কে আগ্রহী ভারতীয়ের সংখ্যা আগে বেশি ছিল না, কিন্তু আনন্দের বিষয় বিশ্বের বিভিন্ন প্রগতিশীল জাতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে প্রতিদিন অধিকতর প্রভাবশালী ভারতীয় আগ্রহী হচ্ছেন। আমার নিজের বিষয়ে বলতে পারি, আপনি জানেন ইন্দো-চেকোস্লোভাকিয়ান সোসাইটি সম্পর্কে প্রথম থেকেই আমি আগ্রহী। আপনাদের দেশ যে আমাকে অতিশয় আকর্ষণ করে, এটি তার একটি কারণ। আমি আশা করি, আগামী বছর ভারতে ফিরে গিয়ে সেখানেও আমি আপনাদের সোসাইটি সম্পর্কে অধিকতর আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারব। ইত্যবসরে আপনি এবং আপনাদের সোসাইটির অন্য সদস্যেরা নিশ্চিত জানবেন আপনাদের কাজকর্ম ক্রমেই অধিকতর সংখ্যক ভারতীয় সাগ্রহে লক্ষ করে যাচ্ছেন এবং আমার নিশ্চিত বিশ্বাস অদূর ভবিষ্যতে আমরা দেখব এই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন আমাদের উভয় জাতির পক্ষেই কী সুফল বহন করে।

আমার গভীর শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন।

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস

জওহরলাল নেহরু-কে

পোস্ট ল্যাগার্নড
হফগাসটেন
৪ অক্টোবর ১৯৩৫

প্রিয় জওহর,

তোমার ২ ও ৩ তারিখের চিঠি পেলাম।

Freiburg-এর সার্জেন-এর রিপোর্ট পড়ে আমি সুখী হলাম। আমার শুধু এইটুকুই আশা, যে তাঁর চিকিৎসাশাস্ত্র রোগিনীর ফুসফুসের ব্যাধির উপশমে সাহায্য করতে পেরেছে। শ্রীমতী নেহরুকে অন্য কোথাও স্থানান্তরিত করা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে সার্জেনের মতামত কি তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে? তোমার এই দুঃসময়ে আমি যদি কোনও রকম সাহায্য করতে পারি আমাকে ডেকে পাঠাতে আশা করি দ্বিধা করবে না।

আমার বইয়ের একটি ভুল দেখিয়ে দেওয়ার জন্যে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। তুমি যা বলেছ তা খুবই সম্ভব, তথ্যের ব্যাপারে কয়েকটি ভুল থাকতেই পারে। তবে আমি আশা করি তেমন গুরুতর কোনও ভ্রান্তি নেই। দুর্ভাগ্যক্রমে, আমাকে প্রধানত স্মৃতির ওপর নির্ভর করতে হয়েছিল, বিশেষত সন-তারিখের ব্যাপারে। তাতে আমার রীতিমতো অসুবিধে হয়েছিল। ওই সময় সম্পর্কে কোনও বই ইত্যাদি আমি জোগাড় করতে পারিনি, সাহায্য করবার জন্য হাতের কাছে কেউ ছিলও না। পণ্ডিত মতিলালজির মৃত্যুর ব্যাপারে—ঠিক তারিখটি মনে করবার আমি অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করেছি কিন্তু পারিনি।

ঠিকমতো প্রুফ দেখা না হওয়ার জন্য ছাপার ভুলও অনেক দেখতে পাবে, আমি এক বার মাত্র প্রুফ দেখতে পেরেছি, তারও খানিকটা আমাকে দেখতে হয়েছে খুব তাড়াহুড়ো করে, কেননা আমাকে তাড়াতাড়ি দেশে ফিরতে হয়েছিল। উপরন্তু বইটাই লিখতে হয়েছিল খুব চাপের মধ্যে, আমার শরীরও তখন যে খুব ভাল ছিল তা নয়। তুমি যে সব ভুল দেখিয়ে দেবে আমি সযত্নে নোট করে রাখব, যাতে দ্বিতীয় সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা যায়।

এই সঙ্গে আমি 'ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান'-কে লেখা আমার একটি চিঠির কপি পাঠাচ্ছি। চিঠিটি ১ অক্টোবর ছাপা হয়েছিল।

এর মধ্যে নিশ্চয় খবর পেয়েছ, আবিসিনিয়ায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। এখন একটিই প্রশ্ন, এটা শেষ পর্যন্ত ইংল্যান্ড এবং ইতালির মধ্যে যুদ্ধ ঘটাবে কি না।

প্রীত্যর্থী
সুভাষ

নাওমি সি. ভেটার-কে

পোস্ট ল্যাগার্নড
হফগাসটেন
১২. ১০.১৯৩৫

প্রিয় মিসেস ভেটার,

আশা করি আমার শেষ চিঠিটি ঠিকমতো পেয়েছেন। আবহাওয়া চমৎকার চলছে। এ মাসের ২ তারিখে বেশ ভালমতো তুষারপাত হয়েছে। শুনেছি ভিয়েনায় বেশ গরম। আমি ভাবছি এ মাসের শেষ দিকে কয়েক সপ্তাহের জন্য রাশিয়া যাব। খুব সম্ভবত এ মাসের শেষ সপ্তাহে আমি ভিয়েনা দিয়ে যাব। ব্যাপারটা একটু গোপন রাখবেন, কেননা যেতে পারব কি না এখনও ঠিক জানি না।

আর. আর.-এর সম্পর্কে লেখাটি একটি ভারতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু এখানকার ছাপাখানা সংক্রান্ত আইন কড়া হওয়ার দরুণ সম্পাদককে কিছু-কিছু অংশ বাদ দিতে হয়েছে, তাতে লেখাটির মূল্য খানিকটা কমে গিয়েছে। কিন্তু আর কোনও উপায় ছিল না।

আপনি যা লিখে পাঠিয়েছেন পণ্ডিত নেহরুর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। মিসেস নেহরুর অবস্থা প্রায় একই রকম। সান্ত্বনা এইটুকুই যে, অবস্থা আর খারাপ হয়নি।

শ্রীমতী ফিউলপ মিলারের এখন যে সব বিপত্তি চলছে আপনি নিশ্চয় তার খবর পেয়েছেন।

ড. ভেটার এবং আপনি নিজে আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করবেন।

একান্ত আপনাদের
সুভাষ সি. বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

পার্ক হোটেল
মানচেন
২৫. ১০. ১৯৩৫

From N. C. Vetter
Wien—IX
Wahringer Str. 41
(Oesterreich)

প্রিয় মিসেস ভেটার,

দিন কয়েক আগে আপনার চিঠি পেয়ে খুব ভাল লেগেছে। দু'দিন আগে আমি হফগাসটেন ছেড়ে এসেছি। ব্যাডেনউইলারে শ্রীমতী নেহরুর সঙ্গে দেখা করতে যাবার পথে এখানে এসেছি। ২৯ বা ৩০ তারিখে আমি ভিয়েনা পৌঁছব। ড. ভেটার এবং আপনি আমার শ্রদ্ধা জানবেন।

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস

ড. থিয়েরফেল্ডার-কে[১]

American Express Co.
Vienna-I
Kaerntnerring
৭ নভেম্বর ১৯৩৫

প্রিয় হের ডক্টর থিয়েরফেল্ডার,

আপনার ইচ্ছানুসারে আমি মিউনিকে আমাদের মধ্যে যে কথাবার্তা সম্প্রতি হয়ে গেল তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করছি। আপনি অবগত আছেন, ১৯৩৩ সালে আমি প্রথম যখন জার্মানি যাই তার পর থেকে জার্মানি এবং জাতীয়তাবাদী ভারতের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতির জন্য চেষ্টা করছি। দুর্ভাগ্যক্রমে এমন কিছু-কিছু ঘটনা ঘটেছে যার ফলে এই বন্ধুত্বের হানি হয়েছে। বস্তুত নতুন শাসকদের আমলে জার্মানির অভ্যন্তরে প্রভূত অগ্রগতি ও উন্নতি সাধিত হলেও আগে জার্মানি এবং ভারতের মধ্যে যে সুসম্পর্ক ছিল তার কিছু অবনতি হয়েছে। ইহুদি প্রভাবের ফলে সাধারণভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যে নাৎসিবিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে, তার ফলে এটা হয়নি। বরং ভারতীয়েরা নিজেরা মনে করেন, অতীতের তুলনায় এখন জার্মানির বাতাবরণ তাঁদের প্রতি কম বন্ধুসুলভ। ভারতের প্রতি এই বিরূপ মনোভাবের কী কারণ হতে পারে তা আমি জার্মানির প্রধান ব্যক্তিবর্গের কাছে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছি। কারণগুলি এইরূপ:

১) ব্রিটেনের প্রতি জার্মান গভর্নমেন্টের বর্তমান অনুকূল মনোভাব।

২) জাতিবাদী প্রচার, জার্মানির অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধিমান মানুষের মনে যার ফলে অশ্বেতকায়দের প্রতি সাধারণভাবে ঘৃণার মনোভাবের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

৩) বর্তমান ভারতের প্রতি জার্মানির সর্বোচ্চ নেতৃবৃন্দের মধ্যে অশ্রদ্ধা, যার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁদের নানা লেখায় এবং বক্তৃতায়।

৪) জার্মান সংবাদ মাধ্যমে ভারতের প্রতি অনুকূল প্রবন্ধাদি প্রকাশ রোধ করা, কিংবা সেগুলোকে সেন্সর করা। জার্মানিতে আমার অনেক বন্ধু আছেন; এবং তাঁদের মধ্যে অনেকে ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট পার্টির অতি উৎসাহী সদস্য। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তায় আমি প্রায়ই, আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কী ভাবে উন্নত করা যায় সে বিষয়ে আমার মতামত ব্যক্ত করে থাকি। যথা—

১) জাতিবাদী প্রচার স্তিমিত করা, যাতে তার দ্বারা ভারত-বিরোধী মনোভাব সৃষ্ট না হয়।

২) সর্বোচ্চ নেতৃবৃন্দের অন্তত একজন একটি খোলাখুলি রিপোর্ট দিন, যাতে বোঝা যায় ভারতের প্রতি নতুন জার্মানির প্রকৃত মনোভাব কী।

৩) জার্মান পত্র-পত্রিকায় ভারত-বিদ্বেষী প্রচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা। যদিও আমি এই সব প্রস্তাব উপস্থাপন করছি কিন্তু আমি এমন কিছু দাবি করা থেকে সচেতনভাবে বিরত থাকছি যা দুঃসাধ্য। যেমন, ব্রিটেনের প্রতি আনুকূল্য যদি জার্মানির পক্ষে লাভজনক হয় আমি ব্রিটিশ বিরোধী নীতি দাবি করতে পারি না, যদিও ভারতীয় হিসাবে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব অথবা নীতিই আমাদের কাম্য। তেমনি, আমি এমন দাবিও করি না যে আপনাদের জাতিবাদী

---

১. ড. থিয়েরফেল্ডারকে জার্মান ভাষায় লিখিত পত্র থেকে পুনরনূদিত।

তত্ত্ব আপনারা পরিত্যাগ করুন, সে-নীতির বিরুদ্ধে যতই কেননা আমরা বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রদর্শন করতে পারি। আমরা শুধু চাই সে নীতির একটু রদবদল, কিংবা উগ্রতার হ্রাস, যাতে জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে তার দ্বারা ভারতবাসীদের সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি না হয়। অধিকন্তু আমরা একবারও বলছি না; জার্মান পত্র-পত্রিকায় আপনারা ভারতের প্রশংসা করুন, আমাদের শুধু এইটাই অনুরোধ, ভারতের বিরুদ্ধে লিখবেন না।

পত্র-পত্রিকায় প্রচারের এই প্রশ্নটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ, কারণ জনমত তার দ্বারাই গঠিত হয়। জার্মানি একটি কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র এবং সেই কারণে এখানকার সংবাদপত্র সম্পূর্ণভাবে জার্মান শাসনকর্তৃত্বের নিয়ন্ত্রণাধীন।

অপরপক্ষে ভারতের সংবাদপত্র ব্রিটিশ সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, কোনও রাজনৈতিক দলেরও নিয়ন্ত্রণে নয়। তবু, কোনও জার্মান, কিংবা জার্মানির প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন কোনও ভারতীয়ের পক্ষে ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় জার্মানির প্রতি অনুকূল এমন কিছু প্রকাশ করা সম্ভব। বস্তুত প্রায়ই দেখা যায় নতুন জার্মান শাসন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কিছু লেখা প্রকাশিত হলে সেই সংখ্যাতেই হয় ভারতস্থিত জার্মান দূতাবাসের, কিংবা জার্মানির প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন কোনও ভারতীয়ের লেখা তার খণ্ডন প্রকাশিত হয়। কিন্তু জার্মানিতে বর্তমানে কোনও লেখা খণ্ডন করে বা ভুল প্রমাণ করে যা ভারত বিরোধী রচনাদি খণ্ডন করে, কিছু লিখলে জার্মান সংবাদপত্রে তার প্রকাশ অসম্ভব। এ কথা আমি বলছি আমার নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে।

ভারত জার্মানির সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করবে, যদি জার্মানির তা অভিপ্রেত হয়, সে ক্ষেত্রে জার্মানিকে দেখতে হবে ভারত-জার্মান বন্ধুত্বের পথে প্রতিবন্ধকতা কী কী স্থাপিত হয়েছে এবং সে সব প্রতিবন্ধকতা বিনা দ্বিধায় অপসারিত করতে হবে, কেবল মাত্র ফাঁকা বুলিতে কাজ হবে না। আপনি জেনে খুশি হবেন, সম্প্রতি বৈদেশিক বিভাগ 'ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টস অ্যাব্রড'-কে একটি চিঠিতে জানিয়েছে জার্মানির পত্র-পত্রিকায় ভারত-বিরোধী প্রচার বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পত্রটিতে (নং III সি ৩৪৮৬) এই কথা আছে: 'The race-relations political office of the NSDAP and the Reich ministry for Public Education and Propaganda have been informed about these complaints and they have consented to cooperate against any anti-Indian attacks in the press.' কিন্তু সেই লক্ষ্যে করা কিছুই হয়নি কেননা আমরা দেখছি এই প্রচার অব্যাহত আছে। এ মাসের প্রথম দিকে 'Frankfurter Zeitung'-এর মতো একটি উচ্চমানের সংবাদপত্রে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধে ভারতের জন্য রচিত নতুন সংবিধানের প্রশংসা করেছে। কিন্তু ভারতীয় রাজনীতির যাঁরা চর্চা করেন এমন প্রত্যেকটি ব্যক্তি সেই সংবিধানকে ধিক্কার করেছেন।

পরিশেষে আরেকটি কথা। জার্মানিতে যাঁরা পড়াশোনা করছেন এমন প্রত্যেকটি ভারতীয় ছাত্র অভিযোগ করেছেন তাঁরা জার্মান কোম্পানিতে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্য কোনও সহায়তা পাচ্ছেন না। একটি ক্ষেত্রে একটি জার্মান কারখানা একজন ভারতীয়কে স্বেচ্ছাকর্মী হিসাবে নিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু জার্মান গভর্নমেন্ট প্রয়োজনীয় অনুমতি দেয়নি। এখন পর্যন্ত জার্মানি ভারতীয় ছাত্রদের প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে এসেছে, কারণ তাঁরা সহজেই জার্মান কল-কারখানায় ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্য আবেদন করতে পারতেন। এখন, এই সুবিধা যদি আর না থাকে জার্মানি আসতে ইচ্ছুক ভারতীয় ছাত্রের সংখ্যা অনেক হ্রাস পাবে। আমার কাছে যাঁরা সাহায্যের জন্য আবেদন করেছেন সে সব ছাত্রদের জন্য চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড এবং ইতালিতে সুযোগের জন্যে চেষ্টা করেছি এবং আমি প্রভূত সাফল্যও লাভ করেছি।

আপনাদের দিক থেকে যদি ভারত-জার্মান সম্পর্ক উন্নত করার চেষ্টা হয়, আমি আপনাকে কথা দিতে পারি, আমরাও একইভাবে সাড়া দেব। জার্মানরা আমাদের, ভারতবাসীদের জন্যে

যা করবে, আমরা জাতীয়তাবাদীরা জার্মানির জন্য ততটাই করব। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, যেমন সংবাদপত্রে প্রচারের ক্ষেত্রে তেমনি বাণিজ্য ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেও জার্মানি ভারতের প্রতি যত, ভারত জার্মানির প্রতি তার চেয়ে বেশি মিত্রসুলভ। প্রকৃতপক্ষে, ভারতে আমরা এখন যে জায়গায় পৌঁছেছি সেখানে আমরা চেষ্টা করব, হয় জার্মানির সঙ্গে আমাদের মৈত্রী বন্ধনের চূড়ান্ত উন্নতি সাধিত হোক, নয় তো তার চূড়ান্ত অবনতি হোক। প্রধানত জার্মানিকেই দেখতে হবে আমরা কোন পথে যাব।

জার্মান অ্যাকাডেমি ভারতীয় ছাত্রদেরকে আর্থিক সহায়তা দিতে চেয়েছে জেনে আমি প্রকৃতই সুখী হয়েছি। কিন্তু সেই সঙ্গে আমি এ কথাও জানাতে চাই, যে-সমস্ত ভারতীয় আর্থিক সাহায্য চান তাঁরা ছাড়াও এমন অনেকে আছেন যাঁরা নিজেদের ভরসাতেই আসেন। তাঁরা শুধু চান তাঁদের জার্মানিতে অবস্থানকালে অধ্যয়ন এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্য তাঁদেরকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করা হোক। জার্মান অ্যাকাডেমি তাঁদেরকে ব্যাপকতর সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে, বিশেষত কারখানায় হাতে-কলমে কাজ শিখবার ব্যাপারে, তাদের গুরুত্বপূর্ণ সহায়তাও করতে পারে।

অনুগ্রহ করে আমাকে জানান, জার্মান ওরিয়েন্ট অ্যাসোসিয়েশন-এর সঙ্গে আপনার যোগাযোগ আছে কি না, এবং ভারতীয় ছাত্রদের হাতে-কলমে কাজ শিখবার সুযোগ দিয়ে তারা সাহায্য করতে পারে কি না।

এই চিঠিতে যদি কিছু অস্পষ্ট থাকে দয়া করে মার্জনা করবেন। চিঠিটি একটি তর্জমা এবং সেই কারণে এর কোনও-কোনও অংশ অস্পষ্ট থাকা অতিশয় সম্ভব।

আমার গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

আন্তরিকভাবে আপনার
সুভাষ সি. বোস

সন্তোষকুমার বসু-কে

C/o American Express Company
Kaerntnerring 14
Vienna 1
১২ নভেম্বর ১৯৩৫

প্রিয় সন্তোষবাবু,

কিছু দিন থেকে আমি ভাবছি একটি বিষয়ে আপনাকে একটি চিঠি দেব। আমার মনে পড়ছে কিছু দিন আগে সংবাদপত্রে দেখেছি কলকাতার নাগরিকদের পক্ষ থেকে আপনি স্বামী বনকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। ওই ভদ্রলোকের বিষয়ে আমি আপনাকে কিছু লিখতে চাই। লর্ড উইলিংডন এবং ভারতের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের প্রশংসাপত্রের বলে বলীয়ান হয়ে হিন্দুধর্ম প্রচার করতে তিনি ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন। ইন্ডিয়া অফিস-এ তিনি সাদর অভ্যর্থনা লাভ করেন এবং কিছুকাল গোঁড়া রক্ষণশীলদের সমভিব্যবহারে ইতস্তত বিচরণ করেন। আমার মনে হয় শেষ পর্যন্ত তিনি বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের জন্য একটি কমিটি তৈরি করেন এবং

তার চেয়ারম্যান হন লর্ড জেটল্যান্ড। লন্ডনের সরকারি মহল তাঁকে পরিপূর্ণ সহানুভূতি এবং সমর্থন দান করে। কারণ সহজেই অনুমেয়। তাঁর এক বন্ধু আমাকে বলেন বাকিংহাম প্যালেসে এক গার্ডেন পার্টিতে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি হিজ ম্যাজেস্টি রাজা পঞ্চম জর্জকে এই বলে আশ্বস্ত করে এসেছেন যে স্বামীজির নিজের লক্ষ-লক্ষ ভক্ত ব্রিটিশ রাজের অনুগত। বন্ধুটি স্বামীজিকে বলেন, এ সব কথা কোনও ভারতীয়কে বলতে যাবেন না, তারা শুনলে তাঁকে বাহবা দেবে না। তার পর, গ্রেট ব্রিটেনে বৈষ্ণবধর্মের জয় সম্পূর্ণ করে অবতার পুরুষটি অবশিষ্ট ইউরোপ অভিযানে বেরোলেন। সারা পৃথিবী জয় না করে তিনি নিরস্ত হবার পাত্র নন, তিনি কি বিবেকানন্দের চেয়েও বড় নন? কয়েক দিন আগে আমি মিউনিকে ছিলাম। সেখানে ভারতীয়েরা আমাকে বললেন, তাঁদের চিত্তজয়ে স্বামীজি ব্যর্থ হয়েছেন। যাঁরা তাঁর বক্তৃতার আয়োজন করেছিল, সেই ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব ডয়েশ অ্যাকাডেমি আর দ্বিতীয়বার সে কাজ করবে না। তলে তলে কল-কাঠি নেড়ে ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় এই মর্মে বিবৃতিও দিয়েছেন, হিটলার তাঁর সঙ্গে জার্মানি এবং প্রাচ্য জগতের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের বিষয়ে আলোচনা করতে চান। এ খবর সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং খবরটি প্রকাশিত হওয়ায় জার্মান সরকারি মহল রীতিমতো বিরক্ত। বস্তুত মিউনিকে ভারতীয়েরা কেউ-কেউ আমাকে বলেছেন স্বামীজির কাণ্ডজ্ঞানহীন কীর্তিকলাপের ফলে জার্মানিতে ভবিষ্যতে কোনও ভারতীয়ের পক্ষে কোনও রকম ধর্মপ্রচারের কাজ অতিশয় কঠিন হবে। তা ছাড়া, পৃথিবীতে এমন কোনও দেশ যদি থাকে যেখানে বৈষ্ণব মতবাদ গ্রাহ্য হবার নয়, তাহলে জার্মান হল সেই দেশ। আজ নাৎসি জার্মানি একমাত্র বিশ্বাস করে শক্তিতে এবং ভারতের মতো পরপদানত যে-সব জাতি তাদের হেয় জ্ঞান করে।

স্বামীজিটি তাঁর বাণী প্রচার করতে ভিয়েনায় এসেছিলেন। তাঁর সভায় উপস্থিত ছিলেন ব্রিটেনের রাষ্ট্রদূত। এ ঘটনা অতি অসাধারণ এবং এমনকী ইউরোপের মূল ভূখন্ডেও যে ব্রিটিশ কূটনীতিকেরা তাঁকে আগলে নিয়ে বেড়াচ্ছেন, তার আরেকটি প্রমাণ। যে বিষয়টি কিছুতেই আমার বোধগম্য হচ্ছে না, তা হল, একজন হিন্দু সন্ন্যাসী, যিনি সংসার ত্যাগ করেছেন, তিনি ব্রিটিশ ছত্রছায়ায় কেন ধর্মপ্রচার করে বেড়াবেন। প্রচার করবার মতো কোনও বাণী যদি তাঁর থাকে, তিনি কেন সে-কাজ বিবেকানন্দ যেভাবে করেছিলেন সে ভাবে করতে পারেন না। প্রবাসীতে আপনি নতুন সংবিধানের সমর্থনে লন্ডনে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার বিষয়ে নিশ্চয় পড়েছেন। সে সম্পর্কে সম্পাদকের মন্তব্য অতিশয় যুক্তিযুক্ত। তা থেকে দেখা যায়, উনি একজন রাজনৈতিক সন্ন্যাসী, যদিও তাঁর রাজনীতি প্রকৃতপক্ষে রাজানুগত্য।

আমি সংবাদপত্রে দেখলাম তিনি দু'জন জার্মান শিষ্য নিয়ে দেশে ফিরেছেন, কে তাঁরা? তাঁরা কি বেকার যুবক, স্বামীজি যাঁদের বস্ত্র এবং খাদ্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন? না কি তাঁরা নির্বোধ ভাবপ্রবণ যাঁদের ভালমানুষীর সুযোগ নিয়েছেন স্বামীজি? এই বাস্তববাদী পাশ্চাত্যেও আদর্শবাদী, ছিটগ্রস্ত, ভাবপ্রবণ এবং অব্যবস্থিতচিত্ত ব্যক্তিদের দেখা মেলে।

স্বামীজিটি যদি ত্রিপুরার মহারাজার সাহায্য নিয়ে লন্ডনে একটি কেন্দ্র খুলবার মতলব করে থাকেন, ভগবান ভারতকে এবং হিন্দুধর্মকে রক্ষা করুন! আপনারা যদি পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে হিন্দুধর্মকে হাস্যাস্পদ করেই তুলতে চান, তার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হল পরমপূজনীয় স্বামীজিটিকে আমাদের ধর্মীয় দূত করে পাঠান।

শ্রদ্ধা সহকারে।

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস।

এন. বি. সাকলাতওয়ালা-কে

C/o American Express Company
Kaerntnerring 14
Vienna -1

১৫ নভেম্বর ১৯৩৫

Ref. G.G.L. 252

প্রিয় স্যার এন. বি. সাকলাতওয়ালা,

আপনার ১৫ অগাস্ট ১৯৩৫-এর চিঠির জন্য আমি আপনার কাছে অতিশয় কৃতজ্ঞ, যদিও চিঠিটির বিষয়বস্তু আমার অতিশয় বিস্ময় ও বেদনার কারণ হয়েছে। উত্তর দিতে বিলম্বের জন্য আমি দুঃখিত। বিলম্বের একটি কারণ আমি স্থান থেকে স্থানান্তরে পরিভ্রমণ করছিলাম; আরেকটি কারণ, আমার মনে হয়েছিল আপনার কাছে আবার চিঠি লেখার আগে আমার কর্তব্য জামশেদপুরের লেবার অ্যাসোসিয়েশন-কে আপনার চিঠির বিষয়ে জানানো।

আপনি বলেছেন, কোনও অলিখিত বোঝাপড়ার দরুণ কোম্পানি বকেয়া ভাড়া এবং চলতি ভাড়ার জন্য অ্যাসোসিয়েশনকে চাপ দেয়নি। আপনার মতে লেবার অ্যাসোসিয়েশন এখন সেই বোঝাপড়ার খেলাপ করেছে এবং সেই কারণে সেই অব্যাহতি এখন প্রত্যাহৃত হওয়া উচিত। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই, বোঝাপড়ার খেলাপ করা হয়েছে, তা হলেও বুঝতে পারছি না, বোঝাপড়া খেলাপের আগেকার সময়ের জন্য বকেয়া ভাড়া কী করে দাবি করা যায়। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বলে, সে দাবি সম্পূর্ণ নীতিবহির্গত এবং আপনাদের মতো কোম্পানির পক্ষে অনুপযুক্ত। খুব বেশি হলে যে মুহূর্তে বোঝাপড়ার খেলাপ করা হয়েছে তখন থেকে সুবিধাটি প্রত্যাহার করতে পারেন।

তারপরে, অলিখিত বোঝাপড়ার খেলাপ করার অভিযোগে আসি। আপনি বলেছেন, অ্যাসোসিয়েশনের এখন আর বাস্তব অস্তিত্ব নেই, চার বছর তাদের কোনও সভা হয়নি। এ অভিযোগ অতি গুরুতর এবং কিছু যদি মনে না করেন, আমি এ বিষয়ে অকপটে কিছু বলতে চাই। আপনার বোধ হয় স্মরণ থাকবে, ১৯২৮-এর ধর্মঘটের মীমাংসার পরে এবং তার আগেও কিছু কাল, কোম্পানি হোমির সঙ্গে কোনও রকম সম্পর্ক রাখতে অস্বীকার করে। সেই সময়ে একটু তাঁর মন বুঝে চললে হোমিকে নিজেদের দিকে টেনে আনা যেত। কিন্তু কোম্পানি তাঁকে উপেক্ষা করার ফলে তিনিও কোম্পানির শত্রুতা করেই চললেন, যাঁরা সৎভাবে মীমাংসার পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন তাদেরও বিরুদ্ধাচরণ করলেন। জামশেদপুরে সবাই জানে হোমির দল শুধু রাত্রিতেই নয়, প্রকাশ্য দিবালোকেও মীমাংসার যারা পক্ষপাতী তাদের আক্রমণ করেছিল। এ-ও সকলের জানা, লেবার অ্যাসোসিয়েশনের ডাকা যে সব জনসভায় আমি সভাপতিত্ব করি, হোমির দলের ভাড়া করা গুণ্ডারা তার ওপরে আক্রমণ চালিয়েছে। সেই সব দুর্দিনে রাজ-সরকারের পুলিশ আমাদের নিরাপত্তা বিধান করেনি। তা সত্ত্বেও আমরা মীমাংসার শর্ত অনুযায়ী প্রদত্ত আমাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিনি, যদিও কোম্পানি মীমাংসার সব শর্ত কার্যে পরিণত করেনি। এই অবস্থা কিছুদিন চলে, তারপর হঠাৎ এক দিন কোথাও কিছু নেই, রহস্যজনকভাবে কোম্পানি বিপরীত পথে চলতে আরম্ভ করে। হোমির সঙ্গে তারা শান্তি স্থাপন করে, আর যারা মীমাংসা মেনে চলছিল তাদেরকে পরিত্যাগ করে। তারপরে কিছু কাল চলে কোম্পানির সঙ্গে হোমির দহরম-মহরম, আর হোমির দলের ভাড়াটে গুণ্ডারা লেবার

অ্যাসোসিয়েশনের ডাকা জনসভার ওপরে আক্রমণ চালাতে থাকে। তার পরে আবার রণকৌশলের পরিবর্তন। হোমিকে আদালতে সোপর্দ্দ করা হল এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে একমাত্র তাঁকে একমেবদ্বিতীয়ম করে যে দল তারও আর কোনও চিহ্ন থাকল না। দল থাকল না কিন্তু তার ভাড়াটে গুন্ডারা থাকল। তারা ভাড়া খাটাতে লাগল অন্য কুমতলবি চক্রীরা। হোমির দলের কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যাবার পর কয়েকটি জনসভায় আমি নিজে ছিলাম, দেখলাম সেখানেও সেই গুন্ডাদের উপদ্রব। আমি নিজে মি. কিনানকে ব্যাপারটা জানিয়েছি, কিন্তু তিনি বললেন এ সবের কিছুই নাকি তিনি জানেন না, যদিও জামশেদপুরের প্রত্যেকটি শিশু জানে গুন্ডারা কার দলের। এই অবস্থা এখনও চলছে। এখন, এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে লেবার অ্যাসোসিয়েশন যদি সভা করতে না পারে সে দোষ কি পুরোপুরি অ্যাসোসিয়েশনের? এ কথা কি কেউ বুক ফুলিয়ে বলতে পারে যে কোম্পানির এতে কোনও দায়িত্ব নেই?

আমার বোধগম্য হচ্ছে না, কেন জামশেদপুরের প্রাচীনতম ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের থেকে কাগজে-কলমে এবং কার্যত স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেওয়া হল; যে-সংগঠন স্থাপিত হয়েছিল ১৯২০ সালে, দেশবন্ধু দাস, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু এবং মহাত্মা গান্ধীর মতো সর্বজনশ্রদ্ধেয় নামের সঙ্গে যে-সংগঠন জড়িত এবং কোম্পানিকে প্রদত্ত যাবতীয় প্রতিশ্রুতি যারা সৎভাবে রক্ষা করে গেছে। তার কারণ কী এই যে হোমির সংগঠন ভেঙে দেবার পরে বর্তমান সংগঠনটিকেও ভেঙে দিতে পারবেন বলে মনে করছেন? আপনারা কি সত্যসত্যই এ কথা জোর দিয়ে বলতে পারেন, যে ১৯২৮-এর মীমাংসার প্রতি যারা বিশ্বস্ত থেকেছে তাদের প্রতি আপনাদের মনোভাব সৎ, নীতিসম্মত? মহাত্মা গান্ধী ১৯৩৪-এ জামশেদপুরে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তার একটি অনুলিপি এখন আমার সামনে আছে। সেই বক্তৃতায় এক জনসভায় তিনি এ কথা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে "কর্মী এবং নিয়োগকর্তাদের মধ্যে মতভেদের মীমাংসা লাঠির সাহায্যে করা হচ্ছে জেনে তিনি দুঃখিত।" মহাত্মা গান্ধীর রাজনীতির সঙ্গে আপনাদের যতই মতপার্থক্য থাক আমার মনে হয় না জামশেদপুরের আদালতের ঘটনার বিবরণ পড়লে আপনি দেখবেন না যে লেবার অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি মি. জন লেবার অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে যখন কাজ করছিলেন কোম্পানির বেতনভোগী পাঠানদের দ্বারা মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়েছেন।

অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি আমাকে জানিয়েছেন ওই সব অসুবিধা এবং বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তাদের সভ্যতালিকায় রীতিমতো সদস্য আছেন এবং অ্যাসোসিয়েশনের আয় সন্তোষজনক না হলেও কোনও রকমে খরচ চালিয়ে যাবার মতো, যদি বাড়ি-ভাড়া তার মধ্যে ধরা না হয়, যদিও অ্যাসোসিয়েশনকে নিগৃহীত করাই এখন নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং কোম্পানির সানুগ্রহ পৃষ্ঠপোষকতায় একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠন স্থাপিত হয়েছে। আমি ভাবি, কোম্পানির এই যে বর্তমান পদক্ষেপ, নতুন একটি সংগঠনকে পৃষ্ঠপোষকতা দান, জামশেদপুরের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সংগঠনকে স্বীকৃতি না দেওয়া, তাদের সঙ্গে সহযোগিতা না করা, এ পদক্ষেপ কি অশোভন, এমনকী অনৈতিক বলে আপনার মনে হয় না?

আপনি বলেছেন, মি. জন কোনও কোনও সংবাদপত্রের স্থানীয় বন্টন মুখপাত্র অর্থাৎ, আপনার বলবার উদ্দেশ্য, শ্রমিক সংগঠনের কাজের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। আমি কি আপনাকে এবং ম্যানেজমেন্টকে—যাদের অনেক বেশি জানার কথা, তাদের জানাতে পারি যে ১৯৩২ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস যখন 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন, তখন থেকে লেবার অ্যাসোসিয়েশন ওই সংবাদপত্রের স্বীকৃত এজেন্ট? সে ব্যবস্থা ভেবেচিন্তেই করা হয়েছিল, উদ্দেশ্য ছিল এখানকার লোকের মধ্যে সংবাদপত্র পাঠের অভ্যাসকে উৎসাহ দান, এবং সেই সঙ্গে অ্যাসোসিয়েশনের আয় বৃদ্ধি। এইসব সংবাদপত্রের এজেন্সি থেকে যে সামান্য

আয় সেটা মি. জনের নিজের সম্পত্তি নয়।[১] মি. জন গরিব মানুষ হতে পারেন, কিন্তু আমি তাঁকে সম্মান জানাই এক জন চরিত্রবান সমাজচেতনাসম্পন্ন কর্মী বলে, যিনি আর্থিক অনটনের মধ্যেও অ্যাসোসিয়েশনের জন্য যথাসাধ্য কাজ করেছেন, জীবনহানির আশঙ্কা সত্ত্বেও এবং টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কম্পানি তাঁকে মাঝে-মাঝে লোভনীয় চাকরি দিতে চাওয়া সত্ত্বেও।

আপনি আরও বলেছেন, একটি বাড়ি অধিকার করেছেন কয়েকটি খবরের কাগজের স্থানীয় পরিবেশক-এজেন্ট, অন্যটি দখল করে আছেন দু'জন খবরের কাগজের হকার, একজন ছাপাখানার কর্মী, একজন হোটেল কর্মচারী, একজন আম-বিক্রেতা এবং একজন ট্যাক্সি-চালক। আমি যে তথ্য সেক্রেটারির কাছ থেকে জেনেছি, তাতে দেখছি ওই হিসাব সম্পূর্ণ ভুল কেবলমাত্র এই একটি ব্যাপার বাদে, যে যাঁরা খবরের কাগজ বিলি করেন এমন কয়েকজন কর্মী অনেক বছর ধরে ওই বাড়িতে বাস করেন। তার কারণ এই ব্যবস্থা অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে সুবিধাজনক।

আপনি প্রয়োজনের তুলনায় বাসগৃহের অভাবের কথা বলেছেন, কিন্তু সে-অভাব এখনই এত তীব্র কী করে হল আমি বুঝতে পারছি না, যখন আপনাদের গৃহ-নির্মাণের বার্ষিক কর্মসূচি আপনারা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং অ্যাসোসিয়েশনের ওই দুটি বাড়ি দেওয়ার পর থেকে আপনাদের শ্রমিক সংখ্যা কুড়ি শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

এই সব বিষয় বিবেচনা করে, কিছু মনে করবেন না যদি আমার মনে হয়ে থাকে কোম্পানির এই পদক্ষেপের প্রকৃত কারণ, কোম্পানি মনে করছে অ্যাসোসিয়েশনকে সে এখন মারণ-আঘাত হানতে সক্ষম। জামশেদপুরে বাসস্থানের ব্যাপারে যেহেতু আপনাদের একচেটিয়া ক্ষমতা, আপনারা হয়তো মনে করছেন, লেবার অ্যাসোসিয়েশনকে বাড়ি না দিয়ে তার অস্তিত্বকেই শেষ করে দেবেন। কিন্তু আমার অনুরোধ দয়া করে অতীতটাকে আপনারা সম্পূর্ণ ভুলে যাবেন না, যারা কোম্পানির সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনৈতিকতাকে পরিহার করবার চেষ্টা করে গেছে তাদের কথাও ভুলবেন না। আর ভবিষ্যতের কথা যদি বলি, আমার মনে হয় না আমরা সম্পূর্ণ বরবাদ হয়ে গেছি।

শুরুতেই বলেছিলাম, যা বলবার খোলাখুলি বলব। তাই যদি করে থাকি, আমায় ক্ষমা করবেন। আমার কথা আপনি বিশ্বাস করবেন, এমন আশা করি না। আমি এই অপ্রিয় সত্য অবগত যে আপনাদের অফিসারদের কথাই আপনারা বেশি বিশ্বাসযোগ্য মনে করবেন। আমি অন্তত এটুকু বলতে পারি, যে আপনাদের সব চাইতে ভাল অফিসারদের চেয়ে আমি কম সম্মানীয় নই। আপনাকে এই চিঠি লিখবার আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল চিত্রটির আরেকটি দিক আপনার সামনে উদ্‌ঘাটিত করা। আপনাকে বিশ্বাস করানোর ব্যাপারে, আমি এখনই বললাম, আমি কোনও আশা রাখি না।

চিঠির দৈর্ঘ্যের জন্যে আমায় ক্ষমা করবেন। শ্রদ্ধা সহকারে,

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস

---

১. (মূলে আছে, "not the private property of the Association" এও অবশ্যই ভুল, কারও অনবধানতা-প্রসূত)

নাওমি সি. ভেটার-কে

Pension Cosmopolite
Alser Str. 23
Wien VIII
২৯.১১.১৯৩৫

প্রিয় মিসেস ভেটার,

আপনার কথা মতো একটি নোট আমি এই সঙ্গে পাঠালাম। আপনি যেরকম চেয়েছিলেন সেরকমই দিতে পারলাম আশা করি। এই নোটটি ড. ভেটারের তাঁকে দেওয়ার দরকার নেই। তিনি এর বিষয়বস্তু মুখেও তাঁকে জানাতে পারেন, যদি না লিখিত ভাবেই দিতে চান।

ভিসা কেন দেওয়া হল না তার কারণটা আমি জানতে চাই, আগেই বলেছি। ড. ভেটার এ কথাও জানিয়ে দিতে পারেন, ভারতের লোকের ধারণা ভিসা না দেওয়ার কারণ নতুন স্থাপিত সোভিয়েত-ব্রিটিশ সুসম্পর্ক। এটা ভারতে সোভিয়েত সরকারের সুনামের পক্ষে হানিকারক। তিনি আরও জানাতে পারেন, ভিসা যদি দেওয়া হয়, আমি এখনও রাশিয়া যেতে পারি, যদিও কিছুদিন পরে। আমার জন্য ড. ভেটারের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করবার দরকার নেই, তিনিই আমার পক্ষ থেকে এ নিয়ে কথা বলতে পারেন।

আপনারা দু'জনেই আমার শ্রদ্ধা নেবেন।

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস

পুঃ 'টাইমস'-থেকে একটা কাটিং এই সঙ্গে পাঠালাম।

ড. থিয়েরফেল্ডার-কে

আমেরিকান এক্সপ্রেস কোং
Kaerntnerring 14
ভিয়েনা-১
৯ ডিসেম্বর ১৯৩৫

German Academy
Received/Entered 19.12.1935
No. J. 3005

প্রিয় হের ডক্টর থিয়েরফেল্ডার,

আপনার ৬ ডিসেম্বর তারিখের চিঠির জন্য অনেক ধন্যবাদ। আপনি যে মন্ত্রক অধিকর্তা মি. ডিয়েকহফ-এর সঙ্গে আমার আরেকবার দেখা করবার ব্যবস্থা করতে পারলেন, সে জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এখন আমি জ্বরে এবং ঠাণ্ডা লাগায় শয্যাশায়ী।

আমি সত্যি সত্যিই দুঃখিত যে এই মুহূর্তেই আমি আপনাকে বলতে পারছি না, কবে এখান থেকে যাত্রা করতে পারব, কেননা আমার অসুস্থতা কোন দিকে যাবে আমি জানি না। তাই আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, মন্ত্রক অধিকর্তা মি. ডিয়েকহফ-এর কাছে একটি জরুরি চিঠি পাঠিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে বলুন আমি এখন আবার কেন বার্লিনে যেতে পারছি না। বলা বাহুল্য, ৫/৬ দিন পরে আমি আবার আপনাকে চিঠি দিয়ে জানাব আমি যেতে পারব কি না। আপনি যদি মন্ত্রক অধিকর্তার কাছ থেকে জেনে নিতে পারেন বড়দিনের ছুটির সময়ে কত দিন তিনি অফিস থেকে ছুটিতে থাকবেন, আমি অতিশয় কৃতজ্ঞ থাকব। তাঁর কী পরিকল্পনা জানলে, আমি সুযোগ মতো হয় বড়দিনের পরে কিংবা তার ঠিক আগে বার্লিন যাব।

গভীর শ্রদ্ধা সহকারে।

একান্ত আপনার
সুভাষচন্দ্র বোস

শ্রীসুনীল মোহন ঘোষ মৌলিক-কে
[মূল বাংলায়]

C/o, American Express Co.
Vienna
20. 12. 35

প্রীতিভাজনেষু—

তোমার অনেকগুলি চিঠি আমি পেয়েছি কিন্তু উত্তর দেওয়া হয় নাই—তার জন্য ক্ষমা করবে। Karlsbad খুব বড় শহর নয়—তাই ওখানে American Express-এর শাখা নেই। বোধহয় শুধু আমার নাম এবং Karlsbad লিখলে আমি পেতাম। যাক্ তোমার শেষ চিঠি যা আমি পেয়েছি তা ১২/১১ তারিখের। আমার উপরোক্ত ঠিকানায় চিঠি লিখলে—যেখানে থাকি না কেন, যথাসময়ে পাব।

শ্রীমতী কমলা নেহরুর অবস্থা কতকটা ভাল।

আমার উপর পূর্বে যা নিষেধাজ্ঞা ছিল—তা এখনও আছে। তার কোনও ব্যতিক্রম এখনও হয় নাই।

এদেশে প্রায় প্রত্যেক লোক stamp সংগ্রহ করে। তোমার জন্য অতঃপর আমি কিছু stamp রেখে দিব।

মহাত্মার কৃপায় পণ্ডিত জহরলাল আবার সভাপতি নির্বাচিত হবেন বলে মনে হচ্ছে। বাংলা দেশের কথা কে শুনবে? ঁপ্যাটেল মহাশয়ের টাকাও বোধ হয় মারা গেল।

বাংলার দলাদলি কি মিটবে না? ডা. রায়ের দল এতদিন বলতেন যে, তাঁরা আমার দল। এখন তো স্পষ্টই দেখা যে তাঁরা অন্য নীতি অনুসরণ করেন। তা না হলে আমার প্রস্তাব তাঁরা গ্রহণ করলেন না কেন? যদি "এনে" সাহেবের সালিশি বাঙালি গ্রহণ করতে পারল তো বাঙালির সালিশি কি বাঙালি গ্রহণ করবে না? আমার শুধু এই দুঃখ হয় যে এত অপমান, লাঞ্ছনা ও লাথি খাবার পরও বাঙালির সঙ্কীর্ণতা এখনও গেল না। আমি ভাবি—বাঙালির সে মহাপ্রাণতা কোথায় গেল?

পণ্ডিত জহরলালের সঙ্গে আমার দুইবার দেখা হয়েছে। আমি ব্যাডেনউইলেন গিছলাম।

আমার শরীর পূর্বাপেক্ষা ভাল, তবে একেবারে সুস্থ হতে বিলম্ব আছে। কাটা শরীর একেবারে সারবে বলে মনে তো হয় না। যা হোক কোনও প্রকারে জোড়াতালি দিতে পারলে সুখী হই এবং বাড়ি ফিরতে পারি। আর বিদেশে থাকতে ভাল লাগে না। এ বৎসর Karlsbad-এ গিয়ে তেমন উপকার পাইনি তবে Gastein-এ গিয়ে উপকার পেয়েছি। তাই আমি ভাবছি জানুয়ারি মাসে আবার Gastein যাব—ওখানকার জল-চিকিৎসার জন্য। আশা করি তোমরা ভাল আছ। আমার ভালবাসা জানবে।

ইতি
শুভার্থী
শ্রীসুভাষ সি. বসু

ই. উডস-কে

C/o American Express Company
Kaerntnerring 14
Vienna -1
২১ ডিসেম্বর ১৯৩৫

প্রিয় মিসেস উডস,

আপনার চিঠি অনেক দিন হল পেয়েছি। এত দিন উত্তর দিইনি বলে আমি দুঃখিত। আমার যে বন্ধুর কথা আপনাকে লিখেছিলাম তিনি যে শেষ পর্যন্ত ডাবলিন গেলেন না সে জন্য আমি দুঃখিত। সত্যি কথা বলতে গেলে, আমার স্বদেশাবাসী যাঁরা লন্ডনে যান তাঁদের মধ্যে অনেকেই ডাবলিন যাবার কোনও আগ্রহ দেখান না, অথচ সেখানে গেলে এমন অনেককে সশরীরে দেখা যায় যাঁরা ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন এবং করছেন। ভারতের যে অংশে আমার বাড়ি—বঙ্গদেশ—সেখানে এমন কোনও শিক্ষিত পরিবার নেই বললেই চলে যাঁরা আইরিশ বীরদের জীবনকাহিনি খুবই আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করেন না। ইদানীং আয়ারল্যান্ড সম্পর্কে বইপত্র পাওয়া আরও কঠিন হয়ে উঠছে, কারণ গভর্নমেন্টের ধারণা আইরিশ বিপ্লবীরা ভারতীয়দের চোখ খুলে দেবেন। কিন্তু আমরা সবাই জানি যে-বই পড়তে কষ্ট করতে হয়, সে বই আমরা বেশি আগ্রহ নিয়ে পড়ি। আমি অনেক দিন ধরে ইংল্যান্ডে যাবার অনুমতির জন্য অপেক্ষা করে আছি, কিন্তু তার আশা নেই। তবে, ফ্রি স্টেট গভর্নমেন্টের কাছ থেকে আমি আইরিশ ফ্রি স্টেট-এ যাবার অনুমতি পেয়েছি এবং আমাকে ইউরোপের মূল ভূখণ্ড থেকে সোজা আয়ারল্যান্ডে যেতে হবে। আমার ইচ্ছে, ফেব্রুয়ারির কোনও সময়ে ভারতের উদ্দেশে রওনা হব। তার আগে আমি আয়ারল্যান্ড যেতে চাই, হয় জানুয়ারির শেষে কিংবা ফেব্রুয়ারির প্রথমে। স্বাভাবিকভাবেই, আমি সেখানে কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে চাই। কাদের কথা বলছি বুঝতে পারছেন। আমি ইন্দো-আইরিশ লিগের ভবিষ্যতের বিষয়েও আলোচনা করতে চাই, তার পুনরুজ্জীবন সম্ভব কি না সে বিষয়ে। বিদেশে প্রচারের কাজ হাতে নিতে আমাদের কংগ্রেসের কর্মকর্তাদের রাজি করাতে আমি ব্যর্থ হয়েছি। তবু, এ কাজের জন্য জনসমর্থন আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি। এবং

আমার আশা ক্ষমতাসীন কংগ্রেস নেতৃত্বের সাহায্য ছাড়াই আমি সে উদ্দেশ্যে কাজ করতে পারব। আপনি শুনে অবাক হবেন, কংগ্রেস দলের পদাধিকারীদের কলকাঠি নাড়ার ফলে পরলোগত মি. ভি. জে. প্যাটেলের উইলের অছিরা সেই টাকার ওপরে চেপে বসে আছেন। উইলে টাকার আর যে-সব বিলিব্যবস্থার কথা বলা আছে সবই করা হয়েছে, শুধু বিদেশে প্রচারের কাজের জন্য যে টাকাটা আমাকে দেওয়ার কথা ছিল সেটা বাদে। বোম্বাই হাইকোর্ট প্রায় চোদ্দোমাস আগে প্রবেট দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু টাকাটা তেমনি পড়ে আছে। মনে হয়, দলের পদাধিকারীরা চান না আমি কাজটা হাতে নিই। অবশ্য মি. প্যাটেলের জীবদ্দশায় এঁরা তাঁরও বিরোধিতা করেছেন, কিন্তু তাঁদের হীন মনোবৃত্তি এত দূর যাবে আমি কখনওই আশা করিনি।

আপনি যদি আমাকে দয়া করে জানান আমার আয়ারল্যান্ড যাওয়ার পক্ষে কোন সময়টা সবচেয়ে ভাল, আমি কৃতজ্ঞ থাকব। আপনার উত্তর পেলে আমি আমার পরিকল্পনা করব।

মাদাম ম্যাকব্রাইড ও আপনি আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করবেন।

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস

কিটি কুর্টি-কে

প্রযত্নে: আমেরিকান এক্সপ্রেস কোং
ভিয়েনা
২২.১২.১৯৩৫

প্রিয় মিসেস কুর্টি,

আপনার ২৭ অক্টোবরের চিঠি এবং তারপরে আর. আর.-এর ওপরে লেখাটি পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি। উত্তর দিতে দেরি হওয়ার জন্য আমি দুঃখিত। আপনার জন্য আমার এক কপি বইয়ের অর্ডারও দেওয়া হয়নি। সে-জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। আজ আমি আমার প্রকাশককে চিঠি দিচ্ছি এবং আশা করি এক সপ্তাহের মধ্যে আপনি বই পেয়ে যাবেন।

তরুণ প্রজন্মের ওপর আস্থা রাখবার বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমি একমত।

বৃদ্ধ এবং তরুণদের মধ্যে সংঘর্ষ ভারতেও চলছে। আমি প্রায়ই দেখি তরুণদের পথে বৃদ্ধরা বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তিক্ত সংঘাতের সৃষ্টি হচ্ছে তা নিয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদেরই জয় হবে।

হয়তো আমি জানুয়ারি মাসে বার্লিনে যেতে পারি। এখন আমি ফেব্রুয়ারি মাসে দেশে যাবার পরিকল্পনা করছি। আপনি যদি এখানকার কাছাকাছি আসেন—দয়া করে আমাকে জানাবেন। হয়তো আমাদের দেখা হতে পারে; যেমন ধরুন এখানে থেকে এক সঙ্গে ব্রাতিস্লাভা যেতে পারি।

আপনি ও ড. কুর্টি শ্রদ্ধা জানবেন,

আপনাদের
সুভাষ সি. বোস

পুঃ আমি এক এক সময়ে ভাবি আপনি বার্লিনে কেন থাকেন। আপনার কি সেখানকার পরিবেশে দম বন্ধ হয়ে আসে না?

অমিয় চক্রবর্তী-কে
[মূল বাংলায়]

Pension Cosmopolite
alsa Str. 23
Wien VIII
২৩. ১২. ৩৫

প্রিয়বরেষু

আপনার চিঠি প'ড়ে বিশেষ ব্যথিত হলাম। আপনার মত কোমলহৃদয় ব্যক্তির পক্ষে ব্যথা যে আরও অসহনীয় হবে তা খুবই স্বাভাবিক। এ অবস্থায় মানুষ নিজের অন্তরের ভিতরেই সান্ত্বনা খুঁজে পায়—বাহির থেকে সে সান্ত্বনা দেওয়া যায় না। আপনাকে আমি চিঠি লিখে এখন বিরক্ত করতাম না—কেবল এই খবরটা দিতে চাই যে আপনার প্রেরিত "Breakdown" by Briffault পেয়েছি। বিশেষ ধন্যবাদ কারণ বইটা চমৎকার। কয়েকজন 'অস্ট্রিয়ান' বন্ধুদের এ বইটা এখন পড়তে দিয়েছি—তারাও বিশেষ তৃপ্ত হয়েছেন এই বইটা পাঠ করে।

আমি বোধহয় জানুয়ারী মাসে আর একবার Badgastein যাব—চিকিৎসার জন্য। গতবার সেখানে গিয়ে উপকার পেয়েছিলাম। Paris যাবার ইচ্ছা আছে—কতদূর ঘটে উঠবে জানি না। যাহোক্, আপনি Paris এলে পূর্ব্বে আমাকে জানাবেন। জহরলাল সেখানে এক সপ্তাহের জন্য গিছলেন। তবে কতদূর কি করতে পারলেন তা আমাকে জানান নাই।

মিসেস্ নেহরুর অবস্থা আবার সঙ্গীন হয়ে উঠেছে—কাল টেলিগ্রাম পেলাম। আমার যাবার ইচ্ছা হচ্ছে কিন্তু এক সপ্তাহ যাবৎ সর্দ্দি এবং সামান্য জ্বর থেকে ভুগছি। এ অবস্থায় যেতে সাহস হচ্ছে না। এখান থেকে ১৭ ঘণ্টার পথ।

House of Commons-এ আমার সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর বোধহয় দেখেছেন। ১০ই তারিখের Times-এ আমি দেখেছি। তাদের এখনও ধারণা যে আমি গুপ্তবিপ্লবে নিমগ্ন। সুতরাং দেশের কর্ত্তৃপক্ষদের মনোভাব বোধহয় বুঝতে পারছেন।

সত্যের খাতিরে স্বীকার করছি যে "হোর" সাহেবের পতনে সুখী হয়েছি। ভারতের অভিশাপ তা'হলে কাজ করেছে। লোকটা পার্লামেন্টে একেবারে কেঁদে ফেল্লে!

আপনার সম্বন্ধে দেশের কাগজে কি বেরিয়েছিল তা আমি একেবারে কিছুই জানী না। আপনি সময়মত আমাকে লিখে পাঠাবেন আমার অবগতির জন্য; এটা দরকার।

আপনার বর্ত্তমান শোকের মধ্যে আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। আশাকরি শারীরিক কুশলে আছেন।

ইতি
ভবদীয়
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার-কে
[মূল বাংলায়]

C/o American Express Co.
Vienna,
২৩/ ১২/ ৩৫

প্রীতিভাজনেষু

অনেকদিন আপনাকে পত্র দিতে পারি নাই। যাহা হউক আশা করি ভাল আছেন। আপনার চিঠি অত্যন্ত আগ্রহ ও তৃপ্তির সহিত পাঠ করি। তবে আপনি বোধ হয় ইচ্ছা করিয়াই ব্যক্তি বিশেষের উল্লেখ করেন না এবং তার জন্য আপনার বর্ণিত চিত্র তত স্পষ্ট হয় না। তথাপি প্রধান রাষ্ট্রীয় গতি বা ধারাগুলি বুঝিতে অসুবিধা হয় না।

আমাদিগকে প্রথমে প্রধান ২ গলদগুলি আক্রমণ করিতে হইবে। আমাদের জীবনে শৃঙ্খলা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে—ভিতরে এবং বাহিরে। শৃঙ্খলা নষ্ট হইবার কারণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অভাব। এ বিষয়ে আপনার বিশ্লেষণ ঠিকই। কোনও আদর্শের উপর বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা না থাকিলে শৃঙ্খলা বা নিষ্ঠা আসিতে পারে না।

আনন্দবাজার পত্রিকার সাহায্যে এই মূল কথা খুব জোর করিয়া প্রচার করুন—আমাদের জীবনে—ভিতরে এবং বাহিরে শৃঙ্খলা চাই। বাঙালিকে একযোগে আবার কাজ করিতে হইবে। পরের সম্বন্ধে সহিষ্ণুতা ও শ্রদ্ধা চাই এবং তার দ্বারা পরকে আপন করিতে হইবে। বাঙালিকে আবার সঙ্ঘবদ্ধ করিতে পারিলে অন্তরের শক্তির স্ফূরণ হইবে। আমাদের প্রকৃতপক্ষে অধঃপতন হয় নাই—হইয়াছে শুধু শৃঙ্খলার অভাব।

সঙ্গে ২ আদর্শবাদের (idealism) একটা তরঙ্গ সৃষ্টি করিতে হইবে। এই ভাবতরঙ্গের সাহায্যে আমাদের অন্তরের গলদগুলি ধৌত করিতে হইবে। বাঙালি বড় পরশ্রীকাতর, ঈর্ষাপরায়ণ—এই দোষ ত্যাগ করিতে হইবে। শুধু idealism-এর সাহায্যে নীচতা নিবারণ করা যায়—তাই এক প্রবল ভাবতরঙ্গের প্রয়োজন।

আশা করি আপনারা ভাল আছেন। আমার শরীর পূর্বাপেক্ষা ভাল কিন্তু এখনও সারে নাই। তার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছি। দেশে আবার ফিরিতে পারলে বাঁচি।

আমার প্রীতি সম্ভাষণ জানিবেন।

ইতি
ভবদীয়
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

সন্তোষকুমার বসু-কে

প্রযত্নে: আমেরিকান এক্সপ্রেস কোং
ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া
৩.১.৩৬

প্রিয় সন্তোষবাবু,

আপনি যে একজন অ্যাডভোকেট তাতে কোনও ভুল নেই। আমার অস্ত্রেই আমাকে কাৎ করেছেন। আপনি যে এতদিন আমায় কেন চিঠি দেননি তা নিয়ে কোনও কথা নেই—এখন সব দোষ আমার ঘাড়ে।

আপনি এ. আই. সি. সি. থেকে আহ্বানের কথা বলেছেন। কিন্তু সে আহ্বান আসবে না। অন্তত এ বছর তো নয়ই। কিন্তু সে যাই হোক, আমি দেশে ফিরতে চাই এবং যত শীঘ্র সম্ভব। বিদেশ বাসে কোনও আনন্দ নেই, যখন আমার সমস্ত মন পড়ে আছে অন্যত্র। আমি স্বীকার করি, বিদেশেও কাজ করা যায়, এবং আমিও আলস্যে সময় কাটাইনি। কিন্তু কাজের কাজ করতে গেলে চাই কিছু অর্থ এবং দেশ থেকে প্রচুর নৈতিক সমর্থন। ওই দু'য়ের কোনওটাই আমার নেই। একা হাতে এবং আর্থিক সংস্থান ছাড়া যত কিছু করা সম্ভব, তার যে একটা সীমা আছে, সে তো স্পষ্টই বোঝা যায়।

বঙ্গদেশের সমস্যাটা কী আমায় বলতে পারেন? আমি সত্যিই বুঝতে পারি না। তুচ্ছ খুঁটি-নাটি কলহ-বিবাদ করতে লোকের লজ্জা লাগে না, করে-করে ক্লান্ত লাগে না? তারা যদি এমন কিছু নিয়ে ঝগড়া করত যার কোনও গুরুত্ব আছে, আমি বুঝতাম, কিন্তু এত তুচ্ছ সব বিষয় নিয়ে! আর, যারা সাধারণ মানুষ, যারা অত ঘোর-প্যাঁচ বোঝে না, তাদের কী হল? তারা কেন উঠে দাঁড়ায় না তাদের এইসব তথাকথিত মুখপাত্র, প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে? শৃঙ্খলা বলতে কিছু আর অবশিষ্ট নেই, শৃঙ্খলা মেনে চলবার ক্ষমতাও আর নেই। আবার একবার একদম শুরু থেকে আরম্ভ করতে হবে।

'টাইমস অব লন্ডন' পত্রিকা কয়েক দিন আগে খবর দিয়েছে মি. এ. কে. ফজলুল হক এবং অন্য মুসলিম কাউন্সিলাররা মুসলমানদের চাকরি দেওয়া নিয়ে পদত্যাগ করেছেন। এ-সব খবর বিদেশে আসতে দেরি হয় না।

আমি 'দি ইনসাইড অব বেঙ্গল পলিটিক্স' নামে একটি প্রবন্ধ 'অ্যাডভান্স' পত্রিকায় পাঠিয়েছিলাম। আপনি দেখেছেন?

কবে আবার আমি বঙ্গদেশে আমার রাজনৈতিক কাজকর্ম আরম্ভ করতে পারব, জানি না। কিন্তু যখন করব, বঙ্গদেশের ঐক্যবদ্ধ, কিংবা কার্যত ঐক্যবদ্ধ সমর্থন আমার চাই। যদি এই শর্ত না মানা হয় তা হলে আমি বাংলাদেশের রাজনীতি স্পর্শ করব না। একটি গোষ্ঠীর নেতা হবার আমার কোনও বাসনা নেই। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে একটি শিক্ষাই লাভ করেছি—ধৈর্য্য। আমার অসীম ধৈর্য্য এবং অশুভ শক্তিগুলো কাজ করে-করে যতদিন না নিজেদের শক্তি নিঃশেষ করে ফেলবে, অবসন্ন হয়ে পড়বে, তত দিন আমি অপেক্ষা করে থাকব। তত দিন আমি ঠিক যাকে রাজনীতি বলে তার বাইরে অনেক কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারি।

আপনি কী ভাবছেন, কী করবেন মনে করছেন?

প্রার্থনা করি, নতুন বছর আমাদের জন্য সৌভাগ্য নিয়ে আসুক।

মিশরীয়রা এখন জেগে উঠেছে, সময় থাকতে-থাকতে তারা আঘাত করছে। কিন্তু আমরা

কোথায়? চরকা, হরিজন, পার্লামেন্টারি বোর্ড, মন্ত্রকের গদি—মুক্তি কি ওই পথেই আসবে?

সুস্থির বাবু এবং ড. সুধীর বসু কোথায় আছেন, কেমন আছেন? আপনার ছেলেরা কী করছে?

শ্রদ্ধা সহকারে

আপনার
সুভাষ সি. বোস।

ভি. লেসনি-কে

পেনসন কসমোপোলাইট
আলসারস্ট্রাসে ২৩
ভিয়েনা VIII
৯ জানুয়ারি, ১৯৩৬

প্রিয় অধ্যাপক লেসনি,

আমি দিন কয়েক আগে যে চিঠি দিয়েছি, আশা করি আপনি পেয়েছেন, এবং ইন্দো-চেকোস্লোভাক সোসাইটির সম্পর্কে বইয়ের প্যাকেটটিও পেয়েছেন। গত কাল এখানে ভিয়েনাতে আমাদের ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জুবিলি উৎসব খুব সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মি. নাম্বিয়ার সম্ভবত আপনাকে সংবাদপত্রে প্রদত্ত আমার একটি বিবৃতি দেখিয়েছেন, যাতে আমি বলেছি চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক ভারসাম্য থাকা দরকার এবং সে উদ্দেশ্যে ভারতের উচিত জার্মানির কাছ থেকে কম দ্রব্য ক্রয় করে চেকোস্লোভাকিয়া থেকে বেশি ক্রয় করা। এই বিবৃতি নিয়ে তর্ক উঠেছে এবং সংখ্যা দিয়ে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে যে চেকোস্লোভাকিয়া থেকে ভারত আগে থেকেই যথেষ্ট ক্রয় করে থাকে। আমি প্রাগের এক্সপোর্ট ইনস্টিটিউটকে (মি. প্লোসকাল) দিয়ে বলেছি—আমদানি-রপ্তানির এখনকার হিসাবটা আমাকে পাঠাতে। উত্তর পেলে একটি মুখের মতো জবাব আমি ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্যে পাঠাব। আমি শীঘ্রই ভিয়েনা ত্যাগ করছি। ১৪ তারিখ সকালে আমাকে বার্লিনে পৌঁছতে হবে। বার্লিন থেকে আমি বেলজিয়াম এবং প্যারিসে যাব এবং আশা করি তার পরে ফেব্রুয়ারি মাসে ভারত যাত্রা করব। দেশে ফিরবার আগে আমার প্রেসিডেন্ট বেনেস-এর সঙ্গে একবার দেখা করার খুব ইচ্ছে। আপনার হয়তো মনে থাকতে পারে, ১৯৩৩ সালে যখন আমি প্রথম প্রাহা যাই তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করবার আমার সুযোগ হয়েছিল। তখন তিনি ছিলেন বিদেশমন্ত্রী। ১৩ তারিখ তাঁর সঙ্গে যদি আমার দেখা করার ব্যবস্থা করতে পারেন, আমি বাধিত হব। আপনাকে এত কম সময় দেওয়ার জন্যে আমি দুঃখিত। তবে, আমি আশা করি আমার বিশেষ অবস্থার কথা বিবেচনা করে, আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন এবং আমার জন্য একটি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে পারবেন। ১৩ তারিখ সোমবার যে-কোনও সময় হলেই আমার চলবে। দেখা করার ব্যবস্থা যদি করতে পারেন, দয়া করে আমাকে টেলিগ্রাম করে দিন।

শ্রদ্ধা সহকারে,

আপনার
সুভাষ সি. বোস।

ই. উডস-কে

C/o American Express Company
Kaerntnerring 14
Vienna - 1
৯ জানুয়ারি ১৯৩৬

প্রিয় মিসেস উডস,

আপনার এ মাসের ৬ তারিখের চিঠির জন্য অশেষ ধন্যবাদ। আমার আয়ারল্যাণ্ড যাওয়ার কোনও ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত হয়নি। এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করবেন এই আশায় আমি আপনার দিকে তাকিয়ে আছি। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে আমার ভারত রওনা হওয়ার ইচ্ছা। কাজেই, আমাকে আয়ারল্যান্ড যেতে হবে ২০ জানুয়ারি থেকে ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কোনও একটা সময়। কোন সময়টা আমার আয়ারল্যান্ড যাওয়ার পক্ষে সবচাইতে ভাল, দয়া করে আপনি সে-বিষয়ে আমাকে পরামর্শ দিন। এক সপ্তাহ কি দশ দিন আমি ওখানে কাটাতে পারি। দয়া করে প্রেসিডেন্ট ডি ভ্যালেরা, দলের নেতৃবৃন্দ, লর্ড মেয়র ইত্যাদির সঙ্গে আমার সাক্ষাতের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে দেবেন। জনসভার জন্য আপনি যেমন ভাল বুঝবেন ব্যবস্থা করতে পারেন। জনসভায় বক্তৃতা করতে আমার নিজের দিক থেকে কোনও আপত্তি নেই। কিছু দিন আগে ভারতের বিভিন্ন সংবাদপত্রে একটা খবর বেরিয়েছিল, যে ডাবলিনের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি আমাকে একটি সাম্মানিক উপাধি প্রদান করতে চায়। এ খবর কোথা থেকে বেরোল এবং সত্য কি না আমি জানি না। তবে, আপনি বোধ হয় খোঁজ করলে জানতে পারবেন।

নববর্ষের শুভেচ্ছা এবং শ্রদ্ধা সহকারে।

আপনার
সুভাষ সি. বোস

পুঃ আমি দিন কয়েকের মধ্যে বার্লিন যাচ্ছি, তাই আমাকে এই ঠিকানায় চিঠি দেবেন: C/o American Express Company, Unter den Linden, Berlin.
এস. সি. বি.

সন্তোষকুমার সেন-কে[১]
[মূল বাংলায়]

C/o, Mon, N, D. Javeri
Antwerp, Belgium
(address illegible)
২২. ১. ৩৬

প্রিয় ডা. সেন

আমি ১৯ জানুয়ারি এখানে পৌঁছেছি। এসেছি প্রাগ ও বার্লিন হয়ে, আরও কয়েকদিন এখানে থেকে প্যারিস রওনা হব। ৩০ তারিখে প্যারিস থেকে আয়ারল্যান্ডের জন্য জাহাজে উঠব। Pension Cosmopolite-কে টেলিফোন করে দয়া করে বলে দেবেন আমার চিঠি পত্র যেন এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়। আমি তাদেরকে বলেছি ১৮ জানুয়ারি পর্যন্তই যেন আমার চিঠিপত্র এখানে পাঠায়, এবং তারপর প্যারিসে পাঠায়।

Dr. Trâunuallner-এর সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়েছিল? তিনি কি এখনও বাংলা শিখতে আগ্রহী?

আপনি যদি দয়া করে কংগ্রেসের জুবিলি সম্পর্কে প্রকাশিত বিবরণ বুক-পোস্টে মি. নাম্বিয়ারের কাছে পাঠিয়ে দেন, খুব ভাল হয়। একই সঙ্গে আপনি তাঁকে একটা পোস্টকার্ড পাঠিয়ে লিখবেন যে আপনি ওটা আমার অনুরোধে পাঠিয়েছেন, এবং সব কাগজ-পত্র, তাঁর পড়া হয়ে গেলে তিনি যেন আমার কাছে ফেরৎ পাঠান। তাঁর ঠিকানা :

Mr. A. C. N. Nambiar
Prag X111
Cestmirova, 863/V. C. S. R

আমার এক ভারতীয় বন্ধু কিছু instrument চান। তিনি আমাকে যে-চিঠি দিয়েছেন সেটি আমি এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। সে-সব instrument কিনে তাঁর কাছে পাঠাতে পারবেন? গায়রোলা জানেন ও-সব কার কাছে পাওয়া যাবে। তাঁর নাম বোধহয় ব্র্যানডেনবার্গ। কয়েকমাস আগে আমি কিছু instrument গায়রোলা-র সাহায্যে তাঁকে পাঠিয়েছিলাম। আপনি গায়রোলাকে জিজ্ঞাসা করে সেই একই ব্যক্তির হাতে সে-সব instrument রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠাতে পারেন।

টাকাটা আমিই আপনাকে পাঠিয়ে দিতে পারি, কিংবা আমার বন্ধু দেশ থেকে টাকাটা আপনাকে পাঠাতে পারেন। অর্ডারটা যদি সেখানে দেন, ব্র্যানডেনবার্গ সে-সব প্যাক করে পাঠাতে পারেন। আমার বন্ধুর নাম-ঠিকানা:

Dr. S. N. Kaul M. B. B. S.
109 Hewett Road
Allahabad

আমি আশা করি আপনি মাঝে-মাঝে মি. ফ্যালটিস-এর কাছে যাবেন। আপনার সহায়তা পেলে তিনি নিশ্চয়ই উৎসাহিত হবেন। মি. মাথুর যদি এখন কিছুদিন ভিয়েনায় থাকেন, তাঁকে দিয়ে মি. ফ্যালটিস-এর সহায়তা হতে পারে। আমার মনে হয়, ভাল হবে যদি ভারত সম্পর্কে

*এই পত্রটি বাংলায় লিখিত ছিল। মূল বাংলা পত্র এখন আর পাওয়া গেল না বলে ইংরাজি অনুবাদ থেকে বাংলায় পুনরনূদিত হল।

সাংস্কৃতিক বিষয়ে মি. ফ্যালটিস কে দিয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা যায়। দয়া করে এইভাবে এগোবার চেষ্টা করুন। আশা করি আপনি ভাল আছেন, সামনের সোমবার আমি এখান থেকে প্যারিস যাচ্ছি। আমার ঠিকানা হবে: C/o American Express Co. Rue Scribe II Paris (IX e).

আপনার
সুভাষচন্দ্র বোস

সন্তোষকুমার সেন-কে

C/o N. D. Javeri
14 Avenue Van deu West
Antwerp
(Belgium)
২৩/১/৩৬

প্রিয় ড. সেন,

ড. কাউলের পত্রটি গতকাল আপনার কাছে পাঠাতে ভুলে গিয়েছিলাম—তাই আজ পাঠাচ্ছি। আপনি যদি ব্র্যান্ডেনবার্গকে বলেন তা হলে তিনি জিনিসগুলো বোম্বাই পাঠিয়ে দেবেন। আপনাকে শুধু যন্ত্রগুলো পছন্দ করে দিতে হবে। আপনি বলবেন, জিনিসগুলো যেন রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠানো হয়। দয়া করে গায়রোলাকে বলবেন তিনি যেন আপনাকে ব্র্যান্ডেনবার্গের সঙ্গে পরিচয় করে দেন। আমার যতদূর মনে হচ্ছে ওঁর নাম ব্র্যান্ডেনবার্গ।

আপনি কি অনুগ্রহ করে আমার আরেকটি কাজ করে দেবেন? দয়া করে কোনও পরিবহন সংস্থার কাছে জেনে নেবেন কি, সামান্য কিছু জিনিসপত্র ভিয়েনা থেকে ট্রিয়েস্টে পাঠাতে কীরকম খরচ হবে? আমার জাহাজ ট্রিয়েস্টে থেকে ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে যাত্রা করবে। তাই আমরা কোনও মালগাড়িতে করে জিনিসগুলো পাঠাতে পারি। যাই হোক, মালগাড়ি বা সাধারণ যাত্রীবাহী গাড়ি—দুটির ভাড়াই আপনি দয়া করে জেনে রাখবেন। আমার জিনিসপত্রগুলো নিয়ে সোজা ট্রিয়েস্টে ভিক্টোরিয়া জাহাজে তুলে দিতে হবে। লয়েড ট্রিয়েসটিনো এ ধরনের মাল পরিবহন করে কিনা জিজ্ঞেস করতে পারেন। না হলে মিসেস ভেটার-এর পরামর্শও আপনি গ্রহণ করতে পারেন।

আমি এখানে ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত থাকছি। ওইদিনই আমি প্যারিস যাত্রা করব এবং ৩০ তারিখ হ্যাভার থেকে ডাবলিন গামী জাহাজে উঠব। ২৭ জানুয়ারির পর থেকে আমার ঠিকানা হবে—

C/o American Express Company
11 Rue Scribe
Paris IXe

১৩ তারিখ ডাবলিন থেকে প্যারিসে ফিরব। আপনার সর্বাঙ্গীন কুশল কামনা করি।

আপনার অনুগত
সুভাষচন্দ্র বোস

ই. উডস-কে

C/o N. D. Javeri
14 Avenue van den Nest
Antwerp
২৩.১.৩৬

প্রিয় মিসেস উডস,

আমার বার্লিন থেকে লেখা চিঠি আপনি এর মধ্যে নিশ্চয় পেয়েছেন। যে জাহাজটি (এস. এস. ওয়াশিংটন) হ্যাভার থেকে ৩০ তারিখে ছেড়ে কোভ-এ ৩১ জানুয়ারি পৌঁছয় তাতে আমি বার্থ রিজার্ভ করেছি। আয়ারল্যান্ডে আমি কত দিন থাকব সেটা নির্ভর করবে সেখানে আমার কর্মসূচির ওপর। ফিরবার জন্য দুটি জাহাজ আছে, একটি কোভ ছাড়ে ৪ ফেব্রুয়ারি এবং আরেকটি ১২ ফেব্রুয়ারি। এ দুটোর যে কোনওটিই আমি ধরতে পারি, তবে আমাকে অন্তত ১২ ফেব্রুয়ারির জাহাজটা ধরতেই হবে। মধ্যে ফিরতেই হবে। ২৬ তারিখ পর্যন্ত আমি এখানে আছি। ২৭ তারিখে আমি প্যারিস যাচ্ছি। সেখানে আমার ঠিকানা:

C/o American Express Company
11 Rue Scribe
Paris IXe

আপনার ১৫ তারিখের চিঠি আমি বার্লিনে থাকতে পেয়েছিলাম। শ্রদ্ধা নেবেন।

আপনার
সুভাষ সি. বোস

এখানে আমার টেলিগ্রাফের ঠিকানা: Care Dahyabhai, Antwerp.

প্যারিসে আমার টেলিগ্রাফের ঠিকানা: Care Amexco 96, Paris

নাওমি সি. ভেটার-কে

Antwerp
২৪.১.৩৬
শুক্রবার

Frau N. C. Vetter
Wien - IX
Wahringer Str. 41
(Autriche)

প্রিয় মিসেস ভেটার,

আপনার কার্ড আজ সকালে পেয়েছি। অনেক ধন্যবাদ। আপনার চিঠিও (২ খানি) বার্লিনে পেয়েছিলাম। আমি এখনও ছুটে চলেছি। আজ আমরা গাড়িতে স্পা-এ যাচ্ছি যাওয়ার পথে

ওয়াটারলু এবং অন্যান্য জায়গা দেখব। কাল ফিরে আসব এবং রবিবার আমি প্যারিস রওনা হব। এখানে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের একটি ছোট বসতি আছে। তাঁরা আমার প্রতি অত্যন্ত সদয়। আমি আলাদা প্যাকেটে Antwerp-এর একটি সংবাদপত্র পাঠাচ্ছি। তাতে এখানে দেওয়া আমার একটি সাক্ষাৎকার আছে। প্যারিসে আমার ঠিকানা:

C/o American Express Co.
11 Rue Seribe
Paris IXe

৩০ তারিখ আমি হ্যাভার থেকে আয়ারল্যান্ড রওনা হচ্ছি। সেখান থেকে আবার প্যারিসে ফিরে আসব। ২৮ ফেব্রুয়ারি আমি প্যারিস ও জেনোয়া হয়ে ভারত অভিমুখে যাত্রা করব। কার্ডে লিখছি বলে কিছু মনে করবেন না, শ্রদ্ধা নেবেন।

আপনার
সুভাষ সি. বোস।

ই. উডস-কে[১]

হোটেল অ্যামবাসেডর
১৬ বুলেভার্দ হাউসমান
প্যারিস 9c
২৬.১. ৩৬

প্রিয় মিসেস উডস,

আপনার ২০ জানুয়ারির চিঠি এবং তার সঙ্গে যা পাঠিয়েছেন তার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আজ আমি Antwerp থেকে প্যারিস পৌঁছেছি। Antwerp থেকে পাঠানো আমার চিঠি আপনি আশা করি পেয়েছেন।

আপনাকে আগেই জানিয়েছি, ৩০ জানুয়ারি আমি হ্যাভার থেকে রওনা হচ্ছি—সেখান থেকে আমায় ডাবলিনের ট্রেন ধরতে হবে। কোভ-এ আমি যখন পৌঁছব, আপনার কাছ থেকে কিছু বার্তা পেলে খুশি হব। কিংবা আপনার পক্ষ থেকে কোনও বন্ধু কোভ-এ আমার সঙ্গে দেখা করতে পারেন।

ডাবলিন হোটেলে আমি কোনও ঘর বুক করিনি। বোধ হয় আমি 'শেলবোর্ন'-এ থাকব। যদি সেখানে ঘর বুক করার দরকার হয়, দয়া করে করবেন।

---

১. এই চিঠির শেষাংশ পাওয়া যায়নি।

নাওমি সি. ভেটার-কে

হোটেল অ্যামবাসেডর
বুলেভার্দ হাউসমান
প্যারিস (9e)
২৭.১.৩৬

Frau N. C. Vetter
Wien - IX
Wahringer Str. 41
(Autriche)

প্রিয় মিসেস ভেটার,

আবার পোস্ট কার্ডে লিখছি, সে জন্য কিছু মনে করবেন না। প্যারিসে পাঠানো আপনার দু'খানি চিঠি সদ্য পেয়েছি। অনেক ধন্যবাদ। আমি গতকাল এখানে এসেছি এবং ৩০ জানুয়ারি হ্যাভার থেকে স্টিমারে ডাবলিন রওনা হব। সেখানে হোটেলে থাকব। ওপরের ঠিকানায় চিঠি দেবেন।

আপনার
সুভাষ সি. বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

ইউনাইটেড স্টেট লাইনস
এস. এস. ওয়াশিংটন-জাহাজে
(হ্যাভারের কাছে, ফ্রান্স)
৩০.১. ৩৬

প্রিয় মিসেস ভেটার,

সাময়িকভাবে বন্ধুদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমি এখন বসে লেখার সময় পাচ্ছি। প্রথমেই বলে রাখি, ভিয়েনা ছাড়বার পর আপনাকে দীর্ঘ পত্র লিখিনি বলে আপনি কিছু মনে করবেন না। দোষটা পুরোপুরি আমার নয়। যখন একলা হতাম, বড় ক্লান্ত লাগত; যখন লিখবার মতো অবস্থায় থাকতাম, আমার সঙ্গে লোক থাকত।

প্রথমে, প্রাগ। বি.-এর সঙ্গে আমার বেশ ভাল কথাবার্তা হয়েছে। তিনি খুব ব্যস্ত ছিলেন, তবু আমার সঙ্গে দেখা করেছেন। প্রতীক্ষা করবার ঘরে দেখলাম আমার আগে আছেন ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত, আর আমার পরে অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রদূত। সেই রাত্রেই আমি বার্লিন রওনা হই।

বার্লিনে দেখলাম অর্থনৈতিক অবস্থা গত বছরের চেয়ে অনেক খারাপ। আরও যেটা লক্ষণীয়, লোকে এখন সরকারের সমালোচনা করছে, আগে যা করবার সাহস ছিল না। গৃহিণীরা

(The Haus-Frau) দেখলাম একটি বিক্ষুব্ধ শ্রেণী, কেননা মাখন, ডিম ইত্যাদি দুর্লভ। এবং এই মহিলাদের জেলে পোরা সরকারের পক্ষে অত সহজ নয়। বাহ্যত, সব কিছু মনে হয় বেশ শান্ত। ১৯৩৩ এবং ১৯৩৪-এও যে রকম ঝটিকা বাহিনীর কুচকাওয়াজ দেখেছিলাম, এবার তা দেখলাম না। কারণ, অবশ্য, সামরিক ব্যাপারটা রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা কর্তৃপক্ষ (Reichswehr) নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছে। তা হলেও আমি অনেককেই বলতে শুনেছি যে সাধারণ মানুষ শান্তি চায়, কারণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি খারাপ। জার্মানি এখন অতিমাত্রায় ব্রিটেনের পক্ষে। বার্লিনে এখন ভারতীয়দের একটা অঞ্চল আছে। তাঁদের সঙ্গে আমাদের একটা বৈঠকও হয়েছিল। ১ ফেব্রুয়ারি তাঁরা কংগ্রেসের জয়ন্তী উৎসব করবেন।

বার্লিন থেকে আমি কোলোন এবং ব্রাসেলস গিয়েছিলাম। সেখান থেকে Antwerp। Antwerp-এ ভারতীয় ব্যবসায়ীদের একটা কলোনি আছে। তাঁরা হিরে-জহরতের কারবার করেন। আমার সঙ্গে তাঁরা খুব ভাল ব্যবহার করেছেন। আমি তাঁদের অতিথি হয়েছিলাম। আমরা ব্রাসেলস, স্পা, ওয়াটারলু এবং তার আশেপাশে কিছু-কিছু দ্রষ্টব্যস্থান দেখতে গিয়েছিলাম। Antwerp-এর "Le Matin" পত্রিকায় আমার একটি সাক্ষাৎকার বেরিয়েছিল। আমি তার একটি কাটিং আপনাকে পাঠিয়েছি।

প্যারিসে আমার হাতে সময় বিশেষ ছিল না, তবু আমি কিছু-কিছু আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে দেখা করতে পেরেছিলাম। যেমন আঁদ্রে জিদ, Felicein Challeye (শান্তিবাদী নেতা), ড. ডেনেরি (বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের), মাদাম দ্রেভেত (জেনেভার উইমেনস ইন্টারন্যাশনাল লিগ-এর প্রাক্তন সভাপতি), Mme Duchene (বামপন্থী নেত্রী), প্রমুখ। এক পক্ষকাল পরে প্যারিসে ফিরে আমি আরও কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করব। ওঁরা আমার জন্য দুটি সম্মেলনের ব্যবস্থা করছেন, সেই সব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে যাঁরা ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল হবেন বলে মনে করা যায়। Mon. Basch-কে আমি যখন টেলিফোন করি তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। Mon. Guernut এখন একজন মন্ত্রী, তাঁর সঙ্গে দেখা করা যাবে কি না সন্দেহ। Mon. Blum এখন নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত তবে প্যারিসে ফিরে তাঁর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করব। আশা করছি ১৪ ফেব্রুয়ারি প্যারিসে ফিরে আসব। এসে এক সপ্তাহ থাকব।

চিঠির ওপরে আমার ঠিকানা থেকে বুঝবেন, আমি এখন হ্যাভার-এ জাহাজে আছি। আগামীকাল বিকালে কিংবা সন্ধ্যায় আইরিশ বন্দর কর্ক-এ পৌঁছব। পরের দিন সকালে ডাবলিন-এর ট্রেন ধরব। ডাবলিন পররাষ্ট্র দপ্তর আমাকে সরকারিভাবে জানিয়েছে প্রেসিডেন্ট ডি ভ্যালেরা আমি পৌঁছনো মাত্র আমাকে সাক্ষাৎ প্রদান করবেন এবং ওখানে পৌঁছিয়ে আমি প্রেসিডেন্ট-এর সঙ্গেই প্রথমে দেখা করব।

আমার ভারত যাত্রা মুলতুবি হয়ে গেল, কেননা ভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন মার্চে না হয়ে এপ্রিলে হবে। তাই আমি ভাবছি, প্যারিস এবং জেনেভাতে আমার কাজ শেষ হলে আমি ব্যাডগাসটেন-এ আমার রোগের নিরাময়ের জন্যে যাব। কংগ্রেসের অধিবেশন যদি মার্চ মাসে বসত, আমি ইতালি থেকে 'লয়েড ট্রিয়েসটিনো' জাহাজে যাত্রা করতাম, কিন্তু এখন দেখছি আমাকে মার্সেই থেকে পি অ্যান্ড ও-র জাহাজ ধরতে হবে। অতএব, আমার মনে হয় না আবার ভিয়েনা যেতে পারব।

আপনার সব চিঠিই আমি পেয়েছি, আপনার ১৩ ও ১৪ জানুয়ারির চিঠি ২০ জানুয়ারির দুটি পোস্টকার্ড এবং ২৩ জানুয়ারির দুটি চিঠি।

আপনার চিঠিগুলো আমি বারবার পাঠ করেছি, আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহের জন্য কীভাবে ধন্যবাদ জানাব জানি না। অনেকে ভাবেন আমি গত তিন বছরে ভিয়েনায় এত সময় ব্যয় করেছি কেন। আমি তাতে অবাক হবার কিছু দেখি না।

আমি যেখানেই গেছি আবহাওয়া দেখেছি বেশ উষ্ণ, বিশেষত এখন এই জানুয়ারি মাসের পক্ষে, প্যারিসে তো দেখলাম রীতিমতো গরম, আমার ভারী ওভারকোট পরে রাস্তায় যখন হেঁটে যেতে হত, প্রচুর ঘাম হত।

হ্যাঁ, বার্লিনে পাঠানো দুটো চিঠিই আমি পেয়েছি, আপনার দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই।

ভারতে যাবার জন্য জাহাজে আমার বার্থ এখনও রিজার্ভ করিনি। লয়েড ট্রিয়েসটিনো জাহাজ, ২৮ ফেব্রুয়ারি যার যাত্রার তারিখ, তাতে আমার রিজার্ভেশন এখন ক্যানসেল করতে হবে এবং আমাকে যেতে হবে ব্রিটিশ জাহাজে, যেটা আমার পছন্দ নয়। কিন্তু তা ছাড়া উপায় নেই, কেননা অন্য কোনও কোম্পানির জাহাজের যাত্রার সময় আমার প্রয়োজনের সঙ্গে মিলছে না।

ফ্রান্সের রাজনীতি এখন একটা কৌতূহলজনক অবস্থায়। বাম এবং দক্ষিণ, এই দুই পন্থার দলগুলিই এখন প্রবল। আগামী নির্বাচনে সম্ভবত বামপন্থীদের শক্তি বাড়বে তবে বেশি নয়। দক্ষিণপন্থী দলগুলির মধ্যে কোনও কোনওটি ব্রিটিশ-বিরোধী, কিন্তু বামপন্থী দলগুলো ব্রিটেনের সমর্থক, ব্রিটিশ শ্রমিক দলের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য।

প্যারিসের সম্পর্কে বলি, ডাবলিন থেকে ফিরে সেখানে এক সপ্তাহ থাকার পরে, আমি আপনাকে আরও কিছু লিখতে পারব। ভিয়েনার মতো, প্যারিসও আমার মনে হল, প্রয়াত রাজা জর্জের শোকে পাষাণ।

প্যারিসে একজন ভদ্রলোককে আমি দেখেছিলাম, লিগ অব্ হিউম্যান রাইটস্-এর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। তিনি ব্যবস্থা করবেন, যাতে আমি প্যারিসে ফিরে লিগের প্রধান ব্যক্তিদের (তাদের মধ্যে এক জন Mon. Basch) সঙ্গে দেখা করতে পারি।

সেট ওয়াটসন-এর বিষয়ে আমি আরও জানতে চাই। তিনি কি চেকদের পক্ষপাতী? আমার মনে হয়, একজন চেক-পক্ষপাতী ব্রিটিশ সাংবাদিক আছেন, যিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন, তিনি কী কী বই লিখেছেন?

আমি আশা করি, ড. ভেটারের ভাষণ মডার্ন রিভিউ অবিলম্বে প্রকাশ করবে। ভাষণটি ছাপা হলে রিভিউয়ের একটি কপি আপনার ঠিকানায় পাঠাতে লিখেছি। ভিয়েনায় কংগ্রেসের জয়ন্তী উৎসবের সময়ে ড. ভেটারের ভাষণ সহানুভূতি, মর্যাদা ও পাণ্ডিত্যে পূর্ণ। চা-পার্টিতে (Hartman's-এ) তাঁর বক্তৃতা পূর্ণ বেদনাবোধে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী।

আবহাওয়া এখন কেমন? ভিয়েনার বাইরে সবজায়গায় আবহাওয়া মোটামুটি ভালই চলছে। আপনারা দু'জনেই আমার শ্রদ্ধা জানবেন,

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস

পুঃ আমার হাতের লেখা এক-এক সময়ে এত খারাপ হয় যে আশঙ্কা হয় আপনি পড়তে পারবেন কি না।

অমিয় চক্রবর্তী-কে

ডাবলিন
৮.২.৩৬

প্রিয় অমিয়,

তোমার ৭ তারিখের চিঠি আজ পেলাম। আমি প্যারিসে পৌঁছব ১৪ তারিখে, তারপর ৫-৭ দিন সেখানে কাটিয়ে জেনেভা চলে যাব। আমার ঠিকানা: Hotel Ambassador, Boulevard, Hausmann, Paris 9

সেখানে আমার কয়েকজন বন্ধু আমার জন্য কয়েকটি দেখাসাক্ষাতের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তার বিশদ বিবরণ আমি জানি না। প্যারিসে পৌঁছে সব কিছু জানতে পারব। আমার মনে হয় তুমিও যদি একই হোটেলে থাক, ভাল হয়। কিছু আলোচনার জন্য সময় আমি করে নিতে পারব।

এখন আর বেশি কিছু লিখব না। দেখা হলে সব কথা হবে।

তোমার
সুভাষচন্দ্র বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

হোটেল অ্যামবাসেডর
১৬, বুলেভার্ড হাউসমান
প্যারিস
২৬.২.৩৬

প্রিয় মিসেস ভেটার,

এত দিন আপনাকে চিঠি না লেখার জন্য মার্জনা করবেন। আমি আয়ারল্যান্ডে এবং তারপর প্যারিসে খুবই ব্যস্ত ছিলাম। আয়ারল্যান্ডের কাগজ থেকে কোনও কাটিং কি আপনি পেয়েছেন?

আমি আজ প্যারিস থেকে ব্যাডগাসটেন রওনা হচ্ছি । সেখানে পৌঁছব ২৯ তারিখে। ব্যাডগাসটেন যাবার পথে আমি লুসান-এ মি. নেহরুর সঙ্গে আর Villeneuve-এ মঁসিয়ে রোমাঁ রলাঁ-এর সঙ্গে দেখা করে যাব।

দীর্ঘ চিঠি বোধ হয় ব্যাডগাসটেন-এ স্থির হয়ে বসার আগে লিখতে পারব না। সেখানে আমি থাকব Kurhaus Hochland-এ।

Mr. Victor Basch এবং শিক্ষামন্ত্রী Mr. Guernut-এর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। আপনি যে পরিচয়পত্র দিয়ে দিয়েছিলেন, তার জন্য অনেক ধন্যবাদ।

আপনি ও ড. ভেটার আমার শ্রদ্ধা জানবেন,

আপনার
সুভাষ সি. বোস

পুঃ আমি ২০ মার্চ ভারতে যাবার জাহাজ ধরছি।
এস. সি. বি.

সন্তোষকুমার সেন-কে[১]
[মূল বাংলায়]

Kurhaus Hochland
Badgastein
৩. ৩. ৩৬

প্রিয় ডা. সেন,

আজ ভোরে আমি এখানে পৌঁছেছি। প্রায় দেড়মাস পরে আমি এখন একটু শান্তি উপভোগ করছি। গত দেড়মাস যেন আমার ঝড়ের মধ্যে কাটল। আরও একবার অস্ট্রিয়ায় ফিরে গিয়েছিলাম, প্রাগ, বার্লিন, ব্রাসেলস, প্যারিস, আয়ারল্যান্ড, তারপরে আবার প্যারিস, লুসান ইত্যাদি হয়ে।

এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর, ঠিক হিমালয়ের মতো। চারিদিকে তুষার এবং পর্বতশ্রেণী দাঁড়িয়ে আছে, অটল, অনড়।

বর্তমানে আমার ইচ্ছে ২০ তারিখে মার্সাই থেকে স্বদেশযাত্রা করব। আমি আশা করছি রওনা হওয়ার আগে আপনার টাকা অর্ধেক ফেরৎ দেব। এখনও পর্যন্ত দেশ থেকে যথেষ্ট পরিমাণ টাকা পাইনি, সেইজন্য আপনাকে কোনও টাকা দিতে পারিনি।

এই সঙ্গে ২২ পাউণ্ডের একটি চেক পাঠাচ্ছি। আপনি যদি চেকটি ওখানে ভাঙিয়ে আমাকে টাকাটা পাঠিয়ে দেন খুব ভাল হয়। আপনি বোধহয় জানেন, আমেরিকার মধ্যে রেজিস্টার্ড চিঠি কিংবা চেক পাঠানোর কোনও বিধি-নিষেধ নেই। চেকটা ভাঙিয়ে আপনি টাকাটা আমাকে মনি অর্ডারে কিংবা রেজিস্টার্ড চিঠিতে পাঠাতে পারেন। তবে আমার মনে হয় রেজিস্টার্ড চিঠিতে পাঠানোর খরচই কম পড়বে। দেখবেন যেন রেজিস্টার্ড চিঠিটি খুব ভাল করে সিল করা হয়। খুচরো থাকলে ডাকটিকিট কিনে পাঠাতে পারেন। এর বেশি লিখবার দরকার নেই। টাকাটা তাড়াতাড়ি এবং সাবধানে পাঠাবেন।

আশা করি আপনি ভাল আছেন। আমি অবসন্ন বোধ করছি।

আপনার
সুভাষচন্দ্র বোস

পুঃ আপনার ২৭ জানুয়ারির চিঠি আমি অনেকদিন হল পেয়েছি।

জওহরলাল নেহরু-কে

Kurhaus Hochland
Badgastein (Autriche)
৪ মার্চ ১৯৩৬

প্রিয় জওহর,

দীর্ঘ যাত্রায় পরিশ্রান্ত হয়ে আমি গতকাল এখানে পৌঁছেছি। এ জায়গাটি বড় সুন্দর ও শান্ত। তুমি যদি ঝড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে ইউরোপে একটু বিশ্রাম করতে পারতে ভাল হত।

---

১. এই পত্রটি বাংলায় লিখিত ছিল। মূল বাংলা পত্র এখন আর পাওয়া গেল না বলে ইংরাজি অনুবাদ থেকে পুনরনূদিত হল।

তোমার কাছ থেকে চলে আসার পর আমি ভাবছি, আমি তোমাকে যে-রকম বলেছিলাম সেই ধরনের কোনও বিবৃতি সত্যিই আমার প্রকাশ করা উচিত কি না। আমার মনে হয় উচিত, কারণ আমাকে আবার জেলে যেতে হতে পারে এমন সম্ভাবনা আছে এবং এমন কেউ-কেউ থাকতে পারেন, যাঁরা আমার প্রস্তাব-পরামর্শ জানতে চাইবেন। আমার বক্তব্য আমি যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত রাখব এবং স্পষ্ট জানাব আমি তোমাকে আমার পূর্ণ সমর্থন দেব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

আজকের কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতাদের মধ্যে একমাত্র তোমার ওপরেই আমরা এ ভরসা করতে পারি যে কংগ্রেসকে প্রগতির পথে নিয়ে যাবে। তা ছাড়া, তোমার অবস্থান সব দিক দিয়েই অনন্য এবং আমার মনে হয়, এমনকী মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত তোমার মতামত যতখানি গ্রহণ করবেন তত আর কারও নয়। আমার আন্তরিক আশা, সাধারণ মানুষের চোখে তোমার যা প্রতিষ্ঠা, তুমি তার সদ্ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। তোমার যে প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতা তাকে খাটো করে দেখো না। গান্ধীজি এমন মতামত কখনওই প্রকাশ করবেন না যাতে তোমাদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়।

আমাদের সর্বশেষ কথাবার্তার সময়ে আমি তোমাকে বলেইছি, এখনই তোমার কর্তব্য দ্বিবিধ: (১) যে কোনও উপায়ে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের বিরোধিতা এবং (২) দলীয় মন্ত্রকের সম্প্রসারণ। তুমি যদি তা করতে পারো, কংগ্রেসের মনোবল হারাবার আশঙ্কা থাকবে না এবং কংগ্রেস তার অভ্যস্ত সঙ্কীর্ণ পথ থেকে বেরিয়ে আসবে। বড় বড় সমস্যার সমাধান পরে করলেও চলবে, কংগ্রেস যাতে মনোবল না হারায় সেটা এখনই দেখতে হবে।

তুমি কংগ্রেসের একটি বৈদেশিক বিভাগ স্থাপন করতে চাও জেনে আমি খুশি হলাম। আমারও ঠিক তাই মত।

এ চিঠি আমি আর দীর্ঘ করতে চাই না, কেননা, তুমি রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে এখন নিশ্চয় খুব ব্যস্ত এবং তার আগে তোমার কিছু-কিছু কাজও আছে।

আমি তোমার নিরাপদ যাত্রা কামনা করি এবং কামনা করি তোমার জন্য যে-সব কর্তব্য অপেক্ষা করছে, তার সমাধা করতে ভাগ্য তোমাকে প্রচুর সহায়তা দান করুক। আমাকে যদি লক্ষ্ণৌ যেতে দেওয়া হয় তবে তোমাকে সর্বোতভাবে সাহায্য করব।

তোমার
সুভাষ

সন্তোষকুমার সেন[১]-কে

[মূল বাংলায়]

Kurhaus Hochland
Badgastein
4. 3.36

প্রিয় ডা. সেন,

আমি কাল আপনাকে একটি চিঠি দিয়েছি এবং একটি চেক পাঠিয়েছি। আমি আশা করি চেকটি আপনি যথা সময়ে পাবেন।

উদয়শঙ্করের কোনও চিঠি কি আপনি পেয়েছেন? আমার ভয়, তিনি অগ্নিহোত্রীর খপ্পরে না

১. এই পত্রটি বাংলায় লিখিত ছিল। মূল বাংলা পত্র এখন আর পাওয়া গেল না বলে ইংরাজি অনুবাদ থেকে পুনর্মুদ্রিত হল।

পড়েন। উদয়শঙ্করের খবর আপনি তাঁর ওখানকার এজেন্টের কাছে পেতে পারেন, এবং তাঁর ঠিকানাতে উদয়শঙ্করকে চিঠি দিতে পারেন। আমি ভিয়েনা থেকে উদয়শঙ্করকে তাঁর কায়রো এবং আলেকজান্দ্রার ঠিকানায় যে চিঠি দিয়েছিলাম তার কোনও উত্তর পাইনি। সেই কারণে আমি একটু চিন্তিত। প্যারিসে এক ভারতীয় ছাত্র আমাকে বলেছিলেন তিনি চিকিৎসার জন্য ভিয়েনা যেতে চান। আমি তাঁকে আপনার নাম-ঠিকানা দিয়ে বলেছি আপনাকে চিঠি দিতে। দেশেও দু-তিনজনকে আমি আপনার নাম ঠিকানা দিয়েছি।

আমি আশা করি সবাই আপনারা ভাল আছেন। আপনার কাছ থেকে বিস্তারিত খবর চাই। আমি এক রকম আছি।

আপনার
সুভাষচন্দ্র বোস

পুঃ ওখানে কি নতুন কেউ এসেছে?

সন্তোষকুমার সেন[১]-কে
[মূল চিঠি বাংলায়]

Kurhaus Hochland
Badgastein
৪. ৩. '৩৬

প্রিয় ডা. সেন,

আমি গায়রোলার কাছ থেকে আজ একটা চিঠি পেয়েছি। তিনি আমাকে ভিয়েনায় তাঁর কাছে যেতে লিখেছেন। লিখেছেন আমার কোনও খরচ হবে না, কারণ আপনি, বিমলকীর্তি এবং গায়রোলা সমস্ত খরচের দায়িত্ব নেবেন। যাওয়ার উপলক্ষ, উদয়শঙ্কর ভিয়েনায় আসছেন। আমাকে এখনি জানান এ-সব কী ব্যাপার। আমি ২০ মার্চ নাগাদ মার্সাই থেকে জাহাজে উঠতে চাই। ইতিমধ্যে আমি যতদূর সম্ভব চিকিৎসা করাতে চাই। যদি আমি ভিয়েনা যাই, তাতে বাধা পড়বে। আর্থিক অসুবিধা আছে, কিন্তু সেটাই একমাত্র বাধা নয়। আপনার ত্রিশ পাউন্ড আমি এখনও শোধ করতে পারিনি। তা ছাড়া, গায়রোলার যে আর্থিক অবস্থা, তাতে তার ওপরে আর বাড়তি বোঝা চাপানো আদৌ সম্ভব নয়, বিমলকীর্তির আর্থিক অবস্থা কেমন আমি জানি না। গায়রোলা চিঠিটি আমাকে সঙ্গে-সঙ্গে দিয়েছেন কি না, এবং খোলাখুলি সব লিখেছেন কি না আমি জানি না। সংবাদপত্র থেকে উদয়শঙ্করকে সম্বর্ধনা কবে দেওয়া হবে? উদয়শঙ্করের প্রথম নৃত্য প্রদর্শনী কবে হবে? আরেকটা কথা। আমাদের জাতীয় পতাকা ব্রিস্টল হোটেলে ফেলে আসা হয়েছিল। আপনারা কি সেটি ফেরৎ এনেছেন?

ভিয়েনার পদাঙ্ক অণুসরণ করে বার্লিন ও প্যারিসের ভারতীয়েরা ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় কংগ্রেসের সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করবেন। কাজেই, আপনাদের প্রচেষ্টার অবশ্যই সুফল ফলেছে।

আমি যদি জাহাজের ফার্স্টক্লাস ভ্রমণ করে থাকতাম, তা হলে ফিরবার সময় তার বদলে বিমানযোগে ফিরতে পারতাম। মার্সাই থেকে বোম্বাই যেতে যা ভাড়া লাগে রোম থেকে করাচির এরোপ্লেনের ভাড়াও তাই। আজকাল বিমানের ভাড়া কমে গেছে, এবং ডাচ বিমানে রোম থেকে

১. এই পত্রটি বাংলায় লিখিত ছিল। মূল বাংলা পত্র এখন আর পাওয়া গেল না বলে ইংরাজি অনুবাদ থেকে পুনরনূদিত হল।

করাচি যেতে মোটে আড়াই দিন লাগে। কিন্তু আর্থিক অনটনের জন্য আমাকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে যেতে হচ্ছে এবং P & O কিংবা লয়েড ট্রিয়েসটিনো সময় থাকতে বোম্বাই পৌঁছবে না।

মাথুর লিখেছেন আপনি এখানে আসতে পারেন। যদি আসেন আমাকে দয়া করে জানাবেন, যাতে আমি ল্যান্ডলেডির সঙ্গে কথা বলে একটা ঘরের ব্যবস্থা করতে পারি। আমার ধারণা এখানে ডাক্তারেরা বিনামূল্যে 'স্নানের' সুযোগ পেয়ে থাকেন। কিন্তু এখানে আসার আগে একটি আইনগত অনুমোদন নিয়ে নেবেন যাতে প্রমাণ থাকবে আপনি পুরোদস্তুর ডাক্তার। তা ছাড়া, আপনি যদি কম ভাড়ার টিকিট চান, এইভাবে টিকিট করাবেন Wien Badgastein: Wien...Czechoslovak Frontier (near Bratislava) এইভাবে যদি টিকিটটি করান, সারা পথের জন্য আপনি শতকরা ৬০ অংশ ছাড় পাবেন, ওদের নিয়ম, বিদেশিকে কোনও সীমান্ত স্টেশন পর্যন্ত টিকিট কাটতে হবে। আপনি যদি ব্যাডগাসটেন আসেন, ভিয়েনায় ফিরে, টিকিটটি ছিঁড়ে ফেলবেন। আমি আশা করি ওখানে সব ঠিকঠাক আছে।

আপনার
সুভাষচন্দ্র বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

Kurhaus Hochland
Badgastein
৫. ৩. ৩৬

Frau N.C. Vetter
Wien-IX
Wahringer Str. 41

প্রিয় মিসেস ভেটার

এখন আমি শুধু আপনার যে দু'খানি চিঠির এখনও জবাব দিইনি (দ্বিতীয় চিঠিটি আমি প্যারিস থেকে এখানেই পেয়েছি) তার প্রাপ্তি স্বীকার করছি। প্যারিসে আমার সময় খুব ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে; তারপর Lausanne-তেও তাই। সেখানে ২৮ ফেব্রুয়ারি শ্রীমতী নেহরু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শেষ সময় পর্যন্ত তাঁর স্বামী এবং কন্যা তাঁর কাছে ছিলেন। শ্রীনেহরু ৭ মার্চ বিমানযোগে ভারতে ফিরছেন।

এ জায়গাটি খুব সুন্দর, খুব শান্ত (যদিও বাতাস একটু জোরে বয়) এবং বিগত ছ' সপ্তাহের দুর্ভাবনার পর খুব আরাম বোধ করছি। ইচ্ছে আছে ২০ মার্চ মার্সাই থেকে জাহাজে উঠব। আপনি ও ড. ভেটার আমার শ্রদ্ধা জানবেন।

আপনার
সুভাষচন্দ্র বোস

ই. উডস-কে

Kurhaus Hochland
Badgastein (Badgastein)
(Austria)
৫.৩.৩৬

প্রিয় মিসেস উডস,

আপনি নিশ্চয় ভাবছেন, আমি কী অদ্ভুত লোক, ডাবলিন থেকে এসেই একেবারে নিখোঁজ হয়ে গেলাম। আমার ত্রুটির জন্য যতই ক্ষমা চাই, তা যথেষ্ট হবে না। ডাবলিন থেকে এসে অবধি একটা ঝড়ের মধ্যে আমার সময় কাটছিল এবং এত দিনে একটু স্থির হয়ে বসতে পারলাম।

ডাবলিন ছেড়ে এসে আমি সেই রাত্রেই মিস ম্যাকসুইনির সঙ্গে দেখা করি, ডাবলিন থেকে ওই ট্রেনটি ধরে আমি ভাল করেছিলাম, কেননা জাহাজ ছাড়ত পরদিন সকালে। তা হলে আমি পরের দিন সকালে মিস ম্যাকসুইনির সঙ্গে দেখা করতে পারতাম না।

সমুদ্র অশান্ত ছিল, সারাক্ষণ আমার গা-বমি করছিল। জাহাজ থেকেই যে আপনাকে দীর্ঘ পত্র লিখব ভেবেছিলাম, সে আশা আমাকে ত্যাগ করতে হয়।

তারপর প্যারিসে পৌঁছেই আমার চারপাশের নানা লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে সারা সময় ব্যস্ত থাকতে হয়। রাত্রে যখন শুতে যাই, এত ক্লান্ত লাগে যে দীর্ঘ পত্র লিখবার শক্তি ছিল না।

তারপর প্যারিস থেকে আমি লুসান যাই শ্রী ও শ্রীমতী নেহরুকে দেখতে। শ্রীমতী নেহরু গুরুতর অসুস্থ ছিলেন, আমার লুসান-এ থাকার সময়েই তাঁর মৃত্যু হয়। সৎকার প্রভৃতির ব্যবস্থা আমাদের করতে হয়। তাই নিয়েই সারাক্ষণ ব্যস্ত ছিলাম। শ্রীনেহরু শীঘ্রই বিমানযোগে দেশে ফিরে যাবেন, কারণ এপ্রিল মাসের প্রথমে লক্ষ্ণৌতে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসবে। শ্রী নেহরুকে তাতে সভাপতিত্ব করতে হবে। লুসান থেকে আমি এখানে এসেছি, বিশ্রামের জন্য এবং কুণ্ডে স্নানের জন্য। এখানকার কুণ্ডগুলি শরীর চাঙ্গা করার ব্যাপারে খুব কাজের। অনবরত ভ্রমণে এবং খানিকটা দুশ্চিন্তাতেও আমি বেশ কাহিল হয়ে পড়েছি। এই বিশ্রামে আমার উপকার হবে। তারপর ২০ মার্চ নাগাদ আমি মার্সাই থেকে জাহাজে উঠব।

ডাবলিনে যখন ছিলাম, তার শেষ দিকে আমার শরীরের মধ্যে একটা যন্ত্রণা লেগেই থাকত। আগে কখনও সে যন্ত্রণাটা হয়নি। আমি তার কথা কাউকে বলিনি, কেননা আমি চাইতাম না ও নিয়ে কারও দুশ্চিন্তা হোক। আমি প্যারিসে পৌঁছবার কয়েকদিন পরে যন্ত্রণাটা চলে গেল।

ডাবলিনে থাকার সময়ে আপনাদের কাছ থেকে যে সহৃদয়তা পেয়েছি, তার জন্য উপযুক্ত ধন্যবাদ দেবার ভাষা আমার নেই। সেই সুখস্মৃতি অন্তরের মধ্যে নিয়ে এলাম। আপনার কন্যারাও আমার প্রতি অত্যন্ত সদয়। এন্ডা তো হয়ে উঠেছিল যেন আমার দেবশিশুর মতো ছোট্ট অভিভাবক।

তাঁদের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাবেন।

আবার কবে আমাদের দেখা হবে জানি না। আমাদের এক প্রাচীন কবি ভবভূতি একদা লিখেছিলেন, 'কালোহ্যয়ং নিরবধি, বিপুলা চ পৃথ্বী,' অতএব আবার আমাদের দেখা হতেও পারে। কিন্তু শেলবোর্ন হোটেলে আমার জেল-সুপারিন্টেডেন্টের সঙ্গে অকস্মাৎ যেমন দেখা হয়ে গিয়েছিল, সেভাবে নয়।

কয়েক দিনের মধ্যে আমি আবার আপনাকে চিঠি দেব, ভারত ও আয়ারল্যান্ডের এই

যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আমাদের কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয়, সেই বিষয়ে। আমার ডাবলিন থেকে আসার পর মাদাম ম্যাকব্রাইড-এর সঙ্গে আপনার কি কোনও কথা হয়েছে? আমি চলে আসার পর নতুন কোনও ঘটনা কি ঘটেছে?

আপনার পুত্র-কন্যাদের আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাবেন। আপনি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা গ্রহণ করবেন।

আপনার
সুভাষ সি. বোস

সন্তোষকুমার সেন-কে[১]
[মূল বাংলায়]

ব্যাডগাসটেন
তারিখবিহীন
(ডাকঘরের ছাপের তারিখ ৫.৩.৩৬)

অগ্নিহোত্রীর হাত থেকে উদয়শঙ্কর বেরিয়ে আসতে পেরেছেন কি না আমি গায়রোলার চিঠি থেকে বুঝতে পারলাম না, যদি আপনি তাঁর (উদয়শঙ্করের) কাছ থেকে কোনও চিঠি না পেয়ে থাকেন, এখনই তাঁকে চিঠি দিন বুদাপেস্ট-এর ঠিকানায়, এবং অগ্নিহোত্রীর সম্পর্কে তাঁকে সতর্ক করে দিন। এর যেন অন্যথা না হয়। উদয়শঙ্করের বুদাপেস্ট-এর ঠিকানা আপনি তাঁর এজেন্টের কাছে সহজেই পেয়ে যাবেন।

আপনার
সুভাষচন্দ্র বোস

সন্তোষকুমার সেন-কে[২]
[মূল বাংলায়]

Kurhaus Hochland
Badgastein
৬.৩.৩৬

প্রিয়বরেষু ড. সেন,

আজ এইমাত্র আপনার জরুরি চিঠি এবং ৫৮৭ শিলিং পেলাম। আমি ভাবতেই পারিনি, আপনি এত তাড়াতাড়ি সব পাঠাতে পারবেন।

বাড়ি ফিরে যাবার আগে একবার ভিয়েনা যেতে পারলে খুব ভাল লাগত— কিন্তু সে বোধ হয় হবে না। গায়রোলার চিঠি পেয়ে প্রথমটায় আমি খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু পরে

১. এই পত্রটি বাংলায় লিখিত ছিল। মূল বাংলা পত্র এখন আর পাওয়া গেল না বলে ইংরাজি অনুবাদ থেকে পুনরনূদিত হল।
২. ঐ।

গভীরভাবে ভেবে দেখলাম, সেটা সম্ভব নয়। ভিয়েনা ছেড়ে আসবার পর এত জায়গায় ঘুরে, বিচিত্র রকমের আবহাওয়ার মধ্যে থেকে, বিচিত্র খাওয়া-দাওয়া করে আমি ক্লান্তি ও দুর্বলতা বোধ করছি। ডাবলিনে একদিন পেটে একটা নতুন ধরনের ব্যথা বোধ করলাম, যেটা আগে কখনও হয়নি। লুসান-এ শ্রীমতী নেহরুর মৃত্যুর কারণে আমাকেও গভীর উদ্বেগ এবং অসুবিধার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। এখন, বাড়ি যাবার আগে, দু-তিন সপ্তাহ নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। চিকিৎসা বলতে এখানে 'স্নান'। মোটমাট ঊনত্রিশটা 'স্নান' নিতে হবে। সাধারণত, তার জন্য পঁচিশ থেকে সাতাশ দিন সময় লাগে। আমার পক্ষে একুশটি 'স্নান' নেওয়াও সম্ভব হবে না কারণ ২০ মার্চ মার্সাই থেকে আমাকে জাহাজে উঠতে হবে। সে কারণে, এখান থেকে আঠারো তারিখের মধ্যে আমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে। এর মধ্যে চোদ্দোটি স্নান আমি নিতে পারি। ভিয়েনা যেতে হলে আমাকে আরও দু-তিন দিন আগে বেরোতে হবে, ফলে ব্যাডগাসটেন-এর চিকিৎসা বিশেষ কোনও কাজেই লাগবে না। এইসব ভেবে আমি ভিয়েনা যাবার প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারলাম না। আজই আমি গায়রোলাকে এই মর্মে পত্র দেব।

আপনারা উদয়শঙ্কর যেদিন পৌঁছবেন, সেদিন যদি সবাই মিলে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে পারেন, তা হলে খুব ভাল হয়। এ ছাড়াও, সংবাদপত্রের সঙ্গে কথা বলার সময়ও আপনি থাকলে ভাল হয়। আমি আবার উদয়শঙ্করকে তাঁর বুদাপেস্ট-এর ঠিকানায় অগ্নিহোত্রী সম্পর্কে লিখেছি। আশা করি, ইতোমধ্যে তিনি পত্রটি পেয়েছেন। সংবাদপত্রকে ডাকার দিন যদি আপনারা সবাই উপস্থিত থাকেন তা হলে অগ্নিহোত্রী কিছু সংযত থাকবে।

আপনার
সুভাষচন্দ্র বোস

অমিয় চক্রবর্তী-কে[১]
[মূল বাংলায়]

Kurhans Hochland
Badgastein, Austria
১১.৩.৩৬

প্রীতিভাজনেষু শ্রীচক্রবর্তী,

আপনার সুদীর্ঘ পত্রটি প্যারিসে যথাসময়ে পেয়েছি। আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারলাম না বলে দুঃখিত। যে দুই ভদ্রমহোদয়ের নাম-ঠিকানা আপনি দিয়েছিলেন, আমি তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। তাঁরা খুব চমৎকার মানুষ।

অনেক কথা আপনাকে বলার আছে। আজ দু-একটি বিষয়ে বলি। সংবাদপত্রে দেখে থাকবেন, হিটলারের বক্তৃতা ভারতে কী পরিমাণ উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। আমার মনে হয় সঙ্ঘের পক্ষ থেকে এর তীব্র প্রতিভাষণ দরকার। খুব গভীরভাবে চিন্তা করে আমি একথা বলছি। এই প্রতিভাষণ আমাদের বিপক্ষে যাবে না, বরং আমাদের সহায়কই হবে। জানি না, জার্মানিবাসী ভারতীয়রা কী করবেন, বস্তুত কিছু করা তাঁদের পক্ষে শক্ত। কিন্তু আমরা যাঁরা বাইরে আছি, আমাদের কর্তব্য পরিষ্কার। এ বিষয়ে আপনি দ্বিধাগ্রস্ত হবেন না। যদি এ ক্ষেত্রে

১. এই পত্রটি বাংলায় লিখিত ছিল। মূল বাংলা পত্র এখন আর পাওয়া গেল না বলে ইংরাজি অনুবাদ থেকে পুনরনূদিত হল।

সময় বেশি লাগে, বা, প্রতিভাষণের জন্য কমিটির সম্মতি পাবার ক্ষেত্রে কোনও অসুবিধা হয়, তা হলে আপনি সভাপতি হিসেবে সঙ্ঘের পক্ষ থেকে একটি জবাব দিতে পারেন। কোনও কাপুরুষ যদি পরবর্তীকালে এ নিয়ে প্রশ্ন তোলে, আপনি বলবেন, ঘরে বসে তাঁরা জনতার সমর্থনে কাজ করতে পারছেন। কিন্তু যখন ভারতীয়রা দেশেই তীব্র বিরোধিতা করছে তখন ইউরোপে যে-ভারতীয়রা আছেন, তাঁদের আরও অনেক বেশি করে তা করা উচিত। অনেক ভাবনা-চিন্তা করে দেশের ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতে আমি একটি প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছি। তাতে, জার্মানির সঙ্গে সমস্তরকম বাণিজ্য বন্ধ করার প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করেছি। খুব শীঘ্র জার্মান নেতৃবৃন্দের কাছে আমি একটি ব্যক্তিগত প্রতিবাদপত্র পাঠাব। কিন্তু যেহেতু আমার পেছনে কোনও বৃহৎ দলীয় প্রতিষ্ঠানের শক্তি নেই সেহেতু এই প্রতিবাদ খুব ফলপ্রসূ হবে বলে আমার মনে হয় না। বছর দুয়েক পূর্বে সঙ্ঘ যে প্রতিবাদ জানিয়েছিল, তা কিছুটা কার্যকরী হয়, কারণ দেখা গেছে বিদেশ দপ্তর খুব মৃদু ভাষণে উত্তর পাঠিয়েছিল। আপনার প্রতিবাদে আপনি ওই চিঠির সূত্র ধরে বলতেই পারেন যে ওতে যা-যা কিছু করা হবে বলে জানানো হয়েছিল, তার কিছুই মান্য করা হচ্ছে না। বরং ভারতীয়দের নতুন করে অবমাননা করা হয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই জেনেছেন যে, জাপানে ইতোমধ্যে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস ৮-ই এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে। আমাকে তার আগে পৌঁছতেই হবে। সুতরাং আমার ইউরোপ ভ্রমণের শেষ পর্ব এসে গেছে। যেতে আমাকে হবেই। আপনি এবং আমার বন্ধুরা এ বিষয়ে যা-কিছু বলেছিলেন সব বিবেচনা করেও বলি, পত্রে সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। এ কথা উল্লেখ করার দরকার হয় না যে ফিরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি গ্রেপ্তার হতে পারি। গ্রেপ্তার না হলে, কর্মপদ্ধতির বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারি। দেশে ফেরার তাড়া থাকায় এখন আর অন্য কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। অনেক দেশে ভ্রমণের ইচ্ছা আমার ছিল। সেগুলো অপূর্ণ রইল। কিন্তু নানা কারণেই আমি আমার ইচ্ছা পূরণ করতে পারলাম না।

উইমেনস ইন্টারন্যাশনাল লিগ-এ আপনার প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি। আপনি এটা আমাকে লিখতে বলেছিলেন। আমি দেখলাম, না লিখে খুব ভাল করেছি। আমি লিখিনি বলেই আপনার অসামান্য প্রবন্ধটি প্রকাশিত হল। সত্যি কথা বলতে কী, বার্লিন, প্যারিস এবং লুসান-এ আমি এত ব্যস্ত ছিলাম যে কোনও প্রবন্ধ লেখা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সময়মতো চিঠিপত্রের উত্তরও আমি দিতে পারিনি।

হিটলার সম্পর্কে কিছু কথা বলা উচিৎ। এটা ঠিক নয় যে প্রতিবাদ করলেই সঙ্ঘের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটবে। দৃঢ় প্রতিবাদ ইতিপূর্বেও জানানো হয়েছে এবং তার ফলাফল আমাদের বিরুদ্ধে যায়নি। জার্মানির সম্পর্কে আমাদের (ভারতীয়দের) অনেক অভিযোগ আছে। কিছুদিন আগে (জানুয়ারিতে) বার্লিনে থাকাকালীন আমি প্রবল প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। ওরা শক্তের ভক্ত, নরমের যম। আমি বলছি, সঙ্ঘ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার প্রস্তুতিও থাকা দরকার। ইতালির বিরুদ্ধে অন্যান্য বিষয়ে অভিযোগ আছে— ভারতীয় স্বার্থ বা সম্মানের সঙ্গে তার কোনও সংযোগ নেই। কিন্তু ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে জার্মানির বিরুদ্ধে আমাদের প্রভূত অভিযোগ।

খুব শীঘ্র হিটলার সরকারের পতন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। যদি যুদ্ধ বাঁধে এবং যুদ্ধ জার্মানিকে দুর্বল করে দেয়, তবে এই সম্ভাবনা আছে। নচেৎ নয়। কিন্তু আমরা যদি জার্মানির সঙ্গে বাণিজ্য বয়কট করি, ওরা অসুবিধায় পড়বে। জার্মান ব্যবসায়ীরা হিটলারের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। এখন জার্মানিতে দুটি দল খুব শক্তিশালী— সেনাবাহিনী এবং ব্যবসায়ীবৃন্দ।

আজ এই পর্যন্ত। আশা করি আপনার শরীর ভাল আছে। বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করে এবং নানা জায়গার জল খেয়ে আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। ডাবলিনে থাকাকালীন পাকস্থলীতে ব্যথা

হয়েছিল। এখন এখানে বিশ্রাম নিচ্ছি, সঙ্গে স্নান-চিকিৎসাও চলছে। গত বছর এই চিকিৎসায় আমার ভাল হয়েছিল। আশা করি এবারেও সুফল পাব। কিছুটা সেরে উঠলেই দেশের উদ্দেশে রওনা দেব। আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানবেন।

আপনার
সুভাষচন্দ্র বোস

অমিয় চক্রবর্তী-কে

মহাশয়,

দিন কয়েক আগে ভিয়েনার ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে আমি একটি চিঠি পেয়েছি। সেটি এরকম:

১২ মার্চ ১৯৩৬

মহাশয়,

আমি বিদেশ মন্ত্রকের রাষ্ট্রসচিবের কাছ থেকে আজ এই নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছি যে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে যেন এই মর্মে সতর্ক করা হয় যে ভারত সরকার খবরের কাগজ মাধ্যমে অবগত হয়েছেন আপনি এই মাসে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পরিকল্পনা করেছেন এবং এ বিষয়ে ভারত সরকার আপনাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চায় যে আপনার পরিকল্পনা রূপায়ণকালে আপনি সম্পূর্ণ স্বাধীনতার প্রত্যাশা করবেন না।

ভবদীয়
Sdt J. W. Taylor
His Majesty's Consul

১৯৩২-এর ২ জানুয়ারি ভারতে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তখন কোনও বিচার ছাড়াই ১৯৩৩-এর ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমাকে অন্তরীণ রাখা হয়েছিল। আমি বারবার জানতে চাওয়া সত্ত্বেও আমাকে জানানো হয়নি, আমার বিরুদ্ধে ভারত সরকারের নির্দিষ্ট কী কী অভিযোগ আছে। সে সময় আমি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় সরকার নিয়োজিত একাধিক চিকিৎসক দল আমাকে পরীক্ষা করেন এবং বলেন আমাকে মুক্তি দেওয়া দরকার অথবা চিকিৎসার জন্য আমাকে ইউরোপে পাঠানো দরকার। এসময় ভারত সরকার আমার বন্দিত্ব প্রত্যাহার করে এবং আমাকে জলপথে ইউরোপ যাবার অনুমতি দেয়। সেই থেকে, বলতে গেলে, টানা তিন বছর ধরে আমি ইউরোপে আছি। এর মধ্যে মাত্র একবার আমি ফিরেছিলাম—১৯৩৪-এর ডিসেম্বরে, তখন আমার মুমূর্ষু বাবাকে দেখতে গিয়ে ছয় সপ্তাহ ছিলাম। ভারতে সেই সামান্য কয়েকটি দিনও আমি গৃহবন্দি ছিলাম।

এখন আমি বাড়ি ফিরতে চাইছি এবং এ ধরনের সরকারি সতর্কবার্তা আমাকে পাঠানো হচ্ছে। শেষবার যখন আমাকে গ্রেপ্তার করা হয় তখন আইনগত এবং নীতিগতভাবে আমার সঙ্গে অন্যায়

করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানের এই প্রস্তাবিত বন্দিদশা আগেকার সমস্ত অন্যায় নজিরকে ছাপিয়ে গেছে। আমি কি জানতে পারি, ব্রিটিশ আইন কীভাবে ভারতে প্রযুক্ত হতে চলেছে এবং এই যদি প্রবর্ধিত স্বাধীনতার পূর্বানুমানের নজির হয়, তবে নতুন সংবিধান কোথায় স্থান পাবে?

ভবদীয়
সুভাষচন্দ্র বোস
(সভাপতি, বেঙ্গল কংগ্রেস কমিটি)

Kurhaus Hochland,
Badgastein
Austria
17 মার্চ

জওহরলাল নেহরু-কে

Kurhaus Hochland
Badgastein, Austria
১৩ মার্চ, ১৯৩৬

প্রিয় জওহর,

এইমাত্র ভিয়েনার ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে একটি জরুরি চিঠি পেলাম। সেটি এরকম:

মহাশয়,

আমি বিদেশ মন্ত্রকের রাষ্ট্রসচিবের কাছ থেকে আজ এই নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছি যে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে যেন এই মর্মে সতর্ক করা হয় যে ভারত সরকার খবরের কাগজ মাধ্যমে অবগত হয়েছেন আপনি এই মাসে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পরিকল্পনা করেছেন এবং এ বিষয়ে ভারত সরকার আপনাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চায় যে আপনার পরিকল্পনা রূপায়ণকালে আপনি সম্পূর্ণ স্বাধীনতার প্রত্যাশা করবেন না।

ভবদীয়
Sdt. J. W. Taylor
His Majesty's Consul

এই ছোট চিঠি পাবার আগে আমি যাত্রার আয়োজন স্থির করতে যাচ্ছিলাম। সত্যি কথা বলতে কী, জাহাজে যাওয়ায় খরচ কম হবে, না আকাশপথে যাওয়ায়—এসব খোঁজখবর করতে গিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে একটু দেরিই হয়ে গেছে। দ্বিতীয় উপায়ে যাবার সুবিধা হল, আমার চিকিৎসার জন্য নির্ধারিত ২৫ দিন সম্পূর্ণ করে যেতে পারব। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার মতো একজনও এখানে নেই। এই মুহূর্তে আমি কী সিদ্ধান্ত নিতে চাইছি তুমি বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই—এই সতর্কীকরণ উপেক্ষা করা এবং বাড়ি ফেরা। শুধু একটাই কথা, এখানে ভাবতে

হবে, কোন সিদ্ধান্ত প্রকৃতপক্ষে জনহিতকর হবে। আমার ব্যক্তিগত বিষয়গুলো নিয়ে ভাবি না, বরং জনগণের স্বার্থে যে-কোনও সিদ্ধান্ত নিতে আমি প্রস্তুত। জনহিতকর কাজকর্মগুলোর থেকে আমি এতকাল সরে আছি যে আমার পক্ষে সুনির্দিষ্টভাবে বোঝা সম্ভব না যে আমি কোন সিদ্ধান্ত নিলে তা মঙ্গলজনক হবে। এ বিষয়ে তুমি আমাকে কিছু পরামর্শ দাও। আমি জানি, এই বিপজ্জনক অবস্থায় তোমার পক্ষে কারওকে পরামর্শ দেওয়া কঠিন। কিন্তু আমি জানি তুমি অনায়াসে ব্যক্তিগত বিষয়গুলো ভুলে যেতে পারো—জনগণের স্বার্থে তুমি তা পারো—তুমিই পারো জনস্বার্থের দিকে তাকিয়ে কোনও জনসেবককে সঠিক পরামর্শ দিতে। আমাদের জাতীয় জীবনে যে বিশেষ স্থান তুমি অর্জন করছ, সেখান থেকে এই অদ্ভুত অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে পরামর্শ দেবার দায়িত্ব তুমি এড়িয়ে যেতে পারো না।

তোমার অসুবিধে ঘটানোর জন্য একটি কারণেই আমি মার্জনা চাইতে পারি, এ বিষয়ে পরামর্শ নেবার জন্য তোমার চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য আমি আর কারওকে পাইনি। সময়ও এত কম যে আমি অনেকের সঙ্গে কথা বলব, তার উপায় নেই। ২০ তারিখের মধ্যে তোমার এ চিঠি পেয়ে যাওয়া উচিত। তুমি যদি অনুগ্রহ করে খুব তাড়াতাড়ি একটা তার করে দাও, আমি যথাসময়ে পেয়ে যাব। তা হলে ২২ এপ্রিল রোম থেকে কে এল এম-এর যে বিমানটি ছাড়বে সেটি আমি ধরতে পারব। সুতরাং যদি শেষ পর্যন্ত ভারতে যাবার সিদ্ধান্ত আমাকে নিতেই হয়, যদি ২১ বা ২২ তারিখের মধ্যেই তা নিয়ে ফেলতে পারি তবে ২ এপ্রিল রোম থেকে যে বিমানটি উড়বে তাতেই আসন পেতে পারি, এমনকী ২৯ মার্চের বিমানেও জায়গা পাওয়া যেতে পারে।

আমি যখন লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আমি জানতাম, ওখানে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে আমার গ্রেপ্তার হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তখন কিছুদিন অন্তত স্বাধীন থাকার সম্ভাবনাও ছিল। এবার সে-সম্ভাবনা একেবারেই নেই। এবার বাড়ি যাওয়া মানেই জেলে যাওয়া। জনগণের দরকারের কথা ভেবে অবশ্যই জেলে যাবার প্রয়োজনীয়তা আছে এবং সে কারণে এই চিঠি উপেক্ষা করে কারাবরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত।

অনুগ্রহ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উত্তর দাও। নীচের ঠিকানায় তুমি টেলিগ্রাম করতে পারো:

Bose, Kurhaus Hochland, Badgastein, Austria

আশাকরি তোমার যাত্রাপথ নির্বিঘ্নই ছিল এবং তোমার স্বাস্থ্য ভাল আছে।

তোমার
সুভাষ

পুনশ্চঃ মাত্র গতকাল খবরের কাগজে পাঠানো একটি বার্তায় আমি জানিয়েছিলাম, চিকিৎসা শেষ হলে আমি বিমানে ফিরে যাব।

ই. উডস-কে

Kurhaus Hochland
Badgastein, Austria
১৭. ৩. ৩৬

প্রিয় মিসেস উডস্,

আপনার সানুগ্রহ এবং সত্বর পাঠানো ৯ তারিখের চিঠিটির জন্য ধন্যবাদ। অন্য কিছু বলার আগে ভিয়েনার ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে আমি যে-চিঠি পেয়েছি তার নকল দিলাম:

১২ মার্চ ১৯৩৬

মহাশয়,

আমি বিদেশ মন্ত্রকের রাষ্ট্রসচিবের কাছ থেকে আজ এই নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছি যে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে যেন এই মর্মে সতর্ক করা হয় যে ভারত সরকার খবরের কাগজ মাধ্যমে অবগত হয়েছেন আপনি এই মাসে ভারত প্রত্যাবর্তনের পরিকল্পনা করেছেন এবং এ বিষয়ে ভারত সরকার আপনাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চান যে আপনার পরিকল্পনা রূপায়ণকালে আপনি সম্পূর্ণ স্বাধীনতার প্রত্যাশা করবেন না।

ভবদীয়
Sd/- J. W. Taylor
His Majesty's Consul

ডাবলিনের কাগজগুলোয় আপনি এটা প্রকাশ করতে পারেন—বিশেষত আইরিশ প্রেসে—যদি আপনি ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করেন। যদি তা করা সম্ভব হয় তবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোও তার সঙ্গে যোগ করে দিতে পারেন:

১) এর আগে ১৯২৪-এর অক্টোবর থেকে ১৯২৭-এর মে পর্যন্ত কোনও বিচার ছাড়াই আমাকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। আমি যখন গুরুতর অসুস্থ, তখন আমাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

২) আবার ১৯৩২-এর জানুয়ারি থেকে ১৯৩৩-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমাকে কোনও বিচার ছাড়াই বন্দি করা হয়। আমি যখন পুনর্বার গুরুতর অসুস্থ হলাম চিকিৎসকরা সরকারকে জানালেন—আমাকে মুক্তি দেওয়া হোক অথবা চিকিৎসার জন্য আমাকে ইউরোপে যাবার অনুমতি দেওয়া হোক। তখন সরকার থেকে আমাকে দেশের বাইরে যাবার অনুমতি দেওয়া হল।

৩) ১৯৩৪-এর নভেম্বরে আমি যখন আমার মুমূর্ষু পিতাকে দেখতে গিয়েছিলাম এবং শেষ পর্যন্ত কলকাতায় পৌঁছেছিলাম তাঁর মৃত্যুর একদিন পর, তখনও আমাকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছিল। যতদিন ভারতে ছিলাম, ওই অবস্থায় আমার দিন কেটেছে—সে প্রায় ছয় সপ্তাহ।

আমার কী হতে চলেছে এই প্রস্তাবিত বন্দিদশা তার পূর্বাভাস। এই হল ব্রিটিশ আইন।

ভাবতে ভাল লাগছে 'আইরিশ পিপল'-এ আপনি কিছু প্রকাশ করতে পারবেন।

খুব তাড়াতাড়ি উত্তর দেবেন।আমিও আপনাকে আবার লেখার চেষ্টা করব।

আপনার অনুগত
সুভাষ সি. বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

Kurhaus Hochland
Badgastein
১৭.৩.৩৬

প্রিয় মিসেস ভেটার,

আমি যে এতদিন চুপ করে আছি তাতে আপনার কী মনে হচ্ছে আমি সহজেই কল্পনা করতে পারি, এর মধ্যে আমিও খুব স্বচ্ছন্দে ছিলাম না। কয়েক দিন আগে আমি ভিয়েনার ব্রিটিশ কনসালের কাছ থেকে এই চিঠিখানি পাই:

"আমি বিদেশ মন্ত্রকের রাষ্ট্রসচিবের কাছ থেকে আজই নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছি যে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে যেন এই মর্মে সতর্ক করা হয় যে ভারত স্করকার খবরের কাগজ মাধ্যমে অবগত হয়েছেন আপনি এই মাসে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পরিকল্পনা করেছেন এবং এ বিষয়ে ভারত সরকার আপনাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চায় যে আপনার পরিকল্পনা রূপায়ণকালে আপনি সম্পূর্ণ স্বাধীনতার প্রত্যাশা করবেন না।

ভবদীয়
Sd/- J. W. Taylor
His Majesty's Consul

আমাকে একা অনেক চিন্তা করতে হয়েছে এবং আমি এই সিদ্ধান্ত করেছি যে এই ভীতিপ্রদর্শন আমি উপেক্ষা করব এবং তার ফলাফল যা হয় তার মুখোমুখি হব। এই সিদ্ধান্ত আমি জানাইনি এবং আমি কী করব তা ব্রিটিশ সরকারকে জানাব না, তারা নিজেরাই জেনে নিক। এখানে আমি দেখছি পুলিশ আমার গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখছে। বোধ হয় তাদের ওপর আদেশ আছে আমার গতিবিধির খবর লন্ডনকে জানাতে।

এই সর্বশেষ ঘটনাটির কথা আমি ভিয়েনায় কাউকে জানাইনি, একমাত্র আমার সেক্রেটারি মিস শেঙ্কল ছাড়া, তাঁকে আমি এখানে ডেকে পাঠিয়েছি, কারণ জেলখানায় ঢোকার আগে আমার বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের সমস্ত কাজ শেষ করতে হবে। দয়া করে এ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ গোপন রাখবেন, যতদিন না অন্য বন্ধুদের জানাবার মতো অবস্থা হয়।

আমি ব্রিটিশ জাহাজে যাচ্ছি না, কারণ আমি তাদের খপ্পরে পড়তে চাই না। তাই ইতালিয়ান জাহাজে যাব। তাতে যদি বার্থ না পাই আমি খুব মুশকিলে পড়ব, তবে ২৭ তারিখে জেনোয়া থেকে একটি ইতালিয়ান জাহাজ ছাড়বে, তাতে একটি বার্থ পাব বলে আশা করছি। যতদিন লয়েড ট্রিয়েসটিনো কোম্পানি থেকে জবাব না পাচ্ছি, আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারছি না। সেইজন্যই আমি আপনার কার্ডটি ভর্ত্তি করতে পারি না।

আমি কোন জাহাজে যাব মিসেস হারগ্রোভ জানতে চেয়েছিলেন, আমি তাঁকে এখনও উত্তর দিইনি, কয়েক দিন পরে চিঠি দেব। ইতিমধ্যে আপনার তাঁকে কিছু বলবার দরকার নেই।

ড. ভেটার ও আপনি সাম্প্রতিক চিঠিগুলিতে আমার প্রতি যে আন্তরিক স্নেহ ব্যক্ত করেছেন, বিশেষ করে সর্বশেষ চিঠিটিতে, তার জন্য আমি কত দূর কৃতজ্ঞ বলতে পারি না। আমার এই

চিঠিটি আপনাদের সে-সব চিঠির উত্তর দয়া করে মনে করবেন না, কয়েক দিনের মধ্যে একটি দীর্ঘ পত্র আমি অবশ্যই দেব।

আমার মনে হয় মডার্ন রিভিউ মার্চ মাসের সংখ্যায় ড. ভেটারের প্রবন্ধটি প্রকাশ করবে। ২৫ মার্চ নাগাদ পত্রিকাটির ভিয়েনা পৌঁছনো উচিত, যদি তার আগেই না পৌঁছয়। আমি সোজা আপনার ঠিকানায় একটি কপি পাঠাতে বলেছি।

ফ্রান্সে যাঁদেরকে আমার সব চাইতে উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছে তাঁরা হলেন আঁদ্রে জিদ, আঁদ্রে ম্যালরক্স ইত্যাদি লেখকদের মতো বুদ্ধিজীবীরা। Basch খুব সহানুভূতি দেখিয়েছেন, Guernut সদয় আচরণই করেছেন কিন্তু একটু সরকারি-কেতা বজায় রাখেন, এ বিষয়ে পরে আরও লিখব।

শ্রদ্ধা সহকারে।

আপনাদের
সুভাষ সি. বোস

শ্রীসুনীল মোহন ঘোষ মৌলিক-কে
[মূল বাংলায়]

Kurhans Hochlam
Badgastein, Austria
17. 3. 36

প্রীতিভাজনেষু—

তোমার ২২ জানুয়ারির চিঠি আমি যথাসময়ে পেয়েছিলাম, কিন্তু নানা দেশে ঘুরছিলাম বলে সময়মতো উত্তর দিতে পারি নাই। এখন এত বিলম্ব হয়ে গেছে যে ভাবছিলাম আর লিখে কী হবে। শেষে লেখাই স্থির করলাম।

এতদিনে তোমার শুভবিবাহ হয়ে গেছে। এরূপ ঘটনা মানুষের জীবনে একবারই হয় এবং এই ঘটনার উপর ভবিষ্যতের ভালমন্দ অনেক কিছু নির্ভর করে। তাই আমি প্রার্থনা করি তোমার বিবাহিত জীবন সুখময় হউক এবং দেশের ও দশের হিতার্থে তোমাদের জীবন ব্যয়িত হউক। ব্যক্তিগত বা পরিবারগত সুখের মূল্য আমার কাছে মোটেই নাই— যদি ব্যক্তির এবং পরিবার বর্গের জীবন দেশের কল্যাণে নিয়োজিত না হয়। তাই আমি বিশেষ করিয়া প্রার্থনা করি যেন তোমাদের জীবন দেশের ও দশের কল্যাণে ব্যয়িত হয়—তার মধ্যেই শ্রেষ্ঠ সুখ ও আনন্দের আস্বাদ নিশ্চয়ই পাবে।

তোমার সাথে কবে আবার দেখা হবে জানি না—তাই দূর থেকে এই শুভ ইচ্ছা তোমার কাছে পাঠাচ্ছি।

আমার ভালবাসা জানবে।

ইতি
শুভার্থী
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

রোঁমা রলাঁ-র পত্র

Villeneuve (Vaud) Villa Olga
২০ মার্চ ১৯৩৬

প্রিয় সুভাষচন্দ্র বোস,

আমরা আপনার চিঠি এখনই পেলাম এবং আমি আপনাকে উত্তর দিচ্ছি। আপনার সমস্ত সংগ্রাম ও বিপদের মধ্যে আমাদের সহানুভূতি ও স্নেহকে আপনার সঙ্গী করে না দিয়ে আমরা আপনাকে বিদায় দিতে পারি না। আপনি ভালই জানেন আমাদের কী ইচ্ছা, কী আশা, জানেন আমরা আপনার দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং সামাজিক অগ্রগতি কামনা করি। এই দ্বিবিধ লক্ষ্যে যারা সংগ্রাম করবেন, তাদের জন্যে আমাদের চিন্তা ও আশা সব সময়েই থাকবে। বিশ্বাস করুন, Villeneuve-এ আপনার বন্ধুরা আপনার কথা সর্বদাই স্মরণ করবেন।

আপনার একান্ত
রোমা রঁলা

সন্তোষকুমার সেন-কে[১]
[মূল বাংলায়]

Kaurhaus Hockland
Badgastein
২২. ৩. ৩৬
রবিবার

প্রিয় ডা. সেন,

আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনাকে আমার অনেক কথা বলবার আছে। চিঠিতে আমি তার কিছু কিছু লিখব, অন্য যা বলবার আছে মিস্ শেঙ্কল-এর মাধ্যমে জানাব, আজ দুটো কাজের কথা নিয়ে, আপনাকে বিরক্ত করব।

(১) এইসঙ্গে দুটো চেক পাঠাচ্ছি। একটি চেক ৩০ পাউণ্ডের, আপনার ধার শোধ করার জন্য। অনেক ধন্যবাদ।

(২) আরেকটি চেক £ 27-18-6-এর।

এই চেকটি ভাঙিয়ে দয়া করে আমার জন্য একটি রেলের টিকিট কিনবেন। রেলের টিকিটের জন্য আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানির নামে একটি চিঠি এই সঙ্গে পাঠালাম। টিকিট কেনার পরে যে টাকা বাঁচবে, দয়া করে আমাকে অবিলম্বে পাঠিয়ে দেবেন। টাকাটা মনিঅর্ডারে, কিংবা সিল করা "wert-brief"-পাঠাতে পারেন।

১. এই পত্রটি বাংলায় লিখিত ছিল। মূল বাংলা পত্র এখন আর পাওয়া গেল না বলে ইংরাজি অনুবাদ থেকে পুনরনূদিত হল।

এই টিকিটের ওপরে আমি অস্ট্রিয়ায় ৬০ এবং ইতালিতে শতকরা ৫০ ভাগ ছাড় পাব। এই ছাড় যদি ওরা না দেয়, দয়া করে টিকিট কিনবেন না। আমি টিকিট কিনব পরের স্টেশন Hofgastein-এ Reiseburo-তে। ছাড় না পেলে টিকিট না কিনে সব টাকাটা আমাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেবেন।

(৩) সম্ভব হলে টিকিট এবং টাকা সোমবার বিকেলের মধ্যে পাঠাবেন। আমি ২৫ (বুধবার) বিকেলে এখান থেকে রওনা হওয়ার বন্দোবস্ত করছি। এ বিষয় নিয়ে কাউকে কিছু বলবেন না। যদি আমার কথা কেউ জিজ্ঞেস করে, বলবেন আপনি কিছু জানেন না। গভর্নমেন্ট আমাকে জানিয়ে দিয়েছে আমি ভারতে ফিরলে আমাকে ছাড়বে না। সরকারি চিঠির একটি কপি এই সঙ্গে পাঠালাম।

আপনার
সুভাষচন্দ্র বোস

পুঃ এখানকার পুলিশ আমার ওপর কড়া নজর রাখছে। তারা জানতে চায় আমি এখান থেকে কবে এবং কোথায় যাব। কাজেই টিকিটের কথা কাউকে বলবেন না।

সুভাষ

রোমাঁ রলাঁ-কে

২৫ মার্চ ১৯৩৬

শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

আপনার ২০ মার্চের সানুগ্রহ পত্রের জন্য এবং পত্রে আপনি যে সহৃদয়তা জ্ঞাপন করেছেন, তার জন্যে আপনি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। Villeneuve-এ আমি যে আপনার সঙ্গে দু'বার সাক্ষাৎ করতে পেরেছিলাম এবং অত দীর্ঘ আলোচনা আপনার সঙ্গে করতে পেরেছিলাম, সে জন্য আমি নিজেকে অসাধারণ ভাগ্যবান মনে করি। আমাদের জাতীয় ও সামাজিক মুক্তির সংগ্রামে আপনার চিন্তা ও শুভেচ্ছা যে আমাদের সঙ্গে আছে, এ আমার এবং আমার সমস্ত দেশবাসীর শক্তি ও অনুপ্রেরণার এক উৎস। ভারতে সুপ্রাচীন সংস্কৃতির সম্পর্কে আপনার গুণগ্রাহিতা এবং বিশ্বকে সেই সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে আপনার যে চেষ্টা, আমাদের কাছে তার মূল্য অসামান্য। কিন্তু আরও মূল্যবান আমরা মনে করি স্বাধীনতায় ভারতের অধিকারে আপনার জোরালো সমর্থন। Villeneuve-এ আমি যে কয়েক ঘন্টা কাটিয়েছি তার সুখস্মৃতি আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি।

আপনার পক্ষ থেকে মাদাম রলাঁ আমাকে যে পরামর্শ দিয়েছেন, আমি যেন এখনকার মতো ভারতে ফিরে যাওয়া মুলতুবি রাখি, সে প্রস্তাব আমি অত্যন্ত যত্ন সহকারে বিবেচনা করে দেখেছি। এ বিষয়ে আপনার মনোভাবের মূল্য আমি উপলব্ধি করি। কিন্তু আমার মনে হয়, সরকার যতই ভ্রূকুটি করুক, আমার কর্তব্য এখনই দেশে ফিরে যাওয়া। তার কারণ আমি

ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রেরিত একটি বিবৃতিতে সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করেছি। এ অবশ্যই এক মর্মান্তিক দুঃখের বিষয় যে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা সৃজনশীল বৎসরগুলি একজনকে কারান্তরালে ব্যয় করতে হয়। কিন্তু এ মূল্য পৃথিবীতে এক পরাধীন জাতিকে চিরকাল দিতে হয়।

আমি আপনাকে এবং মাদাম রলাঁকে আমার গভীরতম শ্রদ্ধা এবং আপনাদের বিবিধ অনুগ্রহের জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই।

শ্রদ্ধা সহকারে
সুভাষ বোস

অধ্যাপক লেসনি-কে

Kurhaus Hochland
Badgastein
২৫ মার্চ ১৯৩৬

প্রিয় অধ্যাপক লেসনি,

কয়েকদিন আগে আপনার পত্র পেয়ে আমি অতিশয় আনন্দিত হয়েছি। ইন্দো-চেকোস্লোভাক সোসাইটি-র জন্য এবং আমাদের দুই দেশের বোঝাপড়া এবং আদান-প্রদানের জন্য আমি সামান্য যেটুকু কাজ করতে পেরেছি, আপনাদের বিশাল হৃদয়ের মহানুভবতাবশত আপনারা তাকে খুব বড় করেছেন। আমি যতটুকুই করে থাকি, তাতে আমি অতিশয় কৃতার্থ এবং জীবনের উদ্দেশ্য বলে আমি যা মনে করি, এ-কাজ সম্পূর্ণভাবে তারই মধ্যে পড়ে। আপনাকে বুঝিয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন, ভবিষ্যতে আমি এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব। আগামী মাসে আমি ভারতে গিয়ে কী অবস্থায় পড়ব, মি. নাম্বিয়ার অবশ্যই আপনাকে বলে থাকবেন। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে আমার ভাগ্যে যাই থাক, এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। শেষ পর্যন্ত আমাদের সকলেরই যাতে মঙ্গল হয় এমন কাজ করবার স্বাধীনতা ও সুযোগ আমি লাভ করব। আমার প্রতি আপনাদের সদয় আচরণের জন্য মিসেস লেসনি ও আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আমার গভীর শ্রদ্ধা গ্রহণ করবেন।

আন্তরিকভাবে আপনাদের
সুভাষ সি. বোস

সন্তোষকুমার সেন-কে[১]
[মূল বাংলায়]

২৫.৩.৩৬

প্রিয় ডা. সেন,

এ-বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। তবে, আমার মনে হয় অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এই ভদ্রলোককে একটি চিঠি লেখা উচিত। যদি সম্ভব হয়, দয়া করে চেষ্টা করুন যাতে ইংল্যান্ডবাসী একজন তাঁর সঙ্গে দেখা করে অ্যাসোসিয়েশনের মনোভাব পুরোপুরি তাঁকে জানিয়ে দেন।

তাঁকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দেওয়া দরকার মি. অগ্নিহোত্রী যদি এর মধ্যে থাকেন, ভারতীয়েরা এই প্রচেষ্টাকে বয়কট করবে এবং এর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।

বোর্ড-এর ঠিকানা যদি জোগাড় করতে পারেন এখনই বিমান ডাকে ভারতে এই ব্যাপারটা জানিয়ে দিন। ভারতে যদি খবরটা পৌঁছয়, বোধহয় কাজ হবে। অতএব সে-রকম চেষ্টা করুন।

আমি কাল সকালে রওনা হচ্ছি, কাজেই ভিয়েনা যাওয়া অসম্ভব।[২]

আপনার
সুভাষচন্দ্র বোস

ড. থিয়েরফেল্ডার-কে

Kurhaus Hochland
Badgastein
২৫ মার্চ ১৯৩৬

প্রিয় ড. থিয়েরফেল্ডার,

আমার ভারতে প্রত্যাবর্তনের সময় উপস্থিত, কিন্তু তার আগে, আমার মনে হয়, অকপটে কিন্তু বন্ধুর মতো কয়েকটি কথা আমার বলা প্রয়োজন।

১৯৩৩ সালে প্রথম যখন আমি জার্মানিতে আসি, আমি আশা করেছিলাম নতুন জার্মান জাতি, জাতীয় শক্তি, এবং আত্ম-মর্যাদার বোধ যার মধ্যে জেগে উঠেছে, অন্য যে-সব জাতি একই লক্ষ্যে সংগ্রাম করছে, তাদের প্রতি স্বভাবতই গভীর সহানুভূতি বোধ করবে। দুঃখের

১. এই পত্রটি বাংলায় লিখিত ছিল। মূল বাংলা পত্র এখন আর পাওয়া গেল না বলে ইংরাজি অনুবাদ থেকে পুনরনূদিত হল।

২. [এই চিঠিতে কোনও ঠিকানা নেই। তবে প্রসঙ্গ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে চিঠিটি ব্যাডগাসটেন থেকে, তাঁর ভারতের উদ্দেশে রওনা হওয়ার প্রাক্কালে লেখা।— সম্পাদক]

বিষয় আজ আমি এই ধারণা নিয়ে ফিরে যাচ্ছি, যে জার্মানির নতুন জাতীয়তাবোধ শুধু যে সংকীর্ণ তাই নয়, স্বার্থপর এবং আক্রমণাত্মক। মিউনিখে হের হিটলারের সাম্প্রতিক বক্তৃতায় নাৎসি দর্শনের সারমর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। আমি জানি, Deutsche Nachrichtenburo এই বক্তৃতা সম্পর্কে একটি অস্বীকৃতি পত্র ভারতে এবং জাপানে পাঠিয়েছে। কিন্তু এই অস্বীকৃতি আমরা গ্রহণ করছি না, কারণ ব্রিটিশ কিংবা জার্মান সংবাদপত্রে এটি প্রকাশিত হয়নি। এই নতুন জাতিবাদী দর্শন, যার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অতিশয় দুর্বল, তাতে সাধারণভাবে শ্বেতকায় জাতিসমূহকে এবং বিশেষভাবে জার্মান জাতিকে গৌরবমণ্ডিত করা হয়েছে। হের হিটলার বলেছেন, অবশিষ্ট পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব করাই শ্বেতজাতির ভবিতব্য। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য এই যে, এখনও পর্যন্ত ইউরোপীয় যত না এশীয়দের ওপর প্রভুত্ব করেছে, এশীয়রা ইউরোপীয়দের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে তার চেয়ে বেশি। এই যুক্তির সারকথা বুঝতে মোগলরা আরবেরা (মুর), হুনেরা এবং অন্যান্য এশীয়রা কত বার ইউরোপ আক্রমণ করেছিল সেটা স্মরণ করাই যথেষ্ট। আমার এ কথা বলার অর্থ এই নয় যে আমি এক জাতির ওপর আরেক জাতির আধিপত্য চাই। আমি শুধু দেখিয়ে দিতে চাই, ইউরোপ এবং এশিয়া পরস্পরের সঙ্গে শান্তিতে থাকতে পারে না, এ কথা ইতিহাসের দৃষ্টিতে অসত্য। সেই কারণেই আমরা বেদনা বোধ করি, যখন দেখি নতুন জার্মান জাতীয়তাবাদ স্বার্থপরতা ও আক্রমণাত্মক মনোভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত। হের হিটলার তাঁর Mein Kampf-এ জার্মানির প্রাচীন ঔপনিবেশিক নীতির নিন্দা করেছিলেন। কিন্তু নাৎসি জার্মানি তার পুরনো উপনিবেশগুলির কথা বলতে আরম্ভ করেছে।

এই যে নয়া জাতিবাদী দর্শন এবং স্বার্থপর জাতীয়তাবাদ, এ ছাড়াও আরেকটি বিষয় আছে, যা আমাদের পক্ষে আরও ক্ষতিকর। ব্রিটেনের আনুকূল্য লাভের উদ্দেশ্যে জার্মানি ভারতকে ও ভারতবাসীদেরকে আক্রমণ করার পন্থা বেছে নিয়েছে। ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট পার্টির ইতিহাসে আমরা বারে বারে তার দৃষ্টান্ত দেখছি। এই প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয় প্রায় দশ বছর আগে, যখন ইংল্যান্ডে প্রচারের উদ্দেশ্যে ইংরাজি ভাষায় নাৎসি পার্টি একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। তাতে হের হিটলার এবং ড. রোজেনবার্গ-এর বই থেকে ভারত-বিরোধী বিভিন্ন অংশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

আমাদের দুই দেশের মধ্যে বোঝাপড়ার জন্য যে কাজ আপনি এবং ডয়েশ অ্যাকাডেমি করছেন তার প্রতি আমরা শ্রদ্ধা পোষণ করি। কিন্তু আমাদের দুঃখ এই যে ওপরে উল্লিখিত কারণে এই কাজের অনেকটাই বিফল হয়ে যাচ্ছে। আমি শুধুমাত্র আশা করতে পারি, শেষ পর্যন্ত আপনাদের প্রচেষ্টা জয়ী হবে; কিন্তু জার্মানির বর্তমান আবহাওয়া আমাদের কাছে খানিকটা হতাশাজনক। আগেকার প্রজন্মের মানুষ, অন্য এক জাতীয় ও রাজনৈতিক দর্শনের প্রভাবের মধ্যে যাঁরা বড় হয়েছেন, বর্তমান প্রজন্মের থেকে তাঁরা অন্য ধরণের ছিলেন। এরা এক স্বতন্ত্র ধারার জাতীয় ও রাজনৈতিক দর্শনের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে। আমাদের পুরনো বন্ধুদের আমরা হারাব না জানি, কিন্তু নতুন প্রজন্ম থেকে নতুন বন্ধু কাউকে পাব কিনা সন্দেহ। অতীত অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি, জার্মান জাতি অতিশয় বন্ধুভাবাপন্ন ছিল, বিশেষত ভারতীয়দের প্রতি। কিন্তু নতুন শিক্ষা যখন ফলবান হবে এখন যারা বড় হচ্ছে সেই প্রজন্মের ওপর, তার পরিণাম কী হবে আমরা কি জানি?

গত জানুয়ারির সাক্ষাতকারের জন্য আপনি যে প্রচেষ্টা করেছিলেন, তার জন্য আমি অতিশয় কৃতজ্ঞ। Ministerialdirektor Dieckhoff এবং Gesandter Dr. Prufer-এর সঙ্গে আমার দুটো দীর্ঘ সাক্ষাৎকার হয়েছিল। আগেকার মতো এবারও তাঁরা দু'জনেই ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে খুব সহৃদয় আচরণ করেছেন। কিন্তু সাক্ষাৎকারের ফলাফলের কথা বলতে গেলে

বলতে হয়, শূন্য। দু'জনের সঙ্গে কথা বলেই আমি এই ধারণা নিয়ে এলাম যে, ভারতের প্রশ্নকে তাঁরা প্রায় কোনও গুরুত্বই দেন না। আমার আরও মনে হয়েছিল, ভারতের সঙ্গে বোঝাপড়ায় যদি আসতে হয়, অন্য মন্ত্রীর কিংবা মন্ত্রীদের কাছে যাওয়া দরকার।

হের হিটলারের বক্তৃতার পরে আমি ভারতীয় সংবাদপত্রে খুব কড়া ভাষায় একটি বিবৃতি দিয়েছি। আমি আশা করি যথাসময়ে বিবৃতিটি প্রকাশিত হবে। কিন্তু ইউরোপ ত্যাগ করার আগে আমি এই কথা বলে যেতে চাই, যে জার্মানি এবং ভারতের মধ্যে বোঝাপড়ার উদ্দেশ্যে আমি কাজ করে যেতে চাই। সে বোঝাপড়া যেন আমাদের জাতীয় আত্মমর্যাদার পরিপন্থী না হয়। আমরা যখন বিশ্বের বৃহত্তম সাম্রাজ্যের সঙ্গে আমাদের স্বাধীনতার জন্য, আমাদের অধিকারের জন্য. সংগ্রাম করছি এবং যখন আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এ সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত আমরা জয়লাভ করব, তখন অন্য কোনও জাতির কাছ থেকে আমাদের জাতির প্রতি কোনও অসম্মান, আমাদের সংস্কৃতির ওপরে কোনও আঘাত আমরা বরদাস্ত করতে পারি না।

আমি আশাবাদী এবং এখনও আমার আশা বর্তমান বাতাবরণের পরিবর্তন হবে এবং শেষ পর্যন্ত আমরা বোঝাপড়ায় পৌঁছতে পারব। ইতিমধ্যে আমি আপনাকে আমার গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং ডয়েশ অ্যাকাডেমি যে কাজ করছে তার সম্পর্কে আমার উচ্চ ধারণার কথা জানাচ্ছি। আপনি কষ্ট করে এই পত্রের উত্তর দেবেন না, কারণ কয়েক দিনের মধ্যেই আমি রওনা হচ্ছি এবং ভারতে পৌঁছলেই, যত দূর সম্ভব, আমাকে গ্রেপ্তার করা হবে।

শ্রদ্ধা সহকারে

আপনার
সুভাষ সি. বোস

পুঃ ওপরে ব্যক্ত মতামত শুধু আমার নিজেরই নয়, সাধারণভাবে জাতীয়তাবাদী ভারতীয়দেরও। আপনি যদি এই চিঠির অনুলিপি কোনও বন্ধুদের কিংবা গভর্নমেন্টের কোনও দপ্তরে পাঠিয়ে দেন, যাতে তাঁরা জানতে পারেন জার্মানির প্রতি ভারতীয় মনোভাব কী, তাতে আমার আপত্তি নেই।

এস. সি. বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

Villach Station
২৬. ৩. ৩৬

Frau N. C. Vetter
Wien - IX
Wahringer Str. 41

প্রিয় মিসেস ভেটার,

আমি এখন যাত্রাপথে, এখান থেকে যে ট্রেন ধরতে হবে তার প্রতীক্ষা করছি। এ ভ্রমণ একটু ক্লান্তিকর। গাসটেন ছেড়ে যেতে আমার খারাপ লেগেছিল। চমৎকার ছিল সেখানকার আবহাওয়া, উষ্ণপ্রস্রবণে স্নানেও আমার উপকার হচ্ছিল। আশা করি আপনি এখন আর শয্যাশায়ী নন। ইদানীং কর্তৃপক্ষ আমার বিষয়ে একটু কৌতূহলী হয়ে উঠছিলেন। যাই হোক, কয়েক ঘন্টার মধ্যেই আমি তাঁদের রাজত্বের বাইরে চলে যাব। আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানবেন এবং ড. ভেটারকেও জানাবেন। আমাকে নিয়ে আপনাদের উৎকণ্ঠার জন্য এবং আপনাদের সহৃদয়তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। এখন আমি তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছি, অতএব আমার জন্য চিন্তার কিছু নেই।

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস

ই. উডস-কে

লয়েড ট্রিয়েসটিনো
পিরোক্যাফো 'কোঁতে ভার্দে'
৩০. ৩. ৩৬

প্রিয় মিসেস উডস,

ব্যাডগাসটেন পরিত্যাগের আগে আপনার ২২ তারিখের পত্র পেয়ে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। আপনার পাঠানো কাটিংগুলি চিত্তাকর্ষক।

এখন আমরা বাহির সমুদ্রে। আবহাওয়া চমৎকার, রৌদ্রোজ্জ্বল। মাথার ওপরে নীল আকাশ, চারিদিকে নীল সমুদ্র। বাতাসের ভিতর দিয়ে, ঢেউয়ের ভিতর দিয়ে একটি জাহাজ পথ কেটে চলেছে। জাহাজ ইতালিয়ানে বোঝাই। তাদের মধ্যে কেউ-কেউ হয়তো আবিসিনিয়ার দুস্তর প্রান্তরের অভিমুখে চলেছে সর্বনাশের আহ্বানে। ভারতীয় কয়েকজন আছে, ইংরেজ কেউ নেই।

ডাবলিনে যখন ছিলাম তখনকার কথা আমার মনে হয়। স্বপ্নের মতো মনে হয়। কত তাড়াতাড়ি দিনগুলি কেটে গেল। সকলের চাইতে আপনাদের প্রতিই আমি সব চেয়ে বেশি

কৃতজ্ঞ, সেখানে আমার বাস এত সুখকর, এত মনোগ্রাহী করেছিলেন, সেজন্য। আপনাদের যেটা আমার সব চেয়ে ভাল লেগেছিল, সেটা হচ্ছে সমস্ত পরিবারের মধ্যে একই ভাব। এ-জিনিস সচরাচর দেখা যায় না। আপনার পুত্র-কন্যারা সকলেই একই রকম সহৃদয়তা আমাকে দিয়েছেন।

আপনি বলেছিলেন এন্ডা চিঠি লিখবেন, কিন্তু লেখেননি, এখন আর লিখবার দরকার নেই, কারণ তা হলে তিনি এখন ভারত সরকারের কু-নজরে পড়বেন। আর, ভারতীয় পুলিশ আয়ারল্যান্ড থেকে আসা কোনও চিঠি অনুমোদন করবে না।

মাদামকে আমি দুটি পত্র লিখেছি, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে কোনও জবাব পাইনি। বোধ হয় চিঠি লিখবার মতো তাঁর শরীরের অবস্থা নেই।

আলাদাভাবে আপনি যে আর দুটি কাগজ পাঠিয়েছেন, তার জন্য ধন্যবাদ।

যদি আপনি Annals of an Active Life-এর কোনও সেকেন্ড-হ্যান্ড কপি পান, দয়া করে আমার দাদা শ্রীশরৎ বোসকে ১, উডবার্ন পার্ক, কলকাতার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন। অবশ্যই রেজিস্ট্রি করে পাঠাতে হবে।

মি. আলেক্স লিন-এর সঙ্গে আপনার যদি দেখা হয়, ওঁকে বলবেন ওঁর বক্তৃতা এবং ওঁর অতি সুন্দর হাস্য-রসিকতা আমার অতিশয় ভাল লেগেছে।

আশা করি ব্যাডগাসটেন থেকে পাঠানো আমার চিঠিটি, যাতে আমি আমার দেশে ফেরার সিদ্ধান্তের কথা এবং সেখানে আমাকে কী করা হবে, সে কথা লিখেছিলাম, সে চিঠিটি পেয়েছিলেন। ভারতের জন্য আমি সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দিয়েছি, তাতে আমার ভারতে ফেরার সিদ্ধান্তের কারণ বুঝিয়ে বলেছি। সব কাগজেই বিবৃতিটি বেরোনো উচিত, যদি না সরকার তাকে আটকে দেয়। একটু খেয়াল রাখবেন, কেননা আমি জানি বিবৃতিটি আপনার ভাল লাগবে।

আমার কোনও সন্দেহ নেই, আপনি যদি লেগে থাকেন তাতে কাজ হবে। মিস এম-এর কাছ থেকে, আমার মনে হয়, আপনি কিছুই পাবেন না। মাদামের ওপর তাঁর প্রভাব যে এত বেশি সেটা আমার দুঃখের কারণ। যাই হোক, আপনাকে যথাসাধ্য চেষ্টা করে যেতে হবে এবং তার ফলও অবশ্যই আপনাকে উৎসাহিত করবে।

যে ফরাসি চিঠি-পত্রের কথা আমি আপনাকে বলেছিলাম, আমি আশা করি হয় আপনি নয় মিস এইলিন ওই দুই মহিলাকে যা জানাবার জানিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরা চমকে যাবেন না।

আপনি ভারতে আসছেন কবে? নিজে যদি না আসেন, আপনার পরিবার থেকে প্রতিনিধি হিসাবে কাউকে পাঠাবেন।

আগামী কাল আমরা সৈদ বন্দরে পৌঁছব। সেখানে এই চিঠি ডাকে দেব। ৮ তারিখে আমরা বোম্বাইয়ে পৌঁছব।

আমার গভীর শ্রদ্ধা নেবেন এবং ছোটদের সকলকে এবং আমার গার্ডিয়ান এঞ্জেলকে, আমার সাদর সম্ভাষণ জানাবেন।

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস

ই. উডস-কে

কোঁতে ভার্দে
সুয়েজ ক্যানাল
৩১. ৩. ৩৬

প্রিয় মিসেস উডস,

গতকালের দীর্ঘ পত্রের পর আমি আজ আবার যে চিঠি লিখছি, তার কারণ আমার কিছু বিশেষ কথা জানাবার আছে। আজ সকালে যখন আমরা সৈদ বন্দরে পৌঁছলাম, কয়েকজন পুলিশ অফিসার আমার খোঁজে জাহাজে ওঠেন। আমার পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং একজন পুলিশকে বলা হয় আমাকে পাহারায় রাখতে। যতক্ষণ জাহাজ সৈদ বন্দরে ছিল পুলিশটি পাহারায় ছিলেন। যখন জাহাজের রওনা হওয়ার সময় হল তিনি নেমে গেলেন আমার পাসপোর্টটি তত্ত্বাবধায়কের জিম্মায় রেখে। বোঝাই যাচ্ছে, ব্রিটিশেরা, যারা এখনও এখানে সবার ওপরে, তারা চায়নি, আমি মিশরে নামি, কিংবা মিশরীয় নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। এ একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নয় কী? আমি জানতাম না মিশরেও আমি একজন বিপজ্জনক ব্যক্তি।

আপনি ইচ্ছে করলে ওই ঘটনাটি যাতে জানাজানি হয় তার ব্যবস্থা করতে পারেন। এর পরে আপনি সহজেই বুঝতে পারেন, বোম্বাইয়ে আমার কী রকম অভ্যর্থনার ব্যবস্থা তারা করবে।

একান্ত আপনার
সুভাষ সি. বোস

পুঃ এখন আমরা সুয়েজ ক্যানাল দিয়ে যাচ্ছি, সুয়েজে পৌছব সন্ধ্যাবেলা। সেখানে আমি চিঠিটি ডাকে দেব।

এস. সি. বি.

সন্তোষকুমার সেন-কে

২. ৪. ৩৬

To Dr. S. K. Sen
Alser Strasse 20/15
Wien IX Autriche

প্রিয় ড. সেন,

এই চিঠির সঙ্গে আমি ভিয়েনার পুলিশ প্রেসিডেন্টকে লেখা আমার একটি চিঠি পাঠালাম। দয়া করে চিঠিটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ এবং টাইপ করাবার ব্যবস্থা করবেন। টাইপ করা অনুবাদের সঙ্গে চিঠিটি পুলিশ প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠাবেন, রেজিস্টার্ড ডাকে, এক্সপ্রেসে।

সঙ্গে প্রাপকের স্বীকৃতিপত্র দেবার দরকার নেই। তিনি উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করবেন কি না জানি না, যদি উত্তর দেন, উত্তরটি আমার অন্যান্য চিঠি-পত্রের সঙ্গে, আমার সেক্রেটারিকে যেমন নির্দেশ দিয়েছি সেইভাবে যেন রাখা হয়।

সৈদ বন্দরে পুলিশ আমার সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করেছে, আমায় সেখানে নামতে দেয়নি, আপনি নিশ্চয় শুনেছেন। আমি জানতাম না মিশরেও আমি এত বিপজ্জনক। বোম্বাইয়ে পুলিশ কী করবে, আপনি কল্পনা করতে পারেন।

আজ আর বেশি কিছু লিখবার নেই, এ পর্যন্ত সমুদ্র শান্তই আছে। কাল আমরা মাসওয়া পৌঁছব, সেখানে চিঠিটি ডাকে দেব। আশাকরি আপনি যথা সময়ে পাবেন।

আশা করি, আপনারা সবাই ভাল আছেন, সৈদ বন্দরে পৌঁছবার আগে আমি আপনাকে একটি চিঠি লিখে ডাকে দিয়েছি।

আপনার
সুভাষ সি. বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

সংশোধিত এবং অনুমোদিত
পাঠ-সম্ভব নয়
২৪-৪-৩৬
লেফটেন্যান্ট কর্নেল আই. এম. এস.
অধ্যক্ষ
যারবেদা কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার

ঠিকানা:

অধীন: ডি. আই. জি., আই. বি., সি. আই. ডি
(বাংলা)
লর্ড সিনহা রো
কলকাতা
২৪. ৪. ৩৬

প্রিয় মিসেস ভেটার,

ভারতে পৌঁছে আপনাকে চিঠি দেব বলেছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি যে অবস্থায় চিঠি দিচ্ছি সেটা খুব অনুকূল নয়। ভারতের মাটিতে পা-রাখা মাত্র আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কয়েক দিন আমি বোম্বাইয়ের একটি জেলে ছিলাম, তারপর আমাকে এখানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে, পুণাতে। বোম্বাই থেকে এ জায়গাটি ট্রেনে চার ঘণ্টার পথ।

কী লিখব সত্যিই বুঝতে পারছি না, কেননা মাথার ওপর দামোক্লেসের তরবারীর মতো নিষেধের খড়্গ ঝুলে আছে।

এখানকার গরম খুবই কষ্টকর, একে তো আমি গরম কোনওদিনই পছন্দ করি না এবং এই

অঞ্চলের গ্রীষ্মকাল চিরকালই কষ্টদায়ক,—আমার নিজের বেলায় পরিবর্তন বড় আকস্মিক হয়েছে। এক মাসও হয়নি, আমি ব্যাডগাসটেন-এ তুষারের পুরু আস্তরণের ওপর দিয়ে হাঁটছিলাম! যদি আপনাকে আমাদের গরমের খানিকটা দিয়ে আপনাদের ঠান্ডার খানিকটা নিতে পারতাম!

আপনার হয়তো জানতে ভাল লাগবে, আমাকে যে জেলখানায় রাখা হয়েছে, মহাত্মা গান্ধী তাঁর কারাবাসের অধিকাংশ কাল সেখানেই কাটিয়েছেন।

ওখানে আমার সব বন্ধুদের আমার কথা বলবেন। কঠোর নিয়ম-কানুনের জন্য আমি তাঁদের আলাদা করে চিঠি দিতে পারছি না। তাঁদেরকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাবেন। প্রেসিডেন্ট ভেটার ও আপনি আমার গভীর শ্রদ্ধা জানবেন। আশা করি আপনারা সবাই ভাল আছেন।

আপনাদের
সুভাষ সি. বোস

যারবেদা কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার
পুনা
২৪. ৪. ৩৬

To
Mrs. N. C. Vetter
Wahringer Strasse 41
Vienna-IX

পুঃ যদি আমায় চিঠি লেখেন, এই ঠিকানায় লিখবেন: c/o কলকাতার ঠিকানা। যেখানে আমার চিঠি সেন্সর করা হয়— জেলখানার ঠিকানায় পাঠাবেন না।

এস. সি. বি.

কংগ্রেস সভাপতি (রাজেন্দ্রপ্রসাদ)-এর নিকট (প্রস্তাব)

১মে ১৯৩৬

কংগ্রেস সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও শ্রীভুলাভাই দেশাইয়ের প্রদত্ত বিবৃতির প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। ভারতীয় প্রচারের সম্পর্কে দুটি বস্তু প্রয়োজন : (১) সুযোগ্য আস্থাভাজন প্রতিনিধি, এবং (২) প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ। এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন, যে অর্থ যত বেশি পাওয়া যাবে, প্রচারের কাজ তত বেশি হবে। তা হলেও, প্রচুর অর্থ ব্যতিরেকেও অনেক প্রয়োজনীয় কাজ করা যেতে পারে, যদি আমাদের কাজ করার ইচ্ছা থাকে। বস্তুত, ইউরোপ এবং আমেরিকায় এমন অনেক ভারতীয় আছেন, যাঁরা মূল্যবান প্রচারের কাজ করছেন, কেউ নিজের উদ্যোগে বিশেষ বিশেষ সংগঠনের নামে, যে-সব সংগঠন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের

কোনও আর্থিক সাহায্য ছাড়াই কাজ করেছে। সেগুলির মধ্যে কোনও কোনওটিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যদি তার প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করে, তা হলে, অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ ছাড়াই তারা দেশের জন্য মূল্যবান কাজ করতে পারে।

পরলোকগত শ্রীবিঠলভাই প্যাটেল সব সময়ে বলতেন কংগ্রেসের নামে যদি তিনি কথা বলতে পারতেন, বিদেশে তাঁর কাজ অনেক বেশি ফলপ্রসূ হত। আমার মতো ক্ষুদ্রতর ব্যক্তিদেরও একই অভিজ্ঞতা। অর্থের অভাব যদি কংগ্রেসের এ ক্ষেত্রে একমাত্র বাধা হয়ে থাকে, কংগ্রেস কি আমাকে (এবং আমার মতো অন্য কর্মীদের) অন্তত এই অধিকারটি দেবে, যাতে আমরা কংগ্রেসের নামে কাজ করতে এবং কথা বলতে পারি? তা হলে কংগ্রেস থেকে কোনও অর্থ বরাদ্দ ছাড়াই আমরা দেশের আরও বেশি সেবা করতে পারি, আরও বেশি কাজ করে দেখাতে পারি। কংগ্রেস সভাপতিকে আমি সোজাসুজি প্রশ্ন করলাম এবং অনুরোধ করছি যেন তিনি একটি সোজাসুজি জবাব দেন।

তুষারকান্তি ঘোষ-কে[১]

১৮ মে ১৯৩৬

প্রিয় তুষারবাবু,

আমি কেমন আছি সে বিষয়ে এক ছত্র আপনাকে লিখে জানাই প্রথমত, গরমে আমি অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছি এবং এর হাত থেকে বাঁচার কোনও উপায়ই দেখতে পাচ্ছি না। দ্বিতীয়ত, ব্যায়ামের যথেষ্ট সুযোগ পাচ্ছি না। গভর্নমেন্টের কাছে আমি দরখাস্ত করেছি জেলের প্রাচীরের মধ্যে হেঁটে বেড়াবার অনুমতি দেবার জন্য। ভয় হচ্ছে, যথেষ্ট ব্যায়ামের অভাবে আবার আমার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে পারে। তাই, আশায় আছি প্রয়োজনীয় অনুমতি পাব।

জওহরলাল নেহরু-কে

অধীন : পুলিশ অধীকক্ষ
দার্জিলিং
৩০ জুন ১৯৩৬

প্রিয় জওহর,

তোমার ২২ তারিখের চিঠি আমি ২৭ তারিখে পেয়েছি এবং অতিশয় আনন্দিত হয়েছি। খবরের কাগজ থেকে আমার ধারণা হয়েছে তুমি অত্যধিক পরিশ্রম করছ এবং তোমার স্বাস্থ্যের জন্য আমার দুশ্চিন্তা হয়েছিল। অল্প দিনের জন্য হলেও, তুমি মুসৌরি গিয়েছ বিশ্রামের জন্য,

---

১. এই পত্রের বাকি অংশ পাওয়া যায়নি।

জেনে আমি খুশি হয়েছি। অত্যধিক পরিশ্রম পরিহার করা তোমার পক্ষে কত কঠিন, আমি বুঝতে পারি। তবু, আমি আশা করব, তুমি অত্যন্ত বেশি পরিশ্রম করবে না। তোমার স্বাস্থ্য যদি ভেঙে পড়ে, তাতে কারও কোনও উপকার হবে না।

তোমার ভগ্নীপতি রঞ্জিতের কথা তুমি যা লিখেছ, সে অতি দুঃসংবাদ। যাই হোক, ডাক্তারেরা যে খুব গুরুতর কিছু আশঙ্কা করছেন না, তাতে একটু স্বস্তি পেলাম। আমরা আশা করব, বায়ু পরিবর্তন এবং বিশ্রামের ফলে উপকার হবে।

আমি এখানে মোটামুটি ভালই আছি। আমার পেটের একটু গোলযোগ চলছে এবং একটু ফ্লুর মতোও হয়েছিল (সেটা হয়তো গলার একটি সংক্রমণ)—কিন্তু এসব সময় হলেই সেরে যাবে।

নীচে যে বইগুলির তালিকা দিলাম, সেগুলি যদি তোমার লাইব্রেরিতে থাকে এবং যদি তোমার অসুবিধা না হয় আমাকে একটি দুটি করে পাঠিয়ে দাও।

1. Historical Geography of Europe by Gordon East
2. Clash of Cultures and Contact of Races by Pitt Rivers
3. Short History of Our Times by J. A. Spender
4. World Politics 1918-33 by R. P. Dutt.
5. Science and the Future by J. B. S. Haldane
6. Africa View by Huxley
7. Genghis (Chenghis) Khan by Ralph Fox
8. The Duty of Empire by Barnes,

এই সব বইয়ের বদলে অন্য কোনও সম্প্রতি প্রকাশিত ভাল বইও তুমি পাঠাতে পারো। চিঠি বা বইপত্র পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়—

c/o Superintendent of Police, Darjeeling

আশা করি তোমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে।

তোমার প্রীত্যর্থী
সুভাষ

সংশোধিত এবং অনুমোদিত
পুলিশ অধীকক্ষ
দার্জিলিং

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু
এলাহাবাদ

নাওমি সি. ভেটার-কে

সংশোধিত এবং অনুমোদিত
স্বাক্ষর (অস্পষ্ট)
৬/৭
পুলিশ অধীক্ষক
দার্জিলিং

অধীন : পুলিশ অধীক্ষক
দার্জিলিং
বেঙ্গল, ইন্ডিয়া
৫ জুলাই ১৯৩৬

প্রিয় মিসেস ভেটার,

পুনার যারবেদা জেল থেকে গত ২৪ এপ্রিল আমি যে চিঠিখানি লিখেছিলাম, সেটি পেয়েছেন কি না জানি না। তার পরে আমাকে বঙ্গদেশের উত্তরে দার্জিলিং-এর কাছে একটি জায়গায় আনা হয়েছে। মিসেস হারগ্রোভ চিঠিতে জানিয়েছেন আপনি এখন চেকোস্লোভাকিয়াতে। বোধহয় সেই কারণেই আমি আপনার উত্তর পাইনি। শুনেছি এ বছর ভিয়েনায় গ্রীষ্মকাল এখন পর্যন্ত সুখকর হয়নি। চেকোস্লোভাকিয়ায় আবহাওয়া কেমন পেলেন?

এই জায়গাটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০০০ মিটার ওপরে। জায়গাটি হিমালয় পর্বতমালার মধ্যে। এখানকার আবহাওয়া আরামদায়ক, যদিও বৃষ্টি বেশি হয়। সবাই বলে এখানে দুটি মাত্র ঋতু, শীত এবং বর্ষা। আমি গৃহবন্দি আমার দাদার একটি বাড়িতে। যদিও এখানে নানারকম কড়াকাড়ি আছে, কিন্তু বন্দিজীবনের পক্ষে একে বেশ উন্নত ব্যবস্থা বলা যায়।

অস্ট্রিয়ার কথা আজকাল ভারতের খবরের কাগজে প্রায়ই থাকে। ওখানকার Heimwehr এবং যাজক দলের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলছে সে-বিষয়ে অনেকের খুব আগ্রহ। কোনও কোনও সংবাদপত্রে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে সম্রাট শরৎকালের মধ্যে হয় Hofburg-এ কিংবা Schonbrunn Palace-এ ফিরে যাবেন, তবে আপনি তো জানেন খবরের কাগজের ভবিষ্যদ্বাণীর কী মূল্য।

এখান থেকে আপনাকে লিখবার বিশেষ কিছু নেই। তবে আপনি ওখান থেকে হয়তো কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয় লিখতে পারেন। আপনি এবং ড. ভেটার কেমন আছেন?

আপনারা দু'জনে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন।

আপনার
সুভাষ সি. বোস

পুঃ ঠিকানার বদল লক্ষ করবেন।
এস. সি. বি.

মিসেস এন. সি. ভেটার
ভিয়েনা

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার-কে
[মূল বাংলায়]

সংশোধিত এবং অনুমোদিত
(স্বাক্ষর অস্পষ্ট)
পুলিশ অধীক্ষক
দার্জিলিং

c/o Superintendent of Police
Darjeeling
১৮.৭.৩৬

প্রিয়বরেষু

আপনার ১২/৬ তারিখের পত্র অনেক দিন হইল পাইয়াছি। নিজ দোষে উত্তর দিতে বিলম্ব হইল—তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। ইতিপূর্বেও অনেকদিন আপনাকে পত্র দিই নাই এবং আপনার দিক হইতে কোনও ত্রুটি হয় নাই—ত্রুটি আমার দিক হইতে হইয়াছিল। এখানে আসিয়া অনেকটা আরাম হইয়াছে বিশেষত পুনার গরমের পর। তবে পেটের গোলমাল যাইতেছে না এবং তাছাড়া গলায় বোধ হয় একটা infection হইয়াছে।

পেটের জন্য এমেটিন ইন্‌জেকশন লইতেছি এবং গলার জন্য auto-vaccine করিতে দেওয়া হইয়াছে। দেখা যাক উপকার হয় কি না।

আপনাদের কথা প্রায়ই স্মরণ করিয়া থাকি। কবে যে আবার দেখা হইবে তাহা ভগবানই জানেন। মধ্যে ২ আপনার পত্র পাইলে সুখী হইব—একথা বলাইবাহুল্য। তবে যদি নিয়মিত রূপে উত্তর না দিই তাহা হইলে ক্ষমা করিবেন।

এখানে আসিবার পর "আনন্দবাজারের" খোঁজ করিয়াছিলাম—কিন্তু আনন্দবাজার এখানে কোনও এজেন্টের কাছে নাকি আসে না।

ভালবাসা জানিবেন।

ইতি আপনাদের
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

কিটি কুর্টি-কে

অধীন : পুলিশ অধীক্ষক

সংশোধিত এবং অনুমোদিত
পুলিশ অধীক্ষক
দার্জিলিং

দার্জিলিং
ইন্ডিয়া
২৫ জুলাই ১৯৩৬

প্রিয় মিসেস কুর্টি,

আপনি অত্যন্ত সহৃদয় বলেই আমাকে চিঠি দিয়েছেন। আপনার ২৫ মে তারিখের চিঠি আমি কিছুদিন আগে পেয়েছি। আমার চিঠি দিতে এত বিলম্বের জন্যে আমি দুঃখিত। ভারতে আমার কী হয়েছে আপনি কী করে জানলেন? আপনি ইংল্যান্ডের সংবাদপত্র পড়েন আমার জানা ছিল

না এবং বোম্বাই পৌঁছে আমি আপনাকে চিঠি দিইনি। বার্লিনের কাগজে কি কোনও খবর বেরিয়েছিল?

আপনার কবিতা এবং মনস্তত্ত্ব-বিষয়ক আপনার প্রবন্ধাদি প্রকাশ করবেন, আপনার চিঠিতে জানতে পেরে আমি সে-বিষয়ে আগ্রহ বোধ করছি। আপনাকে বলেছি কিনা জানি না। আমি মনস্তত্ত্বের ছাত্র ছিলাম, কিন্ত পরে আমার রাজনৈতিক কাজকর্মের জন্য সে-দিকটা আমাকে অবহেলা করতে হয়। এখানে আসার পর থেকে আমি আবার কিছু-কিছু মনস্তত্ত্ব পড়বার চেষ্টা করছি। বর্তমানে আমি "স্বপ্ন" বিষয়ে ফ্রয়েডের লেখা মন দিয়ে পড়ছি এবং তাঁর তত্ত্ব দিয়ে আমার নিজের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করছি। আপনি কি আমায় বলতে পারেন, অন্য কোনও মনস্তত্ত্ববিদ স্বপ্নের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে ফ্রয়েডের তত্ত্ব নিয়ে আরও কাজ করেছেন কি না? যদি করে থাকেন এ বিষয়ে প্রকাশিত অন্য বইয়ের নাম আমাকে দয়া করে জানাবেন, যদি তার ইংরেজি অনুবাদ থাকে। কোনও ইংরেজ মনস্তত্ত্ববিদ এ নিয়ে কোনও কাজ করেছেন বলে আমার মনে হয় না—তবে জার্মান কিংবা ফরাসি কিংবা অস্ট্রীয় মনস্তত্ত্ববিদেরা স্বপ্ন বিষয়ে ফ্রয়েডের কাজ হয়তো আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়ে থাকবেন।

আরেকটি বিষয়েও আমার খুব আগ্রহ, কিন্তু তা নিয়ে আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে আমি দ্বিধা বোধ করছি কেননা বিষয়টি একটু ব্যক্তিগত। মনস্তত্ত্বে আপনার শিক্ষকদের নাম, এবং আপনি পরীক্ষা কোথায় দিয়েছিলেন, আমার জানবার ইচ্ছা।

আমার এ প্রশ্ন করার একটু উদ্দেশ্য আছে। যে বিষয়ে আপনার আগ্রহ, অর্থাৎ শিক্ষাবিষয়ক মনস্তত্ত্ব সারা পৃথিবীতে পুরুষ এবং নারীর তাতে আগ্রহ বোধ করা উচিত। রীতিমতো কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী না হয়েও (আমার ধারণা মনস্তত্ত্ব অধ্যয়নের জন্য আপনি কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হিসাবে নাম লেখাননি) যদি আপনি সে বিষয়ের সার্থক ছাত্রী হতে পেরে থাকেন, অন্য কেউ যার এ বিষয়ে আগ্রহ আছে কিন্তু রীতিমতো ছাত্র হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে যোগ দিতে পারছে না, কেন সে আপনার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে মনস্তত্ত্ব নিয়ে সার্থকভাবে পড়াশোনা করতে পারবে না?

আমার খুব জানতে ইচ্ছা করে, জুরিখে যখন ড. ইয়ুং-এর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হয়, তখন আপনার তাঁকে কী রকম লাগে। আগে কি তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে? ভাল কথা, আমাকে মনোবিশ্লেষণ-সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে ড. ইয়ুং-এর সর্বশেষ বই অথবা পুস্তিকাটির কথা বলতে পারেন? অবদমন বিষয়ে ফ্রয়েডের ধারণা এবং মনোবিশ্লেষণে ফ্রয়েডের পদ্ধতির বিষয়ে তাঁর নিজের যে সব চিন্তা-ভাবনা, তাকে তিনি কতটা পূর্ণতর করেছেন? গত দশ বছরে তিনি যে কাজ করেছেন তার কথা আমি কিছুই জানি না।

আর্থার অ্যাভালন-এর বইগুলির সঙ্গে আমার অবশ্য পরিচয় হয়েছে, কিন্তু হাইনরিখ জিমার-এর কিছু আমি পড়িনি। তাঁর কী কী বই আছে? ইংরেজিতে কি তার অনুবাদ হয়েছে? আপনি কি ইংরেজিতে অ্যাভালন-এর বই পড়েছেন?

আপনি C. G. Jung-এর লেখা Soul Problems of the Present Time আর Reality of the Soul-এর কথা বলেছেন, ইনি আর জুরিখের সেই মনস্তত্ত্ববিদ, আমার মনে হয়, এক ব্যক্তি নন, ওই বই দু'খানি কি শুধুমাত্র মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা-সংক্রান্ত, না কি দার্শনিক সমস্যাও তার সঙ্গে আলোচিত? এবং এই Jung কে? তিনি কোথায় কাজ করছেন? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পাঠাগারে বই দু'খানি আছে কি না আমি খোঁজ করব।

শিক্ষা-মনস্তত্ত্ব ছাড়াও শিক্ষা-পদ্ধতিতে কি আপনার আগ্রহ আছে? যদি থাকে আমি আপনার কাছে এমন কয়েকজনের নাম সুপারিশ করতে পারি সুইজারল্যান্ডে যাঁদের আপনি পাবেন, যাঁরা শিক্ষার নতুন-নতুন পদ্ধতি নিয়ে কাজ করছেন।

আপনি কি Schweitzer-এর Indian Mysticism and Ethics-এর ওপর বইখানি পড়েছেন? বইটি গত বছর জার্মানিতে প্রকাশিত হয়েছে। আপনার বইটি কেমন লেগেছে?

Prof Hauer-এর কোনও লেখা আপনি কি পড়েছেন? তিনি বোধ হয় Gottingen বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক এবং Glaubensbeurgung—এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাঁর চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে সাধারণের আগ্রহ কি বাড়ছে না কমছে?

আমার দীর্ঘ নীরবতার ক্ষতিপূরণ হিসাবে, আমার মনে হয়, যথেষ্ট দীর্ঘ পত্রই লিখলাম। আশা করি আমার হাতের লেখা আপনি পড়তে পারবেন। অনেকগুলি প্রশ্ন করলাম, কিছু মনে করবেন না।

বার্লিনের অলিম্পিক গেমস নিয়ে আপনি বোধহয় এখন খুব ব্যস্ত।

মি. কুর্টি এবং আপনি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানবেন।

আপনাদের
সুভাষ সি. বোস

মিসেস কিটি কুর্টি
বার্লিন

পুঃ আমার বর্তমান ঠিকানা যদি আপনি হারিয়ে ফেলেন, যখন ইচ্ছে আমার বাড়ির ঠিকানায় চিঠি দিতে পারেন। ১, উডবার্ন পার্ক, কলকাতা। সেখান থেকে চিঠিটি আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

এস. সি. বি

জর্জ ডা সিলভা, মহোকোশল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সহ সভাপতি-কে

১৯ অগস্ট ১৯৩৬

আপনাকে চিঠি লেখার পরে আমি দার্জিলিং-এর ব্যাকটেরিয়োলজিস্ট-এর কাছ থেকে রিপোর্ট পেয়েছি এবং থ্রোট সোয়াব থেকে তিনি যে অটোভ্যাকসিন প্রস্তুত করেছেন, তাও পেয়েছি। এই বস্তু দিয়ে তৈরি আটটি ইঞ্জেকশন আমাকে নিতে বলা হয়েছে। তিনি একই সঙ্গে এইসব ব্যাসিলাই পেয়েছেন: নিউমোব্যাসিলাস, নিউমোকক্কাস, স্ট্রেপ্টোকক্কাস, মাইক্রোকক্কাস, ক্যাটার‍্যালিস, স্ট্যাফাইলোকক্কাস এবং কিছু ডিপথেরয়েড ব্যাসিলাই। আমাকে যে ডাক্তার দেখেন তিনি বলেছেন, যদিও এর মধ্যে কোনও কোনও ব্যাসিলাই স্বাভাবিক অবস্থাতেও মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়, আমি যাকে ইনফ্লুয়েঞ্জার লক্ষণ মনে করেছিলাম সে-সব আসলে গলায় সংক্রমণের জন্য হয়েছে। তাই যদি হয়, দুশ্চিন্তার বিশেষ কোনও কারণ নেই। না হলে আমাকে আবার ফুসফুসের কথা ভাবতে হবে, কারণ সন্ধ্যাবেলায় জ্বর-জ্বর ভাব এবং অল্প-স্বল্প কাশি ও ওজন-হ্রাস সেই দিকেও ইঙ্গিত করে। যাই হোক, আমি এখন ভালটারই আশা করছি।

এমেটিন ইনজেকশন এখনকার মতো আমি বন্ধ করে দিয়েছি, এবং অটোভ্যাকসিন থেকে অন্য ইনজেকশনগুলো নিচ্ছি। কিন্তু এমেটিনের আরেকটা কোর্স আমাকে নিতে হবে, কেননা প্রথম কোর্সটাতে আমার বিশেষ উপকার হয়নি এবং পেটের গণ্ডগোল থেকেই গেছে।

কলকাতায় এক বন্ধু-কে

৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬

এখানে এসে যেমন দেখেছিলে, আমার স্বাস্থ্য তেমনই আছে। গলার অসুখটা অটোভ্যাকসিন ইঞ্জেকশন দিয়েও সারেনি। তুমি আমার সঙ্গে দেখা করে যাওয়ার পর দার্জিলিঙের সিভিল সার্জন আমাকে দেখতে এসেছিলেন। তাঁর মতে আমার অসুখের মূল কারণ গলার সংক্রমণ এবং গলার জন্য আরেকটি অটোভ্যাকসিন তৈরি করতে বলেছেন। আমার পেটের গণ্ডগোল এবং যকৃতের অঞ্চলের ব্যথা সম্পর্কে তাঁর মত, গত বছর ভিয়েনায় আমার যে অস্ত্রোপচার হয়েছিল, ও তারই প্রতিক্রিয়া। তিনি এমেটিন ইঞ্জেকশনেরও আরেকটা কোর্স নিতে বলেছেন। আরও এক মাস আমি এই চিকিৎসা চালাব এবং তাতে যদি আমার অবস্থার উন্নতি না হয় ভাল করে ভেবে দেখতে হবে কী করব।

সন্তোষকুমার সেন-কে

সংশোধিত এবং অনুমোদিত
স্বাক্ষর
পুলিশ অধীক্ষক
দার্জিলিং

পুলিশ অধীক্ষক
দার্জিলিং

৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬

প্রিয় ড. সেন

আমার এক বন্ধু শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সান্যালের জন্য আপনাকে একটু কষ্ট দিচ্ছি। কলকাতা হাইকোর্টের তিনি একজন অ্যাডভোকেট। অল্পদিনের মধ্যে ভিয়েনা যাচ্ছেন তীব্র এবং দীর্ঘস্থায়ী...(তাঁর অসুখের এইভাবেই সব চেয়ে ভাল বর্ণনা দেওয়া যায়)। আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শরতের তিনি সহপাঠী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি কোঁতে ভার্দে জাহাজে যাত্রা করবেন। জাহাজটি ১০ সেপ্টেম্বর বোম্বাই থেকে রওনা হবে। অতএব তিনি গন্তব্য বন্দরে (ভেনিস কিংবা জেনোয়া) পৌঁছবেন ২১ তারিখ নাগাদ। সে হিসাবে পরের দিনই তাঁর ভিয়েনা পৌঁছনো উচিত। কোন ডাক্তারকে দিয়ে তাঁর চিকিৎসা করালে ভাল হয় সে বিষয়ে সেখানে কয়েকজন ভারতীয় ডাক্তারের সঙ্গে তিনি পরামর্শ করতে চান। আমি এ বিষয়ে তাঁকে কোনও পরামর্শ দিতে পারিনি। এ বিষয়ে কোনও অভিজ্ঞ বন্ধুও ভিয়েনায় আমার নেই। তিনি অধ্যাপক ভ্যান নুরডেন-এর কথা শুনেছেন, খাদ্য-বিশেষজ্ঞ হিসাবে যাঁর খ্যাতি নাকি আন্তর্জাতিক। তবে তিনি গ্রন্থি বিশেষজ্ঞ কিনা আমার জানা নেই। শ্রীসান্যালকে চিকিৎসার ভার কে নিতে পারেন, আপনি সহজেই সে খবর সংগ্রহ করে তাঁকে যথাযথ পরামর্শ দিতে পারেন।

তাঁকে আমি c/o American Medical Association ছাড়া Alser Strasse-এর আপনার আগেকার ঠিকানাও দিয়েছি এবং তাঁকে বলেছি চিঠি দিয়ে কিংবা টেলিগ্রাম করে আপনাকে তাঁর ভিয়েনা পৌঁছাবার তারিখ জানাতে। আপনি যদি তাঁর কাছ থেকেই সেটা জানতে পারেন, ভাল কথা; যদি না পারেন তা হলেও আপনি তাঁর হদিশ পেতে পারেন, কারণ আপনি ভিয়েনায়

লয়েড ট্রিয়েসটিনো-র অফিস থেকে সহজেই জানতে পারেন ওখান থেকে ভিয়েনা যাবার পরের ট্রেন কখন ছাড়বে। তখন আপনি স্টেশনে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেন। আমি তাঁকে আরও বলেছি, স্টেশনে যদি কারও দেখা না পান, হোটেল ডি ফ্রান্সে-এ উঠতে পারেন। অতএব তাঁর পৌঁছনোর পর আপনাকে সেখানে পৌঁছতে হবে। যদি কোঁত ভার্দে ভর্তি থাকে এবং তিনি তাতে জায়গা না পান, তা হলে তাঁকে পরের জাহাজ ধরতে হবে।

আশা করি আপনি ভালই আছেন। আমার কোনও সন্দেহ নেই আপনি ওঁর জন্য যথাসাধ্য করবেন। আর আমার লিখবার দরকার হবে না। বন্ধুদের সবাইকে আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানাবেন।

আপনার
সুভাষ সি. বোস

ড. এস. কে. সেন
ভিয়েনা

সহ সভাপতি
মহোকোশল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি
মি. জর্জ ডা সিলভাকে

অধীন : পুলিশ অধীক্ষক
দার্জিলিং
১১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬

প্রিয় ডক্টর,

আপনার দু'খানি চিঠির জবাব না দেওয়ার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি। ৬ অগাস্টের চিঠি আমি পেয়েছি ১১ অগাস্ট আর ১৬ অগাস্টের চিঠিটি আমার হাতে আসে ২৭ অগাস্ট।

আপনাকে চিঠি দেওয়ার পর আমার অটোভ্যাকসিনের কোর্স শেষ হয়েছে। তাতে কোনও কাজ হয়নি, আরেকটা ভ্যাকসিন তৈরি করতে হবে। কিন্তু এখন আমার সন্দেহ হতে আরম্ভ করেছে, সংক্রমণের যেটা মূল তার চিকিৎসায় এইসব ইঞ্জেকশনে কি কোনও কাজ হবে? ৯ তারিখে স্যর নীলরতন সরকার এবং দার্জিলিং-এর সিভিল সার্জেন একত্রে আমাকে পরীক্ষা করেন, গভর্নমেন্টের কাছে তাঁরা তাঁদের রিপোর্ট পাঠিয়েছেন বলে আমার ধারণা। আমি এখনও জানি না ওঁরা কী পেয়েছেন। জানতে পারলে আমি আপনাকে জানাব, ডাক্তার হিসাবে আপনার জানবার ইচ্ছা হতে পারে।

আমার ওজনের কথা জানতে চেয়েছেন। সেটি এরকম : ১) ১৫ এপ্রিল যারবেদা জেলে ১৭৪ ১/২ পাউন্ড, ২) জুনের মাঝামাঝি কার্শিয়াং-এ ১৭১ পাউন্ড, ৩) জুলাইয়ের শেষে, কার্শিয়াং-এ ১৬৮ পাউন্ড, ৪) ৯ সেপ্টেম্বর, কার্শিয়াং-এ ১৬৪ পাউন্ড।

জানুয়ারি ১৯২১-এ সিওনি জেলে ঢুকবার সময়ে আমার যা ওজন ছিল, ১৯৩২ সালে আমার শারীরিক অসুস্থতা আরম্ভ হওয়ার আগে আমার স্বাভাবিক ওজন তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল—১৮৫ পাউন্ড।

হ্যাঁ, আমার আর যে উপসর্গের কথা আপনাকে আগের চিঠিতে লিখেছিলাম, সেগুলো থেকেই গেছে, যেমন অল্প-অল্প জ্বর আর লিভারের জায়গাতে একটা চাপা যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণাটার

খাওয়ার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই, আর আগে আমার পিত্তাশয়ের যে তীব্র যন্ত্রণাটা হত (সেটা পিত্তাশয়ের অস্ত্রোপচারের পর সেরে যায়) এটা সে ধরনের নয়। এখন আমি এমেটিন ইঞ্জেকশনের কোর্সটা আবার নিচ্ছি এবং এই ঘন-ঘন ছুঁচ ফোটানোর ফলে আমার দুই বাহু টনটন করছে। রোগীদের দুর্ভাগ্যক্রমে আপনারা ডাক্তারেরা এইসব ইঞ্জেকশন সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন এবং আপনাদের অত্যাচার আমাদের সহ্য করে যেতে হয়।

কয়েকদিন আমরা উষ্ণ সূর্যালোক পেয়েছিলাম, আবার ঝোড়ো হাওয়া আর মেঘলা ভাব শুরু হয়েছে। আমরা আশায় আছি, এ বছরের বর্ষাঋতুর এইটাই শেষ ধাক্কা, তবে বলা যায় না। এই অঞ্চলে বর্ষার আবহাওয়া চলতে পারে সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত। আশা করি আপনারা সবাই ওখানে ভাল আছেন। শ্রদ্ধা সহকারে

আপনার
সুভাষ সি. বোস।

ড. জর্জ ডা সিলভা
জব্বলপুর

অমরকৃষ্ণ ঘোষ-কে

৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬

প্রিয় অমরবাবু,

আপনি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার বোর্ড-এ পুনর্নির্বাচনের প্রার্থী হয়েছেন জেনে আমি আগ্রহ বোধ করছি। আমি আন্তরিকভাবে আশা করি আপনি এ বারও সফল হবেন, এবং আমি কামনা করি ভাগ্য আপনার সহায় হোক। আপনি বুঝতে পারছেন, আমার বর্তমান অবস্থায় আপনার কোনও সহায়তা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় এবং আপনার নির্বাচকমণ্ডলীর ওপরে আমার কিছুমাত্র প্রভাব আছে কি না তাও আমি জানি না। যাই হোক, আশা করি আপনার গতবারের বন্ধু এবং সমর্থকেরা এবারেও আপনার পাশে দাঁড়াবেন এবং আপনাকে নির্বাচিত করতে সক্ষম হবেন। বোর্ডের সদস্য হিসাবে আপনার অনেক প্রয়োজনীয় এবং গঠনমূলক কাজ করবার আছে, আমার শুভ কামনা আপনার সঙ্গে থাকবে।

কিছুদিন থেকে আমার স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছে না। আশা করি আপনারা সবাই ভাল আছেন।[১]

তুষারকান্তি ঘোষ-কে

৮ নভেম্বর ১৯৩৬

প্রিয় তুষারবাবু

আমার ধারণা ছিল আপনার শেষ চিঠিটির জবাব আমি দিয়েছি এবং আপনিই চিঠি লেখা বন্ধ করেছেন, কিন্তু আমার ফাইল ঘেঁটে আমি দেখলাম, দোষ আমারই। অনেক দিন আগে পাওয়া

১. এই চিঠির শেষাংশ পাওয়া যায়নি।

আপনার চিঠির জবাব আমি দিইনি। যাই হোক এখন আমি তাড়াতাড়ি সে ত্রুটি সংশোধন করছি।

দুর্গাপূজা এসে চলে গেল। আপনার দৈনন্দিন কাজের জোয়াল আপনি নিশ্চয় তুলে নিয়েছেন, সরকারের কারাগারে যে বন্দি তার অবকাশ কিন্তু অবিচ্ছিন্ন।

আমার বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা সম্ভাষণ গ্রহণ করুন, পরিবারের অন্য সবাইকে আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা সম্ভাষণ জানান। আপনারা সবাই কেমন আছেন?

আমার স্বাস্থ্যের বিষয়ে নতুন কোনও খবর দেওয়ার নেই, শুধু এইটুকু ছাড়া, যে আমার ওজন আরও কমেছে। তবে আমার সায়েটিকা এখন অনেক ভাল, ফলে আমি চলাফেরা করতে পারছি।

আপনার
সুভাষ সি. বোস

শরৎচন্দ্র বোস-কে[১]

অধীন : পুলিশ অধীক্ষক
দার্জিলিং
৪. ১২. ৩৬

প্রিয় মেজদা

তোমার ২৭ নভেম্বরের চিঠি ২ তারিখে পেয়েছি। নিখোঁজ চিঠিটি যথারীতি অনুমোদন করা হয়েছিল এবং দার্জিলিং-এ ডাকে দেওয়া হয়েছিল। চিঠিটি সিমলার হোটেল সিসিল-এ পাঠানো হয়েছিল। হয়তো হোটেলের লোকেরা চিঠি তোমার কাছে পাঠায়নি।

একই চিঠি—মি. কৃপলানি দার্জিলিং-এর পুলিশ সুপারের মাধ্যমে পাঠিয়েছিলেন। আমি সেটি ১ ডিসেম্বর পাই এবং তৎক্ষণাৎ আমার প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে তার জবাব দিই, যাতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না হয়। আশা করি তুমি সে-চিঠি ঠিক সময়ে পাবে।

তোমাকে চিঠি লেখার পর এখানকার আবহাওয়ায় একটু উন্নতি হয়েছে। ৭/৮ দিন ধরে আমরা সকালে ২/৩ ঘণ্টার রোদ পাচ্ছি। সেটুকুতেই আমরা খুব খুশি। আমার সায়েটিকার ব্যথা আর হয়নি। আমি যতদূর সম্ভব সাবধানে আছি। এখন বেশ ঠাণ্ডা, কিন্তু তাতে আমার আপত্তি ছিল না, এ আমার বরং ভালই লাগত, যদি তার সঙ্গে রোদ একটু পেতাম।

উত্তর কলিকাতার আর কাউকে খোঁজা দরকার, কেননা আমার মত বদলায়নি। আমাকে বঙ্গীয় বিধানসভার জন্য প্রার্থী করা নিরর্থক, আমি যখন সরকারের জেলে বন্দি।

মিসেস ফিউলোপ মিলার শীঘ্রই কলকাতায় আসছেন জেনে আমি খুব আগ্রহান্বিত বোধ করছি। আমার সঙ্গে যদি তিনি দেখা করতে আসেন, সে তাঁর খুবই সহৃদয়তার পরিচয় হবে, কিন্তু তাতে তাঁকে বড় বেশি কষ্ট দেওয়া হবে। তুমি তাঁকে নিরস্ত করতে পারো। এ দেশ যদি তাঁর পরিচিত হত এবং আমাদের ভাষা যদি তিনি একটু জানতেন, তা হলে অন্য কথা হত। যদি আসতে তিনি একান্তই আগ্রহী হন একটা শনি-রবিবার তিনি এখানে কাটাতে পারেন কি না

---

১. এই চিঠিটি দার্জিলিং জেলার কার্শিয়াং-এর গিধাপাহাড় বন্দিশিবির থেকে লেখা হয়েছিল।

ভেবে দেখো। সে ক্ষেত্রে অমিতকে এবং তার সঙ্গে মেয়েদের কেউ হলে ভাল হয়, তাঁর সঙ্গে আসতে হবে। সেই সুযোগে তিনি দার্জিলিং-এও আসতে পারেন। এতে যদি তোমার সম্মতি থাকে, অমি গিয়ে অতিরিক্ত সেক্রেটারি মি. ব্লেয়ার-এর সঙ্গে নিজে দেখা করে অনুমতি নিয়ে আসতে পারি। নিজে দেখা করলে কাজটা অনেক সহজ হবে এবং তাড়াতাড়ি হবে। না হলে আমার আশঙ্কা মিসেস ফিউলোপ মিলার-এর এখানে আসা খুবই কষ্টকর হবে। সাধারণত একটি সাক্ষাৎকার এক ঘন্টা চলে, সারা দিন তিনি কার্শিয়াং-এ কী করবেন, কোথায় সময় কাটাবেন? ব্যাপারটা ভাল করে ভেবে দেখে সেই অনুযায়ী মিসেস ফিউলোপ মিলার-কে পরামর্শ দিও। তোমাদের অতিথি হিসাবে আশাকরি তিনি স্বচ্ছন্দেই থাকবেন।

আশাকরি তোমরা ভাল আছ। আমার শরীর একই রকম তবে ওজন কয়েক পাউন্ড কমেছে।

তোমার স্নেহের
সুভাষ

এস. সি. বোস এস্কোয়ার
কলকাতা।

সীতারাম সাকসেরিয়া-কে

অধীন: ডি. সি. এস. বি., সি. আই. ডি.
১৪ লর্ড সিন্‌হা রোড
কলকাতা
২৬. ১২. ৩৬

প্রিয় সীতারামজি,

আপনার ১৫ তারিখের চিঠি পেয়ে খুব খুশি হলাম। চিঠির বক্তব্য আমার ভাল লেগেছে। আপনার মতো বন্ধুদের স্নেহই আমাকে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে শক্তি জুগিয়েছে। মনে হয়, যে দিন মুক্তি পেয়ে আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে পারব, তার জন্য আমাকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হবে। এর মধ্যে যাই ঘটুক সবই আমাকে ধৈর্য সহকারে সহ্য করে যেতে হবে। রাজবন্দিকে কীরকম অবস্থায় সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হয়, আপনি জানেন। সেই রকম অবস্থার মধ্যে দেখা করতে আমার কিংবা কারওরই ভাল লাগে না। আমার মনে হয় এ বিষয়ে আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন। তা হলে আর আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য অত কষ্ট স্বীকার করা কেন?

সংবাদপত্রে আপনি বোধ হয় দেখেছেন, আমি এখন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

আপনি এবং সকল বন্ধুরা আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার গ্রহণ করবেন।

আপনার
সুভাষচন্দ্র বোস

শ্রীযুক্ত সীতারাম সাকসেরিয়া
কলকাতা

কিটি কুর্টি-কে

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল
৫ জানুয়ারি ১৯৩৭

প্রিয় মিসেস কুর্টি,

আপনার দীর্ঘ চিত্তাকর্ষক চিঠিটি আমি কিছুদিন আগে পেয়েছি। উত্তর দিতে বিলম্বের জন্যে আমি দুঃখিত। মনস্তত্ত্বের ওপর বইয়ের যে তালিকাটি আপনি আমাকে পাঠিয়েছেন, সেটিও পেয়েছি। ইতিমধ্যে আমাকে কলকাতায় একটি হাসপাতালে আনা হয়েছে, কারণ দার্জিলিং-এর কাছে যে জায়গাটিতে আমাকে অন্তরীণ করে রাখা হয়েছিল সেখানে আমার স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছিল না। গত ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে আমি এখানে আছি। কত দিন এখানে থাকব জানি না, তবে যতদূর সম্ভব বেশিদিন নয়। কাজেই, আমাকে যখন চিঠি দেবেন, আমার বাড়ির ঠিকানায় পাঠাবেন:- ১, উডবার্ন পার্ক, কলিকাতা। আমি তখন যেখানেই থাকি ওরা সেখানে চিঠিটি পাঠিয়ে দেবে।

আপনি Tatra Mountain-এ উঠেছিলেন জেনে খুশি হলাম। ফোটো দেখে মনে হয়, জায়গাটি নিশ্চয়ই অতি সুন্দর।

এখানে আসার পর থেকে আমার শরীর একটু ভাল বোধ হচ্ছে। ডাক্তারেরা এখন সমস্ত কিছু পরীক্ষা করে দেখছেন, আমার ব্যাধিটি কী। আমার একটা অসুখ গলায় ব্যথা। অর্থাৎ সেপটিক টনসিল।

আপনি মনস্তত্ত্ববিদ ড. ইয়ুং-এর সঙ্গে কবে দেখা করবেন? আপনি যদি জেনেভা যান, Dr. এবং Mrs. P. Geheeb-এর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করবেন। তাঁরা আগে জার্মানি-তে Odenwald-এ একটি আন্তর্জাতিক স্কুল চালাতেন। এখন তাঁরা জার্মানি থেকে চলে গিয়ে জেনেভার কাছে একটি স্কুলের দায়িত্ব নিয়েছেন। Versoix-তে অবস্থিত স্কুলটির নাম Institute Monnier। জায়গাটা ট্রেনে কিংবা ট্যাক্সিতে জেনেভা থেকে আধ ঘণ্টার পথ। Geheeb-দের এবং তাঁদের স্কুলটি আপনার নিশ্চয় ভাল লাগবে। আমিও সেখানে গিয়েছিলাম। ওঁদেরকে আমার খুব ভাল লেগেছিল।

স্বাস্থ্যের জন্য ইদানীং আমি বেশি পড়াশোনা করতে পারছি না, তবে ফ্রয়েড-এর Interpretation of Dreams আমি আবার পড়ছিলাম, আর আমার কয়েকটি স্বপ্ন আমি বিশ্লেষণ করতেও চেষ্টা করছিলাম। ভিয়েনাতে বৃদ্ধ ফ্রয়েড-এর সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়েছিল? যদি হয়ে থাকে, আপনার তাঁকে কেমন লাগল? আপনারা কী বিষয়ে কথাবার্তা বলেছিলেন?

আজকে এখানেই থামব, মি. কুর্টি ও আপনি শ্রদ্ধা জানবেন।

আপনার
সুভাষ সি. বোস

মিসেস কিটি কুর্টি
বার্লিন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-কে

অধীন: ডি. সি., এস. বি. (কলকাতা)
১৪ লর্ড সিনহা রোড
কলিকাতা
৩০. ১. ৩৭

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার 'সঞ্চয়িতা' পেয়ে আমি যারপরনাই সুখী হয়েছি। আমাকে যে আপনি স্মরণ করেছেন, সে আমার পরম আহ্লাদের বিষয়। আপনার নিজের হস্তাক্ষরে আপনার আশীর্বাদ লাভ করে আমি গভীর কৃতজ্ঞতাবোধে আপ্লুত।

আপনি অবশ্যই জানেন, আপনার স্বাস্থ্য সদা-সর্বদা আমাদের গভীর উদ্বেগের বিষয়। আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করুন।

আপনার স্নেহের
সুভাষচন্দ্র বোস

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল
কলকাতা।

নাওমি সি. ভেটার-কে

সংশোধিত ও অনুমোদিত
৪. ২. ৩৭
ডি. সি., এস. বি.-র পক্ষে

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল
কলকাতা
৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭

প্রিয় মিসেস ভেটার,

আপনার ২ জানুয়ারির সুদীর্ঘ সুন্দর পত্র গত মাসের ২৮ তারিখ পেয়ে আমি সুখী হয়েছি। আপনাকে চিঠি দেওয়ার পর আমাকে কলকাতায় আনা হয়েছে। এখন আমি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আছি, এখানে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে আমার চিকিৎসা চলছে। কত দিন এখানে থাকব জানি না, তাই আবার যখন চিঠি লিখবেন, আমার বাড়ির ঠিকানায় পাঠাবেন: ১, উডবার্ন পার্ক, কলকাতা। সেখান থেকে চিঠি আমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এখন আমি আদৌ জানি না এরপর আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে।

এখানে আসার পর থেকে আমার পরীক্ষা ও চিকিৎসা চলছে। গলায় এবং যকৃতে কিছু গোলযোগ পাওয়া গিয়েছে। তার জন্য আমার চিকিৎসা হচ্ছে। এখন আমার চোখ নিয়ে সমস্যা

হচ্ছে। কাল তার পরীক্ষা হবে। ভারতে ফেরার পর আমার ওজন খানিকটা কমেছে—১০ কিলোর মতো—কিন্তু এখানকার ডাক্তারেরা বলছেন, আমার ফুসফুসে কোনও অসুখ নেই, এবং বলছেন, ওজন কমা নিয়ে আমার দুশ্চিন্তার কারণ নেই। কাজেই, আমি নিজেকে বোঝাচ্ছি, আমি ইচ্ছে করে রোগা হচ্ছি, ইউরোপে যেমন 'স্লিমিং' করা ফ্যাশন!

আপনাকে জানাবার মতো বিশেষ কিছু নেই। মিসেস ফিউলোপ মিলার সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন, আমার দাদার অতিথি হয়েছিলেন। গভর্নমেন্ট দয়া করে তাঁকে আমার সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি দিয়েছিলেন। তাই তিনি কয়েকবার আমার সঙ্গে হাসপাতালে এসে দেখা করেন। দশ দিন আগে তিনি কলকাতা ছেড়ে গেছেন, সারা দেশে দীর্ঘ ভ্রমণ করবেন। তাই এদিকে আর আসতে পারবেন না।

মোটের ওপর এখানে এসে আমি ভালই আছি। এখানে এসে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে পেরে আমি খুশি। ওঁরা দার্জিলিং-এ উঠতে পারতেন না, বিশেষ করে আমার মা। মা চলা-ফেরা করতে পারেন না, তাই গভর্নমেন্ট সপ্তাহে দু'-দিন আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতে অনুমতি দিয়েছেন। অবশ্য আমাকে পুলিশ পাহারায় যেতে এবং আসতে হয়।

আপনি আবার অসুস্থ হয়েছেন জেনে এবং আপনার পুরনো অসুখের কথা জেনে আমি দুঃখিত। ভিয়েনাতে এবারকার শীত যে অত প্রবল হয়নি, সেটা আমার মনে হয় ভালই হয়েছে এবং আমি আশা করি বসন্তের ছোঁয়া লাগলে আপনি আবার ভাল হয়ে উঠবেন, আমি আপনার দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।

পাছে ভুলে যাই, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি? কিছু দিন আগে ভারতের সংবাদপত্রে একটা খবর বেরিয়েছিল, যে Chancellor Schussnig কয়েক মাস আগে Mariazell-এ গোপনে বিবাহ করেছেন। নির্ভরযোগ্য সংবাদ এজেন্সির মাধ্যমে খবরটা আসেনি, কাজেই আমি জানি না এটা বাজে গুজব কি না। আজকাল ইউরোপে গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের নিয়ে বাজে গুজব খুব বেশি চলছে।

আপনি অস্ট্রিয়াতে প্রচুর যাত্রী সমাগমের কথা লিখেছেন। অস্ট্রিয়ার রেলওয়ের পক্ষে, আর অস্ট্রিয়ার গভর্নমেন্টের পক্ষে এ তো ভালই। এতে তাদের আয় বাড়বে। অভ্যাস (কিংবা হুজুগ) হিসাবেও এটা ভাল। এই হুজুগের খানিকটা ছোঁয়া আমাদের ভারতে লাগলেও ভাল হত।

ড. ভেটার এখন কী বই নিয়ে ব্যস্ত আছেন জানতে আমি আগ্রহী। কবে নাগাদ বইটি বেরোবে?

ভিয়েনা সম্পর্কে আপনি যে পুস্তিকাটি পাঠিয়েছেন তার জন্য অনেক ধন্যবাদ। বস্তুত আমি দুটি পুস্তিকা পেয়েছি, একটিতে শুধু ছবি এবং আরেকটিতে ছবির সঙ্গে বর্ষপঞ্জী। খামগুলো সেন্সর আমাকে পাঠায়নি, তাই ওগুলো কারা পাঠিয়েছে বুঝতে পারিনি। আমি মনে করছি প্রথমটি আপনি পাঠিয়েছেন।

আপনার স্বাস্থ্যের আরও খবর দেবেন। আশা করি ড. ভেটার এখন পুরোপুরি সুস্থ। আপনার কন্যা ও জামাতা-ও তাই।

শ্রদ্ধা সহকারে।

আপনার
সুভাষ সি. বোস

মিসেস এন. সি. ভেটার
ভিয়েনা

শ্রীসুনীল মোহন ঘোষ মৌলিক-কে

সংশোধিত এবং অনুমোদিত
স্বাক্ষর অস্পষ্ট

অধীন: ডি. সি., এস. বি., (ক্যাল)
১৪, লর্ড সিনহা রোড
কলকাতা
২২. ২. ৩৭

প্রীতিভাজনেষু—

তোমার তিনখানি চিঠি আমি ইতিপূর্বে পেয়েছি, কিন্তু বিশেষ কিছু লিখবার ছিল না বলে আমি উত্তর দিই নাই। তোমরা সকলে কেমন আছ? তুমি বোধহয় আজকাল শহর ছেড়ে গ্রামবাসী হয়েছ—যদিও পাঁচথুপিকে ঠিক গ্রাম বলা যায় না। ওখানকার স্বাস্থ্য এখন কেমন? কয়েকমাস পূর্বে তো বসন্ত প্রভৃতি দেখা দিয়েছিল।

আমি দুইমাস হল কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আছি। এখানে আসবার পর পেটের অবস্থা কতকটা ভাল বোধ করছি এবং গলাও অপেক্ষাকৃত ভাল। তবে অন্যান্য উপসর্গ যাচ্ছে না, (যথা ওজন হ্রাস এবং দৈনিক জ্বর)। দেখা যাক কী হয়। এখানে আর কতদিন থাকতে হবে তা আমি জানি না।

আমার আন্তরিক ভালবাসা জানবে।

ইতি
শুভার্থী
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

সুনীলমোহন ঘোষ মৌলিক
পাঁচথুপি
মুর্শিদাবাদ।

কিটি কুর্টি-কে

কলকাতা
১৭ মার্চ ১৯৩৭

প্রিয় মিসেস কুর্টি,

আপনার ৩০ জানুয়ারির চিঠি আমি ৩ মার্চ পেয়েছি। চিঠিটির জন্য এবং চিকিৎসার বিষয়ে আপনার পরামর্শের জন্য অনেক ধন্যবাদ। হ্যাঁ, জুরিখের Bircher Benner-এর বিষয়ে আমি অনেক কিছু শুনেছি। তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতিতে আমার চেয়ে একজন ইউরোপীয়ের বেশি উপকার হতে পারে। ইউরোপীয়েরা সাধারণত প্রচুর পরিমাণে মাংস ও মদ্য গলধঃকরণ করে থাকে। আমি মাংস প্রায় খাই-ই না, খেলেও খুব অল্প এবং সাধারণভাবে মদ্য স্পর্শ করি না। যাই হোক, তবু স্যালাড, ফল ইত্যাদি সম্পর্ক আপনি যা বলেছেন তার সঙ্গে আমি একমত এবং সেই রকম ধরনের খাদ্যই গ্রহণ করছি। অন্যান্য যা

যা বলেছেন, যতদিন না আমি নিজের ইচ্ছামতো খাদ্য ও চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারছি, ততদিন আমাকে অপেক্ষা করতেই হবে।

হ্যাঁ, জুরিখে আমার কয়েকজন খুব ভাল বন্ধু আছেন। তাঁরা 'প্রাকৃতিক চিকিৎসা' এবং নিরামিষ ভোজনে বিশ্বাস করেন এবং জীবন সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিও বিশ্বজনীন। Basseradorf-এ তাঁদের একটি বসতিও আছে। জায়গাটি জুরিখ থেকে ট্রেনে প্রায় কুড়ি মিনিটের পথ। দয়া করে Werner Zimmerman-এর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন এবং তাঁকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাবেন। আমি তাঁর পুরনো ঠিকানাটা দিচ্ছি, আশা করি এখনও উনি সেখানেই আছেন:

Mr. Werner Zimmerman
Wirschaftsring Genossenscheft
Zurich, Postfach 36 F
Hauptbahnhof, Zurich
(Tel. F 3521)

যদি কোনওভাবে জুরিখে যান এবং ড. ইয়ুং-এর সঙ্গে দেখা হয়, তবে তাঁর সম্পর্কে এবং মনস্তত্ত্ব নিয়ে তাঁর কাজ সম্পর্কে আপনার কী ধারণা হয় দয়া করে আমাকে জানাবেন। রঁলার বই The Enchanted Soul-এর কোনও ইংরেজি অনুবাদ আছে কি না আপনি কি জানেন?

আপনি তো এখন হস্তলিপিবিদ্যার চর্চা করছেন, আমাকেও বিশ্লেষণ করুন না কেন?

ফ্রয়েড এবং তাঁর পরিবারের কথা আমাকে আরও লিখুন, অন্তত যাঁদের সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছে তাঁদের কথা।

আপনি এখন চলাফেরা করতে পারছেন জেনে আমি সুখী হলাম, উত্তর আমেরিকাতেও যান না কেন? ইউরোপের জলবায়ু থেকে সেখানে একটা পরিবর্তন হবে। পুরনো জগৎ ইউরোপ থেকে নতুন জগৎ অন্য রকম তো বটে!

নাগরিক জীবনে আপনি ক্লান্ত, আমি বুঝতে পারছি, বিশেষত বার্লিনের মতো জায়গায়। কাজেই, শহর থেকে দূরে গিয়ে যদি কয়েক সপ্তাহ থাকেন, নিশ্চয় আপনি অনেক আরাম পাবেন। এই চিঠি যখন পৌঁছবে তখন আপনি বোধহয় সুইজারল্যান্ড থাকবেন। তবে আমি আশা করি চিঠিটি যথা নিয়মে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

আমি এখনও কলকাতায় হাসপাতালে, তবে মনে হচ্ছে আমাকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া হবে, কিন্তু কোথায় জানি না। আমার শরীর যেমন ছিল প্রায় তেমনিই আছে। দয়া করে মি. কুর্টি-কে আমার সম্ভাষণ ও শ্রদ্ধা জানাবেন, আপনিও নেবেন। কবিতাগুলির জন্য অনেক ধন্যবাদ।

আমার বাড়ির স্থায়ী ঠিকানায় চিঠি দেবেন:

১, উডবার্ন পার্ক
কলকাতা।

মিসেস কিটি কুর্টি
বার্লিন

আপনার
সুভাষ সি. বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

১ উড়বান পার্ক
কলকাতা
৫ এপ্রিল ১৯৩৭

প্রিয় মিসেস ভেটার,

১৭ ও ২২ মার্চের আপনার বিমান ডাকের পত্র দুটির জন্য অনেক ধন্যবাদ। ১৭ মার্চ আমি হঠাৎ মুক্তি পাওয়ার পর থেকে যাঁরা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন তাদের দ্বারা আমি পরিবৃত হয়ে গেছি, চিঠিপত্র লিখবার সময় পাচ্ছি না। সেই জন্যই আপনাকে এর আগে চিঠি দিতে না পারায় আমি দুঃখিত। আমি এয়ার-মেলে কয়েক ছত্র লিখছি যাতে আপনি জানতে পারেন আমি আপনার চিঠি পেয়েছি, এবং আপনাদের সকলের কথা প্রায়ই আমার মনে হয়।

আমার শরীর এখনও সারেনি এবং শীঘ্রই উত্তরে কোনও পাহাড়ি জায়গায় যাব।

Mrs. Askanasy-র যে খবর আপনি দিয়েছেন তাতে আমি বিস্মিত। ইহুদিরা এখন রাশিয়াকে ইহুদিবিদ্বেষী মনে করে শুনে আমি অবাক হলাম।

আপনার অভিনন্দন-বার্তার জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আপনি যেদিন চিঠিটি লিখতে শুরু করেন, অর্থাৎ ১৭ মার্চ সে দিনই আমি মুক্তি পাই। এক সপ্তাহ আগে আমি আপনাকে একটি খবরের কাগজের কাটিং পাঠিয়েছি, যাতে আমার মুক্তির খবর আছে, আর ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট-এরও এক কপি পাঠিয়েছি। আপনি কি আজকাল ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট পান?

আমি আরেকটি ইংরেজি ভাষার ভারতীয় দৈনিক পত্রিকা থেকে একটি কাটিং পাঠাচ্ছি। তাতে Chancellor Schussing-র খবর আছে।

ডাক্তারেরা আমাকে একটি মাত্র জনসভায় উপস্থিত থাকবার অনুমতি দিয়েছেন। কলকাতার জনসাধারণ আগামীকাল একটি বিশাল জনসভার আয়োজন করছে, যেখানে আমাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। তারপর আমি কলকাতা থেকে চলে যাব। আমার নাগরিক সম্বর্ধনা (পুরসভার) কয়েক মাস পরে আমার ফিরে আসা পর্যন্ত পিছিয়ে দিতে হবে। আন্তরিক শ্রদ্ধা সহকারে,

আপনার
সুভাষ সি. বোস।

পুঃ এ সপ্তাহে আমি আপনাকে খবরের কাগজের কাটিং পাঠাব। সব বিষয়েই আমি এখন মুক্ত, শুধু আমার চিঠিপত্র পুলিশ গোপনে সেনসর করছে।

এস. সি. বি.

সীতা ধর্মবীর-কে

লাহোর
৯. ৫. ৩৭

প্রিয় সীতা,

আশাকরি তোমাকে আমি এইভাবে সম্বোধন করলাম বলে তুমি কিছু মনে করবে না। সবাই বলছে তুমি এখন মস্ত লোক, একজন পুরোদস্তুর ডাক্তার। হাসপাতাল বলে একটি বস্তু চালাচ্ছ, তাই আমি একটু নার্ভাস বোধ করছি।

যাই হোক, আমি এ চিঠি তোমাকে লিখছি শুধু জানাবার জন্য, এখানে সবাই তোমার অভাব কত অনুভব করছে। আজকাল লীলাকে আমরা একটু-আধটু দেখতে পাই, (ফ্রক পরা লীলাটি নয়, সে শাড়ি পরিহিতা) কিন্তু তোমাকে একদম দেখতে পাই না। বোধ হয় সেই ক্ষতিপূরণ করবার জন্যই, লীলা দয়া করে এই শনি-রবিবার আমাদের সঙ্গে এখানে কাটাতে রাজি হয়েছে। আমাদের এই কঠিন বাস্তব পৃথিবীতে যতটুকু পাওয়া যায়, ততটুকুই লাভ! তার চেয়ে বেশি, আমরা আশা করতে পারি না, কেননা শুনছি লীলাও তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করছে এবং বাড়িতে থেকে কাজ-কর্মের কথা বলার চেয়ে আরও অনেক বড় বড় কাজ তার করবার আছে। এবং যা খুশি করবার, যেখানে খুশি যাবার স্বাধীনতা যতদিন আমি না পাচ্ছি, স্বভাবতই যারা বাড়িতে থাকে তাদের প্রতি আমার সহানুভূতি থাকবে।

আজ এইখানেই শেষ করে তোমাকে প্রতিদানে আমার প্রীতি জানাই। আমরা অল্পদিনের মধ্যেই পাহাড়ে যাব। তোমাদের রেখে যাব রোদ আর তাপ আর ধুলো ভোগ করবার জন্য। তুমি যদি এখানে আসো আমরা সাদরে তোমার অভ্যর্থনা করব, না এলে সে অভাব আমরা বোধ করব, ওই পর্যন্তই।

তোমার
সুভাষ সি. বোস

পুঃ এখানে একটা তর্ক বেঁধেছিল, তোমার এবং লীলার শাড়ি পরা আমি পছন্দ করব কি না। সে বিষয়ে দ্বিমত আছে। তোমার কী মনে হয়? ডাক্তার কি শাড়ি পছন্দ করতেন, না ফ্রক?

ড. মিস সীতা ধর্মবীরকে
লক্ষ্ণৌ

ই. উডস-কে

লাহোর
১১.৫.৩৭

প্রিয় মিসেস উডস,

ভারতে ফিরে আসার পর আমি কেন আপনাকে চিঠি দিতে পারিনি সহজেই বোঝা যায়। তা সত্ত্বেও যে আপনি আমার সম্পর্কে খোঁজ করে গেছেন, সে আপনার সহৃদয়তা। আমি দু' মাস জেলে ছিলাম। তারপর দার্জিলিং-এর কাছে এক নির্জন জায়গায় আমার দাদার একটি বাংলোতে অন্তরিন ছিলাম। গত ডিসেম্বরে আমায় কলকাতায় একটি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়। তিন মাস পরে গত ১৭ মার্চ আমি ছাড়া পাই। তারপর কয়েক সপ্তাহ আমি কলকাতায় ছিলাম এবং এখন আমি উত্তর-পশ্চিম ভারতে একটি পার্বত্য শহরের পথে। আমার স্বাস্থ্য এখন ভাল নয়, সারতে কয়েক সপ্তাহ লাগবে। আগামী কয়েক সপ্তাহ আমার ঠিকানা হবে:

প্রযত্নে ড. এন. আর ধর্মবীর
ডালহৌসি
পঞ্জাব, ভারত।

গত বছর কয়েক সপ্তাহ আমি কিছু-কিছু আইরিশ পত্রিকা পেতাম। সেনসর সেগুলো পাস করে দিত। হঠাৎ সেগুলো বন্ধ হয়ে যায়। 'আইরিশ প্রেস' পড়ে এবং ভারতীয় সংবাদপত্র থেকেও আমি ড. দের সঙ্গে আপনার কন্যা এইলিন-এর বিবাহের কথা জানতে পারি। এত দেরিতে হলেও নব-বিবাহিত দম্পতিকে আমি আমার আন্তরিক গভীর অভিনন্দন জানাচ্ছি, এবং তাদের সুদীর্ঘ, সুখী এবং সৌভাগ্যমন্ডিত দাম্পত্যজীবন কামনা করছি। মিসেস দে বোধ হয় এখন স্বামীর সঙ্গে ইংল্যান্ডে আছেন।

আমার নিজের সব খবর দিলাম, এখন আপনার চিঠি দেওয়ার পালা। আপনারা সবাই (এনডা সহ) কেমন আছেন জানাবেন। এখানকার সংবাদপত্রে নতুন সংবিধানের কথা বেরোচ্ছে।

ম্যাডাম কেমন আছেন? তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাবেন। ভারত সম্পর্কে নতুন কিছু লিখবার নেই, ভারতীয় সংবাদপত্রে যা পাবেন, তা ছাড়া। সে সব খবর আমার মনে হয় আপনি পেয়ে যাবেন। গত নির্বাচনে কংগ্রেসের শক্তি দেখা গেল। সংবিধানের 'বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন করো' নীতি সত্ত্বেও কংগ্রেস ১১টির মধ্যে ৬টি প্রদেশে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে এবং অন্য প্রদেশগুলোতেও সংখ্যা লঘিষ্ঠ হলেও তার শক্তি কম নয়। কিন্তু 'সংখ্যাগরিষ্ঠ' প্রদেশগুলোতেও কংগ্রেস সরকার গঠন করতে অস্বীকার করেছে, যত দিন মন্ত্রীদের কাজে হস্তক্ষেপ করার প্রতিশ্রুতি রাজ্যপাল না দিচ্ছেন। সে আশ্বাস এখনও পাওয়া যায়নি। সংবিধানের কেন্দ্রীয় সরকার-সংক্রান্ত অংশটি এখনও কার্যকর হয়নি। শুধুমাত্র 'প্রাদেশিক' অংশটিই প্রয়োগ করা হয়েছে।

লিগের খবর কী? আমরা যাতে আগ্রহ বোধ করব, এমন আইরিশ পত্রিকা আমাকে দয়া করে পাঠিয়ে দেবেন। নতুন আইরিশ সংবিধানেরও একটি কপি পাঠাবেন।

সব বন্ধুদের আমার কথা বলবেন।

আপনার
সুভাষ সি. বোস

ভি. লেসনি-কে

প্রযত্নে ড. এন. আর. ধর্মবীর
ডালহৌসি, পঞ্জাব
২০ মে ১৯৩৭

প্রিয় অধ্যাপক,

দু' মাস আগে হঠাৎ ছাড়া পাওয়ার পর থেকেই আমি ভাবছি আপনাকে চিঠি দেব, কিন্তু এতদিন আমি খানিকটা ব্যস্ত ছিলাম। মুক্তি পাওয়ার পর শ্রীমজুমদারের সঙ্গে কলকাতায় আমার দেখা হয়েছিল এবং তাঁকে আপনার শুভেচ্ছা-বার্তা দিয়েছি।

এখন আমি উত্তর পশ্চিমের একটি পার্বত্য শহরে এসেছি; সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬৭০০ ফুট (২০০০ মিটার) উঁচুতে। কয়েক মাস আমি এখানে থাকব এবং স্বাভাবিক কাজ-কর্মে ফিরে যাবার আগে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করব।

আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ডিন নির্বাচিত হয়েছেন জেনে আমি আনন্দিত হলাম। আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। মিসেস লেসনিকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাবেন, আপনিও জানবেন। আবার কবে এদিকে আসছেন? আশা করি আপনারা ভালই আছেন, সঙ্গের চিঠিটি দয়া করে মি. নাম্বিয়ারকে পাঠিয়ে দেবেন।

আপনার
সুভাষচন্দ্র বোস

অধ্যাপক ড. লেসনি
প্রাহা

সীতা ধর্মবীর-কে

ডালহৌসি
২২. ৫. ৩৭

প্রিয় সীতা,

তোমার চিঠি পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি। আরও খুশি হয়েছি, যেভাবে তুমি আমাকে সম্বোধন করেছ, তাতে। আমি দিদির সঙ্গে আলোচনা করছিলাম, 'মামা' কী (অস্পষ্ট) বাংলা অথবা পঞ্জাবি ভাষায়। সেই জন্য ... সিদ্ধান্ত করতে পারিনি। হয়তো তুমি (অস্পষ্ট) আলোকপাত করতে পারবে।

স্যান্ডির পুরো ব্যাপারটা তুমি জান কি না জানি না। দিদি এক বিরাট বাস্কেট নিয়ে চলেছেন, আর তার মধ্যে থেকে মাঝে-মাঝে একটা বিড়ালের মাথা বেরিয়ে আসছে, সে একটা দেখবার মতো দৃশ্য! আমি সৌজন্যের খাতিরে বাস্কেটটি বহন করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেটা সম্ভব হত

না কারণ তার পোষা বিড়ালটিকে সামলাতে একমাত্র সেই পারত, তাও অতি কষ্টে। কাজেই একজন মহিলাকে আমরা মস্ত এক প্যাকেজ নিয়ে যেতে দিচ্ছি, এ দৃশ্য যাতে পাঁচ জনে না দেখে, সে জন্য আমি তাকে লীলার জিম্মায় রেখে নিজেই এগিয়ে গেলাম আমাদের কামরার খোঁজে। তখন আমাদের আশা ছিল, একবার যদি কামরার মধ্যে গুছিয়ে বসতে পারি আর আমাদের কোনও ঝামেলা থাকবে না। তখন কি জানতাম, ঝামেলার সেইটেই সূত্রপাত? গাড়ি রওনা হওয়া মাত্র তার আওয়াজে স্যান্ডির মাথাটি গেল বিগড়ে, আর যা লাফঝাঁপ আরম্ভ করল। যদি আমরা না থাকতাম, সে যে ট্রেন থেকে ঝাঁপ দিত তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তা তো আর হবার নয় (যদিও সেরকম ঘটলে তখনকার মতো যে আমি খুব হায় হায় করতাম তা জোর দিয়ে বলতে পারি না) অবশ্য আমাদের দু'জনের, অর্থাৎ ডাক্তার আর আমার খুব অসুবিধে হয়নি, আমরা যতটা পারি ঘুমিয়ে নিয়েছি। কিন্তু দিদির রাত্রিটা বেশ ভালই কাটল, বিড়ালটিকে জাপটে ধরে থেকে। শুধুমাত্র ট্রেন স্টেশনে যখন থামছিল বিড়ালটা একটু শান্ত হচ্ছিল। যাই হোক, পাঠানকোটে যখন পৌঁছলাম দেখা গেল দিদির গায়ে আর শাড়িতে বিড়ালটি তাঁর নখের চিহ্ন বেশ ভাল করে অঙ্কিত করে দিয়েছে। শাড়িটা আমরা ভাল করে খুটিয়ে দেখিনি, কিন্তু দিদির দুই হাতেই আঁচড়ানোর দাগ বেশ চোখে পড়ল। যাই হোক, এ প্রসঙ্গ এই পর্যন্তই থাক, এখন অন্য কথা বলি।

তুমি যতটা বলছ ততটাই তুমি নিরাপদ কি না তাতে আমার সন্দেহ আছে; আর কে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সে কথা অন্যেরা বলবে।

হ্যাঁ ডালহৌসি আমার বেশ পছন্দ এবং আশা করি এখানে থেকে আমার বেশ উপকারই হবে। এর মধ্যেই আমি আগেকার চেয়ে সুস্থ বোধ করছি। দিলীপের যে ফোটোগুলো তোমাকে পাঠিয়েছি, সেগুলো পন্ডিচেরিতে তোলা।

হাসপাতাল চালানো নিয়ে তোমার খুব ... দরকার নেই। আমি এতদিন হাসপাতালে থেকে অন্তত এটা বুঝতে পেরেছি যে হাউস ফিজিসিয়ান আর হাউস সার্জেনরাই আসলে হাসপাতাল চালান।

আজ এখানেই শেষ করছি, কেন না ডাক ধরতে হবে এবং লোকটি অপেক্ষা করছে। প্রীতি নিও।

তোমার
সুভাষ

নাওমি সি. ভেটার-কে

প্রযত্নে: ড. এন আর ধর্মবীর
ডালহৌসি
পঞ্জাব
২৭. ৫. ৩৭

প্রিয় মিসেস ভেটার,

এবারে দোষ আমারই, কারণ অনেক দিন আমি দীর্ঘপত্র লিখিনি, যদিও আপনি সহৃদয়তা বশত একাধিকবার আমায় চিঠি দিয়েছেন। ব্যাপার হচ্ছে, মুক্তি পাওয়ার পর থেকে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা করা নিয়ে আমি অত্যন্ত ব্যস্ত। চিঠির স্তূপ উঁচু হয়ে উঠছে।

মাঝে-মাঝে এক-আধজন বন্ধুকে দু'-এক ছত্র লিখছি। আশা করছি শীঘ্রই স্থির হয়ে বসতে পারব এবং তখন চিঠিপত্র ঠিকমতো লিখব।

আপনি জানেন, ১৭ মার্চ আমি ছাড়া পেয়েছি। সে-খবর জানিয়ে ইউরোপে আমার বন্ধুদের আমি তার করিনি, কেননা বিদেশি সংবাদপত্রে খবর পাঠানোর কাজ সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলিই করবে, এবং আমি জানতাম এন. যেহেতু আমার ভাল বন্ধু, ভিয়েনাতে তিনি আমার বন্ধুদের খবর অবশ্যই দেবেন। বাস্তবিকই তিনি খবর দিয়েছেন, এবং সে-খবর যে যথার্থ সে-বিষয় আপনার সন্দেহ করার কোনও কারণ ছিল না। ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট-এর মাধ্যমে সে-খবর পেতে আপনার মাসখানেক লাগত।

মাসাধিক কাল আমি কলকাতায় ছিলাম, খানিকটা বিশ্রামের জন্য, আর খানিকটা বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজনের সঙ্গসুখ উপভোগ করবার জন্য, তারপর এপ্রিলের শেষ দিকে আমি এলাহাবাদ রওনা হই, মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করা এবং দলের একটি সভায় যোগদান করার জন্য। কয়েক দিন পরে আমি লাহোর (উত্তর-পশ্চিম) চলে যাই। সেখানে দশ দিন ছিলাম। তারপর এখানে এসে পৌঁছাই ১২ তারিখ।

ডালহৌসি একটি পাহাড়ি জায়গা, হিমালয় পর্বতমালায় ২০০০ মিটার উচ্চে অবস্থিত, লাহোর থেকে উত্তরে। জনকয়েক বন্ধুর কাছে আমি এখানে থাকব মনস্থ করেছি। যতদিন না সুস্থ হয়ে কাজে ফিরতে পারছি।

গত ১৭ মার্চ আপনি যা লিখছেন আমি খুব আগ্রহ সহকারে পড়েছি, যে আপনি আশা করছেন আমি শীঘ্রই মুক্তি পাব। আপনি যে-দিন ও-কথা লিখছিলেন, আপনার কোনও ধারণাই ছিল না, যে সেই দিনই আমি বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাব। আমি মুক্তি পেলাম খানিকটা অপ্রত্যাশিত ভাবে, কেননা আমার মুক্তির আশা লোকে ছেড়েই দিয়েছিল। আমিও তাই। কিন্তু মা'কে আমি বলেছিলাম, হয় আমি মার্চ মাসে ছাড়া পাব, নয়তো আগামী ছ'মাসের মধ্যে নয়।

মনে থাকতে-থাকতে একটা কথা বলি। আমার বন্ধু, কলকাতার এক বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ডা. বি. সি. রায়ের কথা আপনাকে লিখতে চাই। সামনের জুন মাসের কোনও একটা সময়ে তিনি ভিয়েনা যাবেন। আমি তাঁকে কোনও পরিচয়-পত্র দিতে পারিনি, এবং ড. ভেটার কিংবা আপনার কথা তাঁকে বলতেও পারিনি। কিন্তু ওখানে যখন তিনি যাবেন, আমি চাই আপনাদের দু'জনের সঙ্গেই তিনি দেখা করুন—যদি অবশ্য আপনারা সে সময়ে ভিয়েনায় থাকেন। আপনি কি দয়া করে এই ঠিকানায় তাঁকে এক ছত্র লিখে জানাবেন যাতে ভিয়েনায় পৌঁছে তিনি আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন? c/o, K. N. Gairola, Hotel de France. সম্ভবত Gairola তাঁর দেখাশোনা করবেন, যখন তিনি ভিয়েনায় থাকবেন। আমি চাই প্রকৃত ভিয়েনা তিনি একটু দেখুন। তাই তাঁর ঠিক লোকের হাতে পড়া দরকার। আমার আশঙ্কা ইহুদি ডাক্তারেরা, তিনি যে নতুন আগন্তুক, তার অন্যায় সুযোগ নিতে পারেন, যদি আগেভাগে তাঁকে সতর্ক করে না দেওয়া হয়।

Mrs. Askanasy-র কথা শুনে আমি খুব আগ্রহ বোধ করলাম। তিনি কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করতে যাবার কথা ভাবছেন? তা হলে তাঁর স্বামীর ব্যবসার কী হবে? তাঁর ক্লাবের খবর কী? তাঁর অনুপস্থিতিতে সে ক্লাব কি এখনও টিঁকে আছে? ভিয়েনায় যদি তিনি এর মধ্যে ফিরে থাকেন, তাঁর কাছে অনেক ভাল ভাল গল্প শুনতে পাবেন।

আমি সদ্য Briffault-এর Europa-র আমেরিকান (না কি ইংলন্ডের?) সংস্করণ পড়ে শেষ করলাম। আমার খুব ভাল লাগল। ড. ভেটার কেন বইটির অনুবাদ করছেন এখন বুঝতে পারছি। বইটির কয়েকটি অনুচ্ছেদ, আগেকার দিন হলে, অশ্লীল বলে চিহ্নিত হত। কিন্তু আমার মনে হয় যুগ এবং মানুষের রুচি দ্রুত বদলে যাচ্ছে। কয়েকদিন আগে আমি অলডাস হাক্সলির 'Eyeless

মাঝে-মাঝে এক-আধজন বন্ধুকে দু'-এক ছত্র লিখছি। আশা করছি শীঘ্রই স্থির হয়ে বসতে পারব এবং তখন চিঠিপত্র ঠিকমতো লিখব।

আপনি জানেন, ১৭ মার্চ আমি ছাড়া পেয়েছি। সে-খবর জানিয়ে ইউরোপে আমার বন্ধুদের আমি তার করিনি, কেননা বিদেশি সংবাদপত্রে খবর পাঠানোর কাজ সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলিই করবে, এবং আমি জানতাম এন. যেহেতু আমার ভাল বন্ধু, ভিয়েনাতে তিনি আমার বন্ধুদের খবর অবশ্যই দেবেন। বাস্তবিকই তিনি খবর দিয়েছেন, এবং সে-খবর যে যথার্থ সে-বিষয় আপনার সন্দেহ করার কোনও কারণ ছিল না। ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট-এর মাধ্যমে সে-খবর পেতে আপনার মাসখানেক লাগত।

মাসাধিক কাল আমি কলকাতায় ছিলাম, খানিকটা বিশ্রামের জন্য, আর খানিকটা বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজনের সঙ্গসুখ উপভোগ করবার জন্য, তারপর এপ্রিলের শেষ দিকে আমি এলাহাবাদ রওনা হই, মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করা এবং দলের একটি সভায় যোগদান করার জন্য। কয়েক দিন পরে আমি লাহোর (উত্তর-পশ্চিম) চলে যাই। সেখানে দশ দিন ছিলাম। তারপর এখানে এসে পৌঁছাই ১২ তারিখ।

ডালহৌসি একটি পাহাড়ি জায়গা, হিমালয় পর্বতমালায় ২০০০ মিটার উচ্চে অবস্থিত, লাহোর থেকে উত্তরে। জনকয়েক বন্ধুর কাছে আমি এখানে থাকব মনস্থ করেছি। যতদিন না সুস্থ হয়ে কাজে ফিরতে পারছি।

গত ১৭ মার্চ আপনি যা লিখছেন আমি খুব আগ্রহ সহকারে পড়েছি, যে আপনি আশা করছেন আমি শীঘ্রই মুক্তি পাব। আপনি যে-দিন ও-কথা লিখছিলেন, আপনার কোনও ধারণাই ছিল না, যে সেই দিনই আমি বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাব। আমি মুক্তি পেলাম খানিকটা অপ্রত্যাশিত ভাবে, কেননা আমার মুক্তির আশা লোকে ছেড়েই দিয়েছিল। আমিও তাই। কিন্তু মা'কে আমি বলেছিলাম, হয় আমি মার্চ মাসে ছাড়া পাব, নয়তো আগামী ছ'মাসের মধ্যে নয়।

মনে থাকতে-থাকতে একটা কথা বলি। আমার বন্ধু, কলকাতার এক বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ডা. বি. সি. রায়ের কথা আপনাকে লিখতে চাই। সামনের জুন মাসের কোনও একটা সময়ে তিনি ভিয়েনা যাবেন। আমি তাঁকে কোনও পরিচয়-পত্র দিতে পারিনি, এবং ড. ভেটার কিংবা আপনার কথা তাঁকে বলতেও পারিনি। কিন্তু ওখানে যখন তিনি যাবেন, আমি চাই আপনাদের দু'জনের সঙ্গেই তিনি দেখা করুন—যদি অবশ্য আপনারা সে সময়ে ভিয়েনায় থাকেন। আপনি কি দয়া করে এই ঠিকানায় তাঁকে এক ছত্র লিখে জানাবেন যাতে ভিয়েনায় পৌঁছে তিনি আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন? c/o, K. N. Gairola, Hotel de France. সম্ভবত Gairola তাঁর দেখাশোনা করবেন, যখন তিনি ভিয়েনায় থাকবেন। আমি চাই প্রকৃত ভিয়েনা তিনি একটু দেখুন। তাই তাঁর ঠিক লোকের হাতে পড়া দরকার। আমার আশঙ্কা ইহুদি ডাক্তারেরা, তিনি যে নতুন আগন্তুক, তার অন্যায় সুযোগ নিতে পারেন, যদি আগেভাগে তাঁকে সতর্ক করে না দেওয়া হয়।

Mrs. Askanasy-র কথা শুনে আমি খুব আগ্রহ বোধ করলাম। তিনি কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করতে যাবার কথা ভাবছেন? তা হলে তাঁর স্বামীর ব্যবসার কী হবে? তাঁর ক্লাবের খবর কী? তাঁর অনুপস্থিতিতে সে ক্লাব কি এখনও টিঁকে আছে? ভিয়েনায় যদি তিনি এর মধ্যে ফিরে থাকেন, তাঁর কাছে অনেক ভাল ভাল গল্প শুনতে পাবেন।

আমি সদ্য Briffault-এর Europa-র আমেরিকান (না কি ইংলন্ডের?) সংস্করণ পড়ে শেষ করলাম। আমার খুব ভাল লাগল। ড. ভেটার কেন বইটির অনুবাদ করছেন এখন বুঝতে পারছি। বইটির কয়েকটি অনুচ্ছেদ, আগেকার দিন হলে, অশ্লীল বলে চিহ্নিত হত। কিন্তু আমার মনে হয় যুগ এবং মানুষের রুচি দ্রুত বদলে যাচ্ছে। কয়েকদিন আগে আমি অলডাস হাক্সলির 'Eyeless

in Gaza' পড়ছিলাম। তাতে ওই রকম অংশ আছে, কিন্তু ইংল্যান্ডে যে বইখানি ভাল বিক্রি হচ্ছে, তা থেকেই বোঝা যায় এখন আর ইংল্যান্ডের সমাজ আগেকার মতো নীতিবাগীশ এবং ভণ্ড নেই।

মিসেস হারগ্রোভ-এর চিঠিপত্র কিছুদিন পাইনি। আমার মনে হয় শেষ চিঠি আমিই দিয়েছি। আপনি আমার কথা তাঁকে একটু মনে করিয়ে দেবেন? এবং তিনি কেমন আছেন, আমায় জানাবেন? এখন বোধহয় তিনি ধ্যানেই খুব মগ্ন হয়ে আছেন।

এর মধ্যে আপনি নিশ্চয় দেখে থাকবেন, সি. এম. জি-কে লেখা আপনার চিঠি খুব বড় করে ছাপা হয়েছে। আপনার যদি সময় হয়, পুরসভা সংক্রান্ত কিংবা জনস্বার্থ সংক্রান্ত যে কোনও বিষয়ে আপনি যে কোনও সময়ে চিঠি লিখতে পারেন। তারা খুব খুশি হয়ে সে-চিঠি ছাপবে।

আমার শরীরের অবস্থা, ছাড়া পাওয়ার পরেও, বিশেষ ভাল নয়। তবে আমি আশা করছি এখানে আমার শরীরের উন্নতি হবে। পাহাড়ের কোলে ছোট্ট জায়গাটি। এ-বাড়ির বারান্দা থেকে অনেক দূরের সমতল ভূমি, নদী দেখা যায়। বাড়ির আরেক দিকে দেখা যায় হিমালয় পর্বতমালা, কোথাও-কোথাও তুষারাবৃত। আমার ওপর এখন আর কোনও বিধি-নিষেধ নেই, তবে অবশ্য খুব গোপনভাবে কড়া নজর আমার ওপর রাখা হয়েছে, এবং আমার চিঠিপত্র গোপনে খোলা হয়। আমি চেপে ধরলে অবশ্য তারা তা অস্বীকার করে, কিন্তু আমরা সবাই জানি। সাধারণত গোপনে পরীক্ষা করার পর সব কিছুই আমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

আপনার যদি কখনও ভারতে প্রকাশিত কোনও ইংরেজি পত্রিকায় কিছু লিখবার ইচ্ছে হয়, আমাকে জানালেই আমি তার ব্যবস্থা করে দেব।

আপনার চিঠির জবাব দিতে আমার যে দেরি হল, তার খানিকটা পুরণ করবার জন্য এ চিঠি আমি বিমান ডাকে পাঠাতে চাই। আমি লাহোরে পৌঁছনর পর যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তার কাটিং এবং ১২ মে ডালহৌসিতে তোলা দুটি ছবি আলাদা খামে পাঠালাম। বাঙালির পোশাকে আমাকে আপনি চিনতে পারবেন কি না, কে জানে। তার ওপর আমি খানিকটা রোগাও হয়ে গিয়েছি।

আপনার সাম্প্রতিক সব চিঠিতে আমার মতো সামান্য লোকের জন্য আপনি যে প্রীতি ও আন্তরিকতা ব্যক্ত করেছেন, তা আমার কাছে কত মূল্যবান, সে কথা আমি চিঠি শেষ করবার আগে আপনাকে জানাতে চাই। সে-জন্য যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে আমি অক্ষম, দয়া করে আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জানবেন, এবং ড. ভি-কে জানাবেন।

এখন আপনার সময় কী নিয়ে কাটছে? অন্য কোনও ভারতীয় সাপ্তাহিক, কিংবা পত্রিকা আপনাকে পাঠাব কি?

আপনার একান্ত
সুভাষ সি. বোস

সন্তোষকুমার সেন-কে[১]
[মূল বাংলায়]

ডালহৌসি, পঞ্জাব
৩১.৫.৩৭

প্রিয় ডা. সেন,

আপনার ১৮ এপ্রিলের চিঠি তিন চার দিন আগে পেয়েছি। আমি ১২ তারিখে এখানে এসেছি, ইচ্ছে আছে কয়েক মাস থাকব। দেখা যাক এখানে আমার শরীর কেমন থাকে। এখানে এসে প্রথমটায় বেশ ভাল বোধ হচ্ছিল, তারপর থেকে গলার সমস্যা আবার শুরু হল এবং শরীর খারাপ হল। আমার ছাড়া পাবার আগে থেকেই ধর্মবীরেরা এখানে আসার জন্য আমাকে খুব পীড়াপীড়ি করছিলেন, তারপর হঠাৎ আমি মুক্তি পাওয়ার পর আরও জোর দিয়ে চিঠি দিলেন। সব কিছু বিবেচনা করে আমি তাঁদের আমন্ত্রণ স্বীকার করলাম। এখানে ওঁরা আমায় খুব যত্ন করছেন, মিসেস ধর্মবীরকে আমি বোনের মতো মনে করি।

স্বাস্থ্যের দিক থেকে, একবার ইউরোপ যেতে পারলে ভাল হত। কিন্তু নানা কারণে তা সম্ভব নয়। প্রথমত বিদেশযাত্রা ব্যয়সাপেক্ষ, তারপর এতদিন বিদেশে থাকার পরে, এখন স্বাধীন হয়ে আমি স্ব-ইচ্ছায় নিজের দেশ থেকে দূরে যেতে চাই না। এদেশে থাকলে সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সহজ হয়। ব্যাডগাসটেন-এর উষ্ণ প্রস্রবণে দু'বার অবগাহনের চিকিৎসায় আমার অনেক উপকার হয়েছিল তাই আমার বিশ্বাস, সেখানে অবগাহনের চিকিৎসা যদি বেশি নয়, আর এক মাসও করতে পারতাম আমার শরীরের দ্রুত উন্নতি হত। আগে আমি ভাবতাম 'স্নান' চিকিৎসা বিজ্ঞানের চমক ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু ব্যাডগাসটেন-এর বাথ আমি পরীক্ষা করেছি দেখেছি, তাতে প্রকৃতই উপকার হয়। সেখানকার তেজস্ক্রিয় জলে স্নান করলে শরীর ভাল বোধহয়, যেন টনিক খেয়েছি। যাই হোক, ও-সব ভেবে এখন লাভ নেই।

ভিয়েনার সোসাইটি বেশি দূর যেতে পারবে বলে আমি মনে করি না। গায়রোলা সোসাইটি নিজের তাঁবে রাখবেন। ভাল লোকেরা যেখানে বেশি দিন টিকতে পারেন না, সেখানে কি নতুন কিছু হবে বলে আপনি আশা করেন?

আপনার গবেষণাপত্র খুব ভাল হয়েছে জেনে আমি যার-পর-নাই খুশি হয়েছি। আপনি ভারতের কয়েকজন খ্যাতনামা চিকিৎসকের কাছে প্রবন্ধটি পাঠাতে পারেন (কয়েক কপি পত্রিকাতেও পাঠাবেন), বিশেষ করে যে-যে জায়গায় আপনি প্র্যাকটিস করবেন।

'ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান'কে পাঠানো চিঠিটি পেয়েছি। ও রকম লেখা, কিংবা খবরের কাগজের কাটিং যদি মাঝে-মাঝে পাঠান, খুশি হব।

ভিয়েনায় আর সব কেমন চলছে? মিস শেঙ্কল-এর চিঠি মাঝে-মাঝে পাই। 'Master'-কে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যত দূর সম্ভব তিনি বার্লিনে আছেন। গায়রোলা কখনও-কখনও চিঠি দেন, মিসেস মিলার সম্প্রতি ভারত ঘুরে এলেন। কলকাতার হাসপাতালে বিশেষ অনুমতি নিয়ে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করেছেন। মিসেস ভেটার গত সপ্তাহে আমাকে চিঠিতে লিখছেন, ইহুদিদের মধ্যে দারুণ উদ্‌বেগ। ভিয়েনায় আমাদের কয়েকজন ইহুদি বন্ধু আমেরিকা চলে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। আচ্ছা, Miss. Weiss-এর খবর কী? তাঁর প্যালেস্টাইন চলে যাওয়ার

---

১. এই পত্রটি বাংলায় লিখিত ছিল। মূল বাংলা পত্র এখন আর পাওয়া গেল না বলে ইংরাজি অনুবাদ থেকে পুনরনূদিত হল।

পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি আমার মত বিশেষ করে জানতে চেয়েছিলেন। তারপর কী সব ভয়ংকর ঘটনা ওখানে ঘটে গেল! আমার মনে হচ্ছে, বর্তমানে কিংবা ভবিষ্যতে মধ্য ইউরোপে ইহুদিদের অবস্থা আদৌ ভাল হবে না।

এখন ইংল্যান্ডে যখন আছেন, ভাল ডিগ্রি না নিয়ে ফিরে আসবেন না। নিজে আমি চিরকালই ডিগ্রি শিকারের বিরোধী। তা হলেও আপনি যখন দিল্লিতে পাকাপাকি ভাবে থাকবেন মনস্থ করেছেন এবং এখন ইংল্যান্ডে আছেন, এডিনবরা কি লন্ডন থেকে ভাল ডিগ্রি না নিয়ে আপনার ফেরা উচিত হবে না। যদি আপনাকে জেনারেল প্র্যাকটিস করতে হয়, অন্তত প্রথম দিকটায় ভাল একটা ডিগ্রি দরকার। এ অবশ্য বাজারের কথা মাথায় রেখে বলা, কিন্তু দুনিয়ায় বাজারের দোকানদারেরাই সর্বত্র বিরাজ করছে! যাই হোক, আমি আশা করি ভবিষ্যতে ক্রমে-ক্রমে স্পেশ্যালিস্টদেরও সুযোগ আসবে।

দিল্লির অধু বাবু (রাসবিহারী) কি আপনার আত্মীয়?

মিসেস ধর্মবীর আমাকে গতকাল বলছিলেন, তাঁর কাছে একটি প্রস্তাব এসেছে, ইংল্যান্ডের কোনও একটা জায়গায় কোনও ভারতীয় ডাক্তারের জায়গায় আপনার তিন-চার মাস প্র্যাকটিস করার। প্রস্তাবটা খারাপ নয়, কিন্তু ওদেশে প্র্যাকটিস করলে তাতে ভারতে কাজ করবার বিশেষ সুবিধা হয় না। তবে টাকার দিক থেকে তাতে আপনার লাভ হবে, তবে, এখনই যদি আপনার টাকার দরকার না থাকে, ওদেশে আপনার সময়টা জ্ঞান আহরণের কাজে লাগানোই ভাল। ওখানে প্র্যাকটিস করলে আপনি টাকা পাবেন ঠিকই, কিন্তু আপনার কাজে লাগবার মতো কোনও অভিজ্ঞতা কি হবে? যাই হোক, সেটা আপনিই ভাল বুঝবেন, কেননা, আপনি ভিয়েনা, লন্ডন, এডিনবরা প্রভৃতি অনেক জায়গায় নিজের চোখেই সব কিছু দেখেছেন, নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই আপনি জানেন, ভাল শিক্ষা কোথায় পাওয়া যায়।

আরেকটা কথা। এই কথাটা একটু দ্বিধা নিয়ে বলছি। মিসেস ধর্মবীর সীতার সঙ্গে আপনার বন্ধুত্বের কথা জানেন। ডাক্তার বোধহয় জানেন না। আপনি যদি মনে করেন, এ-বিষয়ে তাঁদেরকে কিছু বলা আমার ঠিক হবে, দয়া করে নিঃসঙ্কোচে আমাকে জানান। অবশ্য এটা আপনাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ওপর নির্ভর করে।

আশা করি ওখানে আপনাদের সকলেরই খবর ভাল।

আপনার
সুভাষচন্দ্র বোস

কিটি কুর্টি-কে

প্রযত্নে : ড. এন. আর. ধর্মবীর
ডালহৌসি
পঞ্জাব
3. 6. 37

প্রিয় মিসেস কুর্টি,

এত দিন আপনাকে চিঠি না দেওয়ার জন্য, এবং বেশ কয়েক মাস আগে আপনি যে চিঠি দিয়েছিলেন তার উত্তর না দেওয়ার জন্য আমি দুঃখিত। ইতিমধ্যে আপনি মার্চ মাসে আমার মুক্তিলাভের খবর শুনেছেন। আমার স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় আমি দীর্ঘ বিশ্রামের ও হাওয়া বদলের জন্য এখানে এসেছি। কয়েক মাস এখানে থাকব। এটি উত্তর পশ্চিম ভারতের একটি পাহাড়ি শহর, ২০০০ মিটার উঁচুতে।

আপনার এবং মি. কুর্টি-র কথা সব আমাকে লিখে জানাবেন। আপনাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী। প্রাগে কবে যাবেন? সেখানে কী করবেন, আগে থেকে কি পরিকল্পনা করেছেন? জুরিখে গিয়েই ইয়ুং-এর সঙ্গে কি দেখা করেছেন?

অ্যানেট যে আর. আর.-এর বর্তমান পত্নী তা কি আপনারা ঠিক জানেন?

ফ্রয়েড-এর পরিবার সম্বন্ধে আপনাদের কী মনে হয়েছে দয়া করে আমাকে জানাবেন। আপনার কাছ থেকে আমি এখন দীর্ঘপত্র প্রত্যাশা করি। আমার কথা বেশি কিছু লিখবার নেই।

কবিতাগুলির জন্য অনেক ধন্যবাদ। আমি অভিধানের সাহায্যে সেগুলো বুঝবার চেষ্টা করছি।

প্রীতি সহকারে
আপনার
সুভাষ সি. বোস

রামমনোহর লোহিয়া-কে

প্রযত্নে : ড. এন. আর. ধর্মবীর
ডালহৌসি
পঞ্জাব
২৭. ৬. ৩৭

প্রিয় ড. লোহিয়া,

কিছুদিন যাবৎ আমি ভাবছি আপনাকে একটি চিঠি দেব। বিশেষত একটি বিষয় সম্পর্কে। ফরাসি ভারতের যে-সমস্ত বন্দিকে ব্রিটিশ সরকার ব্রিটিশ ভারতে বন্দি করে রেখেছে, তাদের বিষয়ে সংবাদপত্রে দেখছি আপনি ফরাসি ভারতের সঙ্গে, এবং ফ্রেঞ্চ লিগ অব হিউম্যান রাইটস-এর সঙ্গেও পত্রালাপ করেছেন। এ পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে কোনও সাড়া পেয়েছেন কি না আমি জানবার জন্য আগ্রহী।

পুরনো ফাইল ঘেঁটে আমি দেখছি আপনি একটি চিঠিতে আমার এক ডজন ফোটো চেয়েছেন। আমার কাছে কোনও ভাল ফোটো নেই। একটা আছে কাজ চালাবার মতো, কিন্তু বিদেশে ব্যবহার করবার মতো নয়। যাই হোক, আমি আলাদা খামে ছবিটি পাঠাচ্ছি। আপনার যদি মনে হয় ওতে কাজ চলবে আমি আরও কপি করে আপনাকে পাঠিয়ে দেব।

আমার মনে হয় সমস্ত রাজনৈতিক বন্দির মুক্তির জন্য সারা ভারতে একটা তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করা দরকার। এ বিষয়ে আপনার কী মনে হয়?

আশা করি আপনি ভাল আছেন। আমি আগেকার চেয়ে খানিকটা ভাল আছি। যদিও উন্নতি খুব ধীরে ধীরে হচ্ছে।

শুভেচ্ছা সহকারে
আপনার
সুভাষ সি. বোস

ড. আর. এম. লোহিয়া
এলাহাবাদ

সুধীরকুমার বসু-কে

প্রযত্নে : ড. এন. আর. ধর্মবীর
ডালহৌসি
পঞ্জাব
২৯. ৬. ৩৭

প্রিয় সুধীরবাবু,

মুক্তির পরে আপনার টেলিগ্রাম পেয়ে আমি অতিশয় আনন্দিত হয়েছি। উত্তর দিতে দেরি হওয়ার জন্য আমি খুব দুঃখিত।

আপনি এখন কেমন আছেন? আপনি কি ওই বাড়িতেই আছেন? আর, অর্জুন কি এখনও আপনার সঙ্গে আছে? চা করছে, লুচি ভাজছে, মুরগির ঝোল রাঁধছে?

আর আপনার ছেলে? সে কেমন আছে? লুকোচুরি খেলবার পক্ষে সে নিশ্চয় এখন একটু বেশি বড় হয়ে গেছে।

ওখানকার সব বন্ধুকে আমার কথা বলবেন। আপনি কি এখনও মিলনী ক্লাবের দেখাশোনা করছেন? বিবেকানন্দ সোসাইটি, আর মহিলা সমিতির কী খবর? মিলনী নামটি বোধহয় আমি একটু গুলিয়ে ফেলছি।

মিলনী কি সিনেমাটার নাম নয়?

এখানে আসার পর থেকে আমি একটু ভাল আছি—যদিও যতটা চাই তত দ্রুত উন্নতি আমার স্বাস্থ্যের হচ্ছে না।

সন্তোষবাবুর সঙ্গে কলকাতায় আমার দেখা হয়েছিল।

আশা করি ভাল আছেন।

আপনার
সুভাষ সি. বোস

সুনীল মোহন ঘোষ মৌলিক-কে
[মূল বাংলায়]

শ্রীযুক্ত সুনীল মোহন ঘোষ মৌলিক
পাঁচথুপি
মুর্শিদাবাদ

C/o, Dr. N. R. Dharmavir,
Dalhousie, Punjab.
2.7.37

প্রীতিভাজনেষু—

সুনীল

তোমার ১৯/৩ তারিখের চিঠির উত্তর কি আমি দিয়েছি? আমার ঠিক স্মরণ নেই। যাহা হোক আমার আন্তরিক ভালবাসা গ্রহণ করো। গ্রামবাসীদেরও আমার আন্তরিক প্রীতিসম্ভাষণ জানাবে। পত্রের উত্তর দিতে এত বিলম্ব হল বলে কিছু মনে করবে না।

তোমরা কেমন আছ? তুমি বোধহয় আজকাল কলকাতার দিকে বেশি আসতে পার না। যাহা হোক, আশা করি পড়াশুনার চর্চা সর্বদা রাখবে—তা না হলে মনের প্রসার কমে যাবে এবং দৃষ্টিও সংকীর্ণ হয়ে পড়বে।

এখানে এসে আমার শরীর পূর্বাপেক্ষা কতকটা ভাল আছে। তোমাদের কুশল সর্বদা প্রার্থনা করি।

ইতি
নিত্য শুভার্থী
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

সীতা ধর্মবীর-কে

ডালহৌসি
৭.৭.৩৭

প্রিয় সীতা,

এত দিন তোমায় চিঠি না দেওয়ার জন্য আমি দুঃখিত। বিশ্বাস করো, এ নিছক কুঁড়েমি।

আমের জন্য ধন্যবাদ। তার যথাযোগ্য ব্যবহার আমরা করছি। ডাক্তার অবশ্য পচা আমগুলিই বেশি পছন্দ করেন, পচতে আরম্ভ করা পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করেন। আমি ভাবি, যে-আম পচতে আরম্ভ করেছে তা কি কোনও ওষুধের কাজ করে? ডাক্তার বলেন, জিনিস নষ্ট করা আমাদের উচিত নয়। এ যুক্তিটা মানা কঠিন। তিনি আরও বলেন, পচা মাছ কিংবা মাংস খেলে কঠিন অসুখ হতে পারে, পচা ফল খেলে পেটের অসুখের বেশি...ইত্যাদি ইত্যাদি।

খাবার টেবিলে আরও একটা মুশকিল হয়, ডা. সকলকে খরমুজ না-খাইয়ে ছাড়বে না। দিদিকে হার মানতেই হয়, কী আর করবেন। কিন্তু মীরাবেন আর আমি শুনি না, আমরা বলি খরমুজ গুরুপাক। কখনও কখনও আমার প্লেটে জোর করে চাপিয়ে দিলে, আমি আপত্তি জানিয়ে খাই। ডাক্তারের মতে ফলের মধ্যে খরমুজই সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি সকালে, দুপুরে, রাত্রিতে খরমুজ খান (আমি বলি চায়ের সঙ্গেও খেতে পারেন, কিন্তু চায়ের সঙ্গে আর কিছু খাওয়া তাঁর অতিশয় অপছন্দ।)

সাখালে উপজাতির সঙ্গে আমাদের বিশেষ দেখা হয় না। গতকালই প্রথম তাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। দিদি ডা. মানডালকে আজ বিকেলে চায়ে নিমন্ত্রণ করেছেন। তিনি, অর্থাৎ ডা. মানডাল, আমার মনে হয়, কাল নেমে যাচ্ছেন (কিংবা দু-এক দিনের মধ্যেই। পাঞ্চপুলা রোড এখন রাস্তা হিসাবে বেশ পরিষ্কার, কিন্তু আমি এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে একমত যে থানডরাইট রোড সন্ধ্যাবেলা হেঁটে বেড়াবার পক্ষে সবচেয়ে ভাল। আমরা সাধারণত সূর্যাস্তের সময়ে ওখানে যাই। আমি তার নাম দিয়েছি "Lover's Walk"। অনেক ইংরেজ দম্পতি প্রায়ই ওখানে যায়।

শিশুদের কথা তুমি যা লিখেছ, আমি তাতে আগ্রহ বোধ করছি। আমারও মনে হয় ভারতীয়েরা বড় বেশি সংখ্যায় শিশুকে পৃথিবীতে নিয়ে আসে। কেন? মরবার জন্য। কারণ অতি অল্পই বড় হয়। তখনই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কথা আসে, ভারতের পক্ষে যা অত্যন্ত আবশ্যক। মহাত্মা গান্ধী বলেন আত্মসংযম অবশ্যই খুব ভাল, যদি দয়া করে মানুষ ততখানি বিচারবুদ্ধি প্রদর্শন করতে পারে। কিন্তু তা যদি না হয়, ডা. মানডাল, আশা করেন তাঁর কথাই ভারতের পক্ষে মঙ্গলজনক হতে পারে।

আজ এই পর্যন্তই, কেন না কয়েকজন দেখা করতে এসেছেন। আশা করি তোমরা ভাল আছ, আমার সময় ভালই কাটছে, পরিবারের সবাই ভাল আছেন। আবহাওয়াও ভাল। প্রীতি নিও।

তোমার
সুভাষ

কিটি কুর্টি-কে

ডালহৌসি
পঞ্জাব
ভারত
১০.৭.৩৭

প্রিয় মিসেস কুর্টি,

আপনার ২০ জুনের চিঠি পেয়ে আমি খুশি হয়েছি। তার জবাব দিতে দেরি হওয়ায় আমি দুঃখিত। মুক্তি পাওয়ার পরে আমি এখানে এসেছি শরীর সারাতে। এটি একটি পাহাড়ি শহর, ভারতের উত্তর-পশ্চিমে, ২০০০ মিটার উচ্চতায়। কোলাহলবিহীন। এখান থেকে উত্তর হিমালয়ের তুষারাবৃত শৃঙ্গগুলি দেখতে পাওয়া যায়। আমার স্বাস্থ্য এখন আগেকার চেয়ে অনেক ভাল, কিন্তু এখনও আমি সম্পূর্ণ সুস্থ নই। কাজেই আমি আরও দু' মাস এখানে থেকে তারপর সমতলে ফিরে গিয়ে আমার কাজ আরম্ভ করব। এখন ভারত ছাড়া সম্ভব হবে না, কারণ এখানে করবার অনেক কাজ আছে।

আপনি চিঠিতে লিখেছেন আপনি সন্তান-সম্ভবা। আশা করি এক অপূর্ব সুখানুভূতিতে আপনার মন পরিপূর্ণ । এবং আপনি ও শিশু দু'জনেই ভাল আছেন।

মনোবিশ্লেষকদের বিষয়ে আপনি যা লিখেছেন, খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। এ কথা ঠিক, ইউরোপের পরিমণ্ডল স্বার্থপরতায় পূর্ণ। লোকের মনে শান্তি নেই, তারা স্নায়ুদৌর্বল্য রোগে ভুগছে। তার নিরাময় সম্ভব একমাত্র নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে। কিন্তু নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করা যেতে পারে একমাত্র নিঃস্বার্থপর হলে। ইউরোপে নিঃস্বার্থপরতা খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। আমেরিকায় কবে যাচ্ছেন? আশা করি সেখানে গিয়েও চিঠিপত্র লিখবেন।

এখানে ভারতে আমাদের কাজ ধীরে এগোচ্ছে। আমাদের সামনে কঠিন কর্তব্য, কিন্তু আমরা আশাবাদী। আমাদের দলের অবস্থা এক বছর আগে যা ছিল তার চেয়ে অনেক মজবুত। দলের প্রভাব এবং মর্যাদা বেড়েছে। তবে অবশ্য আমরা জানি আমরা যা চাই, ইংরেজরা সহজে দেবে না।

মি. কুর্টি ও আপনি আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন।

আপনার
সুভাষ সি. বোস

সীতা ধর্মবীর-কে

ডালহৌসি
৩১.৭.৩৭

প্রিয় সীতা,

তোমার ২০ তারিখের চিঠি পেয়ে খুশি হলাম। তারপর থেকে ওখানে এবং এখানে, দু'জায়গাতেই সব উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে। গত কিছুদিন ধরে আমি ডাক্তারের সঙ্গে লীলার এবং তোমার শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করে আসছি এবং আমি বলে আসছি আর সময় নষ্ট না করে তোমাদের বিদেশে যাওয়া উচিত। এমনিতে তাতে তিনি রাজিই। সব সময়ে বলে আসছিলেন, ভারতে তোমাদের কাজ শেষ হলে তোমরা বিদেশে যেতে পারো। কলকাতায় তোমার চাকরি পাওয়ার খবরটা যখন এল, বিষয়টা নিয়ে আবার নতুন করে আলোচনা হল। ডাক্তার তখন বললেন, কলকাতায় না গিয়ে তুমি ইংল্যান্ডেও যেতে পারো। লীলাও যেতে পারে। তখন আমি বললাম, তা হলে তোমাদের দু'জনকেই সেপ্টেম্বরে জাহাজে চাপতে হবে। ডাক্তার বললেন তাতে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। তখন ঠিক হল, ডাক্তার তক্ষুনি তোমাদের চিঠি দেবেন। ডাক্তার আজ লাহোর গেলেন। আজ কিংবা কাল লীলার সঙ্গে তিনি এ নিয়ে কথা বলবেন।

অর্থাৎ তুমি কলকাতায় না গিয়ে এখন (সেপ্টেম্বরে) ইংল্যান্ডে যেতে পারো। সেক্ষেত্রে লীলা চাইলে সে তোমার সঙ্গে যেতে পারে। এখন তোমাদেরই ঠিক করতে হবে, তোমরা কী করবে। আমি হলে, সঙ্গে-সঙ্গে রাজি হয়ে যেতাম এবং বিদেশে চলে যেতাম।

ডাক্তার সোমবার সকালে ফিরে আসবেন। দিদিকে আমি যতদূর বুঝতে পারছি, সময় নষ্ট না করে তিনি তোমাদের বিদেশে যাওয়ার পক্ষে।

আমার মনে হয় আমাদের চিঠি তুমি সোমবারে পাবে। তোমার সিদ্ধান্ত জানিয়ে তখন তুমি ডাক্তারকে একটা টেলিগ্রাম করো না কেন?

আলুর সঙ্গে আমার কোনও শত্রুতা নেই এবং ডাক্তারের আপত্তি সত্ত্বেও মাঝেমধ্যে খেয়ে থাকি। মাঝে-মাঝে তাঁর সঙ্গে আমার জোর ঝগড়া হয়ে যায়, কেননা তাঁর মতে আমি বড় বেশি সুপ খেয়ে ফেলি, যেটা ঠিক নয়। গত কয়েকদিন খরমুজের দেখা বিশেষ পাওয়া যাচ্ছে না। ভগবানকে তার জন্য ধন্যবাদ।

এখানকার আবহাওয়া, জুন-জুলাই মাস হলেও, মোটের ওপর ভালই যাচ্ছে। অগাস্টে কী হয় দেখা যাক। বাধ্য হয়ে নিষ্কর্মা হয়ে আছি বলে মাঝে-মাঝে অস্থির লাগে।

আজ লক্ষ্ণৌতে একটি ছাত্র-সম্মেলন হচ্ছে। এখনই তাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে একটা টেলিগ্রাম পাঠালাম।

হ্যাঁ, কখনও-কখনও অপূর্ব সূর্যাস্ত দেখতে পাচ্ছি, তবে এক-এক সময়ে বড় বেশি মেঘলা থাকছে। আমি ভাবি, রঙিন ফোটো কতদিনে ঠিকমতো সম্ভব হবে।

সন্তোষের চিঠি মাঝে-মাঝে পাই।

প্রীতি নিও,

তোমার
সুভাষ

সন্তোষকুমার বসু-কে

ডালহৌসি
(পঞ্জাব)
৫.৮.৩৭

প্রিয় সন্তোষবাবু

এই ব্যাপারটা নিয়ে আপনি একটু দেখবেন, কী করতে পারেন? পুরসভার কাজে আপনার যত অভিজ্ঞতা তাতে এটা নিয়ে কীভাবে এগোনো দরকার আপনি জানতে পারেন। এখান থেকে পরামর্শ দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন। এই চিঠিটির লেখকের সঙ্গে একটু পরামর্শ করবেন?

আমি এখন খানিকটা ভাল। আশা করি আপনারা সবাই ভাল আছেন।

আপনার একান্ত
সুভাষ সি. বোস

কমার্শিয়াল গেজেট
(প্রতিষ্ঠা ১৯২০)
অর্থনীতি, শিল্প এবং বিনিয়োগ বিষয়ে সাপ্তাহিক পত্রিকা

২, রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস
কলকাতা
৭ জুলাই ১৯৩৭

প্রিয় মি. বোস,

আমি আপনাকে 'কমার্শিয়াল গেজেট'-এর বর্তমান সংখ্যার একটি কপি পাঠাচ্ছি, এবং তার সঙ্গে "Toll of High-Tension Alternating Current" শীর্ষক প্রবন্ধেরও একটি মুদ্রিত কপি পাঠাচ্ছি, আপনার পড়বার জন্য।

আপনি নিশ্চয় জানেন, প্রায় তিন বছর ক্রমাগত আন্দোলনের পরে গভর্নমেন্ট ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন-এর মূল্য হারের বিষয়ে তদন্ত করবার জন্য একটি তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করেছে, এবং সেই আন্দোলনে কমার্শিয়াল গেজেট-এর অবদানও খুব নগণ্য ছিল না। আপনি জেনে খুশি হবেন, সেই সময়ে, যখন কমিটি জনসাধারণের সাক্ষ্য গ্রহণ করছিল, জনস্বার্থের মুখপাত্র হিসাবে অসংখ্য সংস্থা কমিটির সামনে সাক্ষ্য প্রদান করেছিল, লিখিত এবং মৌখিকভাবে। ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন লিমিটেড-এর পক্ষে মি. ডবলু. ডবলু. কে. পেজ, বার অ্যাট ল, সি. ই. এস. সি. কাজ পর্যবেক্ষণ করেন, সওয়াল করেন, কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন সার নলিনীরঞ্জন চ্যাটার্জি, হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি।

কমিটির অধিবেশনগুলির শেষের দিকে আপনার শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীশরৎচন্দ্র বোস, দয়া করে আমার অনুরোধে সম্মত হয়ে হাইকোর্টে তাঁর অন্য কাজকর্ম ছেড়ে জনসাধারণের পক্ষে সওয়াল করেন, এবং মি. পেজের যুক্তির মোক্ষম প্রত্যুত্তর দেন। তিনি যদি জনসাধারণের পক্ষে কমিটির সামনে না দাঁড়াতেন, কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রাহকদের পক্ষে যতটা অনুকূল হয়েছে, তা না হয়ে সম্পূর্ণ অন্য রকম হত। যদিও বিদ্যুৎ-সংক্রান্ত প্রযুক্তির ব্যাপারে তিনি অবগত ছিলেন না, কমিটির সামনে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াবার আগে তিনি স্বেচ্ছায় সে-বিষয়ে ১৪ ঘণ্টার শিক্ষা গ্রহণ করেন।

যাই হোক, এ বার আসল কথায় ফিরে আসি। আমি যা প্রস্তাব করতে চাই, সেটা হল,

আপনি যদি মনে করেন গ্রাহকদের বক্তব্য ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত,— আমি নিশ্চিত আপনি তাই মনে করেন, কারণ আপনি কলকাতা পুরসভায় Chief Executive Officer ছিলেন এবং ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন লিমিটেড-এর বিষয়ে আপনি সম্পূর্ণ অবগত— তা হলে কি আপনি বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি-কে, অ্যাসেম্বলির যে অধিবেশন আগামী ২৯ জুলাই আরম্ভ হবে, সেই অধিবেশনে বিষয়টি পেশ করতে পরামর্শ দেবেন?

আমি জানি আপনার ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য এ পত্র আপনার পক্ষে ক্লান্তিকর হতে পারে, কিন্তু আমার বিশ্বাস জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট এমন কোনও বিষয়ে আগ্রহ বোধে আপনার ক্লান্তি নেই। এ-অবস্থায় যা প্রয়োজন আপনি কি দয়া করে করবেন? কমিটির সামনে পেশ করা আমার সাক্ষ্যের একটি কপি আপনাকে পাঠালাম এবং আপনাকে অনুরোধ করছি, এটি পড়বেন, বিশেষত ৯, ১০ ও ১৮ পৃষ্ঠা।

আশা করি এই দীর্ঘপত্রের জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। ঈশ্বরের কাছে আপনার পরিপূর্ণ আরোগ্যলাভের জন্য প্রার্থনা করি।

আন্তরিকভাবে আপনার
কে. ঘোষ

সুভাষ চন্দ্র বোস
প্রযত্নে ডা. ধর্মবীর
ডালহৌসি (পঞ্জাব)

রামমনোহর লোহিয়া-কে

ডালহৌসি
৫.৮.৩৭

প্রিয় ড. লোহিয়া,

আপনার ৫ জুলাইয়ের এফ.ডি. ৯/২৬৪ নম্বর চিঠির উত্তর দিতে দেরি হওয়ার জন্য আমি দুঃখিত।

ফরাসি-ভারতের রাষ্ট্রবন্দিদের প্রশ্নটি আপনি হাতে নেওয়াতে আমি খুশি হয়েছি। শেষ যে খবর এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে কালিচরণ ঘোষ আংশিক মুক্তি পেয়েছেন। তিনি পুরোপুরি ছাড়া পেয়েছেন কি না সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই।

আমি চাই রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির জন্য ভারত জোড়া আন্দোলন হোক। আপনি বলেছেন সভাপতি নেহরুর সঙ্গে আপনি কথা বলেছেন। আমিও এ বিষয়ে কিছুদিন আগে তাঁকে চিঠি দিয়েছি। আমি চাই এ বিষয়ে তিনি নেতৃত্ব দিন।

আপনি যেমন চেয়েছেন, কয়েকটি ফোটো আমি আলাদা খামে পাঠাচ্ছি।

আশা করি সবাই ভাল আছেন। আমি আগেকার চেয়ে খানিকটা ভাল আছি।

আন্তরিক শুভেচ্ছা সহকারে।

আপনার একান্ত
সুভাষ সি. বোস

ডা. রাম মনোহর লোহিয়া

অনিলচন্দ্র গাঙ্গুলি[১]-কে
[মূল বাংলায়]

ডালহৌসি
পঞ্জাব
৪.৪.37

প্রিয় অনিল,

তোমার প্রীতিপূর্ণ পত্রটি পাওয়ার পর থেকে আমি তোমাকে চিঠি দিতে চাইছি, কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার আলস্য। এমন নয় যে এতদিন আমি অলস হয়ে বসে আছি—স্বাস্থ্য যখন কারও খারাপ থাকে যে কোনও রকমভাবে চালিয়ে যায়, শুধু জরুরি কাজগুলো করে। সে রকম কাজ এত ছিল যে তাতেই আমাকে ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন থাকতে হয়েছে।

তোমার শরীরের গোলযোগের কথা জেনে আমি বিস্মিত ও দুঃখিত হয়েছি, কম বয়সে তোমার স্বাস্থ্য কত ভাল ছিল, কত উজ্জ্বল, কত ফুর্তিবাজ ছিলে। তোমার কাছে কত আশা ছিল। সে আশা তুমি এখনও পূরণ করনি। যাই হোক, এখনও সময় আছে।

আমি ভগবান বিশ্বাস করি। প্রার্থনাতেও বিশ্বাস করি, যদিও নিজে প্রার্থনা বিশেষ করি না। আমি যে মানসিক (কিংবা তুমি বলতে পার, আধ্যাত্মিক) অনুশীলন আজকাল করছি, সেটা দু'ধরনের: আমার তখনকার মানসিক অবস্থা অনুযায়ী। এই দুটি অভ্যাসের একটি হল আত্মপ্রতিষ্ঠা। আমি শান্তভাবে বসে জোর দিয়ে চিন্তা করি যে, আমি মানবিক দুর্বলতাগুলো, যথা কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয় জয় করেছি। এই অভ্যাসের দ্বারা আমি প্রচুর শক্তিলাভ করেছি এবং এতে আমি অনেক প্রকার দুর্বলতা জয় করেছি। আরেকটি অভ্যাস আত্মসমর্পণ। আমি বসে বসে দৈবীশক্তির এক বিরাট প্রবাহের কথা চিন্তা করি, বার্গসঁর elan vrtal-এর মতো, এবং আমার নিজের সত্তাকে তার মধ্যে মিশিয়ে দিতে চেষ্টা করি। আমি অনুভব করতে চেষ্টা করি, এইভাবে নিজেকে তার মধ্যে বিলীন করে দেওয়ার (কিংবা আত্মসমর্পণের) ফলে দৈবী শক্তি আমার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, আমি ঈশ্বরের হাতের যন্ত্রমাত্র। আমি কখনও সচেতনভাবে জাগতিক বস্তু কিছু চাই না। তা হবে হীন ও অসুন্দর। আমি মনে-মনে, আত্মসমর্পণের মনোভাব নিয়ে বলি, thy will be Done.

জীবন অন্তহীন সংঘাত। সমস্ত আবেগ জয় না করা পর্যন্ত কোনও শান্তি নেই, কিন্তু সংগ্রাম করতে-করতে ধীরে-ধীরে আনন্দ লাভ হয়, গভীর সন্তোষ ও আত্মবিশ্বাস আসে।

দর্শনে আমার আগ্রহ আছে, কিন্তু তার জন্য সময় বেশি পাই না। মনস্তত্ত্বের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক আমি খানিকটা বজায় রেখেছি। রাজনৈতিক বিষয়েও আমি অনেক পড়াশোনা করি অর্থাৎ রাজনৈতিক দর্শন ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিষয়ে। তা ছাড়া আমি কিছু পরিমাণে সবজান্তা হওয়ার চেষ্টা করি, কেননা জনগণের কাজ করতে গেলে সমস্ত সমস্যা সম্পর্কে সাধারণভাবে একটা জ্ঞান দরকার। কোনও-কোনও দিক থেকে এটা একটা অসুবিধাও কারণ, এতে বিশেষজ্ঞ হওয়া যায় না। কিন্তু এর কোনও উপায় নেই, কারণ জীবন হ্রস্ব, শক্তিও সীমাবদ্ধ, আমি সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেয়েছি অনিশ্চয়তা থেকে ও বিপদসঙ্কুল জীবন থেকে, কোনও আদর্শের জন্য জীবনকে উৎসর্গ করা থেকে। তাতে সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণার ক্ষতি পূরণ হয়ে যায়,

---

১. এই পত্রটি বাংলায় লিখিত ছিল। মূল বাংলা পত্র এখন আর পাওয়া গেল না বলে ইংরাজি অনুবাদ থেকে পুনরনূদিত হল।

জীবন হয় রোম্যান্টিক। সবচাইতে বেশি ব্যথা পেয়েছি মানুষের আচরণ থেকে, কখনও-কখনও নিজের বন্ধুর আচরণে, যাদের কাছ থেকে আরও ভাল, আরও মহৎ কিছু পাওয়ার আশা ছিল।

তোমার বইগুলি পেয়ে খুশি হয়েছি। দুঃখের বিষয় এখনও সেগুলো পড়া হয়নি, শুধু চোখ বুলিয়েছি। সর্বদা আমি তোমার হিতাকাঙ্খী। এখন কি হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করছ? বিয়ে করেছ?

মাঝে মাঝে আমাকে চিঠি দিও, আমার ও তোমার ভাইদের কথা প্রায়ই চিন্তা করি। তুমি যে তোমার দেশের জন্য আরও বেশি কিছু করনি, তাতে আমি দুঃখিত। তবে সময় এখনও আছে। সংগ্রাম এখনও শেষ হয়নি, তোমার অভিজ্ঞতা আছে, যাই তার মূল্য হোক, সব সময়ে তোমার কাজে তুমি লাগাতে পার। আমার লুকোবার কিছু নেই। তোমার বাবা-মা'কে আমার প্রণাম।

অনেক প্রীতি নিও।

তোমার
সুভাষ

পুনশ্চ: একটা কথা তোমায় বলতে ভুলে গেছি। একটা মানসিক অনুশীলন থেকেও আমি অনেক উপকার পেয়েছি, আত্মবিশ্লেষণ। যখনই সময় পাই, আমি শান্তভাবে বসে নিজের মনের মধ্যে দৃষ্টি-সঞ্চালন করে দেখতে চেষ্টা করি সেখানে কোনও দুর্বলতা আছে কি না, কী দুর্বলতা আছে। এই উপায়ে আমি অনেক নিকৃষ্ট বস্তুর সন্ধান পেয়ে অঙ্কুরেই সেগুলোকে বিনষ্ট করেছি। খুঁজে পেলেই অর্ধেক কাজ হয়ে যায়। কোনও নিকৃষ্ট বস্তুর সন্ধান পেলে আত্মপ্রতিষ্ঠা সহজ হয়, মানবিক দুর্বলতাগুলো বিনষ্ট করা সহজ হয়। আমাদের মানসিক ব্যাধির অধিকাংশের কারণ হচ্ছে আমরা নিজেদের মনকে নিজেরাই জানি না। মন এমন সূক্ষ্ম জিনিস যে সে নিজেই নিজেকে ঠকায়। তাই দৈনিক মানসিক অনুশীলন অনবরত করে যেতে হয়। Abnormal psychology এবং psychopathology-র চর্চা আমার আত্মবিশ্লেষণে সাহায্য করেছে।

এস. সি. বোস

ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-কে

ডালহৌসি
(পঞ্জাব)
৯.৮.৩৭

প্রিয় ক্ষিতীশ,

তোমার ২০ জুনের চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি। চিঠিটি পড়ে খুব খুশি হয়েছি। তোমার এখনকার কাজে তুমি শান্তি ও সন্তোষ লাভ করেছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমরা সবাই তো আলাদা-আলাদা ক্ষেত্রে আলাদা-আলাদা ভাবে কাজ করি, কোনও এক ধরনের তৃপ্তি লাভের জন্য। কেউ যদি সে-তৃপ্তি পেয়ে যায়, আর বলবার কিছু থাকে না।

দিলীপের না আসাতে আমার খারাপ লাগছে। আশায় ছিলাম, পাহাড়ের শান্ত নির্জনতায় নিভৃতে তার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা হবে। কিন্তু দীর্ঘ আট বছর নির্জনতা ও শান্তি সে যথেষ্ট উপভোগ করেছে এবং স্বাভাবিকভাবেই কলকাতার আকর্ষণ তার কাছে প্রবল। যদি কলকাতায় তার ভাল লাগে, আমার কিছু বলবার নেই। আমি খালি আশা করি ও প্রার্থনা করি পণ্ডিচেরি থেকে সে শীঘ্র ফিরে আসুক। সেখানে সে নিমগ্ন হয়ে থাকবে, আমি কখনই সেটা পছন্দ করিনি।

তবে আমার কাজ আমাকে করে যেতে হবে। পথ দীর্ঘ, নিরানন্দ। মাঝে-মাঝে ক্লান্তি লাগে। অন্ধকার আমাকে গ্রাস করে, আবার মাঝে-মাঝে বিদ্যুতের আলোও ঝলকায়, কিন্তু তাতে কী? এগিয়ে চলায় আনন্দ আছে। আমি এখনও গৃহহীন যাযাবর। শান্তি, শান্তি! শান্তির সন্ধান আমি এখনও পাইনি, তৃপ্তিরও নয়। শুধু যে বিদ্যুতের ঝলকানিই আমাকে টানে তা নয়, অন্ধকারও আকর্ষণ করে। শুধু উজ্জ্বল ভবিষ্যৎই প্রলুব্ধ করে না, অনিশ্চয়তার অন্ধকারও হাতছানি দেয়। যদি আলোয় পৌঁছোবার আগেই আমার পতন হয়, তাতেই বা কী? এগিয়ে চলাতেও আনন্দ, পথ হাতড়ানোতে, প্রাণ বিসর্জনেও আনন্দ!

তোমার স্নেহের,

সুভাষ

কলিকাতা পুরসভার একজন কর্মী-কে

৯ অগাস্ট ১৯৩৭

আপনি আমার সহায়তা চেয়েছেন। আমার যদি ক্ষমতা থাকত সানন্দে সহায়তা দিতাম। কিন্তু নিজের অসহায়তায় আমি বেদনা বোধ করি। আমার প্রভাব সম্পর্কে আপনার ধারণা অতিরঞ্জিত। যদি মানুষের ওপর আমার কোনও প্রভাব থেকে থাকে, পুরসভার চার দেওয়ালের মধ্যে অবশ্যই তার অস্তিত্ব নেই। যদি থাকত, বিগত কয়েক বছরে অনেক কিছু ঘটেছে, তা ঘটত না। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে কংগ্রেস সদস্যরা পুরসভার বড়-বড় উচ্চপদস্থ কর্মীদের বেতনাদি বৃদ্ধি করে দরিদ্রতর কর্মীদের বর্তমান বেতনক্রমেই রেখে দেওয়ার জন্য প্রবেশ করেননি। যে সংস্থায় কংগ্রেস সদস্যদের প্রচুর প্রভাব আছে, কিংবা থাকা উচিত, যাতে গত কয়েক বছরে স্বজন-পোষণের প্রাবল্য, তার কাজ-কর্ম দেখে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যায়। কয়েক মাস আগে Chief Executive Officer যখন কয়েক মাসের ছুটির জন্য দরখাস্ত করেছিলেন তখন তাঁর প্রতি যে আচরণ করা হয়, সেটি তার একটি দৃষ্টান্ত। গরিব কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদি বৃদ্ধির দাবি অগ্রাহ্য করবার জন্যে যে-সব যুক্তি সাধারণত দেখানো হয়ে থাকে, মার্কা-মারা আমলাদের মুখেই তা শোভা পায়। মানুষ-হিসাবে আমার যে সুবিচার বোধ এবং কংগ্রেসি হিসাবে আমার বিবেক তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। কিন্তু বর্তমানে আমি নিরুপায়।

মুক্তি পাওয়ার পর থেকে পুরসভার অভ্যন্তরীণ কাজকর্ম নিয়ে আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। যে-সব গুজব এবং খবর আমার কানে পৌঁছচ্ছে, তার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও যদি সত্য হয়, মানুষকে জোর ধাক্কা দেওয়ার পক্ষে সেটা যথেষ্ট। আমি দেখে খুশি হলাম যে বর্তমান মেয়রের অধীনে পুরসভার বিভিন্ন বিভাগের যে-সব গ্লানি তার আচ্ছাদনের একটি কোনা অন্তত তুলে ফেলা হয়েছে। কিন্তু আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, যা এখনও অন্ধকারে ঢাকা, তার তুলনায় যা প্রকাশ পেয়েছে সেটা কিছুই নয়।

কংগ্রেসি হিসাবে পুরসভায় যা ঘটছে তার জন্য আমারও কিছু দায়িত্ব আছে, এবং সে-বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অবহিত। এই দায়িত্ববোধ শুধু গরিব কর্মচারীদের প্রতি অবিচার নিয়েই নয়, তা ছাড়াও আরও অনেক ক্ষেত্রে প্রসারিত। এ-সমস্যার সমাধানের চেষ্টা নিকট ভবিষ্যতেই করতে

হবে। আমি কাজে ফিরে এলে কীভাবে কাজ করব আজ আপনাকে বলতে পারছি না, শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, বঙ্গীয় রাজনীতির সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক যদি থাকে, কলকাতা পুরসভার এই নরকের জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে বিদায় করতেই হবে, নয়তো পুরসভার কাজকর্ম সম্পর্কে যাবতীয় দায়িত্ব কংগ্রেসকে ত্যাগ করতে হবে।

আমার মতে, পুরসভায় যা ঘটেছে সেটা থেকে বঙ্গ দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে যা চলছে তার পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের লোকজনকে একটা নৈতিক জাড্য গ্রাস করেছে। একটা গতিশীল আদর্শবোধের অভাব হয়েছে। আমাদের যা-কিছু আদর্শবোধ ছিল মনে হয় তার সবই জেলখানায়, বন্দিশালায় তালাবন্ধ হয়ে আছে। আর বাইরে যারা আছে তারা যেন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে লেফট-রাইট করছে, নয় পিছিয়ে পড়ছে। তাই সব দিকেই দেখছি ক্ষুদ্র বাদ-বিবাদ, সামান্য বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব যার ফলে প্রকৃত এবং গভীরতর সমস্যাগুলো অবহেলিত হচ্ছে। এ থেকে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র পথ নৈতিক পুনরুত্থান, আদর্শবোধের এখন এক জোয়ার যা ভাসিয়ে নিয়ে যাবে যা কিছু ক্ষুদ্র, হীন, প্রতিক্রিয়াশীল, যেমন আমাদের রাজনৈতিক জীবনে তেমনি আমাদের হৃদয়েও ফিরিয়ে আনবে, যার এখন খুবই প্রয়োজন, বিশ্বাস, সততা, নিঃস্বার্থ আনুগত্য। আমি অনুভব করছি, বিশ্বাসহীনতা এবং প্রতিক্রিয়াশীলতার এই পর্বের শেষে বিরাট নৈতিক পুনর্জাগরণের দ্বারপ্রান্তে আমরা দাঁড়িয়ে আছি।

সন্তোষকুমার বসু-কে

ডালহৌসি
পঞ্জাব
১৭.৮.৩৭

প্রিয় সন্তোষবাবু,

অনিলের বিয়ের নিমন্ত্রণ সদ্য পেয়েছি। আশা করি অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে সম্পূর্ণ হয়েছে। আশা করি যাদের খাওয়ানোর দরকার নেই তাদের ভূরিভোজ করিয়ে আপনি অযথা অর্থের অপব্যয় করেননি। তবে এ আশা সম্ভবত বৃথা। একনায়কতন্ত্রী নির্দেশ বিনা আমাদের সামাজিক প্রথায় সংশোধন হবে না, যাই হোক, আমার সদুপদেশ এই পর্যন্তই। নববিবাহিত দম্পতিকে আমার আন্তরিক শুভ কামনা জানাবেন। আপনার গৃহে প্রবেশ নববধূ নিশ্চয় শাশুড়ির অভাব অনুভব করে থাকবেন, তবে শাশুড়িদের জনপ্রিয়তার বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। এ কথা ভেবে নববধূ স্বান্ত্বনা পেতে পারেন।

মুক্তি পাওয়ার পর থেকে কলকাতা পুরসভার ব্যাপার নিয়ে আমি চিন্তিত। সেই নরককুণ্ড সাফ করবার জন্য কী করা দরকার সে-বিষয়ে আপনার মতামত আমাকে জানাবেন কি?

আমার শরীর আগেকার চেয়ে ভাল, তবে আরও কিছুদিন আমাকে এখানে থাকতে হবে। আশা করি ভাল আছেন। শুভেচ্ছা সহকারে

আপনার
সুভাষ সি. বোস

সীতা ধর্মবীর-কে

ডালহৌসি
২৬. ৮. ৩৭

প্রিয় সীতা

তোমায় যদি তাড়াতাড়ি কলকাতা চলে যেতে হয়, আমার দাদা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বোসকে একটি টেলিগ্রাম করে দিও। তাঁর টেলিগ্রাফের ঠিকানা : ESCIBOS, Calcutta। শুধু হাওড়া স্টেশনে তোমার পৌঁছনোর সময়টা জানিয়ে দিও। হাওড়া স্টেশন নদীর অন্য পারে এবং কলকাতায় যেতে একটা ভাসমান সেতু পেরোতে হয়। আমার ভাগিনেয় অশোক, সম্ভবত প্রাগে যার সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছিল, সে বোধ হয় স্টেশনে তোমায় আনতে যাবে, যদি কোনও কারণে তার সঙ্গে দেখা না হয়, একটি ট্যাক্সি নিয়ে বলবে ১ উডবার্ন পার্কে যেতে। সেটি শহরের দক্ষিণে। তার কাছেই ফ্রেঞ্চ মোটর কোম্পানির বাড়ি। সব ট্যাক্সি ড্রাইভারেরই চেনা। উডবার্ন পার্ক হাওড়া স্টেশন থেকে চার মাইলের মতো এবং সেখানে যেতে তোমাকে ময়দানের পাশ দিয়ে, সায়েব পাড়া দিয়ে যেতে হবে।

মাঝে-মাঝে জাহাজ যেতে দেওয়ার জন্য সেতুটি খুলে দেওয়া হয়। ঠিক তুমি যখন পৌঁছবে তখনই যদি সে ব্যাপারটি ঘটে, এবং স্টেশনের কুলি তোমাকে বলে খানিকটা দেরি হবে, একটু পায়ে হেঁটে নদীর ধার পর্যন্ত চলে আসবে, স্টেশন থেকে খুব কাছেই। রেলওয়ে বিনা পয়সায় স্টিমারে তোমাকে নদীর ওপারে পৌছে দেবে। সেখানে ট্যাক্সি পাবে। ভাড়া খাটাবার জন্য অনেক নৌকাও থাকে, কিন্তু স্টিমারে পেরোনই বেশি নিরাপদ। তবে, আমি আশা করি, তোমার প্রথমবার এখানে আসার সময়েই সে অভিজ্ঞতা হবে না।

আমার বৌদির কিছু দিন আগে একটা বড় অস্ত্রোপচার হয়েছে (পিত্তাশয় ও অ্যাপেনডিক্স) এবং বাড়ির সবাই, আমার মনে হয় একটু ব্যতিব্যস্ত। তবে আশা করি তুমি আরামেই থাকবে।

আমার আশা একবার সেখানে পৌঁছলে কলকাতা তোমার ভালই লাগবে, এবং একটু বাংলাও শিখে নেবে। আশা করি ভাল আছ। প্রীতি নিও।

তোমার স্নেহের
সুভাষ

পুঃ তুমি জান, লীলা এখানে আছে। এক দিন আমরা অনেকটা হেঁটে এলাম। আমি মোটামুটি ভালই আছি। যদিও সম্পূর্ণ সুস্থ হইনি এখনও। বোধহয় সেপ্টেম্বরের মধ্যে হব, যদিও লোকে চাইছে আমি এখনই বাংলায় ফিরে আসি।

এস. সি. বি

শ্রীশচন্দ্র চ্যাটার্জি-কে

২৮ অগস্ট ১৯৩৭

আপনি আমাকে যে চিঠিগুলি দিয়েছেন তার জবাব দিতে দেরি হওয়ায় আমি দুঃখিত। দেরির প্রধান কারণ আপনি যে-সব উদ্দেশ্যর কথা ভাবছেন, সে-সব সম্পন্ন করবার ব্যাপারে আমি নিজেকে অসহায় মনে করছিলাম। ভারতীয় স্থাপত্যের পুনরুদ্ধারের বিষয়ে আমার কী মনোভাব, জাতির পুনরুজ্জীবনে তার গুরুত্বের বিষয়ে আমার কী ধারণা, আপনি খুব ভাল জানেন। একটি জাতির আত্মার সূক্ষ্মতর এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রূপটি প্রকাশ করে তার শিল্প ও স্থাপত্য।

এবং জাতির আত্মা যখন জেগে ওঠে, স্বাভাবিকভাবেই তার প্রকাশ ঘটে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিল্প ও স্থাপত্যের দ্বারা। আমার অন্তরের এই গভীর বিশ্বাসের জন্য আপনার কাজকর্ম আমি বিপুল আগ্রহ সহকারে অনুধাবন করে আসছি। অসীম যে-উৎসাহ ও উদ্দীপনা আমি দেখেছি আপনার মধ্যে আপনার জীবনের ব্রত সম্পর্কে, তার জন্য আমি আপনাকে প্রচুর সাধুবাদ জানাই, এবং প্রার্থনা করি বাধা যতই দুর্লঙ্ঘ্য হোক আপনার সহজাত আশাবাদ এক কণাও যেন হারিয়ে না যায়। আপনার সাফল্যের গোপন রহস্যটি ওই আশাবাদ।

আপনার চিঠির যা মূল বিষয়, তার সম্পর্কে আমি বলতে পারি ভারতীয় স্থাপত্যের শ্রীবৃদ্ধিতে কলকাতা পুরসভা অবশ্যই সাহায্য করতে পারে। এমনকী আমি একথাও বলতে পারি, যে পুরসভার ব্যাপারে আমার যদি কোনও হাত থাকত, আপনার কোনও-কোনও চিন্তা-ভাবনা অবশ্যই আমি কাজে রূপান্তরিত করতাম। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন আর না করুন, ওদের ওপর প্রভাব খাটানোর অবস্থায় আমি নেই। আপনার মনে হতে পারে, পুরসভার ভিতরে কংগ্রেস থাকা সত্ত্বেও এ-রকম কী করে হয়? কিন্তু অবস্থাটা তাই।

আইনগত জটিলতার জন্য, শুধুমাত্র ভারতীয় স্থাপত্যই যাতে গৃহীত হয়, সে ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে কি না জানি না। কারণ কাউকে পুরসভা বিশেষ কোনও রীতির স্থাপত্য অনুযায়ী গৃহ নির্মাণ করতে বাধ্য করতে পারে না। তা হলেও পুরসভা পরোক্ষভাবে ভারতীয় স্থাপত্যকে উৎসাহ দিতে পারে। ভারতীয় স্থাপত্যের একটা দপ্তর থাকতে পারে নাগরিকেরা কোন রীতি অনুযায়ী বাড়ি বানাবেন সে বিষয়ে বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়ার জন্য। নাগরিকদের ব্যবহারের জন্য বাড়ির নক্সা, পুস্তিকা ইত্যাদি সেই দপ্তরে থাকতে পারে। ভারতীয় স্থাপত্য যাতে জনপ্রিয় হয় সে জন্য নানাভাবে প্রচারও তারা করতে পারে। কলকাতাবাসীদের মধ্যে ভারতীয় স্থাপত্য জনপ্রিয় করে তুলবার জন্যে প্রদর্শনীর সাহায্যও নিতে পারে। এবং কলকাতা যদি দৃষ্টান্ত দেখায়, অন্য সব ভারতীয় শহর অবশ্যই অনুসরণ করবে।

কিন্তু আসল কথা হল, আমার পরামর্শ শুনবে কে? ছোট-ছোট ঝগড়া-ঝাঁটি, বাদ-বিতণ্ডা নিয়ে সবাই এত ব্যস্ত যে বড়-বড় বিষয়ে মাথা ঘামাবার কারও সময় নেই। কাজেই কিছু কাজ করানো যাবে বলে আমার বিশেষ কোনও আশা নেই। আপনি বলতে পারেন, সে-ক্ষেত্রে কংগ্রেসের পুরসভায় থেকে কোনও লাভ নেই। বোধ হয় সে কথাই ঠিক, এবং ছাড়া পাওয়ার পর থেকে এ-কথাটা নিয়ে আমি ভাবছি। স্বাভাবিক কাজকর্মে ফিরে গিয়ে আমি কী করব বলতে পারছি না। কিন্তু আজ হোক কাল হোক এই সমস্যাটা নিয়ে কিছু করতে হবে। ততদিন আমি শুধু আপনাকে আমার শুভকামনাই পাঠাতে পারি, এবং আশা করতে পারি আপনি আপনার আশাবাদ কখনও হারাবেন না।[১]

সীতা ধর্মবীর-কে

ডালহৌসি
৩১. ৮. ৩৭

প্রিয় সীতা,

তোমার টেলিগ্রাম পেয়ে তুমি নিরাপদে কলকাতা পৌঁছেছ জেনে সুখী হলাম।

সেখানকার অবস্থা তুমি এখন একটু দেখবে... কেননা আমার বৌদি নার্সিং হোমে আছেন, এবং আমার দাদা আজকাল অত্যন্ত ব্যস্ত। যাই হোক, আমি আশা করি তুমি যতটা সম্ভব নিজের

---

১. এই চিঠির শেষাংশ পাওয়া যায়নি।

বাড়ির মতোই থাকবার চেষ্টা করবে। খাবার-দাবার তোমার ঠিক কীরকম পছন্দ আমার ভাইপো অশোককে একটু বলে দিও, কেন না ওরা নিরামিষাশী নয়, এবং তুমি না বলে দিলে তোমার কী কী দরকার ওরা ঠিক বুঝতে পারবে না। এ বিষয়ে যেন কোনও ইতস্তত কোরো না। কলকাতা এমন একটা জায়গা যেখানে চাইলে সব রকম ফল ও তরিতরকারিই পাওয়া যায়।

আশা করি কলকাতা তোমার ভাল লাগবে। খুব তাড়াতাড়ি।

তোমার স্নেহের
সুভাষ

ভি. লেসনি-কে

ডালহৌসি
পঞ্জাব
ভারত
৬. ৯. ৩৭

প্রিয় প্রফেসর,

মি. ও মিসেস মেহতা যখন আপনার কাছে ছিলেন, সেই সময়ে Straz P. Ralskeen থেকে পাঠানো আপনার চিঠিটি পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি। আশা করি এই গ্রীষ্মকালে সেখানে আপনাদের অবসর যাপন ভালই কেটেছে। আপনারা এখন অবশ্যই প্রাহাতে ফিরে এসে থাকবেন। আবার কবে ভারতে আসছেন দয়া করে আমাকে জানাবেন। ইউরোপে যাবার আমার খুবই ইচ্ছা, কিন্তু দুঃখের বিষয় তা সম্ভব নয়, কাজেই আপনাদেরই ভারতে আসতে হবে। রবীন্দ্রনাথের ওপরে আপনি যে বইখানি লিখেছেন তার জন্য আপনাকে সাধুবাদ জানাই, আমি নিশ্চিত জানি, আপনার বই ও-দেশে, সেন্ট্রাল ইউরোপে, কবি রবীন্দ্রনাথকে এবং ভারতবর্ষকে জনপ্রিয় হতে সাহায্য করবে। দয়া করে মিসেস লেসনি-কে আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবেন, আপনিও জানবেন। আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন।

আপনাদের একান্ত
সুভাষ সি. বোস

অধ্যাপক ড. লেসনি
প্রাহা

ই. উডস-কে

ডালহৌসি
পঞ্জাব
ভারত
৯. ৯. ৩৭

প্রিয় মিসেস উডস,

আপনার ২ জুনের পত্র, এবং আর যে-সব কাগজ আমাকে পাঠিয়েছেন, তার জন্য অজস্র ধন্যবাদ। নতুন সংবিধানেরও একটি কপি আমি পেয়েছি।

মুক্তি লাভের পর অল্পদিনের মধ্যেই আমি এখানে বায়ু পরিবর্তনের জন্য এসেছি। এটি

একটি পাহাড়ি শহর, উত্তর-পশ্চিম ভারতে, ৭০০০ ফুট উঁচুতে। আরও দু'মাস আমি এখানে থাকব। আমার শরীর আগেকার চেয়ে ভাল, কিন্তু এখনও পুরোপুরি ঠিক হয়নি।

আপনি আমাকে যে কাগজপত্র আমার গ্রেপ্তার হওয়ার পর পাঠিয়েছিলেন, পুলিশ সে-সব অনুমোদন করে আমাকে দিয়েছে।

গত বছর আমার গ্রেপ্তারের পর আপনি যে টেলিগ্রামটি আমাকে পাঠিয়েছিলেন, সব সংবাদপত্রেই সেটি ঠিকমতো যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়ে ছাপা হয়েছে। ওটি পাঠানো আপনার সহৃদয়তার পরিচয়।

সম্ভবত আগামী বছরের প্রথম দিকে আমি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হব। নির্বাচন (দলের বিভিন্ন শাখায়) ১৯৩৮-এর জানুয়ারিতে হবে।

ড. এবং শ্রীমতী দে-কে, এনডা-কে, এবং পরিবারের অন্যদেরকে আমার কথা বলবেন। আপনাদের কথা আমি প্রায়ই ভাবি, ওখানে আপনারা যে-রকম আদর-যত্ন করেছিলেন, তার কথা মনে পড়ে।

মাদামকেও আমার কথা বলবেন।

আপনার স্বাস্থ্য এখন কেমন যাচ্ছে?

ওখানকার বিভিন্ন গোষ্ঠীর কথা (Fianna Fail ছাড়া) আমাকে জানাবেন। আমি ভেবেছিলাম গত নির্বাচনে এফ. এফ. আরও বড় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে। তারা পারল না কেন?

ভারতে খানিকটা অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে। ১১টির মধ্যে ৭টি প্রদেশে কংগ্রেস ক্ষমতায় আছে। কিন্তু তাতে আমাদের কাজ বেশি এগোবে না, কেননা কেন্দ্রীয় (যুক্তরাষ্ট্রীয়) সরকার আজও তেমনি প্রতিক্রিয়াশীল। সামনে আমাদের কঠিন সংগ্রাম, কিন্তু কংগ্রেস এক বছর আগে যা ছিল তার চেয়ে আজ অনেক বেশি শক্তিশালী। আমাদের মনে প্রচুর আশা, আমরা আশাবাদী।

যে-সব বন্ধুদের সঙ্গে ওখানে আমার দেখা হয়েছিল তাদেরকে আমার কথা বলবেন। পরিবারের সদস্যদেরও বলবেন। আমার দেবশিশুবৎ অভিভাবকটি আজকাল কী করছে?

প্রীতি ও শ্রদ্ধা সহকারে।

একান্ত আপনাদের
সুভাষ সি. বোস

জওহরলাল নেহরু-কে

গিদ্দাপাহাড়
কার্সিয়াং
১৭. ১০. ৩৭

প্রিয় জওহর,

তোমার ৮ ও ৯ তারিখের জি ৮৩/৪১০১ এবং জি ৬০(iii) ৪১২৬ নং পত্র ঠিকমতো পেয়েছি।

'বন্দে মাতরম্' প্রসঙ্গে : আমরা বিষয়টি নিয়ে কলকাতায় কথা বলব। কার্যকরী কমিটিতেও আলোচনা করতে পারি, যদি তুমি বিষয়টি উত্থাপন করো। আমি ড. টেগোরকে, তুমি যখন শান্তিনিকেতন যাবে, তোমার সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে লিখেছি। যখন শান্তিনিকেতন যাবে, তাঁর সঙ্গে কথা বলতে ভুলো না।

এ-বিষয়ে আমি বরাবরই তোমার সঙ্গে একমত যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ব্যাপারে অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলির গুরুত্বই সর্বাধিক। সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন মুসলমানদের অভ্যাস, থেকে-থেকে একটা না একটা ধুয়ো তুলবে; কখনও মসজিদের সামনে বাজনা, কখনও মুসলমানদের জন্য চাকরি নেই, এখন 'বন্দে মাতরম্'। হঠাৎ 'বন্দে মাতরম্' নিয়ে হইচই করার কারণ বোধহয় এই যে, কংগ্রেসের জয় নিয়ে আইনসভায় উৎসব করার সময় ওই গান করা হয়েছিল। জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা যে-সব সমস্যা ও সন্দেহের কথা বলেন তার সমাধানের চেষ্টা আমি সানন্দে করব, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা যা বলেন তাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে আমি রাজি নই। আজ যদি তুমি 'বন্দে মাতরম্'-এর ব্যাপারে পুরোপুরি সন্তুষ্ট করো, কালই আবার আরেকটা বিতর্ক তুলতে তাদের দেরি হবে না, শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক আবেগকে উস্কে দেওয়ার জন্য, আর কংগ্রেসকে বিব্রত করবার জন্য।

ত্রিপুরার কথা তুমি যা লিখেছ তাতে আমি অবাক হইনি। তোমার হয়তো মনে থাকতে পারে, কিছুদিন আগে আমি তোমাকে ত্রিপুরা জেলায় গোষ্ঠী আনুগত্য নিয়ে বিশদভাবে লিখেছিলাম। তখন দেখিয়েছিলাম, শুধুমাত্র সাংবিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সমস্যাটির সমাধান করা কত কঠিন। বঙ্গদেশে তিনটি জেলা আছে যেখানে এই ঝগড়ার মূল খুব গভীর, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট ও ফরিদপুর। আমার মনে হয়, যত দিন না আমি ওই তিন জেলায় গিয়ে জনসাধারণের কাছে আবেদন করছি, ওই সমস্যার কোনও স্থায়ী সমাধান সম্ভব হবে না। আমি দুই গোষ্ঠীকেই অনুরোধ করব (অবশ্য ফরিদপুরে কয়েকটি গোষ্ঠী আছে) হাতে হাত মিলিয়ে পদাধিকারী, কর্মসমিতির সদস্য, ইত্যাদির একটা সর্বসম্মত তালিকা প্রস্তুত করতে রাজি হতে। অন্যথায় আমায় একটি গোষ্ঠীকে রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করতে বলতে হবে। শ্রীহট্টে ১৯৩১ সালে আমি তাই করেছিলাম। এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে কলকাতায় আমাদের আলোচনা হবে।

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রসঙ্গে : আমি চাই তুমি যখন কলকাতায় আসবে এ-বিষয়ে একটা নির্দেশ দেবে। তোমরা যদি চাও সকলের প্রতিই নরম মনোভাব দেখানো হোক, আমরা তাই করতে পারি।

ভবিষ্যতে শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের প্রতি আমাদের মৃদু না কঠোর, কী রকম নীতি গ্রহণ করা উচিত সে-বিষয়ে তোমার এবং কর্মসমিতির মত পরিষ্কার করে জানানো উচিত, তা ছাড়া, ইতিমধ্যেই যে-সব শাস্তি দেওয়া হয়েছে, তা কি ফিরিয়ে নেওয়া উচিত?

তোমার
সুভাষ

সুনীল ঘোষ মৌলিক-কে
[মূল বাংলায়]

Giddapahar
Kurseong
১৯.১০.৩৭

প্রীতিভাজনেষু—

তোমার দুইখানি চিঠি পেয়ে সুখী হয়েছি। উত্তর দিতে বিলম্ব হল বলে কিছু মনে করবে না। আমার ঁবিজয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করবে।

এখানে মেজদাদারা আছেন। আমি (এবং মেজদাদা) এ. আই. সি. সি.-র সময়ে এক সপ্তাহের জন্য কলিকাতায় যাব। আমার শরীর পূর্বাপেক্ষা অনেকটা ভাল।

তোমার স্ত্রীর অসুখের কথা শুনে দুঃখিত হয়েছি। আশা করি তিনি এখন শীঘ্র সেরে উঠবেন। প্যাটেল মহাশয়ের প্রদত্ত টাকার বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয় নাই। তোমরা ওখানে কতদিন থাকবে। আশা করি ভাল আছ।

ইতি
শুভার্থী
শ্রীসুভাষ সি. বসু

এ. সি. ব্যানার্জি-কে

৬ নভেম্বর ১৯৩৭

প্রিয় মি. ব্যানার্জি

আপনার ১৯ তারিখের দীর্ঘপত্রের জন্য অনেক ধন্যবাদ। চিঠিটি আমি মন দিয়ে পড়েছি। আপনি যা বলেছেন আমারও তাই মত।

সশ্রদ্ধ বিজয়া-সম্ভাষণ জানবেন।

আপনার
সুভাষ সি. বোস

সীতা ধর্মবীর-কে

৩৮/২ এলগিন রোড
কলকাতা
১৭. ১১. '৩৭

প্রিয় সীতা,

আগামীকাল সকালে আমি বিমানে ইউরোপ রওনা হচ্ছি। এক মাস সেখানে থাকব। সন্ধ্যার দিকে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। ১ নং উডবার্ন পার্কে দেখা হোক না কেন? তুমি যদি আসো আমি থাকব। এক ছত্র লিখে জানাও, কিংবা (আমাকে ফোনে না পেলে) অশোককে টেলিফোন কোরো।

তোমার
সুভাষ সি. বোস

শ্রীমতী জে. ধর্মবীর-কে

বিমানে
১৮. ১১. ৩৭

প্রিয় দিদি,

আগের চিঠিতে আমার ইউরোপ যাওয়ার কথা আপনাকে লিখেছিলাম কি না মনে পড়ছে না। বোধহয় ভুলে গিয়েছিলাম। যাই হোক এর মধ্যে খবরের কাগজ মারফৎ খবরটা নিশ্চয়

পেয়ে থাকবেন। সীতা আমার কাছ থেকে সবে কাল সকালেই খবরটা পেয়েছে। কাল রাত্রে সে আমাদের সঙ্গে খেয়েছিল। সে আমাকে আপনার চিঠি এবং খবরের কাগজের কাটিংগুলো দিয়েছে। কাটিংগুলো আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি। আমার গন্তব্যস্থল ব্যাডগাসটেন পৌঁছে ও-বিষয়ে যা করার করব। ২২ তারিখে পৌঁছব। আমার ঠিকানা হবে c/o, Poste Restante, Badgastein, Austria। আমার হাতের লেখা থেকেই বুঝতে পারবেন বিমান কত মসৃণগতিতে চলছে। আমরা এখন এলাহাবাদ ও যোধপুরের মাঝামাঝি। যোধপুরে রাত কাটাব। পরের রাত আমরা থাকব বাগদাদে। ২৫ দিনের অবিরাম অস্বাভাবিক ধকলের পর এখন শান্তি বোধ করছি। আপনারা সবাই কেমন আছেন? নারাং ও স্যাণ্ডি কেমন আছে? রঘু আমার কাছে এসেছিল একটি সুপারিশ পত্রের জন্য। শাড়ি আর শাল নিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। সে অস্বীকার করল। আমার অনুপস্থিতিতে (তখন আমি কার্সিয়াং-এ ছিলাম) সে আমার মা'র সঙ্গে বেয়াদপি করেছিল। তাকে তখন ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। সীতা চমৎকার মানিয়ে নিচ্ছে এবং কিছু দিনের মধ্যেই খাঁটি কলকাত্তাই বনে যাবে। ভিয়েনার অধ্যাপক ডেমেল যদি লাহোর যান, তাঁকে চায়ে নিমন্ত্রণ করবেন, এবং ডাক্তার বন্ধুদের সঙ্গে তাকে আলাপ করিয়ে দেবেন। ডা. লীলা এবং আপনি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা নেবেন।

আপনাদের
সুভাষ

To

Mrs. J. Dharmavir,
Pediham Grove
Lahore

ওরিয়েন্টুরিস্ট লিমিটেড-কে

স্টেট হোটেল
(যোধপুর রাজপুতানা)
যোধপুর ও করাচির মাঝখানে
১৯. ১১. ১৯৩৭

ম্যানেজার
ওরিয়েন্টুরিস্ট লিমিটেড
কলকাতা

প্রিয় মহাশয়,

ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করার আগে, কলিকাতা থেকে নেপলস আসার বিমানযাত্রার জন্য আপনারা যে চমৎকার ব্যবস্থা করেছিলেন তার জন্য আপনারা নিশ্চিতভাবে ধন্যবাদার্হ। বিমানবন্দরেও আমার দেখা-শোনা উত্তমরূপে করা হয়েছিল। তার ফলে অনেক ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা থেকে আমি অব্যাহতি পাই। এই সব কাজ করবার জন্য একটি ভারতীয় সংস্থা যে আছে তাতে

আমি আনন্দিত। আপনাদের এই উদ্যোগে সর্বাঙ্গীণ সাফল্য আমি কামনা করি এবং আশা করি জনসাধারণ আপনাদের পৃষ্ঠপোষকতা করবেন।

ভবদীয়
সুভাষ সি. বোস

নাওমি সি. ভেটার-কে

হাউস এরিকা
ব্যাডগাসটেন
২৫. ১১. ৩৭

প্রিয় মিসেস ভেটার,

ব্যাডগাসটেন থেকে নেপলস (নাপোলি) যাওয়ার পথে রোম থেকে আমি আপনাকে যে চিঠি দিয়েছিলাম, আপনি নিশ্চয় পেয়েছেন।

২২ তারিখ রাতে আমি এখানে পৌঁছই এবং পরের দিনই স্নানের চিকিৎসা আরম্ভ করি। এখানে থাকার সময়ে আমি আরেকখানি বই লিখব। এবারে আমার ইউরোপে বাস স্বল্প কালের হবে, কেননা দেশে ফিরতে জানুয়ারির প্রথমের বেশি দেরি করা চলবে না। দেশে ফিরবার আগে ভিয়েনা গিয়ে সেখানকার সব বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

আশা করি আপনি ও ড. ভেটার ভালই আছেন। আপনারা দু'জনেই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নেবেন।

আপনাদের
সুভাষ সি. বোস।

পুঃ সম্ভবত সামনের জানুয়ারিতে আমি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হতে পারি। তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে যাওয়ার সেটাও একটা কারণ।

এস. সি. বি.

ম্যাগিওরি র‍্যাপিকাভোলি-কে

Post Restante
Badgastein
(Austria)
২৫. ১১. ১৯৩৭

প্রিয় ম্যাগিওরি র‍্যাপিকাভোলি,

নাপোলি থেকে ব্যাডগাসটেন-এ যাওয়ার পথে আমি রোম থেকে আপনাকে যে চিঠিটি দিয়েছিলাম নিশ্চয় পেয়েছেন। সেই চিঠিতে আমি এ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি, যে ২১ নভেম্বর ১৯৩৭-এর সকালে আমি নাপোলি-তে এরোপ্লেন থেকে যখন নামি ইতালির পুলিশ

আমাকে উত্যক্ত করেছিল। অন্য কোনও যাত্রীর মালপত্র খোলা পর্যন্ত হয়নি, কিন্তু আমার প্রত্যেকটি বাক্স খোলা হয়, এবং সবকিছু ওলট-পালট করে তন্ন-তন্ন করে পরীক্ষা করা হয়। তারপর একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে আমার পকেট তল্লাশি করা হয়। তারপর আমাকে জেরা করা হয়, আমি কোথায় যাব, কোন পথে যাব। আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন আমি কতখানি রেগে গিয়েছিলাম। কে. এল. এম. কোম্পানির এজেন্ট, যাঁদের বিমানে আমি ভ্রমণ করছিলাম, তাঁর কাছে আমি এ-বিষয়ে নালিশ করলাম। আমাকে যে কষ্ট দেওয়া হয়েছিল, যে অসুবিধায় ফেলা হয়েছিল, তার জন্য তাঁরা অকুণ্ঠভাবে মার্জনা ভিক্ষা করেন, এবং আমাকে বলেন, ও-কাজ সাধারণ শুল্ক অফিসারেরা করেননি, ইতালির পুলিশ করেছে।

আমি টারভিসিও-তে পৌঁছালে আমার পাসপোর্ট, মালপত্র সব আবার খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হয়, বিশেষ করে বাক্সের সব জিনিস ওলোট-পালট করা হল, প্রচণ্ড ভাবে জেরা করা হল। ইতালির সীমান্ত পেরিয়ে, আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

এ-অভিজ্ঞতা আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন, কেননা আগে যতবার ইতালিতে এসেছি অন্যরকম ব্যবহার পেয়েছি। ভাবছি এই অভিজ্ঞতার কথা ভারতের সংবাদপত্রে লিখে জানাব, কিন্তু তার আগে আপনাকে আমি এ-বিষয়ে কিছু করার সুযোগ দিতে চাই। শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে, ব্যাপারটা খুব গুরুতর বলে আমি মনে করছি।

এখানে আমার চিকিৎসা সম্পূর্ণ হলে মাসখানেক পরে আমি ভারতে ফিরে যাব। স্বাভাবিকভাবেই আবার অপমানিত হওয়ার জন্য ইতালি দিয়ে যাবার আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা নেই। তাই, আমি ইউরোপের অন্য কোনও বিমানবন্দর থেকে প্লেনে উঠতে চাই যদি না ইতালির কর্তৃপক্ষ আমাকে ভরসা দেন যে উপরোক্ত অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি হবে না।

প্রথমে আমি ভেবেছিলাম, সোজাসুজি সরকারের প্রধানকে ঘটনাটির কথা লিখব, কিন্তু আমার মনে হল, আমার ব্যাপার নিয়ে তাঁকে বিরক্ত করার প্রয়োজন নেই।

দয়া করে শীঘ্র উত্তর দিয়ে আমায় বাধিত করবেন।

আপনার একান্ত
সুভাষ সি. বোস
(ভারত থেকে)

মারকুইস অব জেটল্যান্ড-কে

Post Restante
Badgastein
(Austria)
২৫. ১১. ১৯৩৭

পরম সম্মানীয় মহাশয়,

আমি স্বল্পকালের জন্য ইউরোপে এসেছি, ব্যাডগাসটেন-এ চিকিৎসার উদ্দেশ্যে, এবং খুব বেশি দেরি হলেও জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে বিমানযোগে আমি দেশে ফিরে যাব। বস্তুত চেষ্টা করব তার আগেই ফিরে যেতে।

এখানকার চিকিৎসায় আনুমানিক এক মাস কি পাঁচ সপ্তাহ লাগবে এবং দেশে ফিরবার আগে, আমার ইচ্ছা, একবার ইংল্যান্ড ছুঁয়ে যাব, সেখানে আমার বন্ধুদের সঙ্গে আর আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের

সঙ্গে দেখা করতে। সে এখন লন্ডনে পড়াশোনা করছে। মাননীয় মহোদয় জানেন ১৯৩৩ এবং ১৯৩৬-এর মধ্যে আমি যখন ইউরোপে ছিলাম আমার লন্ডনে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। এই নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে আমার পাসপোর্টে কোনও উল্লেখ নেই। কিন্তু মৌখিকভাবে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বিশেষ অনুমতি ছাড়া ইংলন্ডে না যেতে এবং সে নির্দেশ আমি পালন করেছিলাম। সে-নিষেধাজ্ঞা এখনও বহাল আছে কি না আমি জানি না। যদি বহাল থাকে, আমি অনুরোধ করছি, এখন তা প্রত্যাহার করা হোক, এবং আমাকে ইংলন্ডে যেতে দেওয়া হোক।

যদি আমাকে ইংল্যান্ডে যেতে দেওয়া হয়, খুব বেশি হলে এক সপ্তাহ, কি দশ দিন আমি সেখানে থাকতে চাই। সম্ভবত তার চেয়েও কম দিন আমি সেখানে থাকব, যদি আমার চিকিৎসা বেশি দিন চলে, কেননা কোনওক্রমেই আমি ১০ জানুয়ারির পর ইউরোপে থাকতে পারব না। তার মধ্যে আমাকে ভারতে ফিরে যেতেই হবে।

মাননীয় মহোদয় যদি আমার ইংলন্ডে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা অবিলম্বে প্রত্যাহারের আদেশ দেন, আমি অতিশয় বাধিত হব।

মহোদয়কে অগ্রিম ধন্যবাদ জানাই।

ইতি বিনীত
সুভাষচন্দ্র বোস

Rt. Hon. The Marquis of Zetland
Secretary of State for India
Whitehall
S. W.— I.

শ্রীমতী জে. ধর্মবীর-কে

ব্যাডগাসটেন
অস্ট্রিয়া
৬. ১২. ৩৭

প্রিয় দিদি,

আপনার ২৩ নভেম্বরের বিমান ডাকের চিঠি গত মাসের ৩০ তারিখে পেয়ে আমি খুশি হয়েছি। এ-মাসের ৩ তারিখে আমি ট্রিবিউন পত্রিকায় বিমান ডাকে একটি বিবৃতি (আবেদন) পাঠিয়েছি এবং সম্পাদককে অনুরোধ করেছি, তিনি যেন সম্পাদকীয়তে তার বিষয়ে মন্তব্য করেন। এই সঙ্গে আমি তার একটি অনুলিপি পাঠাচ্ছি। আমি আশা করি সম্পাদক এটি প্রকাশ করবেন এবং তার ওপর মন্তব্য করবেন। যদি না করেন, আপনি তাঁকে মনে করিয়ে দিয়ে একটি চিঠি দিতে পারেন। এই সঙ্গে পাঠানো কপিটিও দিতে পারেন।

গান্ধীজি যখন কলকাতায় তখন আমি সেখানে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারি না, বিশেষত ১ নভেম্বর তাঁর অসুস্থ হয়ে পড়ার পর, কেননা আমরা তাঁকে ২০০০ আটক জেলবন্দি এবং রাজনৈতিক বন্দির ব্যাপারটা নিয়ে কিছু করতে অনুরোধ করেছিলাম। বৃদ্ধ সম্পর্কে এই কথাটা না বললে কিন্তু অন্যথা হবে, যে তিনি আমাকে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার জন্য (স্বাস্থ্য

পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে) চাপ দিয়েছিলেন। তিনি চাপাচাপি না করলে আমার পক্ষে ওখান থেকে বেরোনো সম্ভবই হত না।

মি. জুতশি-র খবর আপনি পেলেন কোথায়, বলুন তো? আপনার যে তাঁর সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ আছে আমি ভাবিনি। আপনি যদি ঠিক খবর পেয়ে থাকেন, মি. জুতশি-র আমাকে নিয়ে দুর্ভাবনার কথা জেনে আমি অবাক হচ্ছি।

এ-জায়গা এখন বড়ই সুন্দর, চারিদিক বরফে সাদা, তার সঙ্গে সূর্যালোক। শুকনো ঠাণ্ডা, শরীর মনকে অত্যন্ত সতেজ করে তোলে। আমি স্নান করছি, এবং সে-চিকিৎসা চলবে এ-মাসের শেষ পর্যন্ত। জানুয়ারির মাঝামাঝি নাগাদ বিমানে আমার কলকাতায় পৌঁছনোর ইচ্ছা। জানুয়ারির প্রথম দিকে আমাকে অল্প দিনের জন্য লন্ডন যেতে হবে, যদি ইতিমধ্যে তার অনুমতি পাই। তবে সেটা এখনও ঠিক করিনি।

অধ্যাপক ডেমেল-কে আপনি চায়ে ডেকেছিলেন জেনে আমি খুব খুশি হয়েছি। তিনি চমৎকার মানুষ, তাই না? ভাল সার্জেন তো বটেই।

আমি তাড়াহুড়ো করে কলকাতা ছেড়ে আসার আগে সীতা আমাকে আপনার চিঠিটি দিয়েছিল। কিন্তু চিঠিটি আমি হারিয়ে ফেলি, এখানে আনতে পারিনি, যদিও আনবার ইচ্ছে ছিল।

সীতার সম্পর্কে আরেকটা কথা। আপনি শুনে আনন্দিত হবেন, সীতার মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাস জন্মেছে। দেখলে বেশ ভাল লাগে। তাকে দেখে মনে হয় সে তার নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারে এবং নির্ভয়ে নির্ভাবনায় কাজকর্ম, চলাফেরা করতে পারে।

(আশা করি যা বলতে চাই, ঠিকমতো বলতে পেরেছি।)

আপনার চিঠি থেকে জানলাম সীতা গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, বোধহয় মিস নায়ারের সঙ্গে। তাই যদি হয়, আমি সীতার ওপর খুব রেগে গেছি। তার উচিত ছিল গান্ধীজির সঙ্গে তার পরিচয় আমাকে করাতে দেওয়া। সেইটেই ঠিক হত। আমি সে-কথা তাকে বলেছিলাম, কিন্তু গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করায় তার আগ্রহ তখন এতই কম মনে হয়েছিল যে আমি দেখা করা নিয়ে তাকে আর চাপাচাপি করতে চাইনি।

আমি কলকাতা থেকে আসার সময়ে বাড়ির সবাই মোটামুটি ভালই ছিল। আমার মা এবং বৌদি দু'জনেই আগেকার চেয়ে ভাল ছিলেন। সীতাকে বলবেন আর ঝি-চাকর নিয়ে যদি কোনও অসুবিধা হয়, ১ উডবার্ন পার্ক কিংবা ৩৮/২ এলগিন রোডে জানাতে যেন ইতস্তত না করে, এবং ওই দুই জায়গার যে-কোনও জায়গায় যেন গিয়ে ওঠে। তার জন্য কোনও নিমন্ত্রণের দরকার নেই। সবাই তাকে পছন্দ করে, এবং যে-কোনও রকম সাহায্য তাকে সানন্দে করবে।

আমার কথা (অস্পষ্ট)-কে বলবেন, কাজের লোকদের এবং স্যাণ্ডিকেও বলবেন। সোমনাথকে আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাবেন। ডা., আপনি ও মেয়েরা প্রীতি জানবেন।

সুভাষ

ই. উডস-কে

কুরহাউস এরিকা
ব্যাডগাসটেন
অস্ট্রিয়া
১৮. ১২. ৩৭

প্রিয় মিসেস উডস্,

কয়েক সপ্তাহ আগে বায়ুপরিবর্তনের জন্য আমি এখানে এসেছি। তখন থেকেই আপনাকে লিখব বলে ভাবছিলাম। জানুয়ারিতে আমি ভারতে ফিরে যাচ্ছি। তার আগে হয়তো সামান্য ক'দিনের জন্য লন্ডন যাব। ১০ জানুয়ারি ওখানে পৌঁছচ্ছি। অবশেষে, দীর্ঘ দিন পর, ব্রিটিশ সরকার আমার ইংল্যান্ড যাবার বিষয়ে নিষেধ প্রত্যাহার করেছে। সুতরাং আমি ওখানে যেতেই পারি।

আপনি কি দয়া করে একটু 'গোপন' খোঁজখবর করে দেখবেন, ইংল্যান্ডে প্রেসিডেন্ট ডি ভালেরা-র সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করতে পারি কিনা? এটা একেবারেই সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ। ১৬ থেকে ১৯ জানুয়ারির মধে যে-কোনও একদিন পেলেই হবে। দয়া করে পুরো বিষয়টি 'কঠোরভাবে গোপনীয়' রাখবেন। প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর সচিব ছাড়া একজনকেও এ বিষয়ে কিছু জানাবেন না। আপনি জবাব দেবার সময় খামের ওপরে লিখবেন Miss. E. Schenkl, Poste Restante, Badgastein এবং অবশ্যই সিলড রেজিস্টার্ড খামে পাঠাবেন। এই সতর্কতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমি চাই না, আমার ডাবলিন পৌঁছবার আগেই কেউ এই সাক্ষাতের কথা জানুক।

আপনার পরিবারের সকলকে আমার হার্দিক সম্ভাষণ জানাবেন। আপনি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা গ্রহণ করবেন।

আপনার
সুভাষ সি. বোস

ই উডস-কে

Kurhaus Hochland
(or Poste Restante)
ব্যাডগাসটেন
(অস্ট্রিয়া)
৩০. ১২. ১৯৩৭

প্রিয় মিসেস উডস,

আপনার ২২ তারিখের চিঠির জন্য অনেক ধন্যবাদ। চিঠিটি আমি পেয়েছি ২৬ তারিখে।

আমার কর্মসূচী আপনাকে পাঠাচ্ছি। তা থেকে আপনি জানতে পারবেন, আমার জন্য কী ব্যবস্থা আপনি করতে পারেন। ১০ জানুয়ারি আমি লন্ডনে পৌঁছব এবং থাকব ১৭ পর্যন্ত। ডাবলিনে আমার কাজটি যেন ১৮ জানুয়ারি অবশ্যই হয়। আমি ১৭ রাতে লন্ডন থেকে রওনা

হয়ে ১৮ সকালে ৬:৪৫ নাগাদ ডাবলিনে পৌঁছব। সেই রাতেই ৮:১০ নাগাদ রওনা হয়ে ১৯ জানুয়ারি সকাল ৫:৩০ নাগাদ লন্ডনে পৌঁছব। দু'ঘণ্টা পরে আমি কন্টিনেন্টে ফিরবার প্লেন ধরব, এবং সেখান থেকে ভারতে ফিরব, সেও বিমান যোগে।

হোটেলেই যে থাকতে হবে এমন কোনও কথা নেই, কিন্তু তাই বোধহয় করা উচিত— সাংবাদিকেরা যদি এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। আমার মনে হয় শেলবোর্ন-ই ঠিক হবে, যদি সবচাইতে ভাল সেইটেই হয়। যদি আমি হোটেলে থাকি, সবচাইতে ভাল হোটেলেই আমার থাকা উচিত। আপনি যা ভাল মনে করেন, করবার ভার আপনাকেই দিলাম।

এখান থেকে আমি ৮ জানুয়ারি সকালে রওনা হব।

প্রেসিডেন্ট ডেভ-এর সঙ্গে আমি যখন দেখা করব, সেই সময়কার তাঁর এবং আমার একটি ফোটোর জন্য ভারতের সংবাদপত্রগুলো খুব চাপাচাপি করবে। গতবার আমি যখন ডাবলিন গিয়েছিলাম, তাঁরা খুব আশাহত হয়েছিলেন। আপনি কি তার ব্যবস্থা করতে পারবেন? এ নিয়ে আমার চিঠির উত্তর দেওয়ার দরকার নেই, তবে দয়া করে ব্যবস্থাটা করবেন, যদি প্রেসিডেন্টের কোনও আপত্তি না থাকে। শহর ছেড়ে বাইরে যেতেও আমার আপত্তি নেই, যদিও সেই দিন সন্ধ্যা বেলাতেই ডাবলিনে ফিরে সঙ্গে-সঙ্গে স্টিমার ধরতে পারি।

দয়া করে এই দেখা করবার ব্যাপারটা এখন গোপন রাখবেন। শুধু চিঠিতে একটি লাইন লিখে আমাকে জানান, যে এই চিঠিটি পেয়েছেন। নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা সহ।

আপনার
সুভাষ সি. বোস

পুঃ আপনার চিঠির খামটি এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। চিঠিটি যখন ডাবলিন থেকে রওনা হয় তখন তার সিলের কি এই অবস্থা ছিল?

এস. সি. বি.

ম্যাগিওরি র‍্যাপিকাভোলি-কে

Kurhaus Hochland
Badgastein
(Austria)
৩১. ১২. ১৯৩৭

প্রিয় ম্যাগিওরি র‍্যাপিকাভোলি,

আপনার টেলিগ্রাম ও তারপর দু'-খানি চিঠির জন্য সহস্র ধন্যবাদ। আমি এর আগে আপনাকে চিঠি দিতে পারিনি, তার কারণ আমার কী কর্মসূচী হবে আমি ঠিক জানতাম না। এখনও পুরোপুরি জানি না, তা হলেও মোটামুটি যা ঠিক হয়েছে আপনাকে জানাচ্ছি।

প্রথমেই আপনাকে জানাই, নেপলস-এর ব্যাপারটা আমি মনে করি চুকে গেছে। তার জন্য আপনি যে কষ্ট করলেন, সে জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি ১২ জানুয়ারি ডাচ কে. এল. এম. বিমানে উঠব নেপলস থেকে। অতএব রোম দিয়ে আমি যাব ১১ কিংবা ২০ জানুয়ারি। সোজা এখান থেকেই যদি ভারতে ফিরে যাই, ১২ তারিখে বিমানে উঠব। কিন্তু ফিরে যাবার আগে যদি ইংল্যান্ডে যাই, বিমান ধরব ২১ তারিখে।

জানুয়ারিতে আমাকে যেহেতু ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত করার সম্ভাবনা আছে সেইজন্য ব্রিটিশ সরকার আমার ইংল্যান্ডে প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে। আমার লণ্ডনবাসী ভারতীয় বন্ধুরা আমাকে দেশে ফিরে যাবার আগে একবার অল্প দিনের জন্য লন্ডন যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করছেন। সেখানে আমি যেতে পারব কি না সেটা নির্ভর করছে ভারত থেকে আমি কী নির্দেশ পাই তার ওপর। বর্তমানে আমি ভারতের সঙ্গে চিঠিপত্র চালাচ্ছি, এবং আশা করি চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই আমার সিদ্ধান্ত জানাতে পারব।

আমার খুব ইচ্ছা, রোম দিয়ে যাওয়ার সময়ে আমি সরকারের প্রধানের সঙ্গে দেখা করি। মুশকিল হচ্ছে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ গোপন রাখতে হবে। আমার কোনও সন্দেহ নাই, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি, এ-খবর যদি জানাজানি হয়ে যায়, আমি ভারতে ফিরে গেলে সরকারের তরফ থেকে আমার মুশকিল হতে পারে। আপনি কি মনে করেন সে-সাক্ষাৎকার 'সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করে' হওয়া সম্ভব? যদি তা মনে করেন, দয়া করে যত শীঘ্র সম্ভব আমাকে জানান। এ কথাও বলে রাখতে আমি বাধ্য যে আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও খবরটা যদি বেরিয়ে যায়, আমাকে সে-খবর অস্বীকার করতে হবে। ও-দিকে আপনাকেও তাই করতে হবে। নভেম্বর মাসে আমি যখন ইতালি দিয়ে যাচ্ছিলাম, ইতালির সংবাদপত্রে সে-খবর বেরোয়; তার সঙ্গে এ কথাও জানানো হয় যে আমি সরকারের প্রধানের সঙ্গে দেখা করব। লন্ডন থেকে তা নিয়ে খোঁজ-খবর করা হয় এবং আমাকে বলতে হয়, কোনও ইতালীয় অফিসারের সঙ্গে আমি দেখা করিনি। সে কথা অবশ্য সত্যই ছিল।

যদি আগেকার বিমানে ফিরে যাই, আমি এখান থেকে রোমে যাব ৯ তারিখে কিংবা বড় জোর ১০ তারিখ। যদি পরের বিমানে যাই, আমি প্রাগ থেকে বিমানযোগে রোমে পৌঁছব ২০ তারিখে বিকেল চারটে নাগাদ, এবং রাতের ট্রেনেই আমাকে নেপলস রওনা হতে হবে, যাতে পরদিন ভোরে বিমান ধরতে পারি। অতএব সাক্ষাৎকারটি হতে হবে হয় ১১ তারিখে, নয়তো ২০ তারিখে অপরাহ্নের শেষ ভাগে, অর্থাৎ ৫ : ৩০ টা কি ৬টা নাগাদ।

এখান থেকে সোজা যদি নেপলস যাই, অবশ্য ট্রেনে যেতে হবে। যদি ইংল্যান্ড থেকে নেপলস যাই, বিমানে যেতে হবে প্রাগ, ভিয়েনা, ভেনিস এবং রোম হয়ে। কোনও কারণে যদি সাক্ষাৎকার সম্ভব না হয়, দয়া করে আমাকে জানাবেন। সে ক্ষেত্রে আমি আমস্টারডাম থেকে বিমান ধরব, এবং সোজা নেপলস চলে যাব, মার্সাই হয়ে।

দেশে ফিরবার আগে আমাকে যদি ইংল্যান্ড যেতে হয়, ৮ জানুয়ারি সকালে আমাকে লন্ডন রওনা হতেই হবে।

নববর্ষের শুভেচ্ছা সহকারে।

আপনার
সুভাষ সি. বোস

দেশবাসীর উদ্দেশে বাণী[১]

আমার ইউরোপ যাত্রার প্রাক্কালে আমি সারা দেশে আমার সব বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীকে আমার প্রতি তাঁদের সহৃদয় আগ্রহের জন্য আন্তরিক প্রীতিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই।

আমার শয্যাশায়ী অবস্থা সত্ত্বেও সরকার, কী কারণে তাঁরাই ভাল জানেন, ভারতের যে-অঞ্চলেই আমি থাকি না কেন, আমাকে মুক্তি দেওয়া বা কোনও রকম স্বাধীনতা দান করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেননি। বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও আমার বয়োবৃদ্ধ এবং অসুস্থ বাবা-মা'র সঙ্গে আমাকে দেখা করতেও অনুমতি দেননি।

তা হলে, আমি মনে করি, যতটুকু সুযোগ-সুবিধা সরকার আমাকে দিয়েছেন, সেটা সমগ্র দেশে আমার বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের এবং জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র সমূহের নিরন্তর আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল। আমার আন্তরিক ধন্যবাদ তাঁদের প্রাপ্য।

জনসাধারণ জানেন, যদিও আমার স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থার জন্য সরাসরি সরকারই দায়ী, সরকারি খরচে ইউরোপে আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে তাঁরা অস্বীকার করেছেন। ভারতে আমার চিকিৎসার দায়িত্ব যে আমার বন্ধু ও আত্মীয়েরা নেবেন, তারও অনুমতি দেননি।

প্রধানত আমার দাদা শ্রীশরৎচন্দ্র বোসের কারাবাসের জন্য আমার আত্মীয়েরা বর্তমানে যে আর্থিক সমস্যার মধ্যে আছেন, তার দরুন সরকারের প্রস্তাব গ্রহণ করা অসম্ভব ছিল। কিন্তু আমার কয়েকজন বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী স্বেচ্ছায় আমার ইউরোপে থেকে চিকিৎসা করানোর আর্থিক দায়িত্ব নিজেদের স্কন্ধে গ্রহণ করেছেন এবং ইউরোপে গিয়ে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা আমার পক্ষে সম্ভব করেছেন।

আগেকার স্বাস্থ্য আবার ফিরে পাব কি না এখনও জানি না। কিন্তু ভবিষ্যতে আমার জন্য যাই জমা থাক, যাঁরা আমার ইউরোপে যাওয়া সম্ভব করেছেন তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

যদিও আমার স্পর্শকাতরতা অতি তীব্র, আমার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের প্রদত্ত সাহায্য গ্রহণ করতে আমি দ্বিধা করিনি। তার কারণ, আমার পরিবার শুধু তাঁরাই নন যাঁদের সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক। আমার পরিবার আমার সমগ্র দেশ, এবং একবার যখন চিরতরে আমার নগণ্য জীবন আমার দেশের সেবায় উৎসর্গ করেছি, আমার মঙ্গলামঙ্গলের দায়িত্ব আমার নিকটতম আত্মীয়দের যত, আমার দেশবাসীর তার চেয়ে কম নয়।

আমার একমাত্র আশা, এবং ঈশ্বরের কাছে আমার একমাত্র প্রার্থনা, জাতিধর্ম নির্বিশেষে ভারতীয়েরা আমার ওপর যে পরিমাণ প্রীতি ও ভালবাসা বর্ষণ করেছেন, আমি যেন তার যোগ্য হই।

---

১. ১৯৩৩-এর ২৫ ফেব্রুয়ারি জাহাজে ইউরোপ যাত্রার প্রাক্কালে কেবলমাত্র Free Press-কে প্রদত্ত বিবৃতির বয়ান।

জাহাজে উঠবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আমার ওপর আরোপিত সমস্ত বাধানিষেধ সত্ত্বেও, আমি অনুভব করছি আমার দেশবাসীর গভীরতম শুভেচ্ছা, প্রীতি ও সহানুভূতি আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

অতএব আমি পরিবর্তে তাঁদের আশ্বস্ত করতে চাই, তাঁদের যত প্রার্থনা, আমার জন্য তাঁদের যত শুভেচ্ছা, আমার আরোগ্য লাভে (যদি খুব বেশি দেরি না হয়ে গিয়ে থাকে) সর্বাপেক্ষা সহায়ক হবে। পৃথিবীর সর্বোত্তম চিকিৎসকের দেওয়া ঔষধের চেয়েও এই শুভেচ্ছা অধিক ফলদায়ী।

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম ও সাম্যবাদ[১]

আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য আমরা ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে অহিংস সংগ্রামে রত ছিলাম। কিন্তু আজ আমাদের অবস্থা সুদীর্ঘ কঠিন সংগ্রামের মধ্যে সহসা শত্রুপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণকারী সৈন্যদলের মতো।[২] এবং এই আত্মসমর্পণ এ-জন্য করা হয়নি, যে জাতীয় সৈন্যবাহিনী তার নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করল, এ-জন্য করা হয়নি যে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আত্মসমর্পণের কারণ, উপর্যুপরি অনশনের ফলে সেনাপতি অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন, কিংবা কোনও আত্মগত কারণে যা অন্যের বুদ্ধির অগম্য, তাঁর বিচারবুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল।

যাই হোক না কেন—আমার প্রশ্ন—এ-রকম ঘটনা অন্য দেশে ঘটলে কী হত? গত বিশ্বযুদ্ধের শেষে যে-সব গভর্নমেন্ট শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, তাদের কী হয়েছিল? কিন্তু ভারত এক অদ্ভুত দেশ।

১৯৩৩-এর আত্মসমর্পণ মনে করিয়ে দেয় ১৯২২-এর বারদৌলির পশ্চাদপসরণের কথা। কিন্তু ১৯২২-এর পশ্চাদপসরণের তবু কিছু কারণ দেখানো যায়, সে-কারণ যতই অসন্তোষজনক হোক। ১৯২২-এর আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত করার অজুহাত হিসাবে চৌরি-চৌরার হিংসার ঘটনার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ১৯৩৩-এর আত্মসমর্পণের কী ব্যাখ্যা, কী অজুহাত?

এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, যে ১৯২০ সালে যে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করা হয়, এবং কোনও-না-কোনও আকারে সেই সময় থেকে জারি রাখা হয়, ১৯২০ সালের সন্ধিক্ষণে সেই আন্দোলনই ভারতের পক্ষে সবচাইতে উপযুক্ত ছিল। কোনও সন্দেহ নেই, ১৯২০ সালে, যখন রাজনৈতিক ভারত উন্মুখ হয়েছিল আরও সংগ্রামী কোনও কর্মপন্থার জন্য—মহাত্মা গান্ধীই ছিলেন জনগণের অবিসম্বাদিত মুখপাত্র হিসাবে দাঁড়াবার মতো মানুষ, তিনিই নেতা হিসাবে জনগণকে জয়ের পর জয়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন। এ বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই, যে বিগত দশ বছরে ভারত এক শতাব্দীর অগ্রগতি সম্পন্ন করেছে। কিন্তু ভারতের ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, আমাদের উপযুক্ত কাজ হবে অতীতের ভুলভ্রান্তি খুঁজে বের করা, যাতে আমাদের ভবিষ্যত কাজকর্ম ঠিক পথে চলে, যাতে খানা-খন্দে আমাদের পা না পড়ে।

---

১. ১০ জুন ১৯৩৩-এ লন্ডনে তৃতীয় ভারতীয় রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ বক্তার অনুপস্থিতিতে প্রদত্ত।

২. সুভাষচন্দ্র এখানে মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক হঠাৎ আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত করে দেওয়ার কথা বলছেন।

স্বাধীনতা লাভের জন্য আমাদের সামনে দুটো রাস্তা। একটি রাস্তা আপোসহীন সংগ্রামের, আরেকটি আপোসের। প্রথম পথটি যদি আমরা অনুসরণ করি, যত দিন না পূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে পারি মুক্তিসংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে, স্বাধীনতার পথে কোনও আপোস চলবে না। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় পন্থা যদি গ্রহণ করি, প্রতিপক্ষের সঙ্গে কিছুকাল অন্তর আপোস করতে হতে পারে, যাতে আরও অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করবার আগে আমাদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে পারি।

প্রথমেই এ কথা সকলের মনে হওয়া উচিত, যে বিগত তেরো বছর আমাদের আন্দোলন আপোসহীন সংগ্রামের পথে চলেছে না আপোসের পথ ধরে চলেছে, সেটা আদৌ স্পষ্ট নয়। এই মতাদর্শগত দ্ব্যর্থবোধকতা অনেক ক্ষতির জন্যে দায়ী। আমাদের নীতি যদি হত আপোসহীন সংগ্রাম, ১৯২২ সালের বারদৌলির আত্মসমর্পণ ঘটত না, ১৯৩১-এর মার্চের দিল্লি চুক্তিও আমরা করতাম না। পক্ষান্তরে, আপোসের পথে যদি আমরা চলতাম, ডিসেম্বর ১৯৩১-এ ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার সুযোগ আমাদের কখনওই হারানো উচিত হত না। সময়টা তখন অত্যন্ত অনুকূল ছিল। ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে অবস্থাটা বোঝাপড়া করার পক্ষে মোটেই সুবিধাজনক ছিল না। তা সত্ত্বেও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে একটি সন্ধি স্থাপিত হল। এবং ১৯৩১-এর মার্চ মাসে আমাদের যে শক্তি ছিল তার কথা বিবেচনা করলে বলতে হয়, সেই চুক্তির শর্তাবলী ছিল সম্পূর্ণ অসন্তোষজনক। এক কথায় বলতে গেলে, রাজনৈতিক সৈনিক হিসাবে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রামীও ছিলাম না, যথেষ্ট পরিমাণে কৌশলীও ছিলাম না।

একটি নিরস্ত্র পরাধীন জাতি, যেমন ভারতীয়েরা, তাদের সঙ্গে গ্রেট ব্রিটেন-এর মতো একটি প্রথম শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যখন সংগ্রাম হয়, আমাদের প্রয়োজনীয় সম্পদের জোগান নির্ভর করে, জনগণের উদ্দীপনা এবং সরকারের প্রতি তাদের বিরোধিতার মনোভাব আমরা বজায় রাখতে পারব কি না, তার ওপরে। যখন লড়াই হয় দুই সুসজ্জিত, সু-শিক্ষিত সৈন্যবাহিনীর মধ্যে, মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্নটা, আমাদের ক্ষেত্রে যত, ততটা গুরুত্বপূর্ণ হয় না। ১৯২২ সালে যখন সমগ্র জাতির আবেগ উদ্বেলিত, যখন অধিকতর সাহসিকতা, অধিকতর ত্যাগ তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যেত, আমাদের সৈন্যাধ্যক্ষ হঠাৎ শ্বেত-পতাকা তুলে দিলেন। এবং এ-ঘটনা ঘটল যখন তার দু'-মাস আগে শাসকদের সঙ্গে, যাকে একটি সম্মানজনক আপোস বলে তখনকার পরিস্থিতিতে মনে হতে পারত, সে রকম একটি চুক্তিতে আসার এক অনন্য সুযোগ তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা, কিংবা সে-শিক্ষা মনে রাখা সহজ নয়, এবং ভারতে সম্প্রতি যে-সব ঘটনা ঘটেছে তাতে দেখছি ১৯২১ এবং ১৯২২ সালের শিক্ষা আমরা এখনও হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি এবং আমাদের দুর্ভাগ্য, ১৯২৫ ও ১৯৩১-এ যথাক্রমে পুণ্যস্মৃতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর পরলোক গমনে দুই বিশাল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের তিরোধান ঘটে, যাঁরা বর্তমান রাজনৈতিক দুর্গতি থেকে ভারতকে রক্ষা করতে পারতেন।

১৯২৭-এর ডিসেম্বরে মাদ্রাজে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হওয়াতে সাধারণ মানুষের ক্রমবর্ধমান উদ্দীপনার ইঙ্গিত পাওয়া গেল, এবং ১৯২৮-এর প্রথম দিকে সাইমন কমিশন যখন বোম্বাইয়ে অবতরণ করল, সারা দেশে যে মিছিল ইত্যাদি হল তাতে ১৯২১ সালের সেই গৌরবময় দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। এক দিক থেকে দেখলে ১৯২৮-এর পরিস্থিতি ১৯২১-এর চেয়ে অনেক বেশি অনুকূল ছিল, কারণ ১৯২১ সালে ভারতীয় উদারনৈতিকেরা সক্রিয়ভাবে কংগ্রেসের বিরোধী ছিল, কিন্তু

১৯২৮ সালে তারা ছিল ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সক্রিয়, এবং সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে কংগ্রেস ও লিবারাল পার্টির যুক্তফ্রন্ট হয়েছিল। সেই কারণে সাইমন কমিশনের আগমন উপলক্ষে আন্দোলনের পুনরুজ্জীবন করতে হত, যে আন্দোলন মহাত্মা গান্ধী ১৯২২ সালে বিনা কারণে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তবু পুরো দুটি বছর আমরা এগিয়ে যাওয়ার বদলে পশ্চাদপসরণ করে গেলাম। ১৯২৮-এর ডিসেম্বরে পক্ষে ১৩০০ ও বিপক্ষে ৯০০ ভোটে কলকাতা কংগ্রেসে সুস্পষ্ট ভাবে ডোমিনিয়ান স্টেটাস স্বীকার করবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে ছিল। এইভাবে আমরা পিছিয়ে গেলাম শুধু ১৯২৭-এর ডিসেম্বরের মাদ্রাজের অবস্থান থেকেই নয়, ডিসেম্বর ১৯২০-র নাগপুরের অবস্থান থেকেও। স্বরাজ সম্পর্কে নাগপুরের প্রস্তাবে যে অস্পষ্টতা ছিল, তার দরুন সেই প্রস্তাবকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা যেত, যে ভারতের জাতীয় দাবি 'ডোমিনিয়ান স্টেটাস' নয়, স্বাধীনতা।

কলকাতা কংগ্রেসের প্রস্তাবে ব্রিটিশ সরকারকে এক বছর সময় দেওয়া হল। তার মধ্যে ভারতকে ডোমিনিয়ান স্টেটাস দিতে হবে। কিন্তু সরকারের সে-রকম কোনও ইচ্ছা ছিল না। কাজেই, যখন ১৯২৯ সাল শেষ হয়ে এল অথচ ডোমিনিয়ান স্টেটাস অর্থাৎ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন-এর কোনও লক্ষণ দেখা গেল না, পরিস্থিতিটা কংগ্রেসের পক্ষে সঙ্কটজনক হয়ে উঠল। কংগ্রেস নেতারা আবার একবার মীমাংসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, লাহোর কংগ্রেসের প্রাক্কালে, ১৯২৯-এর নভেম্বরে। কিন্তু তাতে কোনও ফল হল না। এক যুক্ত ইস্তাহারে, যেটি বর্তমানে দিল্লি ইস্তাহার নামে পরিচিত, নেতৃবৃন্দ জানালেন তাঁরা লন্ডনের গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে প্রস্তুত, যদি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে।

১৯২৮-এর কলকাতা কংগ্রেসে সাহস করে যাঁরা মহাত্মা গান্ধীর ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন এবং ১৯২৯-এর নভেম্বরের দিল্লি ইস্তাহারের যাঁরা নিন্দা করেছিলেন, আমি তাঁদের একজন। আমাদের বলে দিতে হয়েছিল যে 'গোলটেবিল বৈঠক' নামটি ভুল, কেননা বিভিন্ন যুযুধান পক্ষের পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের সম্মেলন এটি নয়। বৈঠকে এমন অনেকে হাজির থাকবেন যাঁদের নিজস্ব কোনও পরিচয় নেই, বিদেশিরা যাঁদের মনোনীত করবেন, ধুরন্ধর ব্রিটিশ রাজনীতিকদের কথা মতো যাঁরা চলবেন। উপরন্তু বৈঠকে যদি এমন কোনও সিদ্ধান্ত গৃহীতও হয় যা ভারতের স্বার্থের অনুকূল, ব্রিটিশ সরকার তেমন সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে বাধ্যও থাকবে না। আমরা এ বিষয়েও সকলকে অবহিত করলাম যে এ বৈঠক ডাকার সরকারের আসল উদ্দেশ্য ভারতীয়দের ইংলন্ডে ডেকে এনে তাদের পরস্পরের মধ্যে লড়াই লাগিয়ে দেওয়া, যা দেখে ইংরেজরা আমোদ পাবে। সেই জন্য আমরা জোর দিয়ে বললাম, Sinn Feiners যেমন লয়েড জর্জের আয়ারল্যান্ডের বৈঠক বর্জন করেছিল, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসেরও তেমনি উচিত সযত্নে গোলটেবিল বৈঠক পরিহার করা।

কিন্তু সে আমাদের অরণ্যে রোদন। নেতৃবৃন্দ একযোগে মহাব্যস্ত হয়ে উঠলেন, আত্মসম্মান বজায় রেখে সরকারের সঙ্গে আসন্ন সংগ্রাম কী করে এড়ানো যায়, যে সংগ্রাম দিনে দিনে অপরিহার্য হয়ে উঠছিল। কিন্তু সরকার তার কোনও সুযোগই দিলেন না। ফলে, ১৯২৯-এর ডিসেম্বরে যখন লাহোর কংগ্রেস আরম্ভ হল, দেশবাসীর মেজাজ তেতে উঠেছে, স্বাধীনতার প্রস্তাব গলাধঃকরণ ছাড়া নেতাদের আর কোনও উপায় থাকল না।

কিন্তু 'স্বাধীনতা', যার অর্থ ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ, সে পাঁচন বড়ই তিক্ত, হজম করা কঠিন। কংগ্রেস যখন একমত হয়ে স্বাধীনতা প্রস্তাব গ্রহণ করল, বিগত ন' বছরের 'করছি-করব'-র অবসান হল, দেশের নরমপন্থীরা ভয় পেয়ে গেলেন। আমাদের নেতৃবৃন্দ কিছুমাত্র কালক্ষেপ না করে তাঁদের আশ্বস্ত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, সুমধুর বাক্য, চিত্তাকর্ষক

স্লোগান উদ্ভাবিত হল। আমাদের বলা হল, স্বাধীনতার অর্থ 'পূর্ণ স্বরাজ।' (তার ব্যাখ্যা যে যার নিজের প্রয়োজন মতো করতে পারেন)। মহাত্মা গান্ধী ১৯৩০-এর প্রথম দিকে তাঁর 'একাদশ-সূত্র'-র প্রস্তাব করলেন। তাঁর মতে সেই এগারো সূত্রেই স্বাধীনতার সারবস্তুটি নিহিত আছে, এবং ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সমঝোতার সেটিই ভিত্তি হতে পারে। এইভাবে লাহোর কংগ্রেসের স্বাধীনতা প্রস্তাবের তাৎপর্য এবং গুরুত্ব বহুলাংশে অন্তর্হিত হল নেতাদের নিজেদের কাজের ফলে।

লাহোর কংগ্রেসের পর কংগ্রেস নেতাদের পক্ষে হাত গুটিয়ে বসে থাকা অসম্ভব হল। কাজেই ২৬ জানুয়ারি ১৯৩০ স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করে আন্দোলন আরম্ভ করা হল। এপ্রিল মাসের মধ্যে আরম্ভ হয়ে গেল দেশব্যাপী অভ্যুত্থান (হতে পারে অহিংস)। সংগ্রামের আহ্বানে এমন সাড়া পড়ে গেল সারা দেশে যে মহাত্মা গান্ধীও চমকে গেলেন। তিনি বললেন, আন্দোলন দু' বছর আগেই শুরু হতে পারত।

আগেকার ১৯২১ সালের আন্দোলনের মতো ১৯৩০ সালের আন্দোলনের জন্যও সরকার প্রস্তুত ছিল না। আন্দোলন দমন করবার সবচেয়ে কার্যকর উপায় কী হতে পারে, সেটা ঠিক করতেই তাদের অনেক সময় লেগে গেল। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও—আর্থিক ও রাজনৈতিক—ভারতকে সহায়তা করল। সেই কারণেই যাকে দিল্লি চুক্তি বলা হয় (১৯৩০-এর গান্ধী-আরউইন চুক্তি) তার ভিত্তিতে আন্দোলন মুলতুবি রাখা ভুল হয়েছিল। নেতারা আপোস চাইলেও, তাঁদের উচিত ছিল অধিকতর অনুকূল সময়ের জন্যে অপেক্ষা করা, এবং আরও ছ' মাস কিংবা এক বছর আন্দোলন চালিয়ে গেলে সে-রকম সময় নিশ্চয় আসত। কিন্তু আবার, দিল্লি চুক্তি সম্পাদনের সময়ে, বাস্তব অবস্থাটা বিবেচনার বাইরে থেকে গেল, তাঁদের নিজেদের মনোভাব, পূর্ব-সংস্কার, এই সবই প্রাধান্য পেল। আমি এমন কী এমন কথাও বলব যে ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে পরিস্থিতি যা ছিল, তাতে সরকারের কাছ থেকে এর চাইতে ভাল শর্ত আদায় করা যেত, যদি আমাদের নেতারা অধিকতর রাজনীতিজ্ঞ হতেন, অধিকতর কুশলী হতেন।

বাস্তবে যা হল, দিল্লি চুক্তিতে সরকারের সুবিধা হল, দেশবাসীর সর্বনাশ হল। ১৯৩০ ও ১৯৩১ সালে কংগ্রেস যে রণকৌশল অবলম্বন করেছিল সরকার সেটা অনুধাবন করবার সময় পেল। যার ফলে আবার একবার কংগ্রেস আন্দোলনে নামলে তাকে চরম আঘাত হানবার জন্য নিজেদের ব্যবস্থাদি আরও পোক্ত করে তোলবার তারা সময় পেল। এ কথা এখন লোকের মুখে-মুখে ফিরছে যে, সরকার ১৯৩২ সালে যে অর্ডিনান্স জারি করেছিল, এবং সারা বছর ধরে যে কৌশলে যুদ্ধ চালিয়ে ছিল তার সমস্ত ১৯৩১ সালের মধ্যেই ঠিক করা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস কী করল? সীমান্ত প্রদেশ, যুক্ত প্রদেশ ও বঙ্গদেশে তীব্র বিক্ষোভ সত্ত্বেও, যে-সংগ্রাম আবার আরম্ভ করতেই হবে তার জন্য দেশকে প্রস্তুত করবার জন্য নেতারা কিছুই করলেন না। এ কথা বলাও আমার ভুল হবে না যে, আবার সংঘর্ষ আরম্ভ করবার সম্ভাবনা পরিহার করবার জন্য যা দরকার তার সব কিছুই করা হল শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

দিল্লি চুক্তির ফলে লোকের উৎসাহ ও আবেগ ঝিমিয়ে পড়ল। তা হলেও মানুষের মেজাজ এমন লড়ায়ে হয়ে উঠেছিল যে মিষ্টি কথায় তাকে ভোলানো যেত না। তা যদি না হত, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আবার সংঘর্ষ শুরু হওয়া নেতারা আটকাতে পারতেন। আগামী দিনের কর্মীদের বুঝতে হবে যে ১৯৩২-এর আন্দোলনের পরিকল্পনা ও সংগঠন নেতাদের দ্বারা হয়নি। অথচ তাই হওয়া উচিত ছিল। দেশবাসী তাঁদের বাধ্য করেছেন সে আন্দোলনে নামতে। এবং এ কথা যদি সত্য হয়, ১৯৩২-এর জানুয়ারি মাসে আমাদের নেতাদের যে অশান্তির মধ্যে পড়তে হয়েছিল, তা থেকে তাঁরা যে বেরিয়ে আসবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠবেন, তাতে কি অবাক হওয়ার কোনও কারণ আছে?

১৯৩১-এর দিল্লি চুক্তি আমরা যত পড়ি তত বেদনা বোধ করি:

(১) প্রথমত, প্রধান যে প্রশ্ন, স্বরাজ, সে-বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের দায়বদ্ধতা সম্পর্কে একটি কথাও ছিল না;

(২) দ্বিতীয়ত, ভারতের দেশীয় রাজ্যের নৃপতিদের নিয়ে একটি সংযুক্ত রাষ্ট্রের প্রস্তাব কার্যত স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল;

(৩) তৃতীয়ত, অহিংসার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভূ, সেইসব কারারুদ্ধ গাড়োয়ালি সৈন্য, যাঁরা তাঁদের নিরস্ত্র স্বদেশবাসীর ওপর গুলি বর্ষণ করতে অস্বীকার করেন, তাঁদের মুক্তির কোনও ব্যবস্থা ছিল না;

(৪) চতুর্থত, যে-সব রাজনৈতিক বন্দি বিনা বিচারে, বিনা অভিযোগে, বিনা কারণে কারাবাস করছেন তাঁদের মুক্তির কোনও ব্যবস্থা ছিল না;

(৫) পঞ্চমত, মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা, যা বছরের পর বছর চলছে, তার প্রত্যাহারের কোনও ব্যবস্থা ছিল না;

(৬) ষষ্ঠত, অন্য শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দি, আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য যাঁদের অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়নি, তাঁদের মুক্তির জন্য কোনও ব্যবস্থা ছিল না।

অতএব দেখা যাচ্ছে, গাড়োয়ালি সৈনিকদের, রাজনৈতিক বন্দিদের, মিরাট-ষড়যন্ত্র বন্দিদের এবং বিপ্লবী বন্দিদের পাশে না দাঁড়ানোর ফলে ভারতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মুখপাত্র বলে কংগ্রেস আজ নিজেকে দাবি করতে পারে না। ভারতে যাঁরা সংগ্রামী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী তাঁদের মুখপাত্র হতে অস্বীকার করাতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভারতবাসীদের সামনে শুধুমাত্র সত্যাগ্রহীদের মুখপাত্র ও প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়াল।

১৯৩১-এর দিল্লি চুক্তি যদি একটি ভুল হয়ে থাকে, ১৯৩৩ সালের মে মাসের আত্মসমর্পণ তার তুলনায় এক বিরাট বিপর্যয়। রাজনৈতিক রণকৌশলের যা নীতি তাতে ভারতের নতুন সংবিধান নিয়ে যখন আলোচনা চলছিল তখন দেশে আইন অমান্য আন্দোলন তীব্রতর করে সরকারের ওপর যতদূর সাধ্য চাপ দেওয়া উচিত ছিল। সেই গুরুতর সময়ে আন্দোলন মুলতুবি করে, গত তেরো বছরের দেশবাসীর পরিশ্রম, দুঃখভোগ এবং ত্যাগ বিফল করে দেওয়া হল। এবং এই যে পরিস্থিতি এর মধ্যে সবচাইতে দুর্ভাগ্যের বিষয় এটাই, যে এই বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে যাঁদের প্রতিবাদ ফলপ্রসূ হতে পারত, তাঁরা এখন জেলখানায় বন্দি। আর, জেলের বাইরে যাঁরা আছেন, তাঁদের পক্ষেও তেমন প্রতিবাদ সম্ভব হয়নি, সম্ভবত মহাত্মা গান্ধীর ২১ দিনের অনশনের ফলে।

কিন্তু পাশার দান দেওয়া হয়ে গেছে। আইন অমান্য আন্দোলন এক মাস স্থগিতের অর্থ চিরতরে স্থগিত, কেননা গণ-আন্দোলন রাতারাতি সৃষ্টি করা যায় না। অতএব আমাদের সামনে এখন প্রশ্ন, এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও কতটুকু কী করতে পারি, ভবিষ্যতের জন্য কী নীতি, কী পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করতে পারি।

এই সমস্যার সমাধান করতে হলে তার আগে অন্য দুটি প্রশ্নের উত্তর আমাদের দিতে হবে:

(১) আমাদের লক্ষ্যের কথা মনে রাখলে, ইংল্যান্ড এবং ভারতের মধ্যে বোঝাপড়া কি শেষ পর্যন্ত সম্ভব?

(২) আমাদের উপায় প্রসঙ্গে, মাঝে-মাঝে আপোস করে, আপোসহীন সংগ্রামের পথ গ্রহণ না করে ভারত কী রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করতে পারবে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমি বলি, সে-রকম আপোস সম্ভব নয়। রাজনৈতিক আপোস তখনই সম্ভব হয় যখন স্বার্থের কোনও মিল থাকে। কিন্তু ইংল্যান্ড ও ভারতের স্বার্থে কোনও মিল নেই, যে মিল থাকলে দু' দেশের মধ্যে আপোস সম্ভব ও বাঞ্ছনীয় হত। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থেকেই সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়—

(১) দুটি দেশের মধ্যে কোনও সামাজিক বন্ধন নেই।

(২) ভারত ও ব্রিটেনের সংস্কৃতিতে এমন কিছু নেই যার মধ্যে কোনও মিল পাওয়া যায়।

(৩) অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ব্রিটেনের কাছে ভারত কাঁচা মাল সরবরাহকারী ও ব্রিটেনে প্রস্তুত সামগ্রীর ক্রেতা। অথচ ভারত পণ্য প্রস্তুতে সক্ষম দেশ হয়ে উঠতে চায় যাতে নির্মিত পণ্যের ক্ষেত্রে সে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হতে পারে এবং শুধুমাত্র কাঁচামালই নয়, বিদেশে স্ব-উৎপাদিত পণ্যও রফতানি করতে পারে।

(৪) বর্তমানে ভারত ব্রিটেনের বৃহত্তম বাজারগুলির অন্যতম। ফলে ভারত যদি উৎপাদিত পণ্যে আত্মনির্ভরশীল হয় তবে তা ব্রিটেনের অর্থনৈতিক স্বার্থপরিপন্থী হবে।

(৫) ভারতের সেনাবাহিনীতে ও অসামরিক প্রশাসনে এখন ব্রিটিশ তরুণবয়সীরা চাকরি পেয়ে থাকেন। তাতে ভারতের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। ভারত চায় তার নিজের সন্তানেরা সে-সব চাকরিতে নিযুক্ত হন।

(৬) ব্রিটেনের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই নিজের পায়ে দাঁড়াবার যথেষ্ট শক্তি ও সম্পদ ভারতের আছে। এ-বিষয়ে ভারতের অবস্থা উপনিবেশসমূহ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

(৭) এতদিন ধরে ব্রিটেন ভারতকে শোষণ এবং ভারতের ওপর প্রাধান্য করে এসেছে, সে প্রকৃতই একটা আশঙ্কা আছে যে দুটি দেশের মধ্যে রাজনৈতিক আপোস হলে তাতে ব্রিটেনেরই লাভ হবে ও ভারতের ক্ষতি হবে। তদুপরি, দীর্ঘদিন ব্রিটিশের পদাবনত থাকায় ভারত একধরণের হীনমন্যতার শিকার। ভারত যতদিন সম্পূর্ণ স্বাধীন না হচ্ছে ততদিন এই হীনমন্যতা দূরীভূত হবে না।

(৮) ভারত চায় স্বাধীন দেশের মর্যাদা, তার নিজের পতাকা, তার নিজস্ব স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী, প্রতিরক্ষা। সে চায় বিভিন্ন স্বাধীন দেশের রাজধানীতে তার নিজের রাষ্ট্রদূত। এই তেজস্কর সঞ্জীবনী স্বাধীনতা ব্যতিরেকে ভারতবাসী কোনওদিনই পুরোপুরি মানুষ হয়ে উঠতে পারবে না। স্বাধীনতা ভারতের মনস্তাত্ত্বিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রয়োজন। ভারতের নবজাগরণের জন্য তা অবশ্যপ্রয়োজনীয়। যে স্বাধীনতা ভারতের অভীষ্ট তা কানাডা কিংবা অস্ট্রেলিয়ার মতো ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সে যে সম্পূর্ণ জাতীয় সার্বভৌম স্বাধীনতা বিদ্যমান, তাই।

(৯) ভারত যতদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকবে সাম্রাজ্যের অন্যান্য দেশে যাঁরা স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন সেই ভারতীয়দের স্বার্থ সে রক্ষা করতে পারবে না। গ্রেট ব্রিটেন চিরদিনই শ্বেতাঙ্গদের দিকে থেকেছে এবং থাকবে, ভারতীয়দের দিকে নয়। অপর পক্ষে, স্বাধীন ভারত, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের স্থায়ী বাসিন্দা তার যে-সব সন্তান, তাঁরা যাতে ভাল ব্যবহার পান তার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হবে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, ভারত ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে আপোসের কোনও ভিত্তি নেই। অতএব ভারতবাসীদের নেতৃবৃন্দ যদি এই মৌলিক সত্যটিকে অগ্রাহ্য করে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপোস করেন, সে ব্যবস্থা স্থায়ী হবে না। ১৯৩১-এর মার্চের গান্ধী-আরউইন চুক্তির মতো সে হবে স্বল্পায়ু। এমন সব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি এখন ভারতে ক্রিয়াশীল যে ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে শান্তি স্থাপন একমাত্র তখনই সম্ভব যখন ভারতের ন্যায়সঙ্গত দাবিসমূহ পূরণ করা হবে।

বর্তমান অচল অবস্থার অবসান সম্ভব একমাত্র ভারতের স্বাধীনতা লাভের মধ্য দিয়ে। তার অর্থ ভারতে ব্রিটিশ সরকারের পরাজয়। ভারত কীভাবে নিজেকে স্বাধীন করতে পারে, এখন সে-কথা ভাবতে হবে।

দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি, অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভের জন্য আমাদের কী উপায় অবলম্বন করা উচিত, সে প্রসঙ্গে আমি বলি যে, কিছুকাল অন্তর আপোস করার পথ দেশবাসী ইতিমধ্যেই খারিজ

করে দিয়েছে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে দেশ যে সমর্থন করেছিল তার কারণ কংগ্রেস প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সে দেশকে স্বাধীন করবে, এবং প্রতিজ্ঞা করেছিল যতদিন তা না হয় সংগ্রাম করে যাবে। অতএব ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কর্মপন্থা স্থির করবার আগে আমাদের মাঝে-মাঝে আপোস করার পথ চিরতরে বাতিল করতে হবে।

কংগ্রেস আশা করেছিল ভারতকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনে দেবে দেশের অসামরিক প্রশাসনকে অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের সাহায্যে অচল করে দিয়ে। এখন প্রয়োজন, সে কাজে আমরা কেন ব্যর্থ হলাম তার কারণ বিশ্লেষণ করা, যাতে ভবিষ্যতে আমরা অধিকতর সাফল্য লাভ করতে পারি।

কংগ্রেসের চোখে ব্রিটিশ সরকারের এখন যা অবস্থা তার সঙ্গে তুলনা করা যায়—

এক সুরক্ষিত, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত দুর্গের মতো, যে দুর্গের এমন এক ভূমিতে অবস্থিত যে ভূমি সহসা শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে। এখন, দুর্গ, যতই তার অস্ত্রশস্ত্র থাক, নিরাপদে অবস্থানের জন্য তার চতুর্দিকে সর্বক্ষণ বন্ধুভাবাপন্ন অসামরিক জনসাধারণ থাকা দরকার। কিন্তু চারিদিকের অধিবাসীবৃন্দ শত্রুভাবাপন্ন হলেও সে দুর্গের আশু কোন ভয়ের কারণ নেই, যতদিন সেখানকার অধিবাসীবৃন্দ দুর্গটি জয় করবার জন্য সচেষ্ট না হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য ব্রিটিশ সরকার অধিকৃত দুর্গটি দখল করে নেওয়া। সেই উদ্দেশ্যে দুর্গের চারিপাশের মানুষের সহানুভূতি ও সমর্থন সে লাভ করেছে। সংগ্রামের জন্য ভারতের দিক থেকে এই হল প্রথম পর্যায়। সংগ্রামের পরবর্তী পর্যায়ের জন্য নিম্নলিখিত কাজের হয় দুটিই কিংবা একটি করতে হবে:

(১) দুর্গটির সম্পূর্ণ অবরোধ, যার ফলে সেখানে অবস্থিত সৈন্যবাহিনী খাদ্যাভাবে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

(২) অস্ত্রবলে দুর্গটি জয়ের চেষ্টা।

যুদ্ধের ইতিহাসে এই দুটি পদ্ধতিই সাফল্য সহকারে ব্যবহৃত হয়েছে। বিগত মহাযুদ্ধে সামরিক দিক থেকে জার্মানিরই জয় হয়েছিল, কিন্তু মিত্রশক্তিসমূহ অবরোধের দ্বারা খাদ্যাভাব সৃষ্টি করে তাকে পরাজয় স্বীকারে বাধ্য করে। অবরোধ যে সম্ভব হয়েছিল তার কারণ সমুদ্রের ওপর এবং জার্মানির সঙ্গে যোগাযোগের সমস্ত পথের ওপর মিত্রশক্তি সমূহের দখল ছিল।

শত্রু-দুর্গের ওপর হানা দিয়ে অস্ত্রবলে তাকে জয় করার কোনও চেষ্টা ভারতে হয়নি, কারণ কংগ্রেস অহিংসার নীতি সম্পর্কে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অর্থনৈতিক অবরোধের চেষ্টা সাধারণভাবে হয়ে থাকলেও তিনটি কারণে বিফল হয়।

(ক) ভারতের সঙ্গে বহির্জগতের সমস্ত যোগাযোগ সরকারের নিয়ন্ত্রণে।

(খ) ভারতের মধ্যে সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্য সমুদ্রবন্দর থেকে দেশের অভ্যন্তরের এবং দেশের এক অংশ থেকে আরেক অংশের যোগাযোগের পথগুলি সরকারের নিয়ন্ত্রণে, কংগ্রেসের নয়।

(গ) রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থাদি, যার ওপর নির্ভর করে ভারতে ব্রিটিশ সরকারের অস্তিত্ব, তাকে তেমনভাবে জখম করা যায়নি, সন্দেহ নেই, অধিকাংশ প্রদেশে ঘাটতি চলেছে, কিন্তু সে ঘাটতি সরকার পূরণ করতে পেরেছেন কর-বৃদ্ধি করে কিংবা ঋণের সাহায্যে।

সর্বদা মনে রাখতে হবে, বিদেশি সরকারকে অচল করে দিতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তখনই সক্ষম হয় যখন নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলির একটি অথবা সবক'টি গ্রহণ করা হয়:

(১) কর ও রাজস্ব সংগ্রহ বন্ধ করা।

(২) এমন সব ব্যবস্থা করা যাতে সামরিক কিংবা অসামরিক অন্য কোনও দিক থেকে সরকারের কাছে আপৎকালে সাহায্য না পৌঁছয়।

(৩) এখন যারা ভারতে ব্রিটিশ সরকারেরর সমর্থক, অর্থাৎ সামরিক বাহিনী, পুলিশ এবং অসামরিক প্রশাসক, তাদের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করা, যাতে সরকার তাদেরকে আন্দোলন দমন করার আদেশ দিলে সে আদেশ পালিত না হয়।

(৪) অস্ত্রবলে ক্ষমতা দখলের প্রকৃত প্রচেষ্টা

শেষোক্ত পদক্ষেপটি বাতিল করতে হবে, কেননা কংগ্রেস অহিংসায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তা সত্ত্বেও নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি যদি আমরা গ্রহণ করতে পারি, বর্তমান সরকারকে অচল করে দেওয়া এবং আমাদের দাবিসমূহ স্বীকার করতে তাকে বাধ্য করা সম্ভব:

(১) কর ও রাজস্ব আদায় করতে না দেওয়া।

(২) শ্রমিক এবং কৃষক সংগঠনগুলির সাহায্যে দুঃসময়ে সরকারের কাছে সবরকম সাহায্য পৌঁছনো বন্ধ করা,

(৩) উৎকৃষ্টতর প্রচারের দ্বারা সরকারের বর্তমান নিজস্ব সমর্থকদের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করা।

এই তিনটি কাজ যদি করা যায়, সরকারি যন্ত্র বিকল হয়ে যাবে। প্রথমত, প্রশাসনের খরচ চালাবার মতো অর্থ তাদের থাকবে না, দ্বিতীয়ত, তারা যে-সব আদেশ জারি করবে তাদের নিজেদের অফিসাররাই তা পালন করবেন না, এবং শেষত, অন্য সব দিক থেকে প্রেরিত সাহায্য তাদের কাছে পৌঁছবে না।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের কোনও সহজ রাস্তা নেই। উপরোক্ত তিনটি পন্থা, সম্পূর্ণ কিংবা অংশত গ্রহণ করতেই হবে। কংগ্রেসের ব্যর্থতার কারণ ওই তিনটি কাজের একটিও সে, যাতে কাজ হয়, এমনভাবে করতে পারেনি। যেসব শান্তিপূর্ণ জনসভা, মিছিল, বিক্ষোভ প্রদর্শন ইত্যাদি গত কয়েক বছর করা হয়েছে, সরকারি নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও, তাতে সরকারের প্রতি অমান্যের ভাব একটা প্রকাশ পেয়েছে সন্দেহ নেই, এবং সরকারের তাতে বিরক্তিও উৎপন্ন হয়েছে, কিন্তু ও-সবে সরকারের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে ওঠেনি। আমাদের সমস্ত বিক্ষোভ প্রদর্শন সত্ত্বেও এবং ১৯৩২-এর জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত সত্তর হাজার মানুষ কারারুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সরকার দাবি করতে পারে:

(১) তাদের সামরিকবাহিনী সম্পূর্ণ অনুগত,

(২) তাদের পুলিশ সম্পূর্ণ অনুগত,

(৩) তাদের অসামরিক প্রশাসন, রাজস্ব ও কর সংগ্রহ, আদালত, জেলখানা ইত্যাদির কাজ অব্যাহত।

(৪) সরকারি কর্মচারী, এবং তাদের সমর্থকদের জীবন ও সম্পত্তি সম্পূর্ণ নিরাপদ।

এবং সরকার এখনও বুক ফুলিয়ে বলতে পারে, ভারতের সাধারণ জনগণ যদি নিষ্ক্রিয় শত্রুতার ভাবও পোষণ করে, তারা তা গ্রাহ্য করে না। যতদিন না দেশবাসী অস্ত্রের সাহায্যে, কিংবা কার্যকর অর্থনৈতিক অবরোধের দ্বারা সক্রিয়ভাবে সরকারকে বিপন্ন করে, সরকার অনির্দিষ্টকাল টিকে থাকবে, আমাদের অসহযোগ এবং আইন অমান্য সত্ত্বেও।

বিগত দশকে সারা ভারতে এক অভূতপূর্ব গণজাগরণ হয়েছে। মানুষের নির্বিকার আত্মতুষ্টির অবসান হয়েছে। সমগ্র দেশে নতুন প্রাণের স্পন্দন এবং স্বাধীনতার জন্য দেশ আকুল। সরকারি ভ্রূকুটি, কারাবাস, লাঠির আঘাত, এ-সবকে দেশ আর ভয় করে না। ব্রিটিশদের মানমর্যাদা তলানিতে ঠেকেছে। এখন আর ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভারতের দিক থেকে বন্ধুত্বের মনোভাবের কোনও প্রশ্ন নেই। ব্রিটিশ শাসনের নৈতিক ভিত্তি অন্তর্হিত হয়েছে, সে শাসন এখন কোষমুক্ত তরবারির ওপর দাঁড়িয়ে। এবং ভারত এখন সমগ্র দুনিয়ার মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

কিন্তু একটা সত্য মানতেই হবে, স্বাধীন ভারত এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে! ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের যে মনোভাব সাম্প্রতিক শ্বেতপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রকৃত ক্ষমতার লেশমাত্র তারা ছাড়তে রাজি নয়। স্পষ্টত ব্রিটিশ সরকার মনে করছে, ভারতবাসীর দাবি প্রতিরোধ করতে তারা সক্ষম। তাদের সে-শক্তি আছে এবং আমাদের প্রতিরোধ করবার শক্তি যদি তাদের থাকে, তাতে স্পষ্ট বোঝা যায়—১৯২০ সাল থেকে ভারতবাসীর যত পরিশ্রম, যত কষ্ট স্বীকার তার কিছুই আমাদের যে লক্ষ্য 'স্বরাজ', তার বিশেষ কাছাকাছি আমাদের আনতে পারেনি।

অতএব ভারতকে এখন বৃহত্তর এবং তীব্রতর আরেকটি সংগ্রাম আরম্ভ করবার শপথ গ্রহণ করতে হবে। তার জন্য বৌদ্ধিক এবং ব্যবহারিক প্রস্তুতি হওয়া চাই বিজ্ঞানসম্মত এবং তার ভিত্তি হওয়া চাই ব্যক্তিনিরপেক্ষ। এ কাজের জন্য যে বৌদ্ধিক প্রস্তুতি প্রয়োজন তাতে এইসব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে:

(১) ভারতীয়দের সম্পর্কিত ব্যাপারে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের শক্তি ও দুর্বলতাসমূহের বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা।

(২) ভারতে ব্রিটিশ শাসন-সম্পর্কিত ব্যাপারে ভারতীয়দের শক্তি ও দুর্বলতাসমূহের পর্যালোচনা।

(৩) পৃথিবীর অন্যান্য অংশে বিভিন্ন সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতনের বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা।

(৪) অন্যান্য দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা, এবং পৃথিবীতে সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতার ক্রমিক বিবর্তনের বিষয়ে জ্ঞানান্বেষণ।

সেই জ্ঞানান্বেষণ সম্পূর্ণ হলে তবে আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারব আমাদের কর্তব্য কী বিরাট, তার আগে নয়।

তারপরে আমাদের প্রয়োজন হবে একদল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুরুষ ও নারী, যারা ভারতকে মুক্ত করার কাজ নিজেদের হাতে নেবে, তাতে দুঃখ কষ্ট যতই আসুক। ভারত নিজেকে স্বাধীন করতে পারবে কি না, আবার স্বাধীন জাতি হিসাবে জীবনধারণ করতে পারবে কি না, তা নির্ভর করে, প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব সে সৃষ্টি করতে পারবে কি না তার ওপরে। যে-রকম নেতার প্রয়োজন তার জন্ম দেওয়ার ক্ষমতার দ্বারাই পরীক্ষা হবে তার প্রাণশক্তির, 'স্বরাজ'-এর জন্য তার যোগ্যতার।

তারপরে আমাদের দরকার হবে, বিজ্ঞানসম্মত কর্মপরিকল্পনা এবং ভবিষ্যতের জন্য বিজ্ঞানসম্মত কার্যসূচি। আজ থেকে যে কাজ আরম্ভ হবে, এবং ক্ষমতা অধিকার করা পর্যন্ত চলবে, তার পদ্ধতি এখনই আমাদের মনশ্চক্ষে স্পষ্ট হওয়া চাই, এবং বিস্তারিত ভাবে তার পরিকল্পনা, যতদূর সাধ্য এখনই করতে হবে। অতএব ভবিষ্যৎ আন্দোলনকে স্থাপন করতে হবে ব্যক্তিনিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর এমনভাবে যাতে ইতিহাসের সত্য এবং মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে যেন তার বিরোধ না থাকে। এতাবৎকাল রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনায় বড় বেশি নির্ভর করা হয়েছে 'অন্তরের নির্দেশ'-এর 'নিজস্ব অনুভূতি'-র ওপর। আসলে সে-আন্দোলন তো ব্যক্তিনিরপেক্ষ।

কর্ম-পরিকল্পনা, যার সাহায্যে আমরা ক্ষমতা অধিকার করা যায়, তা ছাড়াও আমাদের প্রয়োজন হবে, ভাবতে যে নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হবে তার জন্যে একটি কার্যসূচি। ভাগ্যের হাতে কিছুই ছেড়ে দেওয়া যায় না। গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে সংঘর্ষে যেসব পুরুষ ও নারী নেতৃত্ব দান করবেন, তাঁদেরকেই দায়িত্ব নিতে হবে নতুন রাষ্ট্রকে এবং রাষ্ট্রের মাধ্যমে সমগ্র জাতিকে নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা এবং বিকশিত করার। আমাদের নেতারা যুদ্ধোত্তর পর্বেও নেতৃত্ব দানের জন্য তৈরি হয়ে যদি না ওঠেন, তা হলে এমন একটা সম্ভাবনা থেকে যাবে, যে ক্ষমতা দখল

করে নেওয়ার পরে একটা অরাজকতার কাল আরম্ভ হতে পারে। এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি বিপ্লবের পরে যে-সব ঘটনা ঘটেছিল সে রকম ঘটনা ভারতেও ঘটতে পারে। অতএব, স্বাধীনতার সংগ্রামের সময়ে দেশবাসীর মনে যে-সব আশা আকাঙ্ক্ষা নেতাদের জাগিয়ে তুলতে হবে, সে সব আশা-আকাঙ্ক্ষা যদি যথার্থ প্রমাণ করতে হয়, তবে স্বাধীনতা সংগ্রামের সেনাপতিদেরকে সংগ্রামোত্তর সমগ্র সংস্কার-কর্মসূচি যে সম্পূর্ণ করতে হবে, তা স্পষ্টই বোঝা যায়। এই নেতাদের কাজ ততদিন পর্যন্ত সম্পূর্ণ হবে না, যত দিন না নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর নতুন প্রজন্মের নারী ও পুরুষেরা প্রস্তুত হয়ে উঠছেন, এবং এই নতুন প্রজন্ম দেশের দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছেন।

অনাগত দিনের সেই দলকে, এতাবৎকাল যাঁরা ভারতবাসীদের নেতা তাঁদের পথ পরিত্যাগ করতে হবে, কারণ গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে সংগ্রামের পরবর্তী পর্যায়ের জন্য যে সব রণনীতি রণকৌশল, কর্মসূচি ইত্যাদির প্রয়োজন হবে এই নেতৃবৃন্দ যে সে-সব গ্রহণ করতে পারবেন তার বিশেষ কোনও সম্ভাবনা নেই। ইতিহাসের এক পর্বের নেতারা পরবর্তী পর্বেও নেতৃত্ব দান করেছেন, এমন ঘটনা কদাচিৎ দেখা গেছে, আদৌ দেখা গেছে কি না সন্দেহ। সর্বদা নতুন যুগ নতুন মানুষের জন্ম দেয়। ভারতেও তাই হবে।

নতুন দলকে গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে সংগ্রামে যোদ্ধা এবং নেতার ভূমিকা পালন করতে হবে, এবং নতুন ভারতের স্থপতির কাজও করতে হবে, যাদের ওপর বর্তাবে সংগ্রামোত্তর ভারতে সমাজ পুনর্গঠনের দায়িত্ব। ভারতীয় আন্দোলনের দুটি পর্ব থাকবে। প্রথম পর্বে সংগ্রাম হবে গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে 'জাতীয়' সংগ্রাম, যদিও নেতৃত্ব থাকবে জনগণের পার্টির হাতে, যারা প্রতিনিধিত্ব করবে ভারতীয় শ্রমজীবীদের, এবং শ্রেণি সংগ্রাম হবে এই পার্টিরই নেতৃত্বে। আন্দোলনের এই পর্বে সমস্ত বিশেষ অধিকারাদি ভেদাভেদ এবং কায়েমি স্বার্থ দূরীভূত হবে, যাতে আমাদের দেশে সম্পূর্ণ সাম্য (সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক) প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। আমরা সবাই জানি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ড বিশ্বসভ্যতায় একটি অসাধারণ সম্পদ দান করেছিল, সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক সরকারের ধারণা। তেমনি আবার অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের অপূর্ব অবদান 'স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী'। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জার্মান নিয়ে এল মার্ক্সীয় দর্শন। বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে রাশিয়া সমৃদ্ধ করল সর্বহারার বিপ্লব, সর্বহারার সরকার ও সর্বহারার সংস্কৃতির মাধ্যমে। বিশ্বের সংস্কৃতি ও সভ্যতার ভাণ্ডারে এর পরে মূল্যবান কিছু দান করতে হবে ভারতকে।

আমাদের ব্রিটিশ বন্ধুরা কখনও-কখনও বলে থাকেন, যে ভারতের প্রশ্নে ব্রিটিশ জনসাধারণের মনে কোনও সংকীর্ণতা নেই, এবং আমাদের প্রচারের দ্বারা আমরা যদি তাদের সহানুভূতি অর্জন করতে পারি, আমাদের অনেক লাভ হবে। আমার কিন্তু মনে হয় না ভারতের প্রশ্নে ব্রিটিশ জনসাধারণের মন এত পরিষ্কার। কোনও মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়, ভারতে শাসন ও শোষণ হাত ধরাধরি করে চলে এবং এই শোষণ শুধু ব্রিটিশ পুঁজিপতি ও মূলধনের মালিকদের নয়, এ সমগ্র গ্রেট ব্রিটেন কর্তৃক ভারতকে শোষণ। যে ব্রিটিশ পুঁজি ভারতে বিনিয়োগ করা হয়েছে, তা কেবলমাত্র উচ্চ শ্রেণি থেকে আসেনি। মধ্যবিত্ত শ্রেণি, এবং সম্ভবত কিছু পরিমাণে দরিদ্রতর শ্রেণি থেকেও এসেছে। তা ছাড়া, ব্রিটেনের শ্রমজীবী শ্রেণিরও পকেটে টান পড়বে, ল্যাঙ্কাসায়রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারতের বস্ত্রশিল্প যদি এগিয়ে যায়। সেই কারণেই ব্রিটেনের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি ভারতকে তাদের দলীয় প্রসঙ্গ ও আলোচনার বিষয় বানায়নি। সেই কারণেই লন্ডনে যখন শ্রমিক সরকার ছিল তখনও ভারতে অমানুষিক নিপীড়ন ও দমননীতি বজায় ছিল। আমি জানি শ্রমিক দলে এমন বিশেষ-বিশেষ সদস্য আছেন,

যাঁরা ভারতের প্রতি সুবিচার করার আন্তরিক আগ্রহে স্বার্থচিন্তার ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম। কিন্তু যতই আমরা তাঁদের গুণগ্রাহী হই না কেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক যতই হৃদ্যতাপূর্ণ হোক না কেন, প্রকৃত সত্য হল, দলের সিদ্ধান্ত প্রভাবান্বিত করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এবং অতীত অভিজ্ঞতা বলছে, ডাউনিং স্ট্রিটে সরকার বদলের দ্বারা ভারতের পরিস্থিতির কোনও উন্নতির আশা আমরা করতে পারি না।

ভারতে যেহেতু রাজনীতি ও অর্থনীতি অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত, এবং যেহেতু ব্রিটিশ শাসন ভারতে শুধু রাজনৈতিক আধিপত্য নয়, অর্থনৈতিক শোষণের জন্যও বহাল রয়েছে, অতএব রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমাদের প্রাথমিক অর্থনৈতিক প্রয়োজন। আমাদের লক্ষ-লক্ষ বুভুক্ষু দেশবাসীর অন্নের সমস্যা, তাদের শিক্ষার সমস্যা, বস্ত্রের সমস্যা, জাতির স্বাস্থ্যের ও শরীরের উন্নতির সমস্যা, যতদিন ভারত দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ, ততদিন সে সব সমস্যার সমাধান অসাধ্য। ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের আগে তার অর্থনৈতিক উন্নতি এবং শিল্প-বিকাশের কথা ভাবা ঘোড়ার আগে গাড়ি জোতা। প্রায়ই আমাদেরকে প্রশ্ন করা হয়, দেশ থেকে বিদেশি শাসন বিদায় নিলে কী অবস্থা হবে দেশের অভ্যন্তরে। ব্রিটিশ প্রচারের দৌলতে পৃথিবীর চোখে ভারত অন্তর্দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ, এবং একমাত্র ইংল্যান্ডের প্রতাপেই সেখানে শান্তি বজায় আছে। অতীতে অন্তর্দ্বন্দ্ব ভারতে অবশ্যই ছিল, অন্য সব দেশেই আছে। কিন্তু এই সব কলহ বিবাদের মীমাংসা দেশের লোক নিজেরাই করেছে। সেই কারণেই প্রাচীনতম কাল থেকে মহাশক্তিশালী বিশাল-বিশাল সাম্রাজ্যের উত্থান ভারতে প্রচুর হয়েছে, যার অধীনে দেশব্যাপী শান্তি ও সমৃদ্ধি কায়েম থেকেছে। যেমন, মহামতি অশোকের সাম্রাজ্য। কিন্তু বর্তমানের সংঘাতগুলি স্থায়ী, আমাদের দেশে তৃতীয় পক্ষের আজ্ঞাবাহীদের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম। এবং এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, প্রকৃত ঐক্য ভারতবাসীদের মধ্যে কখনওই স্থাপিত হতে পারবে না যতদিন বিদেশি শাসন ভারতে বজায় থাকবে।

যদিও আমরা কখনওই ইংলন্ডের কোনও রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা করতে পারি না, ভারতের সপক্ষে আন্তর্জাতিক প্রচার সংগঠন করা আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে অপরিহার্য। এই প্রচার একই সঙ্গে হতে হবে সমর্থনে এবং বিরুদ্ধে। বিরুদ্ধের দিকে, গ্রেট ব্রিটেনের চরেরা সারা পৃথিবীতে জেনে অথবা না-জেনে যে সব মিথ্যা প্রচার করছে তা খণ্ডন করতে হবে। এবং সমর্থনের দিকে ভারতের সমৃদ্ধিশালী সংস্কৃতি, তার বিভিন্ন দিক সহ এবং ভারতের বিভিন্ন দুঃখ-দুর্দশা পৃথিবীর নজরে আনতে হবে। বলা বাহুল্য এই আন্তর্জাতিক প্রচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হবে লন্ডন। এটা একটা পরিতাপের বিষয় যে আন্তর্জাতিক প্রচারের গুরুত্ব ও প্রয়োজন এই সে-দিন পর্যন্ত উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। তবে এখন আমাদের আশা, আগামীদিনে আমাদের দেশবাসী আন্তর্জাতিক প্রচারের মূল্য উত্তরোত্তর বুঝতে পারবে।

ব্রিটিশদের যত তারিফ আমি করি তাদের প্রচারের কৌশলের জন্য তত সম্ভবত আর কিছুর জন্য নয়। ব্রিটিশরা জন্মসিদ্ধ প্রচারবিদ এবং তাদের চোখে প্রচারের শক্তি হাউইটজার কামানের চাইতে বেশি। ইউরোপে একটি দেশ আছে যারা ব্রিটিশদের কাছ থেকে এই শিক্ষাটি গ্রহণ করেছে। সে দেশ হল রাশিয়া, এবং এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, যে ব্রিটেন রাশিয়াকে অন্তর থেকে অপছন্দ করে, এমন কী ভয়ও করে, ব্রিটেনের সাফল্যের এই গোপন চাবিকাঠিটি আবিষ্কার করে ফেলার জন্য।

ব্রিটিশের চরেরা বিশ্বজুড়ে ভারতের বিরুদ্ধে এত প্রচার চালাচ্ছে যে, আমরা যদি শুধুমাত্র ভারতের প্রকৃত অবস্থাটা, এবং ব্রিটেনের সম্পর্কে আমাদের যত অভিযোগ সবাইকে জানাতে পারতাম, তৎক্ষণাৎ আমরা আন্তর্জাতিক সহানুভূতি প্রভূত পরিমাণে লাভ করতে পারতাম।

এখন আমি এমন কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করব যে, যে-বিষয় সম্পর্কে সারা পৃথিবীতে সক্রিয় প্রচার আবশ্যক:

(১) ভারতের রাজনৈতিক বন্দিদের প্রতি দুর্ব্যবহার এবং দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক বন্দিদের অস্বাস্থ্যকর আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে দ্বীপান্তর, যেখানে সম্প্রতি দু'জন অনশনে প্রাণত্যাগ করেছেন।

(২) ভারতীয়দেরকে পাসপোর্ট প্রদানের বিষয়ে সরকারের চরম প্রতিহিংসাপরায়ণতা (ভারতের বাইরে এ কথা কেউ জানে না, যে অসংখ্য ভারতীয়কে দেশের বাইরে যাবার পাসপোর্ট দেওয়া হয়নি, এবং বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের দেশে ফিরবার পাসপোর্ট দেওয়া হয়নি।)

(৩) ভারতে বিমান থেকে নিয়মিত বোমা-বর্ষণ, বিশেষত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, অসহায় গ্রামবাসীদের আতঙ্কিত করবার জন্য।

(৪) গ্রেট ব্রিটেন কর্তৃক তাদের শাসনকালে ভারতের স্বদেশি শিল্প কারখানা ইত্যাদির শ্বাসরোধ করে হত্যা, জাহাজ নির্মাণ শিল্পসমেত।

(৫) ব্রিটিশ শক্তি নিয়ন্ত্রিত যে কোনও নীতি সম্পর্কে জনগণের মধ্যে ব্যাপক বিরোধী মনোভাব অটোয়া চুক্তি সমেত (বিশ্ববাসীর জানা উচিত ভারত কোনও দিন অটোয়া চুক্তি মেনে নেয়নি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভারতকে সে চুক্তি গলাধঃকরণ করতে বাধ্য করা হয়।)

৬) আমদানি-শুল্ক সংক্রান্ত চুক্তির যে কোনও প্রস্তাব সম্পর্কে ভারতে জনগণের মধ্যে বিরোধিতা, কারণ দেশের সদ্যোজাত শিল্পসমূহের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা ভারতের অত্যন্ত প্রয়োজন।

৭) ব্রিটেন কর্তৃক মুদ্রাবিনিময় মূল্যের হার অযৌক্তিক ভাবে স্থির করা, যে হার ভারতের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকারক। বিনিময়হারের হেরফের করে ব্রিটেন কীভাবে ভারতের কোটি-কোটি টাকা অপহরণ করেছে, বিশ্ববাসীর জানা উচিত।

৮) পৃথিবীকে আরও জানানো দরকার, গ্রেট ব্রিটেন ভারতের ওপর বিপুল জাতীয় ঋণ চাপিয়ে দিয়েছে। যে ঋণের দায়িত্ব জাতীয়তাবাদী ভারতীয়রা অস্বীকার করেছেন। অনেকদিন আগে ১৯২২ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তার গয়া অধিবেশনে সরকারকে নোটিশ দিয়েছিল যে তারা এই জাতীয় ঋণের দায় অস্বীকার করবে। এবং এ-কথা সকলেরই জানা, এই ঋণ গ্রহণ করা হয়েছিল ভারতের স্বার্থের জন্য নয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে।

কিছু প্রচার ভারতের পক্ষে যার-পর-নাই প্রয়োজন বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলন ও নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে। যাতে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অভিযোগসমূহ এবং ভারতের প্রকৃত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হবে এমন একটি স্মারকপত্র সযত্নে প্রস্তুত করে বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলনের প্রত্যেক সদস্যের সামনে উপস্থাপিত করা দরকার।

নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত প্রশ্নে ভারতের বিশ্বকে বলা উচিত, ব্রিটেনের আন্তরিকতার পরীক্ষা হওয়া দরকার ভারতকে নিয়ে। যে দেশে প্রায় আশি বছর ধরে মানুষকে নিরস্ত্র করে রাখা হয়েছে, যে দেশে সমগ্র জনসমষ্টি জীর্ণশীর্ণ, সেখানে কেন্দ্রীয় রাজস্বের শতকরা ৫০ ভাগের অধিক সামরিক প্রয়োজনে ব্যয় করার কী যুক্তি থাকতে পারে?

আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, এ বিষয়ে সমস্ত তথ্য যদি বিশ্ববাসীর গোচরে আনা যায়, তা হলে ব্রিটেনের দোষ এমনভাবে প্রমাণিত হবে যার কোনও জবাব থাকবে না।

কোনও বিশ্ব কংগ্রেস কিংবা বিশ্ব সমাবেশে ভারতের প্রশ্ন উত্থাপিত হলেই সাধারণত ব্রিটেনের প্রবক্তরা এই অজুহাত দেখান যে ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি অভ্যন্তরীণ বিষয়। এই যুক্তি ভারতীয়দের আর মেনে নেওয়া উচিত নয়। ভারত যদি জাতিসঙ্ঘের সদস্য হয় তা হলে ভারত অবশ্যই একটি জাতি, এবং একটি জাতির যা কিছু অধিকার, যা-কিছু সুযোগ-সুবিধা

ভারত তার সবকিছুরই অধিকারী। আমি জানি, আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ভারতের অবস্থার পরিবর্তন করতে গেলে আমাদের কঠোর এবং দীর্ঘ সংগ্রাম করতে হবে। তথাপি, সে প্রচেষ্টা এখনই শুরু করা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

শ্বেতপত্রের বিষয় বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার আমার দরকার নেই। কেননা তা সে রকম আলোচনার যোগ্য নয়। আমি শুধু বলব, দেশীয় রাজন্যবর্গকে নিয়ে ফেডারেশন-এর প্রস্তাব অসম্ভব, অগ্রহণীয়। সমগ্র ভারতে ঐক্য স্থাপন, ভারতবাসীদের ফেডারেশন-এর জন্য চেষ্টা আমরা অবশ্যই করব। কিন্তু এখনকার যে প্রস্তাব, আইন সভাগুলিতে বর্তমান সরকারি গোষ্ঠীর জায়গা দেশীয় রাজন্যবর্গ দখল করুন, মি. র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড, কিংবা লর্ড স্যানকিকে সন্তুষ্ট করবার জন্য, আমরা গ্রহণ করতে পারি না। এবং একই সঙ্গে 'স্বাধীনতা' ও 'রক্ষাকবচ' এর কথা বলা নিরর্থক। যদি আমাদের স্বাধীনতা লাভ করতে হয়, কোনও রক্ষাকবচ থাকতে পারে না, কারণ একমাত্র যে রক্ষাকবচটি আমাদের থাকতে পারে সেইটে হল স্বাধীনতা। 'ভারতের স্বার্থে রক্ষাকবচ'-এর কথা বলা এক ধরনের আত্মপ্রবঞ্চনা।

দেশবাসী যাতে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হয়, এমন সংবিধান আমরা কবে পাব, এখনই বলা সম্ভব নয়। কিন্তু এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে সে-ক্ষমতা আমাদের হাতে যখন আসবে দেশবাসী অস্ত্রধারণের অধিকার অবশ্যই দাবি করবে। তারা এ কথাও বিশ্বকে, বিশেষ করে ব্রিটিশ সরকারকে বলবে, 'তোমরা অস্ত্র বর্জন করো, নয়তো আমরা অস্ত্র হাতে তুলে নেব।' স্বেচ্ছায় অস্ত্রবর্জন এই বেদনার্ত পৃথিবীতে অবশ্যই এক আশীর্বাদ। কিন্তু কোনও জাতির স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে আশি বছর ধরে তাকে নিরস্ত্র করে রাখা, ভারতে যা হয়েছে, সে এক প্রচণ্ড অভিশাপ। এবং যা নিয়ে খুব গর্ব করা হয়, সেই Pax Britannica (অর্থাৎ রোমক সাম্রাজ্য বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে যে শান্তি বিরাজ করত) তার অনুকরণে যা আমরা ভারতে দেখছি, সে কোনও সুস্থ জীবনের শান্তি নয়, কবরখানার শান্তি।

নতুন দলটিকে, নিজের অস্তিত্বের যুক্তি হিসাবে যে দ্বিবিধ ভূমিকা পালন করতে হবে, তার কথা আগেই বলেছি। রাজনৈতিক ক্ষমতা যাতে সে ছিনিয়ে নিতে পারে, এবং পরে সে ক্ষমতা সমাজের পুনর্গঠনে ব্যবহার করতে পারে সে জন্য আজ থেকেই মানুষকে সে-কাজের জন্য তৈরি করে তুলতে হবে। আমার মনে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে আমাদের জাতীয় জীবনের সমস্যা সমূহের সমাধানের জন্য, ভারত যখন স্বাধীন হবে, নতুন চিন্তা, নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হবে। পূর্ববর্তী প্রজন্মের এবং অতীতের শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা বিশেষ কাজে লাগবে না, স্বাধীন ভারতের আর্থ-সামাজিক অবস্থা আজকের অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হবে। শিল্পে, কৃষিতে, ভূমিব্যবস্থায়, মুদ্রা-ব্যবস্থায়, বিনিময় ব্যবস্থায়, শিক্ষায়, কারাপ্রশাসনে, জনস্বাস্থ্যে, নতুন নতুন তত্ত্ব, নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্ভাবন করতে হবে। যেমন, আমরা জানি সোভিয়েত রাশিয়ায় সে-দেশের বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী জাতীয় (অথবা রাজনৈতিক) অর্থনীতির জন্য একটি নতুন পরিকল্পনা উদ্ভাবিত হয়েছে। ভারতেও তাই করতে হবে। Pigon এবং Marshall-কে দিয়ে কাজ চলবে না।

ইউরোপে এবং ইংল্যান্ডে জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই পুরনো তাত্ত্বিক চিন্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে আরম্ভ করেছে, তার জায়গায় আসছে নতুন সব তত্ত্ব। দৃষ্টান্ত হিসাবে Silvio Gesell-এর উদ্ভাবিত Free Money তত্ত্বের উল্লেখ করতে পারি। জার্মানির একটি ছোট জনগোষ্ঠীর মধ্যে তত্ত্বটি প্রয়োগ করা হয়েছে এবং সম্পূর্ণ সন্তোষজনক প্রমাণিত হয়েছে। ভারতেও তাই হবে। স্বাধীন ভারত পুঁজিপতিদের, জমিদারদের, বর্ণভেদের দেশ হবে না। স্বাধীন ভারত হবে সামাজিক এবং রাজনৈতিকভাবে গণতান্ত্রিক। স্বাধীন ভারতের যে-সব সমস্যা, বর্তমান ভারতের থেকে তা হবে সম্পূর্ণ আলাদা। অতএব আজকের ভারতের মানুষকে সেই ভাবে শিক্ষিত করতে

হবে, যাতে তারা ভবিষ্যতকে ধারণা করতে পারে, স্বাধীন ভারতের মতো করে চিন্তা করতে পারে। এবং পূর্বাহ্ণেই সে-সব সমস্যার সমাধান করতে পারে। এক কথায়, স্বাধীন ভারতের মন্ত্রীমণ্ডলকে আজকের ভারত থেকেই শিখিয়ে-পড়িয়ে তৈরি করে নিতে হবে।

প্রত্যেকটি বৃহৎ আন্দোলনের শুরু হয় ক্ষুদ্র ভাবে। ভারতেও তাই হবে। আমাদের প্রথম কর্তব্য, এমন এক দল পুরুষ ও নারীকে একত্র করা, যারা আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজন সর্বাধিক সম্ভব ত্যাগস্বীকার করতে ও দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করতে প্রস্তুত থাকবে। তাদের হতে হবে সর্বক্ষণের কর্মী, স্বাধীনতার মদে মাতাল সব ব্রতধারী, যারা ব্যর্থতায় হতাশ হবে না, কোনও প্রকার বাধা বিপত্তিতে নিরুৎসাহ হবে না, এবং শপথ নেবে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাদের মহৎ ব্রতের জন্য পরিশ্রম করবে, সংগ্রাম করবে।

এইসব নৈতিকভাবে প্রস্তুত পুরুষ ও নারী যখন আমরা পাব, তাদেরকে প্রয়োজনীয় বৌদ্ধিক শিক্ষা দিতে হবে, যেন তারা তাদের কর্তব্য কী বিরাট, উপলব্ধি করতে পারে। অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে বৈজ্ঞানিক ও সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে তাদেরকে অনুধাবন করতে হবে, যাতে তারা বুঝতে পারে একই ধরনের সমস্যা, একই ধরনের বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও কী ভাবে সমাধান করা হয়েছে। এই জ্ঞানের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তাদের বৈজ্ঞানিক ভাবে পরীক্ষা করতে হবে, ভারতে ভারতীয়দের সম্পর্কিত বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের কোথায়-কোথায় জোর, কোথায়-কোথায় দুর্বলতা, এবং একই রকম ভাবে দেখতে হবে ব্রিটিশ সরকারের সম্পর্কিত ব্যাপারে ভারতীয়দের শক্তি ও দুর্বলতার স্থান কোনগুলি।

এই বৌদ্ধিক প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ হওয়ার পর আমাদের পরিষ্কার ধারণা হবে, ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য কী রকম কর্ম-পরিকল্পনা দরকার, এবং ক্ষমতা হস্তগত হওয়ার পর যখন নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হবে, তখন কী কর্ম-পরিকল্পনা কার্যকর করতে হবে। কাজেই, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আমাদের এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুরুষ ও নারীর একটি দল প্রয়োজন, যারা এই মহৎ ব্রতে তাদের জীবন উৎসর্গ করেছে, যাদের প্রয়োজনীয় বৌদ্ধিক শিক্ষালাভ হয়েছে, এবং যাদের স্পষ্ট ধারণা হয়েছে, ক্ষমতা জয় করে নেওয়ার আগে এবং তার পরে তাদের কী কী কাজ করতে হবে।

এই দলকে বিদেশি শাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করতে হবে। এই দলকে ভারতে এক নতুন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম দিতে হবে। এই দলকে সংগ্রামোত্তর আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠনের জন্য একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা কার্যকর করতে হবে। জীবন সংগ্রামে শিক্ষিত এবং প্রস্তুত এক নতুন প্রজন্মের পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করতে হবে এই দলকে। এবং সবশেষে, যদিও এটি সর্বাপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, এই দলের কাজ হবে নেতৃত্ব দিয়ে ভারতকে জগতের স্বাধীন জাতি সমূহের মধ্যে এক সম্মানিত স্থানে নিয়ে যাওয়া।

এই দলের নাম হোক 'সাম্যবাদী সংঘ'। এ হবে একটি কেন্দ্রীভূত সুশৃঙ্খল সর্বভারতীয় দল, দেশবাসীর সমস্ত অংশের মধ্যে কাজ করবে। এই দলের প্রতিনিধিরা থাকবেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে, সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে, বিভিন্ন কৃষক সংগঠনে, ছাত্র সংগঠনে, দলিত শ্রেণি সমূহের সংগঠনে, এবং প্রয়োজন হলে বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর ও সম্প্রদায়ের মধ্যেও। বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন স্থানে কর্মরত দলের বিভিন্ন শাখা, দলের কেন্দ্রীয় কমিটির নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশের অধীনে থাকবে।

একই লক্ষ্যে, সম্পূর্ণত অথবা অংশত, কর্মরত অন্য যে কোনও দলের সঙ্গে এই দল সহযোগিতা করবে। কোনও ব্যক্তি অথবা দলের প্রতি এই দল শত্রুতার মনোভাব পোষণ করবে না, কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখবে, যে পূর্বোল্লিখিত ভূমিকা পালন করবার জন্য ইতিহাস বিশেষভাবে এই দলকে আহ্বান করেছে।

ওপরে যে-সব কাজের কথা বলা হল, তা ছাড়াও দলের বিভিন্ন শাখা দেশের সর্বত্র স্থাপন

করতে হবে, নতুন দলটির আদর্শ ও লক্ষ্য ও বিধেয় সম্পর্কে সাধারণ ভাবে প্রচার চালাবার জন্য। সাম্যবাদী সংঘ হবে এমন একটি দল, যার লক্ষ্য হবে ভারতবাসীর সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতা, অর্থাৎ সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা। যতদিন দেশবাসী প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ না করছে, ততদিন এ দল সর্বপ্রকার বন্ধনের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রামে রত থাকবে। এর লক্ষ্য হবে, ভারতের জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা, যার ফলে, সুবিচার, ন্যায়, সাম্য ও স্বাধীনতার চিরন্তন নীতি সমূহের ভিত্তিতে স্বাধীন ভারতে সৃষ্ট হতে পারে এক নতুন রাষ্ট্র। ভারতের যে পবিত্র ব্রত, সেই ব্রত শেষ পর্যন্ত পূরণ করা হবে এ দলের লক্ষ্য, অতীত যুগ থেকে যে বাণী ভারত পরম্পরাক্রমে বহন করে এসেছে, সেই বাণী যাতে সে বিশ্বের দরবারে শোনাতে পারে।

ভিয়েনা, প্রাগ, ওয়ারস এবং বার্লিনের অভিজ্ঞতা

ইউরোপে স্বল্পকাল অবস্থানের সময়ে আমার সেখানকার চারটি বড় শহরে যাবার সুযোগ হয়েছিল—ভিয়েনা, প্রাগ, ওয়ারস এবং বার্লিনে। সাধারণভাবে পৌরপ্রশাসন সম্পর্কে আমার যে আগ্রহ, এবং কলকাতা করপোরেশনের সঙ্গে আমার যে নিকট সম্পর্ক, তার দরুন, আমি ওইসব শহরের নাগরিক জীবন সংক্রান্ত এবং নাগরিক বিকাশ সংক্রান্ত বিষয়ে অনুসন্ধান করবার জন্যে বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েছিলাম।

সর্বত্র মেয়র আমাকে আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন এবং পুরসভার বিভিন্ন বিভাগ যাতে আমি পরিদর্শন করতে পারি তার বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন, যথা জলসরবরাহ ব্যবস্থা, গ্যাস-সরবরাহ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, পৌর বিদ্যালয়, সমাজ-কল্যাণ প্রতিষ্ঠান, পয়োপ্রণালী, ইত্যাদি। কলকাতার মেয়র ও নাগরিকদের উদ্দেশেও মেয়র শুভেচ্ছা-বার্তা পাঠিয়েছেন। কলকাতার মেয়রকে আমি ইতিমধ্যেই ভিয়েনা, প্রাগ এবং ওয়ারসর মেয়রের বার্তা পাঠিয়ে দিয়েছি, এবং আগামী সপ্তাহে বার্লিনের মেয়রের প্রদত্ত বার্তাও পাঠিয়ে দেব।

ওই সমস্ত শহরে আমি দেখেছি, শুধু মেয়র নিজে নন, সমস্ত বিভাগীয় প্রধানরাও সুদূর ভারতে আমাদের পৌর-সংক্রান্ত সমস্যা সমূহের সমাধানে সাহায্য করতে আগ্রহী। ভবিষ্যতে যে কোনও সময়ে আমরা তাঁদের দ্বারস্থ হতে পারি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে, যে যথাসাধ্য সাহায্য তাঁরা করবেন। এছাড়াও, আমি সর্বত্র দেখেছি, জনজীবনের বিবিধ সমস্যা এবং বিষয়ে নানা সমাধান ও পরামর্শ দেবার আগ্রহে সকলেই ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে ইচ্ছুক।

ওই সব বিখ্যাত শহরে অবস্থানকালে আমি দেখলাম, ভারতে আমাদের যে-সব বড় শহর, ইউরোপের শহরগুলির সঙ্গে তুলনায় তারা কোনও অংশেই নগণ্য নয়। তা সত্ত্বেও আমার ধারণা নাগরিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন যা-কিছু হচ্ছে তার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা দরকার।

ওই শহরগুলির প্রত্যেকটিতে এমন অনেক কিছু আছে, আমরা যা থেকে কিছু পেতে পারি। একটি ছোট প্রবন্ধে তার সব-কিছুর আলোচনা সম্ভব নয়। যে-সব বন্ধুরা কলকাতা পুরসভার সঙ্গে যুক্ত তাঁদের সকলের কাছে আমার আবেদন, জগতের অন্য বড়-বড় শহরে যা ঘটছে তার সম্পর্কে অধিকতর আগ্রহী হন।

মেয়রকে এবং কলিকাতা পুরসভাকে আমি আগেই জানিয়েছি, এই ব্যাপারে তাঁরা যা বলবেন আমি করতে রাজি আছি। ভিয়েনায় এবং অন্যান্য বড় শহরে আমি যা-কিছু দেখেছি এবং শিখেছি তা নিয়ে একটি বই আমি লিখতে পারি। কিন্তু বিশেষ ভাবে আমাকে সে-দায়িত্ব

না দিলে আমি সে-কাজ হাতে নিতে পারি না। এ কাজে আমার যে শুধু কিছু অর্থব্যয় হবে তাই নয়, তার চেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ—সময় এবং শক্তিও যথেষ্ট পরিমাণে ব্যয় করতে হবে। এবং এখন আমার শারীরিক এবং আর্থিক যে অবস্থা এই দায়িত্ব নেওয়ার আগে আমাকে এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে, যে মেয়র এবং কলকাতা পুরসভা তার জন্য আমাকে বিশেষ ভাবে আদেশ দিয়েছেন।

২৫ নভেম্বর ১৯৩৩

কলকাতা পুরসভা

সম্পাদক
ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান,
সমীপেষু,

১ মার্চ ১৯৩৪

মহাশয়,

আপনাদের ৮ ফেব্রুয়ারির সংখ্যায় মি. জে. সি. ফ্রেঞ্চ শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকারের একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করেছেন। সেই উদ্ধৃতিটি তিনি দিয়েছেন, Joint Parliamentary Committeeর সামনে তাঁর যে বক্তব্য, Calcutta (Municipal) Corporation দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে, সেই বক্তব্যের সমর্থনে।

আমার আগেকার পত্রেই আমি জানিয়েছি বিশ্বজনীন সঙ্কটের কারণে কলকাতা পুরসভার আর্থিক অবস্থার ওপর প্রতিকূল প্রভাব পড়েছে। তা সত্ত্বেও ১৯৩৩-৩৪ বৎসর আরম্ভ হয়েছিল প্রাথমিক ৬৬, ২৪,০০০ টাকার উদ্বৃত্ত নিয়ে, যে ক্ষেত্রে আইনত ৬,০০,০০০ টাকার উদ্বৃত্ত থাকা প্রয়োজন। এই রিপোর্ট থেকেই দেখা যাবে, তথাকথিত যে ঘাটতিকে মি. ফ্রেঞ্চ এত গুরুত্ব দিয়েছেন সেটা চলতি বৎসরের আনুমানিক আয়-ব্যয় সংক্রান্ত, তাতে বিরাট প্রাথমিক উদ্বৃত্তটি বিবেচনা করা হয়নি, যে উদ্বৃত্ত সাধারণত আয়ের দিকে জমা করা হয়। ১৯৩৪- ৩৫ সালের প্রাথমিক উদ্বৃত্ত হবে ৫৩,৬৬,০০০ টাকা।

শ্রীসরকার, তাঁর বিবৃতিতে বলেছিলেন, বাৎসরিক সমস্ত পৌনঃপুনিক আয় ও ব্যয়ের ভারসাম্য আনা সম্ভব হলে প্রারম্ভিক উদ্বৃত্তের বিপুল অর্থ পরিমাণ স্থায়িত্ব লাভ করবে। চলতি বছরে কলকাতা পুরসভার আনুমানিক আয় ২,৫৬, ৮২,০০০ টাকা। অতএব প্রাথমিক উদ্বৃত্ত বাৎসরিক আয়ের শতকরা ২৫ ভাগের অধিক। এর সঙ্গে মি. ফ্রেঞ্চ তুলনা করুন বিগত কয়েক দশক বঙ্গীয় সরকারের বাৎসরিক প্রায় ২০০,০০০,০০০ টাকার ঘাটতি।

কলকাতা পুরসভার বিদ্যালয় সমূহে সন্ত্রাসবাদ শিক্ষাদানের অভিযোগ প্রসঙ্গে, ১৯৩৩-এর ৯ সেপ্টেম্বর Bengal Legislative Council-এ Calcutta Municipal Amendment Bill বিষয়ে মন্ত্রীর যে বিবৃতির কথা মি. ফ্রেঞ্চ বলেছেন, আমি তার সন্ধান পাইনি বলে আমি দুঃখিত। প্রকৃতপক্ষে, খসড়াটি সেপ্টেম্বর ১৯৩৩-এ পাশ হয়ে আইন হয়। তবে Secretary to the Department of Local Self Government এবং বঙ্গীয় সরকারের মুখপাত্র মি. এইচ. পি. ভি. টাউনেন্ড আই. সি. এস., বঙ্গীয় আইনসভায় ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩-এ বলেন:

> এমন কথা বলা হয়েছে যে তিনি নাকি বলেছেন কলকাতা পুরসভা

বিপ্লবাত্মক কাজ-কর্মে উৎসাহ দান করে থাকে এবং পুরসভা একটি সরকার বিরোধী সংস্থা। তাঁর বক্তৃতার এটি সঠিক অর্থ নয়। এ-কথা বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে, মি. টাউনেন্ড বলেছেন, যে পুরসভা অযথা আইন অমান্য আন্দোলনকে উৎসাহিত করেছে। তাঁরা সরাসরি সন্ত্রাসবাদকে উৎসাহিত করেছেন, এ-কথা কেউ বলেনি। (Calcutta Municipal Gazette September 9, 1933, page 6 of the supplement)

কলকাতা পুরসভার সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সপক্ষে (কিংবা বিপক্ষে) আমি কিছু বলিনি। তার কারণ আর কিছুই নয়। সে-অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। সংশোধিত আইনে পুরসভার কোনও কর্মচারীর বরখাস্তের কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি, এবং আমার মতে, গভর্নমেন্ট এই আইনটি এনেছে, কারণ পুরসভা নীতিগত কারণে চিরকালের জন্য কোনও প্রাক্তন রাজনৈতিক বন্দির নিয়োগ নিষিদ্ধ করতে অস্বীকার করে।

সংশোধিত আইন কেবল মাত্র তাদেরই নিয়োগ নিষিদ্ধ করেছে যারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনও অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হবে, অথবা অন্যূন তিন মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে। তার ফলে, ২০০০ রাজনৈতিক বন্দি, যাঁরা এখন পুরনো আইনে অথবা সাম্প্রতিক অর্ডিন্যান্সের দরুন জেলে আছেন, তাঁরা পুরসভায় নিয়োগের যোগ্য। আরও লক্ষণীয়, কোনও-কোনও ব্যক্তি সংশোধিত আইনে পুরসভায় নিযুক্তির অযোগ্য সাব্যস্ত হলেও কাউনসিলার অথবা অলডারম্যান অথবা মেয়র হিসাবে তাঁদেরকে নির্বাচনের অযোগ্য করা হয়নি। তা ছাড়া, সংশোধিত আইনে স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, যিনি মন্ত্রী হিসাবে বর্তমান পুরসভার সৃষ্টিকর্তা, তিনি পুরসভার অধীনে কোনও চাকরির জন্য অযোগ্য বিবেচিত হবেন, যদিও তিনি কলকাতার মেয়র হতে পারবেন।

কোনও নিরপেক্ষ বাইরের লোকের দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক বিষয় এইটা যে বঙ্গীয় আইন সভায় একজন মন্ত্রী এই মর্মে বিবৃতি দিলেন, যে 'এই বিলের চিঠিগুলি যে রাজনীতি বহির্ভূত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত কোনও ব্যক্তির প্রতি প্রযুক্ত হোক, এমন কোনও উদ্দেশ্য ছিল না।' 'রাজনৈতিক অপরাধ' সম্পর্কে মি. ফ্রেঞ্চের সঙ্গে কংগ্রেস দল একমত হতে পারে না, কারণ কংগ্রেস জানে আজ ইউরোপে অনেক দেশ প্রাক্তন রাজনৈতিক বন্দিরা শাসন করছেন— যেমন, আয়ারল্যান্ড, ইতালি, জার্মানি, রাশিয়া। তা ছাড়া কংগ্রেসের বিশ্বাস আজ যাই ঘটুক না কেন, ভারতে কংগ্রেসের শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা লাভ কেউ রোধ করতে পারবে না।

আপনার
সুভাষচন্দ্র বোস

অস্ট্রিয়ার ধাঁধা[১]

১৯১৪ সালে যে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে, তার শুরু হয়েছিল অস্ট্রিয়াতে। তাই সর্বত্র মানুষ আজ প্রশ্ন করছে, '১৯৩৪-এর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অস্ট্রিয়াকে কোথায় নিয়ে যাবে?'

ইউরোপের পরিস্থিতি এখন এত জটিল, যে ভবিষ্যতে কী ঘটবে এখনই বলা কঠিন। ১৯৩৩-এর মাঝামাঝি ভিয়েনায় একজন অতিশয় বুদ্ধিমান এবং ওয়াকিবহাল ইংরেজ সাংবাদিক, যিনি নানা দেশে ভ্রমণ করেছেন, তাঁর সঙ্গে অস্ট্রিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা

১. দ্য মডার্ন রিভিউ, ক্যালকাটা: এপ্রিল, ১৯৩৪ পৃষ্ঠা ৪৬১—৮

করছিলাম। ভিয়েনার আবহাওয়া তখন উত্তেজনায় ভরপুর ছিল, এবং লোকে আকস্মিক ক্ষমতা হস্তান্তরের (Coup d'etat) কথা বলাবলি করছিল। উনি বললেন, 'না, সে-সব কিছু হবে না। অস্ট্রিয়ার লোক অমায়িক প্রকৃতির। আমি কয়েকবারই দেখেছি, পরিস্থিতি সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠতে-উঠতে আবার সবকিছু মিটে গেল। আবার তাই হবে।' তিনি যা বলেছিলেন তা ঠিক, আবার ঠিক নয়ও বটে।

ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪-এর ভিয়েনার ঘটনাগুলির প্রসঙ্গে 'ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান' যা বলেছে তাতে সারবস্তু আছে: 'অস্ট্রিয়ার সমাজবাদীরা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন, কিন্তু তাঁদের জার্মানির সহকর্মীদের মতো বিনাযুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করেননি।' অস্ট্রিয়ার সমাজবাদীদের প্রতি ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান-এর মনোভাব সহানুভূতিসম্পন্ন। সেই পত্রিকার মতে, তাঁরা মধ্য ইউরোপে সংসদীয় গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতার প্রবক্তা। অপরপক্ষে লন্ডন টাইমস-এর সহানুভূতি স্পষ্টত বর্তমান অস্ট্রীয় সরকারের দিকে। অস্ট্রীয় সমাজবাদীদের জয় নিঃসন্দেহে সারা ইউরোপে সমাজবাদীদের হাত শক্ত করবে, এবং 'টাইমস'-এর মতো একটি রক্ষণশীল পত্রিকা স্বভাবতই সমাজবাদ বিরোধী মনোভাবই গ্রহণ করবে। মোটের ওপর ইতালির সংবাদপত্রগুলি বর্তমান অস্ট্রীয় সরকারকে সমর্থন করেছে। এটা অনেকেই জানেন যে অস্ট্রীয় সরকারের সঙ্গে ইতালীয় সরকারের সম্পর্ক ভাল এবং পূর্বোক্তরা অস্ট্রিয়ার জন্য একটি সংবিধান রচনা করছে ইতালির ধরণ অনুসরণ করে। অস্ট্রীয় সরকারের প্রতি জার্মানির খবরের কাগজগুলির মনোভাব অনুকূল নয়, যদিও অস্ট্রিয়ায় সরকার সমাজবাদীদের দমন করে আসছিল, যে সমাজবাদীদের জার্মানির নাৎসিরা শত্রু বলে মনে করে। সবাই বলছে, দুটো কারণে জার্মানির সংবাদপত্রের মনোভাব বদলে গেছে। প্রথমত অস্ট্রিয়ার সরকার অস্ট্রীয় সমাজবাদীদের আক্রমণ করবার আগে, অস্ট্রিয়ার নাৎসিদের দমন করেছে, এবং জার্মানির সংবাদপত্রের ক্রোধের কারণ হয়েছে। দ্বিতীয়ত, জার্মানি আশা করে, অস্ট্রিয়ার সমাজবাদীদের প্রতি বন্ধুত্বের মনোভাব প্রদর্শন করে, অস্ট্রিয়াতে তাদের যে বিপুল সংখ্যক মানুষের সমর্থন ছিল এবং সম্ভবত এখনও আছে, সেটাকে নিজেদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের সপক্ষে নিয়ে আসতে পারবে। আরেকটি কারণের কথাও বলা হয়ে থাকে: অস্ট্রিয়ার গভর্নমেন্ট যেহেতু তাদের নাৎসিদমন প্রচেষ্টায় ফ্রান্সের সমর্থন পেয়ে আসছে, এইটাই স্বাভাবিক যে জার্মানি তাতে অসন্তুষ্ট হবে, যদিও এই মুহূর্তে তারা সমাজবাদীদের ক্ষমতাচ্যুত করবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বারো মাস আগে আমি ভারতের বিভিন্ন সংবাদপত্রকে এক ত্রিকোণ সংগ্রামের কথা জানিয়েছিলাম। সে-সংগ্রাম ছিল সমাজবাদী, নাৎসি এবং হ্বেইম্হর-এর মধ্যে। আমি আরও বলেছিলাম, শেষপর্যন্ত অস্ট্রিয়ার ভাগ্য ইউরোপীয় রাজনীতিকে প্রভাবিত করবে। বর্তমানে এদের মধ্যে একটি দল, সমাজবাদী দল, নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে, অতএব ভবিষ্যৎ বাকি দুটি দলের একটির উপর নির্ভর করছে। যদি নাৎসি দল ক্ষমতায় আসে, রীতিমতো ঐক্যসাধন কিংবা Anschluss (জার্মানি কর্তৃক অস্ট্রিয়াকে আত্মসাৎ করণ) হোক বা না হোক, অস্ট্রিয়া কার্যত জার্মানির অংশ হয়ে দাঁড়াবে। এর অর্থ দাঁড়াবে জার্মানির প্রচুর শক্তিবৃদ্ধি, এবং এই কারণে ইউরোপের তিন বৃহৎ শক্তি এর বিপক্ষে। ইতালি, যার জনসংখ্যা চার কোটির কিছু বেশি, সেও চাইবে না সাত কোটি জনসংখ্যা সম্বলিত জার্মানি ইতালির উত্তর সীমান্ত থেকে একেবারে উত্তর সাগর পর্যন্ত প্রসারিত হোক। এবং ইতালির (এখন ইতালির, আগে ছিল অস্ট্রিয়ার) টাইরল আবার অস্থির হয়ে উঠতে পারে, বিশেষত যখন জার্মানি বারংবার ইউরোপের জার্মানভাষীদের ঐক্যবদ্ধ করবার লক্ষ্য ঘোষণা করছে। অতএব, যেমন অস্ট্রিয়ার নাৎসিরা জার্মানির নৈতিক সমর্থন পাচ্ছে তেমনি, তাদের যারা বিরোধী, সেই হ্বেইম্হর পার্টি পাচ্ছে ইতালির নৈতিক সমর্থন। কিন্তু এখন ইউরোপের পরিস্থিতি যাই হোক, ইতিহাসের একজন নিরপেক্ষ ছাত্রের

অবশ্যই মনে হবে, অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের ভেঙে যাওয়ার পর জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার জার্মান-ভাষী অধিবাসীরা শেষপর্যন্ত এক অভিন্ন রাজনৈতিক এককে পরিণত হতে বাধ্য। ভার্সাই চুক্তিতে মিত্রশক্তিবর্গ চূড়ান্ত প্রতিহিংসা পরবশ হয়ে পুরনো অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্য খণ্ড-খণ্ড করে ফেলল, একবার ভেবে দেখল না অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরির মতো ছোট-ছোট রাষ্ট্রের পক্ষে স্বাধীন রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে অস্তিত্ব বজার রাখা অসম্ভব। এতদিন পরে এখন মিত্র রাষ্ট্র সমূহের চিন্তাশীল পুরুষ ও নারীরা বুঝতে আরম্ভ করছেন যে অস্ট্রিয়া এখন টিকে থাকতে পারে কেবল মাত্র জার্মানির অংশ হিসাবে কিংবা অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের মতো কোনও রাজনৈতিক এককের অংশ হিসাবে। বছরখানেক আগে একজন আমেরিকান সাংবাদিকের সঙ্গে আমি অস্ট্রিয়ার রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করছিলাম। আমি তখন মন্তব্য করেছিলাম যে মিত্রশক্তিবর্গ যদি প্রকৃতই অস্ট্রিয়াকে জার্মানি থেকে আলাদা রাখতে চায়, রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে তাদের উচিত অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরিতে হ্যাপসবার্গ রাজবংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকে উৎসাহিত করা। আমার স্পষ্ট মনে আছে, তখন সেই আমেরিকান সাংবাদিক এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন, যেন আমি রাজনীতিতে এক অবোধ শিশু, এতই অদ্ভুত লেগেছিল তাঁর কাছে আমার মন্তব্য। কিন্তু আজ আমি দেখছি বিভিন্ন দেশে লোকে অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় রাজতন্ত্রের পুনরুদ্ধারের কথা খোলাখুলি আলোচনা করছে, এবং যখন ইউরোপের খবরের কাগজে পড়ছি হাঙ্গেরি এবং অস্ট্রিয়ার রাজতন্ত্রের সমর্থকেরা সম্প্রতি তাঁদের সমস্যাবলীর আলোচনায় জন্য ভিয়েনায় মিলিত হয়েছেন, এই ভেবে আমি সন্তোষলাভ করছি যে এক বছর আগেকার আমার অনুমান পুরোপুরি ভ্রান্ত ছিল না। আমাদের নিজেদের রাজনৈতিক পছন্দ-অপছন্দ যাই হোক, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না, সে মিত্রশক্তিবর্গ যদি প্রকৃতই মধ্য ইউরোপের জার্মানভাষীদের বিভক্ত করতে চাইত, হ্যাপসবার্গ রাজবংশের প্রতি বিরূপ মনোভাব তাদের ত্যাগ করা উচিত ছিল, এবং চেক, স্লোভাক ও অন্যান্য স্লাভ জাতিগুলোর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে নিয়ে, তাদের উচিত ছিল অস্ট্রো-হাঙ্গেরিকে যেমনকার তেমনি রেখে দেওয়া। ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে আমার অন্তত মনে হয় শেষ পর্যন্ত অস্ট্রিয়াকে জার্মান রাইখ-এ যোগ দিতে হবে, কিংবা একটি রাজনৈতিক এককে হাঙ্গেরির সঙ্গে যোগ দিতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতি হচ্ছে অস্থিতিশীল ভারসাম্যশূন্য এবং তা বজায় থাকতে পারে না। তলিয়ে না দেখলে মনে হতে পারে, আমি এখন যা বললাম তার বিপরীতটাই সত্য। সমগ্র অস্ট্রিয়ায় শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়েছে। অস্ট্রিয়ার নাৎসিদের চাল বিফল করে দেওয়া হয়েছে এবং অস্ট্রিয়ার সমাজবাদীদের পুরোপুরি দমিয়ে দেওয়া হয়েছে। গ্রেট-ব্রিটেন ফ্রান্স ও ইতালি প্রকাশ্য সরকারি ঘোষণায় অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দিয়েছে, এবং এই পদক্ষেপের সঠিক ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে, এতে ওই তিন রাষ্ট্রের অস্ট্রিয়াকে জার্মানি থেকে দূরে রাখবার সংকল্প প্রকাশ পেয়েছে। এবং এ বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই, যে ওই তিন শক্তি ঋণ ইত্যাদি দ্বারা অস্ট্রিয়াকে বর্তমান অর্থনৈতিক দুরবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করতে চায়। কিন্তু তাতেই কি অস্ট্রিয়ার জনগণ সন্তুষ্ট হবে, তাতেই কি তারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হবে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমাদের অস্ট্রিয়ার ইতিহাসের মধ্যে আরেকটু গভীরভাবে প্রবেশ করতে হবে।

অস্ট্রিয়ার বর্তমান সরকার প্রধানত তিনটি দলের সমবায়ে গঠিত (১) ক্রিশ্চিয়ান সোস্যাল, (২) হ্বেইম্হর এবং (৩) অ্যাগ্রেরিয়ান। এই মুহূর্তে হ্বেইম্হর দলেরই শক্তি সবচাইতে বেশি এবং রাশিয়া, ইতালি ও জার্মানির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তারা চেষ্টা করছে যাতে অস্ট্রিয়ার অন্য সব রাজনৈতিক দল বলপূর্বক ভেঙে দেওয়া হয়। সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে দেখা যাচ্ছে হের ডলফাস, যিনি এখন অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী এবং ক্রিশ্চিয়ান সোস্যালদের নেতা, তার দল ভেঙে দিতে রাজি হয়েছেন। আর সব রাজনৈতিক দলকে দমন করার যে চেষ্টা হ্বেইম্হর পার্টি করছে। তা যদি

সফল হয়, তা হলে অস্ট্রিয়ার রাজনীতি কোন দিকে যাবে সেটা কতকাংশে নির্ভর করবে সে-দলের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ওপর।

হ্বেইম্হর হচ্ছে ফ্যাসিস্টদের অস্ট্রীয় সংস্করণ, এবং তাদের অনুপ্রেরণার উৎস হচ্ছে ইতালি। অস্ট্রিয়ার নাৎসিরা তাদের জার্মান কমরেডদের মতো বাদামি রঙের পোশাক পরে, আর হ্বেইম্হর-এর ইউনিফর্ম হল সবুজ আর সাদা। তাদের পতাকার রঙও তাই। তাদের ধ্যান-ধারণা, তাদের কাজের পদ্ধতি অনেকটা নাৎসিদের মতো। তারা দুটি দলই সংসদীয় গণতন্ত্রের বিরোধী এবং একনায়কতন্ত্রে বিশ্বাস করে। বাইরের লোকের চোখে এটা অদ্ভুত মনে হতে পারে যে এই দুটি দল, যাদের মধ্যে এত মিল, তারা পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করছে। কিন্তু আসল ব্যাপার হল, হ্বেইম্হর-এর মধ্যে আগেও ছিল এখনও আছে এক প্রভাবশালী অংশ যাঁরা চান নাৎসিদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে অথবা সহযোগিতা করতে, এবং এটাও চাপা থাকেনি যে সে উদ্দেশ্যে কথাবার্তা চালানো হচ্ছিল অল্পদিন আগে পর্যন্ত।

হ্বেইম্হর-এর মতো অস্ট্রীয়ার একটি ফ্যাসিস্ট দল কী করে এত দ্রুত বেড়ে উঠল তার তিনটি কারণ পাওয়া যায় ঃ (১) সমাজবাদবিরোধী মনোভাব (২) জাতীয়তাবাদী আবেগ (৩) আন্তর্জাতিক সমর্থন। গত মহাযুদ্ধের অবসানে, যখন জার্মান গভর্নমেন্ট Social Democrat-দের হাতে চলে গেল, অস্ট্রিয়াতে যদিও সেখানে Federal Government দখল করলেন Christian Socialist, ভিয়েনা মিউনিসিপ্যালিটির এবং ভিয়েনা প্রদেশের দখল নিলেন সমাজবাদীরা। অস্ট্রিয়ার সমাজবাদীরা চিরকাল ইউরোপের সর্বাপেক্ষা বিপ্লবপন্থী সমাজবাদী বলে খ্যাত। সেই কারণে অস্ট্রীয়ার যাঁরা রক্ষণশীল তাঁরা কখনই চাননি যে ও-রকম একটি চরমপন্থী দল অস্ট্রিয়ার রাজনৈতিক জীবনের অত গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান নিয়ন্ত্রণ করবে। যুদ্ধোত্তর অস্ট্রিয়ায় পরিস্থিতি বরাবরই ছিল অস্থিতিশীল। পঁয়ষট্টি লক্ষ জনসংখ্যা বিশিষ্ট দেশটিতে সমাজবাদ বিরোধী ক্রিশ্চিয়ান সোস্যালিস্টরা Federal Government দখল করে রেখেছেন, কিন্তু রাজধানী শহরের এবং প্রধান-প্রধান প্রদেশের প্রশাসন ক্ষমতা থেকে কখনওই তাঁরা উগ্রপন্থী অস্ট্রীয় সমাজবাদীদের হঠাতে পারেননি। তেমনি আবার সমাজবাদীরা তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি আর-বেশি প্রসারিত করে দেশের Federal Government দখল করতে পারলেন না। তার কারণ শহরগুলিতে যা হল গ্রামাঞ্চলে তা হল না, সেখানে সমাজবাদীদের প্রভাব তাদের অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলি থেকে কম। এই পরিস্থিতিতে মনে হয়েছিল দুটির মধ্যে একটি রাজনৈতিক দলের পতন হবে। নিজেদের ভিত্তি আরও দৃঢ় করবার জন্য সমাজবাদীরা একটি বেসরকারি বাহিনী Schutzbund, গড়ে তুললেন। ক্রিশ্চিয়ান সোস্যাল-এর মতো একটি নিছক রাজনৈতিক দল সমাজবাদীদের সঙ্গে শেষ লড়াইয়ে যে জিততে পারবে, তার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। সেইজন্য তাদের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য হ্বেইম্হর-এর মতো একটি উগ্রপন্থী দল গড়তে হল। এই দলটি প্রথম থেকেই সমাজবাদ-বিরোধী এবং সেই কারণে ক্রিশ্চিয়ান সোস্যাল এবং হ্বেইম্হর-এর মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হতে দেরি হল না।

আরও কয়েকটি ছোটখাটো কারণ ছিল হ্বেইম্হর এবং ক্রিশ্চিয়ান সোস্যাল-এর সমাজবাদীদের প্রতি তীব্র বিরোধিতার। অস্ট্রীয় সমাজবাদীরা মোটের ওপর ধর্ম-বিশ্বাস বিরোধী, কিংবা অন্তত ক্যাথালিক চার্চ-এর আধিপত্যের বিরোধী ছিলেন, এবং জার্মানিতে যতদিন সমাজবাদী দলের শাসন চলছিল, তাঁরা Anschluss, অর্থাৎ জার্মানির সঙ্গে একীকরণ চাইছিলেন। সমাজবাদীদের ধর্ম বিশ্বাস বিরোধী মনোভাব ক্রিশ্চিয়ান সোস্যাল অর্থাৎ ক্যাথলিক দলকে কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিপুল জনসমর্থন লাভে সাহায্য করল। সারা পৃথিবীতে কৃষিজীবীরা রক্ষণশীল মনোভাবের জন্যে সুবিদিত। তা ছাড়া সমাজবাদী দলের উদ্যোগে শেষ পর্যন্ত জার্মানির অঙ্গীভূত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা, অস্ট্রিয়ার অভিজাত সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভের

একটা সুযোগ হ্বেইম্হর-কে করে দিল। মনে রাখতে হবে, সাম্রাজ্য হিসাবে অস্ট্রিয়া জার্মানির চেয়ে অনেক প্রাচীন এবং পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের গরিমা অস্ট্রিয়ার ওপরেই বর্তেছে। যতদিন জার্মানি থেকে অস্ট্রিয়া আলাদা থাকবে, অস্ট্রিয়ার অভিজাত শ্রেণির দেশে কিছু মান-মর্যাদা থাকবে। কিন্তু অস্ট্রিয়া যদি জার্মান রাইখ-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, তাদের কোনও দাঁড়াবার জায়গাই থাকবে না। তাই Prince Starhemberg-এর মতো একজন খ্যাতিমান ও ধনবান অভিজাত হ্বেইম্হর (আক্ষরিক অর্থে গৃহরক্ষাকারী)-এর নেতৃত্ব গ্রহণের জন্যে এগিয়ে এলেন, উদ্দেশ্য অস্ট্রিয়া রাষ্ট্রের অখণ্ডতা ও প্রাচীন অভিজাত পরিবারগুলির ক্ষমতা ও প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখা।

দলটিকে জোরদার করার জন্য ইতিহাসের সাহায্য নেওয়া হল। ১৯৩৩-এর জুন মাসে, আমি যখন ভিয়েনায়, অস্ট্রিয়ার গভর্ণমেন্ট তুর্কিদের বিরুদ্ধে জয়লাভের ২৫০ বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন করছিল। ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে তুর্কিরা, পূর্ব ইউরোপ জয় করার পরে ভিয়েনা অবরোধ করেছিল, এবং তারা শেষ পর্যন্ত পরাজিত হল যাঁদের কৃতিত্বে তাঁদের একজন ছিলেন Starhemberg, হ্বেইম্হর-এর বর্তমান নেতা Prince Starhemberg-এর পূর্বপুরুষ। জুন মাসের উৎসবে স্বভাবতই সমগ্র দেশের সমর্থন ছিল। কিন্তু এমন ভাবে উৎসবটি পরিচালনা করা হল, যে তার একটি ফল হল Prince Starhemberg-এর এবং সেই কারণে তাঁর দলেরও খ্যাতি বৃদ্ধি। উৎসবের অঙ্গ হিসাবে ৪০,০০০ হ্বেইম্হর. স্বেচ্ছাসেবক সবুজ-সাদা ইউনিফর্ম পরে শহরের বাইরে থেকে ভিয়েনাতে এল, এবং ভিয়েনার রাস্তা দিয়ে রুট মার্চ করল। সারা পথ জুড়ে আমি শুনলাম হ্বেইম্হর-এর সমর্থকেরা চিৎকার করছিল, "Heil Starhemberg", এবং তার জবাবে নাৎসিরা চিৎকার করছিল, "Heil Hitler." এবং পুলিশ সেজন্য তাদের তাড়া করছিল। উৎসব সাঙ্গ হলে আমি একজন হ্বেইম্হর নেতাকে তাঁর স্বেচ্ছাসেবকদের শৃঙ্খলাপরায়ণতার জন্য অভিনন্দন জানালাম, কিন্তু উৎসব নিয়ে তাঁর আদৌ কোনও উৎসাহ দেখলাম না। তিনি অনুযোগ করলেন যে ভিয়েনার অধিবাসীরা সকলেই হ্বেইম্হর-এর সমর্থক নয়, এবং শ্রমজীবী অঞ্চলে তাঁদের দিকে পচা ডিম ছুড়ে মারা হয়েছে। এই ঘটনা গত বছর জুন মাসের। কিন্তু তার আট মাসের মধ্যে জনসাধারণের কাছে তাদের অবস্থানের এতই তারা উন্নতি করেছে, যে তারা এখন তাদের শত্রু অস্ট্রিয়ার নাৎসি ও সমাজবাদীদের ওপর সরাসরি আক্রমণ করতে সক্ষম। তাদের শত্রুদের হীনবল করবার জন্য একের পর এক তারা যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, লক্ষ করে গেলে রাজনৈতিক কলাকৌশল সম্পর্কে কৌতূহলোদ্দীপক জ্ঞান সঞ্চয় করা যায়।

বিগত মহাযুদ্ধের পরে মনে হয়েছিল ইউরোপে জাতীয়তাবাদের যুগের অবসান হল, এবং সামাজিক পুনর্গঠনের যুগের শুরু হল পুরোদমে। এখন কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, জাতীয়তাবাদের যুগের অবসান হয়নি। যতদিন না আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি একভাবে সমগ্র ইউরোপে প্রযুক্ত হচ্ছে জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম বন্ধ হতে পারে না। ভার্সাইয়ের চুক্তি চেক, পোল, এবং তৎকালে অস্ট্রিয়ার শাসনাধীন ইতালীয়ান-ভাষীদের প্রতি সুবিচার করলেও, জার্মান এবং হাঙ্গেরীয়, যারা অন্যান্য জাতির শাসনাধীনে ছিল, তাদের প্রতি যথেষ্ট অবিচার করেছিল। ভার্সাই চুক্তির সময় এই অবিচার যে সম্ভব হয়েছিল তার কারণ, চুক্তির সম্পাদনের আগে শান্তি-সম্মেলনে বিজয়ীদের মনে ছিল তীব্র প্রতিহিংসাপরায়ণতা। এই অন্যায়ের প্রতিবিধান না হওয়া পর্যন্ত ইউরোপে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের যুগ শেষ হতে পারে না, যুদ্ধের সম্ভাবনাও দূর হতে পারে না।

অস্ট্রিয়াতে জমি হ্বেইম্হর-এর বেড়ে ওঠার পক্ষে অনুকূল হলেও এবং যদিও হ্বেইম্হর প্রথম থেকেই জাতীয়তাবাদী আবেগ এবং ঐতিহ্যের মধ্যে গভীরভাবে নিজেদের ভিত্তি স্থাপন করেছিল, তবুও, খুব বেশি অগ্রগতি তারা করতে পারত না অস্ট্রিয়ার আরেকটি রাজনৈতিক

দলের সহায়তা ছাড়া, এবং বাইরে থেকে আন্তর্জাতিক সমর্থন না পেলে। এই বিষয়েই মহামূল্যবান হয়ে উঠল হের ডলফাস-এর মতো একজন সুযোগ্য রাজনৈতিক নেতার সহায়তা। তাঁর নেতৃত্বে গঠিত হল ফেডারেল গভর্নমেন্ট ক্রিশ্চিয়ান সোস্যাল, হ্বেইম্হর, অ্যাগ্রেরিয়ান দলের সমর্থনে সমাজবাদী এবং নাৎসি দলের বিরুদ্ধে। উগ্রপন্থী হ্বেইম্হর না থাকলে উগ্রপন্থী নাৎসি অথবা উগ্রপন্থী সমাজবাদী দলের সঙ্গে হের ডলফাস পেরে উঠতেন না। শেষোক্তদের ছিল শৃঙ্খলাবদ্ধ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, Schutzbund কাজেই হের ডলফাস স্বভাবতই উগ্রপন্থী হ্বেইম্হর-এর সঙ্গে মৈত্রী সাগ্রহে মেনে নিলেন। এতে হ্বেইম্হর-এর তাতে লাভ হল আরও বেশি। হের ডলফাস-এর মাধ্যমে তারা পেল ক্রিশ্চিয়ান সোস্যাল-এর মতো প্রভাবশালী দলের সমর্থন এবং সেই দলের মাধ্যমে সমগ্র ক্যাথলিক চার্চের সমর্থন। আবার হের ডলফাস তাদের সঙ্গে থাকায় তারা সমর্থন লাভ করল, অস্ট্রিয়ার নাৎসিদের, যারা জার্মানির নৈতিক সমর্থন পাচ্ছিল, তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে, মিত্রশক্তি সমূহের সমর্থন। সব শেষে (গুরুত্বপূর্ণভাবে বলা চলে) হের ডলফাস-এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং বিচক্ষণতা তাদের খুব কাজে লাগল। তাঁর সাবধানতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ না থাকলে যতদূর সম্ভব তারা অতিরিক্ত ব্যস্ততার দ্বারা নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনত।

১৯৩৩ সালে মনে হচ্ছিল হের ডলফাস এবং ক্রিশ্চিয়ান সোস্যাল-রা সমাজবাদী এবং অস্ট্রীয় নাৎসিদের বিরুদ্ধে তাদের দ্বিমুখী সংঘর্ষে হের ডলফাস-কে কাজে লাগাচ্ছিলেন। এবং এ বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই, যে অস্ট্রিয়া সরকার যে আন্তর্জাতিক সমর্থন পাচ্ছিল তার অনেকটাই এই কারণে আসছিল যে বিদেশে একটা ধারণা জন্মেছিল, তারা প্রধানত অস্ট্রিয়ার নাৎসিদের দমন করতেই চেষ্টা করছিল। সেই আন্তর্জাতিক সমর্থন তারা পেত না যদি তখন বোঝা যেত অস্ট্রিয়ার সরকার অবিলম্বে অস্ট্রিয়ার সমাজবাদী দলকে অত নৃশংস আঘাত করবে। গ্রেট ব্রিটেনে এবং ফ্রান্সে অস্ট্রিয়ার সমাজবাদীদের বন্ধু ছিল, এবং যেহেতু সমাজবাদীরা Anschluss, অর্থাৎ জার্মানির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাওয়ার প্রস্তাব, জার্মানিতে নাৎসি বা ক্ষমতা অধিকার করার দরুন, বাতিল করে দিয়েছিল, হের ডলফাস অস্ট্রিয়ার সমাজবাদীদের ওপর আক্রমণ করবেন জানলে তাঁরা তাঁকে সমর্থন করতে অত যে আগ্রহী হবেন, তার কোনও কারণ ছিল না। সেই কারণে অস্ট্রিয়ার সরকারের পক্ষে আগে নাৎসিদের আক্রমণ করাই কৌশলের দিক থেকে বুদ্ধিমানের কাজ ছিল। সে কাজে তারা আন্তর্জাতিক সমর্থন পুরোপুরি পাবে জানত। তারপর একবার বিশ্বজনমত যখন তারা নিজেদের দিকে আনতে পারবে, অস্ট্রিয়ার নাৎসিদের পর্যুদস্ত করা হয়ে যাবে, তখন তাঁরা অস্ট্রিয়ায় নির্ভয়ে সমাজবাদীদের জব্দ করতে অগ্রসর হতে পারবে। প্রথমেই সমাজবাদীদের কাবু করবার চেষ্টা করলে তাদের বিপদে পড়তে হত। সমাজবাদীদের পতন ঘটানোর পর মনে হচ্ছে হ্বেইম্হর-ই হের ডলফাস-কে নিজেদের কাজে ব্যবহার করবে, হের ডলফাস-ই তাদেরকে নিজের কাজে ততটা লাগাতে পারবেন না।

১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে প্রথম যখন আমি ভিয়েনায় আসি, ফেডারেল পার্লামেন্ট-এর নিম্নতর কক্ষে সরকারের ন্যূনতম সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। কোনও সরকারের পক্ষে সে-রকম অবস্থা আদৌ নিরাপদ নয় এবং বেশিদিন চলতেও পারত না, তাই, স্পিকার-এর পদত্যাগের সুযোগ নিয়ে ১৯৩৩-এর মার্চ মাসের এক সকালে গভর্নমেন্ট হঠাৎ পার্লামেন্টকে নিলম্বিত করে দিয়ে ডিক্রি জারি করে দেশ শাসন করতে আরম্ভ করল। সেই থেকে সে-দেশের সংসদ জীবন্মৃত অবস্থায় রয়েছে। ১৯৩৩-এর মার্চ মাসে জার্মানিতে নাৎসিরা ক্ষমতায় আসায় জার্মানির ওপর সকলের নজর পড়েছে। সেই কারণে, তাদের নিজেদের দেশে যে কী হচ্ছে অস্ট্রিয়ার সমাজবাদীরা সেটা খেয়াল করেননি। তা ছাড়া, সংসদে যেহেতু সমাজবাদীরাও ছিলেন, অস্ট্রিয়ার নাৎসিরাও ছিলেন, সমাজবাদীরা অনেকে বোকার মতো মনে করলেন সরকার নাৎসিদেরই

শায়েস্তা করতে চায়, তাঁদের নয়। সংসদ নিলম্বিত হওয়ার পরে সরকার নাৎসিদের ওপরেই বেশি করে আক্রমণ চালাল, সমাজবাদীদের ওপরে সে তুলনায় কম। তাতেই সমাজবাদীরা এই ভেবে স্বস্তি বোধ করল, যে তাদের কোনও বিপদ নেই।

এইসব যখন চলছিল, কোনও-কোনও সমাজবাদীর মধ্যে, হের ডলফাস যে-সব সংসদ-বহির্ভূত কার্যকলাপ চালাচ্ছিলেন নাৎসিদের বিরুদ্ধে, তার জন্য তাঁর প্রতি যেন একটা প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি দেখা গেল। তখনকার দিনে সাধারণ সমাজবাদীদের সঙ্গে অস্ট্রিয়ার রাজনীতি নিয়ে আলোচনার সময়ে একটা পরিষ্কার ধারণা জন্মানো যেত যে তাঁদের সামনে যে আসন্ন বিপদ, তার গুরুত্ব তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেননি। সেই সময়ে আমার মতো একজন নিরপেক্ষ বাইরের লোকের মনে হতে পারত, অদূর ভবিষ্যতে অস্ট্রিয়ার সরকার ঘুরে দাঁড়িয়ে সমাজবাদীদের ওপর আক্রমণ হানবে। হের ডলফাস-এর এই একটি কারণে সাধুবাদ অবশ্যই প্রাপ্য যে একাধিকবার তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, যে গভর্নমেন্ট দুটি ফ্রন্টে লড়াই চালাচ্ছে, নাৎসিদের সঙ্গে ও সমাজবাদীদের সঙ্গে।

১৯৩৩-এর মার্চে, গভর্নমেন্ট যখন সংসদকে নিলম্বিত করে দিল, স্পিকার, যিনি বিরোধী পক্ষের সদস্য ছিলেন, গভর্নমেন্ট অমান্য করে সংসদের অধিবেশন ডাকলেন। লোকের মনে তখন প্রচুর উত্তেজনা, প্রবল কৌতূহল, 'গভর্নমেন্ট কী করবে?' গভর্নমেন্ট পুলিশকে আদেশ দিল, সংসদ বসতে যেন না দেয়। কিন্তু পুলিশ এসে পৌঁছবার আগেই জনপ্রতিনিধিরা সংসদভবনে ঢুকে পড়তে পারলেন এবং নির্দিষ্ট সময়ে অধিবেশন আরম্ভ হল। মন্ত্রী এবং তাঁদের সমর্থকেরা অবশ্য উপস্থিত ছিলেন না, তা হলেও বিরোধী পক্ষের সদস্যদের কাজকর্মের যে কোনও মূল্য ছিল না তা নয়। সংসদের আক্ষেপ একটা কারণেই হতে পারত, যে সরকারকে অমান্য করার এই প্রথম পদক্ষেপটির পরে সে-কাজ তারা আর চালিয়ে যেতে পারলেন না। তার জন্য সম্পূর্ণ দায়িত্ব সমাজবাদী দলের। গভর্নমেন্ট যখন দেখল সংসদের নিলম্বন বিরোধীপক্ষীয়রা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছেন, জনসাধারণের স্বাধীনতার উপর নতুন করে আঘাত হানবার জন্য তারা প্রস্তুত হতে আরম্ভ করল। পয়লা মে-র আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসের উদ্‌যাপন নিষিদ্ধ হল। এ-রকম আদেশ এমনকী হ্যাপসবার্গ সম্রাটদের আমলেও জারি করা হয়নি। শহরের মধ্যে সমাজবাদীরা যাতে মিছিল ইত্যাদি না করতে পারে সে জন্য পুলিশ ও মিলিটারি নামানো হল। তবে তাঁদেরকে মিউনিসিপ্যাল স্টেডিয়ামে একটি জনসভা ও ক্রীড়ার অনুষ্ঠান করতে দেওয়া হয়েছিল। সেই জনসভায় আমার উপস্থিত থাকবার সুযোগ হয়েছিল এবং যা দেখলাম আমার খুবই মনে লেগেছিল। অন্তত ষাট হাজার লোক সমবেত হয়েছিল। পাঁচশো কিশোরী ও তরুণী এবং বয়ঃপ্রাপ্ত নারী ড্রিল করেছিলেন। সে-রকম ড্রিল ইত্যাদি ছেলেরা এবং বয়স্ক পুরুষেরাও করেছিলেন। যুব-সম্প্রদায় সেখানে উপস্থিত ছিল প্রচুর সংখ্যায়, এবং তাতে বোঝা গিয়েছিল তরুণ বয়স্কদের মধ্যে সমাজবাদীদের প্রভাব যথেষ্ট। দলের নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করলেন যথেষ্ট আবেগ ও উদ্দীপনা সহকারে, কিন্তু আমার মনে হল তাঁদের বয়স আরেকটু কম হলে ভাল হত। আমার মনে আছে, তরুণ-বয়স্ক সমাজবাদী বন্ধুদের বলেছিলাম, দলের মধ্যে তরুণতর নেতাদের উঠে আসা উচিত। তুলনায় নাৎসি নেতৃবৃন্দের বয়স কম ছিল, প্রাণ-প্রাচুর্য তাদের বেশি ছিল। পয়লা মে নাৎসিদেরও বদ্ধ জায়গায় সভা হয়েছিল, যদিও শহরে মিছিল ইত্যাদি তাদের করতে দেওয়া হয়নি। তাদের সভায় জনসমাবেশও সমাজবাদীদের তুলনায় সামান্য ছিল, কিন্তু উৎসাহ উদ্দীপনা এবং প্রাণ-প্রাচুর্য তাদের বেশি ছিল।

পয়লা মে-র পর গভর্নমেন্ট আর সমাজবাদী দলের ওপর সরাসরি আঘাত করেনি। নাৎসিদের দিকেই তারা মনোযোগ দিয়েছিল। তার দ্বারা সরকার সমাজবাদীদের মনে একটা

নিরাপত্তার ভাব এনে দিল এবং তাদের নাৎসি-বিরোধী নীতির সপক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থনও লাভ করল। এ কথা ঠিক, মে-দিবসের ঘটনার অল্পদিন পরেই সরকার socialist schutzbund (স্বেচ্ছাসেবক) বাহিনীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল, কিন্তু তাতে সমাজবাদী দলের মধ্যে কোনও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল বলে মনে হয়নি। তাঁরা ভেবেছিলেন, গোপনে তাঁরা কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারবেন, এবং তাঁরা খানিকটা সান্ত্বনা পেয়েছিলেন এটা দেখে যে সরকার নাৎসি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। প্রধান সমাজবাদী মুখপত্র Arbeiter Zeitung বন্ধ করে দেওয়া হয়নি, কিন্তু সেনসর-এর অধীন আনা হয়; অপরপক্ষে একটির পর একটি নাৎসি পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হতে থাকে। সেই সঙ্গে প্রকাশ্যে নাৎসিদের কোনও ইউনিফর্ম-পরা নিষেধ করে একটি আদেশ জারি করা হয়, এবং নাৎসিদের ওপর এই আক্রমণের চূড়ান্ত পর্যায়ে সারা দেশে তাদের সব সদর কার্যালয় জোর করে দখল করা হয়। এই আক্রমণ যখন অস্ট্রিয়ায় নাৎসিদের ওপর চলছিল নাৎসিরা হাত গুটিয়ে বসে থাকেননি, মাথা পেতে মেনেও নেননি। গভর্নমেন্টের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যান। সমাজবাদীরা এই সময়ে, তাঁদের কাজ-কর্মের ওপর বাধা-নিষেধ এবং গভর্নমেন্ট কর্তৃক সমাজবাদী দল পরিচালিত মিউনিসিপ্যালিটির তহবিল বাজেয়াপ্ত করা সম্পর্কে গজগজ করে গেলেন কিন্তু কোনও প্রতিরোধ কিংবা বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করলেন না। তাঁরা যদি তখনকার গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে নাৎসিদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে প্রতিরোধ করতেন কী হত বলা কঠিন। দুর্ভাগ্যক্রমে নাৎসিরা তাঁদের চোখে এত বড় আসন্ন বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছিলেন, যে গভর্নমেন্টের দিক থেকে যে বিপদটা আসছিল সেটা কত বড় তাঁরা বুঝতে পারেননি। কোনও-কোনও সমাজবাদী বন্ধুকে আমি মাঝে-মাঝে বলতাম, সম্ভবত অস্ট্রিয়ার নাৎসিদের প্রতি গভর্নমেন্ট যা করছে, তার সঙ্গে জার্মানির নাৎসিদের প্রতি Von Papen সরকার যা করেছেন, তার কোনও তফাৎ নেই। তাঁরা সে-কথার কোনও জবাব দেননি। নাৎসিদের ওপর গভর্নমেন্টের আক্রমণের সময়ে সমাজবাদীরা যেমন চুপ করেছিলেন, এ বছর সমাজবাদীদের ওপর গভর্নমেন্টের আক্রমণের সময়ে তেমনি নাৎসিরাও চুপ করে থাকলেন। একমাত্র ভবিষ্যতই বলতে পারবে, রাজনৈতিক রণকৌশলের দিক থেকে অস্ট্রিয়ার নাৎসিরা যা করেছেন, ঠিক করেছেন কিনা। গত বৎসর সমাজবাদীরা বৃথা আশা করেছিলেন, যে গভর্নমেন্ট নাৎসিদের নির্মমভাবে দমন করলেও তাঁদেরকে টিকে থাকতে দেবে। তা সত্ত্বেও এমন কোনও-কোনও নাৎসি আছেন যাঁরা এ বছর অস্ট্রিয়াতে সমাজবাদী দমনে বিন্দুমাত্র বিচলিত নন, বরং মনে করেন এর ফলে তাঁদের নিজেদের কাজ গভর্নমেন্ট সহজ করে দিল।

গত বছর আমি ভেবেছিলাম দুটি প্রতিপক্ষের সঙ্গে এক যোগে লড়াই চালিয়ে গিয়ে অস্ট্রীয় সরকার রাজনৈতিক রণকৌশল-নীতির বিরুদ্ধাচরণ করছে এবং যদি কৃতকার্য হতে হয়, দুই পরস্পরবিরোধী দলের একটির সঙ্গে তাদের বোঝাপড়া করতে হবে। স্বীকার করতেই হয়, ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে আমি কখনওই ভাবিনি তারা অর্থাৎ গভর্নমেন্ট দুই প্রতিপক্ষকেই ধরাশায়ী করতে সক্ষম হবে। এর জন্য বাহবা দিতে হয় প্রধানত হের ডলফাস-এর রাজনৈতিক কুশলতাকে। গত বারো মাস তিনি সর্বদাই ঠিক সময় এসে তবে ঠিক কাজটি করেছেন। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় তাঁর কোনও দুর্বলতা কখনও দেখা যায়নি। অকারণ অধীনতার বশে কোনও কাজে অতিরিক্ত ব্যস্ততাও কখনও তিনি দেখাননি। এখন আমার বলা দরকার তাঁর দুই প্রতিপক্ষকে গত বছর পর্যুদস্ত করার প্রস্তুতি হিসাবে তিনি যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তার কথা। প্রথম পদক্ষেপ, হ্বেইম্হর-এর হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া ও সরকারি পুলিশের মধ্যে তাকে ঢুকিয়ে নেওয়া; দ্বিতীয় পদক্ষেপ, গত বছর ভিয়েনাতে ক্যাথলিক সম্মেলন।

গত বছর ভিয়েনাতে অনেকেই বলছিলেন, সরকারের যখন, সৈন্য ও পুলিশ মিলিয়ে ত্রিশ হাজারের সশস্ত্র বাহিনী, সমাজবাদী ও হ্বেইম্হর—উভয়েরই তখন প্রায় সমসংখ্যক সশস্ত্র লোকের বাহিনী হাতে আছে। কাজেই সরকারের সমস্যা হয়েছিল, তার হাতে যে সশস্ত্র বাহিনী, গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে তার আকার কী করে বাড়ানো যায়। যেমন গৃহযুদ্ধ হয়েছিল এই বছর ফেব্রুয়ারি মাসে। সরকার সে-সমস্যার সমাধান করল প্রচুর সংখ্যক হ্বেইম্হর-কে নিজের হাতে তুলে নিয়ে ও তাদেরকে পুরোদস্তুর সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে। এ-বছর Socialist Schutzbund-এর সঙ্গে সংঘর্ষে হ্বেইম্হর স্বেচ্ছাসেবকদের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়েছিল, তাতেই বোঝা গেল, তাদের সহায়তা ছাড়া সরকার কত অসহায় হয়ে পড়ত, এই অতিরিক্ত বাহিনীর প্রয়োজন আরও বেশি করে হয়েছিল তাদের নাৎসিদের প্রতি অনুকূল মনোভাবের জন্য। (এ কথা এখন আর কারও অজানা নেই যে অস্ট্রিয়ার পুলিশ ও মিলিটারির মধ্যে নাৎসি-পক্ষপাতী প্রচার খুব জোর চলছিল।)

গত বছর জুন মাসে হ্বেইম্হর এবং সরকার-সমর্থকেরা ভিয়েনাবাসীদের মধ্যে আগ্রহ ও উদ্দীপনার যে অভাব দেখেছিল, তার কথা আমি আগেই বলেছি। তাদেরকে স্বমতে আনবার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল তাদের এই কথা বোঝানো যে সরকারের পিছনে প্রচুর জনসমর্থন আছে, ১৯৩৩-এর জুনে হ্বেইম্হর প্রদর্শনী এই উদ্দেশ্য কিছুটা সাধিত করেছিল, কিন্তু তা যথেষ্ট ছিল না। সেই উদ্দেশ্যে গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে জার্মানভাষী এক ক্যাথলিক সম্মেলন ভিয়েনায় আহ্বান করা হয়েছিল। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল সে-সময়ে ভিয়েনায় থাকবার। অস্ট্রিয়ার বিভিন্ন স্থান থেকে এবং অন্যান্য জার্মানভাষী ক্যাথলিক দেশ থেকে লোক যাতে ভিয়েনায় আসতে পারে তার জন্য সরকার ব্যাপক ব্যবস্থা করেছিল। মহামান্য পোপকেও সে-উপলক্ষে তাঁর ধর্মপ্রচারক দূত পাঠাতে সম্মত করা হয়েছিল, অন্তত ২০০,০০০ লোক সে উপলক্ষে ভিয়েনায় এসেছিল। সেই সময় নাগাদ ভিয়েনাতে একটি মেলারও আয়োজন করা হয়েছিল, এবং ভিয়েনাতে আগন্তুকদের জন্য বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভিয়েনার মেলা এবং ক্যাথলিক সম্মেলনের জন্য যে বাড়তি ভিড়, তার ফলে, ভিয়েনার হোটেল ও বোর্ডিং হাউসগুলিতে এবং সাধারণভাবে ভিয়েনার ব্যবসায় এদের লাভের অঙ্ক বৃদ্ধি পেয়েছিল। আর্থিক টানাটানির সময়ে ভিয়েনাবাসীর পকেটে এই বাড়তি টাকা আসার ফলে তাঁদের অজ্ঞাতেই, তাদের সমর্থন সরকারের দিকে চলে গেল। উপরন্তু, সরকারি উদ্যোগের ফলে গ্রামাঞ্চল থেকে বিপুল জনতার ক্যাথলিক সম্মেলনের জন্য ভিয়েনায় আগমন সকলের মনে এ-রকম একটা ধারণার সৃষ্টি করল যে দেশে সরকারের বিপুল জনসমর্থন আছে, এবং সমগ্র ক্যাথলিক চার্চ, মহামান্য পোপ সমেত হের ডলফাস-এর সরকারকে সমর্থন করল। আমার মতো একজন বাইরের লোক, যে সেই বিশাল জনসমাবেশের ভিতরে ঢুকছিল আর বেরিয়ে আসছিল, তার কাছে লোকের ধর্মীয় আবেগের আন্তরিকতা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এটাও বোঝা যাচ্ছিল যে সরকার ক্যাথলিক সম্মেলন থেকে রাজনৈতিক মুনাফা তুলছে, যদিও ব্যবস্থা এমন সুচতুর ছিল, যে সাধারণ লোক সম্ভবত সেটা বুঝতে পারেনি। ক্যাথলিক সম্মেলনের মিছিল ইত্যাদির সঙ্গে মিলিটারি কুচকাওয়াজ ইত্যাদিও ছিল। সেপ্টেম্বরের সেই উৎসবাদির নিট ফল এই হয়েছিল যে লোকের মনে, বিশেষত ভিয়েনার অধিবাসীদের মনে, ধারণা হল সরকারের অবস্থা খুব মজবুত, কেননা ক্যাথলিক চার্চ, মিলিটারি এবং অস্ট্রিয়ার গ্রামাঞ্চলের মানুষ সবাই সরকারকে সমর্থন করে। হের ডলফাস-এর মর্যাদা এবং প্রতিষ্ঠা ফলে এমন বৃদ্ধি পেল যা আগে কখনও হয়নি।

এই সময়ে ভিয়েনার একটি ঘটনা আমার মনে পড়ে। Rathaus (টাউন হল, মেয়রের অফিস যেখানে অবস্থিত) তার কাছে একটি জমায়েতে একজন হ্বেইম্হর নেতা Rathaus-এর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, তাঁর আশা সে-দিনের বেশি দেরি নেই যে-দিন গভর্নমেন্ট

বলশেভিকদের (অর্থাৎ সমাজবাদীদের) ওই বাড়ি থেকে উৎখাত করবে, ভিয়েনা থেকে তাদের দলকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবে। কয়েক দিন আগে যখন খবরে দেখলাম, গভর্নমেন্ট এবং হ্বেইম্হর বাহিনী জবরদস্তি Rathaus দখল করে নিয়েছে এবং সমাজবাদী মেয়রকে বন্দি করেছে, মনে হল সেই হ্বেইম্হর নেতার ভবিষ্যদ্বাণী অভ্রান্ত ছিল।

সেপ্টেম্বরের উৎসবের পর সরকার মনে করল, বিরোধী দলগুলিকে দমন করবার কাজে এগোবার যথেষ্ট শক্তি তারা সঞ্চয় করেছে। প্রথম কয়েক মাস চলল নাৎসিদের দমন করা, এবং সে-কাজ যখন প্রায় সমাপ্ত, নতুন বছরের আগমনে গভর্নমেন্ট সমাজবাদীদের আক্রমণ করবার জন্য প্রস্তুত হল। সাম্প্রতিক ঘটনাবলি ঠিকভাবে দেখলে মনে হয়, সমাজবাদীদের লড়াই যে জিতবার লড়াই নয় সেটা পরিষ্কার। তাঁদের হাতেই ভিয়েনা মিউনিসিপ্যালিটি এবং ভিয়েনা প্রদেশ ঠিকই, কিন্তু অবস্থা তাঁদের কোনওদিনই তেমন মজবুত নয়। বিদেশেও তাঁদের আন্তর্জাতিক সমর্থন বিশেষ নেই, এবং জার্মানিতে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের শোচনীয় ব্যর্থতা অস্ট্রিয়ার মনোবলকেও জখম করে দিয়েছে। ক্যাথালিক চার্চ তাদের ঘোরতর বিরোধী এবং সম্প্রতিকালের ঘটনাবলি দেখিয়ে দিয়েছে, এখনও অস্ট্রিয়াতে ক্যাথলিক চার্চের প্রভাব কত শক্তিশালী। অস্ট্রিয়ার অভ্যন্তরে সমাজবাদীদেরকে দুই প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। একদিকে নাৎসি এবং সোস্যাল ডেমোক্র্যাট-রা আরেক-দিকে হ্বেইম্হর। এই অবস্থায় তাঁরা বেশি আর কী করতে পারতেন?

'ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান' যা বলেছে তা ঠিক, অস্ট্রিয়ার সমাজবাদীরা তাঁদের জার্মানির সহকর্মীদের মতো বিনাযুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করেননি। ইতিহাসের এ এক ট্র্যাজেডি, যে অস্ট্রিয়ার সমাজবাদীদের মতো একটি দল যাঁদের জনসেবা এবং সমাজসেবার ইতিহাস এত গৌরবোজ্জ্বল, এইভাবে তাঁদের পতন হল, তাঁরা পর্যুদস্ত হলেন। একটা সান্ত্বনা, তাঁরা ইতিহাস সৃষ্টি করতে পেরেছেন। মি. হ্যারল্ড ল্যাস্কি লন্ডনের 'ডেলি হেরাল্ড' পত্রিকায় যথার্থ বলেছেন, সমাজবাদী সংগ্রামের ইতিহাসে ভিয়েনার স্থান হবে প্যারিস কমিউন এবং ১৯০৫-এর রুশ বিপ্লবের পাশে। সে-সব স্বীকার করে নিয়েও, এ কথা মনে না হয়ে পারে না, যে সমাজবাদী নেতৃবৃন্দ যদি অধিকতর রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারতেন, ঘটনা অন্য দিকে মোড় নিতে পারত। বিভিন্ন সমাজবাদীমহল এখন যে-সব স্বীকারোক্তি করছেন তাতে মনে হয় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সমাজবাদী নেতারা গভর্নমেন্টের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সাধারণ সমাজবাদী কর্মীদের চরিত্র নিয়ে কোনও সমালোচনা করা চলে না, কারণ নেতাদের কথায় তাঁরা দেখিয়েছেন তাঁরা কী ধাতুতে গড়া। কিন্তু নেতারা যে-ভাবে দলকে এক অলীক নিরাপত্তার বোধে নিশ্চিন্ত করে রেখেছিলেন এবং শেষ সংগ্রামটি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ঠেকিয়ে রেখেছিলেন, তা কি উচিত হয়েছিল?

অস্ট্রিয়াতে সমাজবাদী দল বলে আর কিছু থাকল না। কিন্তু নাৎসিদের সম্পর্কে সে-কথা বলা যায় না, যতদিন জার্মানিতে ন্যাশনাল সোস্যালিজম শাসন করবে, অস্ট্রিয়াতে নাৎসিরা থাকবেন। বর্তমান সরকারের পতন ঘটাবার জন্য বর্তমান সরকারের পতন ঘটাবার জন্য অস্ট্রিয়ার ওপর জার্মানি যতদূর সম্ভব অর্থনৈতিক চাপ দিচ্ছে। বর্তমান সরকার কি অস্ট্রিয়ার মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারবে? এবং মিত্রশক্তিবর্গ, যারা অস্ট্রিয়াকে জার্মানি থেকে তফাতে রাখতে এত ব্যস্ত, তারা কি যথেষ্ট পরিমাণ অর্থনৈতিক সহায়তা বর্তমান অস্ট্রিয়া সরকারকে দেবে? দুটি প্রশ্নের উত্তরই যদি হয় "হ্যাঁ" তা হলে অবশ্যই বর্তমান সরকার দীর্ঘায়ু হবে, অন্যথায় অস্ট্রিয়ার মানুষের সামনে দুটি রাস্তা, জার্মানির সঙ্গে অথবা হাঙ্গেরির সঙ্গে সংযুক্তি।

ফেব্রুয়ারির ঘটনাবলি থেকে যে-সব সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় তার একটি হল, একটি ক্ষুদ্র

কিন্তু সুশৃঙ্খল সামরিক বাহিনী, যেমন অস্ট্রিয়ার গভর্নমেন্টের ছিল, কামান ইত্যাদির সহযোগে যে কোনও অস্ত্রসজ্জিত বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে শত্রুকে পরাস্ত করতে সক্ষম।

এখন অস্ট্রিয়াতে সব কিছু শান্ত, কিছু কাল তাই থাকবে। আমূল পরিবর্তন দ্রুতগতিতে চলছে। Rathaus-এর শীর্ষে হ্বেইম্হর-এর সবুজ-সাদা পতাকা সমাজবাদীদের বহিষ্কার ঘোষণা করছে। অস্ট্রিয়ার প্রজাতন্ত্রের তিন স্থাপয়িতা নেতার আবক্ষমূর্তি অপসৃত হয়েছে, তার জায়গায় বসেছে—হের ডলফাস, Prince Starhemberg এবং Major Fey (হ্বেইম্হর নেতা)-র মূর্তি। সমাজবাদী পুরসভা কর্মীদের জন্য যে প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করেছিল, এবং নাম দিয়েছিল Marxhof, তার নতুন নামকরণ হয়েছে Dolfusshof। নাৎসিদের শৃঙ্গযুক্ত ক্রস, অর্থাৎ স্বস্তিকার পরিবর্তে হের ডলফাস একটি নতুন ক্রস-এর নকশা করেছেন তার দলের প্রতীক হিসাবে। যতরকম কৌশল, পদ্ধতি ও পন্থা রাশিয়া, ইটালি এবং জার্মানির মতো দেশে প্রযুক্ত হয়েছে, অস্ট্রিয়াতেও তার ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু যে প্রধান সমস্যা, যার ওপরে অস্ট্রিয়ার রাজনীতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, সেটা হল অর্থনৈতিক সমস্যা। সে-সমস্যার সমাধান যতদিন না হচ্ছে, অস্ট্রিয়ায় শান্তি আসবে না।

অনেক জল্পনা-কল্পনা চলছে হের ডলফাস-এর ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে। তিনি কি নিজের স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারবেন, না হ্বেইম্হর-এর হাতে পুরোপুরি নিজেকে সমর্পণ করবেন? তাঁর দল, ক্রিশ্চিয়ান সোস্যাল দল ভেঙে যাওয়ার পর এখন তাঁর অবস্থানটা কোথায়? কী ধরনের সংবিধান তিনি অস্ট্রিয়ার ওপর চাপিয়ে দেবেন? সে কি ইতালির সংবিধানের নকল হবে, না তার কোনও পরিবর্তিত সংস্করণ হবে?

'নাইনটিনথ সেঞ্চুরি' পত্রিকার ফেব্রুয়ারি (১৯৩৪) সংখ্যায় একটি অতি সুলিখিত নিবন্ধে এলিজাবেথ উইসকারমান অস্ট্রিয়ায় ক্যাথলিক চার্চ ও সমাজবাদের মধ্যে সু-সম্পর্কের জন্য গভীর আবেগসহকারে আবেদন করেছেন, যাতে দেশ National Socialist-দের দিকে না চলে যায়। কিন্তু ফেব্রুয়ারির ঘটনাবলির পর, সমাজবাদী দল যখন প্রায় নিশ্চিহ্ন, তখন মনে হয় তার সময় পেরিয়ে গেছে। বাইরের কোনও পর্যবেক্ষকের মনে হবে, স্পষ্টত হ্বেইম্হর-এর হাতেই এখন শক্তি বেশি, এবং হের ডলফাস-এর পক্ষে তাদের হাত থেকে নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। হ্বেইম্হর দলের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিই এখন অস্ট্রিয়ার রাজনীতির ভবিষ্যৎ নির্ধারন করবে। হ্বেইম্হর-এর ভিতরেই একটি নাৎসি পক্ষপাতী গোষ্ঠী এবং একটি রাজতন্ত্র-পন্থী গোষ্ঠী আছে। নাৎসি-পক্ষপাতী অংশটিকে এখনকার মতো দমিয়ে রাখা হয়েছে এবং রাজতন্ত্রপন্থীদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। ভিয়েনা থেকে প্রাপ্ত সর্বশেষ খবরে দেখা যায় রাজ-পরিবারের সদস্যেরা এখন খোলাখুলি হ্বেইম্হর দলের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করছেন এবং অস্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরির রাজপন্থীরা শুধু যে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন তাই নয়, একত্রে আলাপ-আলোচনাও করছেন। সাগ্রহে লক্ষ করবার মতো কিছু-কিছু ঘটনা এখন যে কোনও সময়ে ঘটতে পারে। কিন্তু ঘটনা যাই ঘটুক এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে অন্তত কিছুকাল মিত্রশক্তিবর্গ অস্ট্রিয়ার রাজনীতির গতি-প্রকৃতির ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারবে না অস্ট্রিয়া এখনও ইউরোপীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু, যদিও বাহ্যত সে দেশ মনে হয় শান্ত। লন্ডনের 'টাইমস' পত্রিকার ভিয়েনার সংবাদ-দাতা, মনে হচ্ছে, মনে করেন বাইরের শক্তিগুলোর পক্ষে এখন সব চাইতে ভাল হবে হের ডলফাস-কে এবং তাঁর সরকারকে সমর্থন করা। তিনি আরও মনে করেন, ডলফাস যে সংবিধান অস্ট্রিয়াকে দেবেন, তাতে একটি সক্রিয় উপাদান হবে ফ্যাসিবাদ। কিন্তু অস্ট্রিয়াতে হ্বেইম্হর-এর যে-রকম প্রভাব, এবং ইতালির সঙ্গে সে-দলের যে-রকম সম্পর্ক, তাতে মনে হয় ভবিষ্যৎ সংবিধানের ইতালির আদর্শের ভিত্তিতে রচিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। অবশ্যই হের ডলফাস-এর আগেকার ঘোষণাগুলিতে ক্রিশ্চিয়ান

করপোরেট স্টেট-এর কথা আছে, কিন্তু তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে ক্যাথলিক চার্চের প্রভাবের মধ্যে ছিলেন, এবং সম্ভবত তিনি ১৯৩১-এর Papal Encyclical-এর থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন, যে ঘোষণাপত্রে সামাজিক পুনর্গঠনের প্রশ্নে ক্যাথলিক চার্চের মত ব্যক্ত হয়েছিল। কিন্তু আজ হ্বেইম্হর-এর বিরুদ্ধে হের ডলফাস-এর পক্ষে কিছু করা প্রায় অসম্ভব এবং হ্বেইম্হর যে ক্যাথলিক চার্চের নির্দেশ পালনে প্রধানমন্ত্রীর মতো তৎপর হবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এর পরে অস্ট্রিয়ায় কী ঘটে বহির্জগতের পক্ষে সেটা আগ্রহের বিষয় হবে এবং সমগ্র ইউরোপে তার ফল হবে সুদূরপ্রসারী।

ভিঠলভাই প্যাটেলের উইল[১]

প্রয়াত শ্রীভিঠলভাই প্যাটেলের উইল সম্পর্কে সংবাদপত্রে কোনও বক্তব্য প্রচার করা থেকে এখন পর্যন্ত আমি বিরত থেকেছি। আমার যে-সব বন্ধু এ বিষয়ে আগ্রহী তাঁদের সঙ্গে আমি পত্রালাপ করেছি। তাদের মধ্যে কেউ-কেউ আমাকে অনুরোধ করেছেন তাঁদেরকে আমি ইতিমধ্যে যা বলেছি তা যেন সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করি, যাতে অধিকতর সংখ্যক লোক, যাঁরা এ-বিষয়ে আগ্রহী, তাঁরাও আমার কথা জানতে পারেন।

শ্রদ্ধেয় উইল প্রণেতার উইলের প্রাসঙ্গিক অংশ এই রকম ঃ

'উল্লিখিত চারটি দানের পর আমার অবশিষ্ট সম্পত্তি সুভাষচন্দ্র বোস (প্রয়াত জানকীনাথ বোসের পুত্র)-কে সমর্পণ করতে হবে, তাঁর দ্বারা, অথবা তাঁর নির্দেশ মতো তাঁর মনোনীত ব্যক্তি ও ব্যক্তিগণের দ্বারা ভারতের রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য এবং বিশেষত বিদেশে ভারতের স্বার্থে প্রচারের জন্য যাতে তাঁরা ব্যয় করতে পারেন।'

কী কারণে সেই প্রয়াত মহাপ্রাণই ভাল জানতেন, সম্ভবত রাজনৈতিক প্রশ্নে আমাদের মত অভিন্ন ছিল বলে এবং সেই জন্য আমার ওপর তাঁর আস্থা বেশি ছিল বলে আমার ওপর তিনি বৃহত্তর দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, সেই দায়িত্ব হবে এক পবিত্র কর্তব্য যা আমি আমার যত দূর সাধ্য পালন করবার চেষ্টা করব।

যে-সব বন্ধুদের সঙ্গে আমার পত্রালাপ হয়েছে তাঁদের আমি আগেই জানিয়েছি, এই উইল অনুসারে আমার কর্তব্য সম্পাদনে, কর্ম-পরিকল্পনা এবং তার জন্য যে অর্থ-ব্যয় হবে, এই উভয় ব্যাপারেই, আমি জনসাধারণকে সব কিছু অবগত করাতে চাই, জনসাধারণের সেবক হিসাবে আমার যে কর্তব্য, তা ছাড়া আরও একটি কারণে আমাকে তা করতে হবে। যদি সুপরিকল্পিতভাবে এবং ফলপ্রসূ উপায়ে কাজ চালিয়ে যেতে হয়, প্রয়াত নেতার গচ্ছিত অর্থ যথেষ্ট হবে না। অতএব আরও অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। প্রয়াত শ্রী ভি. জে. প্যাটেলের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল দেশে ফিরে সে-কাজ করবেন। তাঁর অবর্তমানে আমাকে সে ইচ্ছা পূরণ করতে হবে। বলা বাহুল্য জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ তাদেরকে সব কথা না জানিয়ে সম্ভব নয়।

আরও বলা দরকার যে উদ্দেশ্যে সে অর্থ তিনি রেখে গেছেন, তার পূরণের জন্য তাঁর কর্মসূচি ও নীতিতে যাঁরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন, সেই-সব বন্ধুদের সহায়তা এবং পরামর্শ আমি পেতে চাই। কোনও নাম উল্লেখ করা এই পর্যায়ে কঠিন, তবে আমি এটুকু বলতে পারি যে শ্রী কে এফ নারিম্যান, শ্রী এস এ ব্রেলভি, শ্রী আর ভবন, শ্রীদীপনারায়ণ সিং

---

১. এই বিবৃতি ইউনাইটেড প্রেস, আগস্ট ১৯৩৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

প্রভৃতি বন্ধুদের সহায়তা আমি পেতে ইচ্ছুক। আমার ওপরে ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে শ্রদ্ধেয় উইলকর্তার উদ্দেশ্য এবং ধারণা সকল, এবং আইনের সব ধারা আমি যথাযথ মান্য করব। তাঁর একটি উদ্দেশ্য ছিল আইনের সীমার মধ্যেই কাজ করা।

উইলের ব্যবস্থাদি থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, আমাকেই একমাত্র অছি নিযুক্ত করা হয়েছে। উইলের ব্যবস্থাদি অনুসারে এবং আইনের প্রয়োজন অনুযায়ী আমি, দায়িত্বশীল এবং আইনসম্মতভাবে কাজ করতে প্রস্তুত আছি, যাতে জনসাধারণের সন্তোষবিধান হয়, কিন্তু প্রয়াত নেতার প্রতি আনুগত্যবোধ বশত আমার পক্ষে, একমাত্র অছি হিসাবে যে দায়িত্ব আমাতে ন্যস্ত হয়েছে তা ত্যাগ করা সম্ভব নয়।

রুমানিয়াতে এক ভারতীয় কর্নেল[১]

সম্প্রতি আমি যখন রুমানিয়া গিয়েছিলাম, বুখারেস্টে এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, তিনি Dr. Narsing Mulgund, রুমানিয়ার সৈন্যবাহিনীর মেডিক্যাল বিভাগের একজন লেফটেনান্ট কর্নেল। তাঁকে দেখে আমার ঔৎসুক্য এত দূর জাগ্রত হয়েছিল, যে তাঁর আগেকার জীবনের সব তথ্য আমি তাঁর কাছ থেকে জেনে নিই। আমার দেশবাসীর জ্ঞাতার্থে আমি সে-সব লিখে পাঠাচ্ছি।

তিনি জন্মসূত্রে মহারাষ্ট্রীয় এবং আদি নিবাস দাক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদ থেকে ষাট মাইল দূরে তালুক ভুবনগির-এ। প্রথমে বম্বেতে শিক্ষালাভের পর ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে তিনি চলে যান কলকাতায়।

কলকাতায় তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন এবং এফ. এ. পড়েন। একই সঙ্গে তিনি ডা. এস. কে. মল্লিকের ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজেও শিক্ষা লাভ করেন। সেখানে তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ এস. কে. মল্লিক, ডাঃ ওয়াই. এম. বোস, ডাঃ বি. সি. ঘোষ এবং ডাঃ এম. ডি. দাস। তিনি যথাসময়ে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে এফ. এ., এবং ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম. সি. পি. এস পাশ করেন। ১৯১২ সালে তিনি লন্ডনে চলে যান এবং MRCS ডিপ্লোমা গ্রহণ করেন। এই রকম সময়ে তুর্কি-বল্কান যুদ্ধ আরম্ভ হয়, এবং Dr. Mulgund তুরস্কে রেড ক্রেসেন্ট মিশনে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগদান করেন। মেডিক্যাল মিশন ছিল দুটি, একটি ডাঃ আনসারির নেতৃত্বে, আরেকটি ডাঃ আবদুল হোসেন-এর নেতৃত্বে। Dr. Mulgund শেষোক্তটিতে যোগ দেন। শাটালজা-তে তিনি তুর্কি সৈন্য বাহিনীতে সার্জেন হিসাবে ছয় মাস কাজ করেন। সেখানে তিনি তুর্কি সরকারের কাছ থেকে Order of Commander of Majidia উপাধি লাভ করেন। তুর্কি-বল্কান যুদ্ধে গ্রিস, সার্বিয়া এবং বুলগেরিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। সে-যুদ্ধ অবিলম্বে শেষ হয়ে যায়, কিন্তু নতুন একটি যুদ্ধ আরম্ভ হয়, সার্বিয়া এবং গ্রিস আক্রমণ করে বুলগেরিয়াকে, রুমানিয়াও লড়াইয়ে নেমে পড়ে। তুর্কি-বল্কান যুদ্ধের সময়ে যেহেতু তুরস্কের বিস্তৃত ভূখণ্ড বুলগেরিয়া দখল করে নিয়েছিল, তাই এই সুযোগে তুরস্ক হারানো জমি খানিকটা পুনরুদ্ধার করে। রুমানিয়া যখন বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল, মিশনটি রুমানিয়ায় চলে গেল। রুমানিয়াতে Dr. Mulgund Zimnica-তে কাজ করেছিলেন। সেখানে যুদ্ধক্ষেত্রে একটি হাসপাতাল ছিল। তখন রুমানিয়ার সৈন্যবাহিনীর মধ্যে কলেরা আরম্ভ হল এবং মেডিক্যাল মিশন খুবই ভাল কাজ করল। কাজের পুরস্কার স্বরূপ Dr. Mulgund রুমানিয়া

---

১. দ্য মডার্ন রিভিউ, ক্যালকাটা: সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪, পৃষ্ঠা ৩০৮—৯

সরকারের কাছ থেকে Order of Military Virtue পেলেন ১৯১৩ সালের আগস্ট মাসে। দ্বিতীয় বল্কান যুদ্ধের অবসানে মেডিক্যাল মিশনের অন্য সদস্যেরা ভারতে ফিরে গেলেন, কিন্তু তিনি সেখানেই থেকে গেলেন। তাঁর প্রবল ইচ্ছা, রুমানিয়াতে নিজের কর্মজীবন তৈরি করে নেন।

কিন্তু সমস্যা হল, কে তাঁকে সাহায্য করবে? ভাগ্যক্রমে এই সময়ে একজন সুপরিচিত রাজনীতিক, Dr. Lupu, এবং অধ্যাপক Stanculeanu-র তাঁকে পছন্দ হয়েছিল। তাঁর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছিল সে-দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করার ওপরে। তাঁর দুই বন্ধুর সাহায্যে এবং যুদ্ধে তিনি যে কাজ করেছেন সেই সুবাদে সাধারণত যত দিন লাগে তার আগেই তিনি নাগরিকত্ব লাভ করতে পারলেন। তারপর অল্প দিনের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত চক্ষু-চিকিৎসালয়ে তিনি চাকরি পেলেন। তারপরে তিনি রুমানিয়ার State Examination পাশ করলেন। সে-পরীক্ষা পাশ করার পর তিনি রুমানিয়ার সৈন্য বাহিনীর মেডিক্যাল বিভাগে সাব-লেফটেন্যান্টের পদে নিযুক্ত হলেন।

সেটা ছিল ১৯১৫-এর এপ্রিল। ১৯১৬-এর পনেরোই অগাস্ট রুমানিয়া জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। ১৯১৭ সালে তিনি লেফটেন্যান্ট হলেন, ১৯১৮-তে ক্যাপটেন হলেন। ১৯২৬-এ তিনি মেজর হলেন এবং মে ১৯৩৪-এ বুখারেস্ট-এ আসবার আগে তিনি লেফটেন্যান্ট কর্নেল হলেন।

Dr. Mulgund, কিংবা বলা উচিত Lt. Col. Mulgund রুমানিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চক্ষু-বিশেষজ্ঞ। ১৯১৯ থেকে ১৯২২ তিনি ওরাদিয়া চক্ষু হাসপাতাল-এর প্রধান ছিলেন, এবং ১৯২২ থেকে ১৯২৮ তিনি ছিলেন বুখারেস্ট-এ মিলিটারি হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত চক্ষু-বিশেষজ্ঞ। আমি যখন বুখারেস্ট-এ ছিলাম যুদ্ধমন্ত্রী তাঁকে বলেছিলেন সৈন্যবাহিনীর জন্য একটি নতুন চক্ষু হাসপাতাল খুলতে।

Lt. Col. Mulgund এক রুমানীয় মহিলাকে বিবাহ করেন এবং তাঁদের দুটি সন্তান হয়েছে, দুটিই কন্যা। তাঁরা এক সুখী পরিবার। বুখারেস্টে তিনি বেশ সুপরিচিত এবং তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই কয়েকজন রুমানীয় বন্ধুর কাছে আমি তাঁর কথা শুনেছিলাম। যখন বুখারেস্ট-এ ছিলাম তখন তাঁর সঙ্গে অনেকটা সময় কাটাবার আনন্দ আমি লাভ করেছিলাম। আমরা যখন একসঙ্গে ঘোরাফেরা করতাম রুমানিয়ার ভদ্রলোকেরা এবং মিলিটারি অফিসারেরা যে-ভাবে তাঁকে সৌজন্য প্রদর্শন করতেন, তাতে মনে হত সেখানে তিনি শুধু সুপরিচিত নন, অত্যন্ত সম্মানিতও।

যদিও দীর্ঘকাল তিনি ভারতের বাইরে আছেন, এবং যদিও তিনি রুমানিয়ার নাগরিক, নিজের মাতৃভাষা তিনি ভোলেননি। মারাঠি ছাড়া তিনি হিন্দিও যথেষ্ট ভাল বলতে পারেন এবং সংস্কৃতেও তাঁর এখনও যথেষ্ট জ্ঞান। সংস্কৃত বচন এবং গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করতে তিনি ভালবাসেন। বুখারেস্ট-এ Dr. Mulgund-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ আমার পক্ষে খুবই আনন্দের এবং সম্মানের হয়েছিল। এ বিষয়েও আমার কোনও সন্দেহ নেই যে আমার যে-সব স্বদেশবাসী এই লেখা পড়বেন, তাঁরাও এ-বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহী বোধ করবেন। Dr. Mulgund থাকেন ঃ

Strada Canzasi 14, Bucharest, এই ঠিকানায়।

এক নজরে এডেন[১]

১৩ জানুয়ারি ১৯৩৫, যখন লয়েড ট্রিয়েসটিনো-র এম. ভি. ভিক্টোরিয়া বম্বে থেকে ইউরোপের পথে এডেন-এ ভিড়ল, এডেন-এর কয়েকজন ভারতীয় অধিবাসী জাহাজে উঠে এলেন এবং কয়েক ঘণ্টার জন্য তাঁদের আতিথ্য স্বীকার করতে অনুরোধ জানালেন। আমি সানন্দে সম্মত হলাম। তাঁদের সঙ্গে ডাঙায় নেমে যা দেখলাম তাতে বিস্মিত ও আনন্দিত হলাম। এর আগের বার ইংলন্ডের পথে আমি এডেন-এ এসেছিলাম ১৯১৯ সালে। কিন্তু কত পার্থক্য এবং তা দেখে খুব ভাল লাগল। এখন দেখি সুন্দর-সুন্দর সব রাস্তা, (সম্ভবত পিচঢালা) রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলো এবং সুন্দর-সুন্দর চোখে লাগবার মতো বাড়ি। আমি জিজ্ঞেস করে জানলাম এডেন-এর জনসংখ্যা ৫০,০০০-এর বেশি এবং ভারতীয়দের সংখ্যা ২০০০-এর বেশি। ভারতীয় অধিবাসীরা ব্যবসায়ী, এবং তাঁদের অধিকাংশ এসেছেন কাথিয়াওয়াড় থেকে। এডেন এক সমৃদ্ধিশালী বন্দর এবং ব্যবসাকেন্দ্র এবং ব্যবসা সমানে বেড়ে চলেছে। পশুচর্ম প্রভৃতি কাঁচা মাল এবং কফি প্রভৃতি সামগ্রী অভ্যন্তর থেকে নিয়ে এসে ইউরোপে রপ্তানি করা হয়। শিল্পজাত দ্রব্যাদি যেমন বস্ত্র, যা তথাকথিত সভ্যতার নিদর্শন, ইউরোপ থেকে আমদানি করে আরব উপদ্বীপের অভ্যন্তরে পাঠানো হয়। প্রশাসনের ব্যক্তিবর্গ এবং উচ্চতর পদাধিকারীগণ ব্রিটিশ। অপেক্ষাকৃত নিম্নতর পদে নিযুক্ত বা অংশত আরবি এবং অংশত ভারতীয়। বর্তমানে এডেন ভারত সরকারের শাসনাধীন।

এডেনে প্রবাসী ভারতীয়দের কাছে যে প্রশ্নটা শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা হল ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার প্রস্তাব। তারা প্রকৃতই ভীত, ভারত থেকে তারা যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, এবং তার ফলে ভারতের জনগণের সমর্থন যদি তাঁরা হারায়, তাদের স্বার্থ প্রভূত পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কর্তৃপক্ষের এই প্রস্তাবের পিছনে তাঁদের কী মানসিকতা কাজ করছে আমি জানতে চেয়েছিলাম, ভারতীয়দের কথা বলতে গেলে, তারা মনে করে কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক। গভর্নমেন্ট এডেনকে একটি উপনিবেশে পরিণত করতে চায়, যাতে ভবিষ্যতে কোনও সময়ে ভারত স্বরাজ লাভ করলেও এডেন নিরাপদে তাদের হাতেই থাকবে। এডেন এবং সিঙ্গাপুর, এই দুটি সমুদ্রপথে ভারতের দুই বৃহৎ প্রবেশদ্বার, এবং এই দুই প্রবেশদ্বারকে সম্পর্ণভাবে সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। আগে এডেনে কয়েকটি ভারতীয় রেজিমেন্ট ছিল, কিন্তু তাদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং তার পরে ছিল শুধুমাত্র ব্রিটিশ সৈনিকেরা, সংখ্যায় হাজার দুয়েক। রয়্যাল এয়ার ফোর্স-এরও একটি শক্তিশালী অংশ এডেনে ছিল। এডেন থেকে ২৫ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে ভূমিখণ্ড ব্রিটিশ অভিভাবকত্বের অধীনে ছিল, তার বাইরে যে ভূমি, সে ছিল স্বাধীন।

লোহিত সাগরের প্রবেশ পথের ওপর কর্তৃত্বের প্রয়োজনে এডেনের যে গুরুত্ব, তা ছাড়াও, পার্বত্য ভূমির মধ্যে অবস্থিত জায়গাটি দেখতেও ছবির মতো সুন্দর, এবং সেই কারণে চিত্তাকর্ষক। শহরটির বৃহত্তর ভাগ পাহাড়ের পাদদেশে হলেও সবচাইতে সুন্দর বাড়িগুলির কয়েকটি উঁচুতে অবস্থিত, এবং সেখানে যাওয়ার জন্য আঁকাবাঁকা রাস্তা আধুনিক পদ্ধতিতে নির্মিত, কয়েকটি পাহাড়ের ভিতর দিয়ে সুড়ঙ্গ কাটা হয়েছে, যোগাযোগের উন্নতিসাধনের জন্য।

এডেনে বৃষ্টিপাত অতি অল্প এবং সেই কারণে পানীয় জলের সমস্যা তীব্র। বহুকাল পূর্বে আরবরা সুকৌশলে সে-সমস্যার সমাধান করেছিল। পাহাড়ের ওপর যে-বৃষ্টি পড়ত, তার জল পাহাড়ের পাদদেশে সেখানকার পাথর দিয়ে নির্মিত একটি বিশাল জলাধারে জমা করে রাখা

---

১. দ্য মডার্ন রিভিউ, ক্যালকাটা: মার্চ, ১৯৩৫, পৃষ্ঠা ৩১৪—১৬

হত এবং সারা বছর সেখান থেকে পানীয় জল নেওয়া হত। তা ছাড়া গভীর-গভীর কূপ ছিল, ভারতের গ্রামে যেমন দেখা যায়, সে-রকম ধরনের, আমরা যে-দিন পৌঁছলাম সে-দিন প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিল, জলাধার ভর্তি ছিল।

আমি দেখে খুশি হলাম, এডেনের ভারতীয়েরা স্বদেশের ঘটনাবলি সাগ্রহে লক্ষ করে যাচ্ছিলেন। সর্বশেষ সংবাদ তাঁরা জানতে চাইলেন আমার কাছ থেকে। একত্রে বৈঠক করবার পর, এডেন-সংক্রান্ত যা কিছু আমি জানতে চাইলাম, আমাকে জানানো হল, এরপর তাঁরা আমাকে কংগ্রেসের কর্মসূচি জানাতে বললেন। আমি বম্বে কংগ্রেসে গৃহীত গঠনমূলক কর্মসূচি এবং ভারতে খাদি আন্দোলনের বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলাম। সভার পর হালকা জলযোগ পরিবেশিত হল এবং আমাকে শহর ঘুরিয়ে দেখানো হল। জেটিতে একটি মনোরম বিদায় অনুষ্ঠান হল এবং আমি আমার জাহাজ 'এম. ভি. ভিক্টোরিয়া'-য় ফিরে এলাম। মধ্যরাত্রি নাগাদ আমরা আবার বাহির সমুদ্রে।

নেতৃস্থানীয় ভারতীয়েরা যদি এডেনে অবতরণ করে সেখানে তাঁদের স্বদেশবাসীদের সঙ্গে দেখা করার কষ্টটুকু স্বীকার করেন, সেখানকার প্রবাসী ভারতীয়েরা বিপুল উৎসাহলাভ করবেন। মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের আগমন তাঁরা সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন। সেখানকার ভারতীয়দের মধ্যে সাংস্কৃতিক প্রচারকার্যেরও প্রচুর সুযোগ আছে এবং সেই উদ্দেশ্যে কোনও ভারতীয় যদি এডেনে যান, তাঁদের অবশ্যই সাদর অভ্যর্থনা জানানো হবে। বর্তমানে পণ্ডিত কানহাইয়া লাল মিশ্র সেখানে কাজ করছেন, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর চলে যাওয়ার কথা।

এডেনের ভারতীয়দের প্রবল ইচ্ছায় এডেনকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার যে প্রস্তাব, তার বিরুদ্ধে ভারতে জোরালো আন্দোলন হোক। শেষ পর্যন্ত যাই হোক, এতে কোনও সন্দেহ নেই যে এ বিষয়ে ভারতের মতামত সকলের জানা উচিত।

ইতালি

অমৃতবাজার পত্রিকা সমীপেষু ৯ মার্চ ১৯৩৫

২০ জানুয়ারি আমি নেপলস্-এ অবতরণ করলাম। মনে হচ্ছিল সমুদ্রযাত্রা যথেষ্ট হয়েছে, নেপলস থেকে ট্রেনে চাপলেই হয়। দেখে অবাক হলাম। জাহাজ থেকে নামবার আগেই খবরের কাগজের প্রতিনিধি ও আলোকচিত্রীরা আমাকে ঘিরে ধরলেন। যাই হোক, এটা দেখে ভাল লাগল, যে ইউরোপের কিছু লোক অন্তত ভারতের ব্যাপারে আগ্রহী হতে আরম্ভ করেছেন।

প্রায় তিনদিন নেপলস্-এ অতিবাহিত করেছিলাম আমি। এখানে, ইউরোপে একটা কথা প্রচলিত আছে—'নেপলস্ দেখো এবং মরে যাও'—এর অর্থ, নেপলস্ এত সুন্দর যে তাকে না দেখে মরে যাওয়া উচিৎ নয়। সে-কথা বলা মোটেই অতিরঞ্জন নয়। একটি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত, সামনে সমুদ্রের অপূর্ব দৃশ্য, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মহাশক্তিধর, সদা ধূমায়িত ভিসুভিয়াস, সব মিলিয়ে নেপলস একটি সুন্দর-বিন্দু। কোনও-কোনও দিকে রিভিয়েরার চেয়েও সুন্দর। সমুদ্র তীরের যে রাস্তাটি, যার নাম Via Partenope, তার চেয়ে পায়ে হেঁটে বেড়াবার সুন্দর রাস্তার কথা কল্পনা করা যায় না। আমি একবার পম্পেই দেখতে গিয়েছিলাম, যে শহরটি একদা ভিসুভিয়াসের লাভায় চাপা পড়ে গিয়েছিল, এখন সম্পূর্ণ খুঁড়ে বার করা হয়েছে। ২০০০ বছর

আগে শহরটি যেমন ছিল এখন ঠিক তেমনটি দেখা যায়, অবশ্য শহরবাসীদের বাদ দিয়ে। শহরটির খননকার্য একেবারে নিখুঁত হয়েছে।

নেপলস থেকে আমি রোমে এসেছিলাম এবং এক সপ্তাহ ছিলাম। যদিও ওখানে মাত্র দু-তিন দিন থাকার ইচ্ছা ছিল আমার। রোমে দেখবার এবং করবার এত কিছু আছে যে সময় কোথা দিয়ে কেটে যায় বুঝতেই পারা যায় না। আমার কাছে রোমের আকর্ষণের কারণ সেখানে প্রাচীন ও আধুনিকের একটি সমন্বয়। যখন কেউ Colosseum, কিংবা Forum, কিংবা Roman Pantheon, কিংবা Catacombগুলিতে যাবে, তার মনে হবে সে প্রাচীন রোমে আছে, ইতিহাস পড়ে যে রোমের সঙ্গে ভারতে আমরা এত পরিচিত। কিন্তু যখন সে রোমের নবনির্মিত রাস্তাগুলো দিয়ে গাড়িতে করে যাবে কিংবা ভিক্টর ইমানুয়েল-এর স্মৃতিস্তম্ভটির দিকে তাকিয়ে থাকবে, তার মনে হবে সে আধুনিক রোমে ফিরে এসেছে।, যে রোম, মুসোলিনি চান, হোক নবজাগ্রত ইতালির প্রতীক। তিনি বিপুল পরিশ্রম করেছেন, বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় করেছেন, রোম যাতে এক প্রথম শ্রেণির ইউরোপীয় শক্তির যোগ্য রাজধানী হয়ে ওঠে।

গত বছর আমি যখন রোমে এসেছিলাম অনেকখানি সময় ব্যয় করেছিলাম দর্শনীয় বস্তুগুলি দেখতে এবং শহরের পৌর প্রশাসনের বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয় করতে। এবার আমি চেষ্টা করেছি জানতে ফ্যাসিস্ট দলের কাজকর্ম, এবং গভর্নমেন্টের সঙ্গে একযোগে কীভাবে তাঁরা জাতির উন্নয়নের জন্য কাজ করছেন। দলের কার্যালয়গুলি ঘুরে-ঘুরে দেখা, দল কীভাবে চালানো হয়, দলের সংগঠন, এবং যে ধরণের তথ্য আমি চাই তা জানবার জন্য অসংখ্য প্রশ্ন করার সমস্ত সুযোগ আমাকে দেওয়া হয়েছিল। পার্টির সংগঠন কীভাবে কাজ করে আমার ধারণা একটি পত্রে বিবৃত করা সম্ভব নয়, আমি শুধুমাত্র প্রধান বিষয়গুলোরই উল্লেখ করতে পারি। আমি দেখলাম, ফ্যাসিস্ট পার্টি তার চিন্তা-ভাবনা, তার আদর্শ অনুযায়ী একটি নতুন জাতি সৃষ্টি করতে চলেছে। দলটি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিকের দায়িত্ব নিজের হাতে নিতে চায়। কোনও ব্যক্তি রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন নয় এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে প্রশিক্ষিত করা।

আপনাদের এ বিষয়ে আগ্রহ থাকতে পারে, তাই জানাই আমার বই The Indian Struggle প্রকাশিত হয়ে গেছে, রোমে আমি তার এক কপি দেখেছি, ছাপা-বাঁধাই ইত্যাদি বেশ ভাল। রোমে অল্পকাল থাকবার সময়ে সিনর মুসোলিনির সঙ্গে আমার একটি সাক্ষাৎকার হয়েছিল, তাঁকে আমি আমার বই একটি দিয়েছি। তিনি বইখানি পেয়ে খুশি হলেন এবং আমাকে বললেন সময় করে বইটি পড়বেন। ইতালির বিভিন্ন সংবাদপত্র, তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দেশের অগ্রগণ্য পত্রিকা Giornale d' Italia ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে এবং লন্ডনে যে সংবিধানের খসড়া আইন নিয়ে এখন আলোচনা হচ্ছে, সে সম্পর্কে ভারতের প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। সব সংবাদপত্রেই আমার বইয়ের সমালোচনা বেরোবে।

রোমে আসার আর একটি উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা হয়েছিল, আফগানিস্তানের ভূতপূর্ব রাজা আমানুল্লার সঙ্গে সাক্ষাৎ। 'হিজ ম্যাজেস্টি' আমাকে যৎপরোনাস্তি আন্তরিকতা সহকারে আপ্যায়ন করেন এবং আমাদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়। তিনি মহাত্মা গান্ধী, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সর্বশেষ সংবাদ জানতে চান। তিনি কমিউনিজম-এর কড়া নিন্দা করেন ও জাতীয়তাবাদের প্রশংসা করেন। আমি দেখলাম তাঁর সমস্ত হৃদয় জুড়ে আছে তাঁর প্রজারা। প্রজারা যদি সুখে থাকে আনন্দে থাকে, তা হলে তাঁর নিজের কী হল না হল তা নিয়ে তাঁর কোনও দুশ্চিন্তা নেই। আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি আশাবাদী। ভারতের অধিবাসীদের মঙ্গলের জন্য তিনি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালেন, একজন প্রকৃত দেশপ্রেমী নৃপতি বলে তাঁকে আমার মনে হল।

কায়রোর মধ্যে দিয়ে যাত্রা[১]

আধুনিক মিশরের রাজধানী কায়রোর মতো মন-কাড়া শহর কমই আছে। নীল নদ-সেবিত, সু-উচ্চ পিরামিড-সমূহ দ্বারা সুরক্ষিত, এই শহরের মনোরম আবহাওয়া, সুন্দর-সুন্দর রাস্তা এবং ছবির মতো বাড়িগুলি নিরন্তর বিদেশিদের আকর্ষণ করে। কিন্তু যারা বারে-বারে সুয়েজ খাল দিয়ে যাওয়া আসা করে তাঁদের মধ্যে ক'জন কায়রো গেছে?

লয়েড ট্রিয়েসটিনো-র বন্দোবস্তর কল্যাণে আমরা সুয়েজে এম. ভি. ভিক্টোরিয়া থেকে নেমে মোটর যোগে কায়রো যেতে পারলাম, সেখানে কয়েক দিন থাকতে পারলাম এবং আবার সৈদ বন্দরে-এ এসে জাহাজে চাপতে পারলাম। ১৬ জানুয়ারি ১৯৩৫-এ রাত নটার মধ্যে আমরা সুয়েজ-এ পৌঁছলাম। জাহাজ উপকূল থেকে অনেকটা দূরে ভিড়ল এবং আমাদের সেটুকু পেরোতে হল ফেরিতে। চাঁদিনি রাত ছিল, বিস্তীর্ণ জলরাশি রূপালি চাঁদের আলোয় ঝলমল করছিল। আমাদের চারিদিকে ঝকমক করছিল সুয়েজ শহরের এবং Port Tewfik-এর আলো, সমুদ্র বক্ষে সে-সব আলো আকাশের তারার মতো নৃত্য করছিল। শুল্ক বিভাগের বাধা পেরিয়ে আমরা গাড়িতে উঠলাম কায়রো যাওয়ার জন্য। দেখতে-দেখতে শহর ছাড়িয়ে আমরা এসে পড়লাম মরুভূমির বুকে। উত্তর দিকে ছুটে চলেছি। আমাদের একজন সঙ্গী আশায়-আশায় ছিলেন, বেদুইনদের হাতে পড়ে কিছু অ্যাডভেঞ্চার হবে। সে আশা বিফল হল। সারা পথ শান্তিতে কাটল, দু'ধারে সীমাহীন বালুকা রাশি, রাস্তা সোজা চলে গেছে তার মধ্যে দিয়ে। চাঁদের আলো নেমে আসছে আকাশের চাঁদোয়া থেকে। কায়রোয় যখন পৌঁছলাম মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত। রাতের নিস্তব্ধতায় কায়রোর আলোকিত পথগুলি এবং রাস্তায় দু'পাশের বাড়িগুলি মনোমুগ্ধকর লাগছিল।

পরদিন সকালে আমরা পিরামিড দেখতে গেলাম। বাতাস বইছিল ঠান্ডা কনকনে যখন আমরা নীল নদ পেরিয়ে পৌঁছলাম যেখানে পিরামিডগুলোকে আকাশের গায়ে ছায়ার মতো দেখাচ্ছিল। আমরা তাদের পায়ের কাছে পৌঁছে ওপর দিকে তাকাতে লাগলাম। তা হলে এই হল সেইসব পাথরে গড়া পাহাড় যা দেখে নেপোলিয়নের মতো যোদ্ধারও কল্পনা উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিল! ফরাসি সম্রাট তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে পিরামিডগুলোর কাছে হাজির হয়েছেন। তাদের ক্লান্ত-অবসন্ন শরীরে তিনি এই বলে প্রাণ-সঞ্চার করলেন যে ৫০০০ বছরের ইতিহাস তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। সেই আবেদনে জাদুর মতো কাজ হল, মিশরের সৈন্যবাহিনী ঝড়ের আগে খড়-কুটোর মতো উড়ে গেল। পিরামিডগুলোর চারপাশে আমরা ঘুরে বেড়ালাম, যেখানে-যেখানে খননকার্য চলছিল তার ভিতরে ঢুকে-ঢুকে দেখলাম। সারাক্ষণ ভাবলাম এই সব পিরামিড থেকে আমরা কী শিখতে পারি। হ্যাঁ, আমরাও অনুপ্রেরণা পেতে পারি। ওই সব আকাশচুম্বী দৈত্যের সামনে দাঁড়িয়ে, যার পশ্চাদপটে সীমাহীন জনহীন উর্বর মরুভূমি, আমরা উপলব্ধি করতে পারি মানুষের রাজকীয় মহিমা, মানবাত্মার অমরত্ব। এই সব সৃষ্টি যাঁদের তাঁরা কালকে অস্বীকার করেছিল। পাথরের বুকে তাঁরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। যার কিছুমাত্র অন্তর্দৃষ্টি আছে সেই তাঁদের সঙ্গে অন্তরের সংযোগ স্থাপন করতে পারবে।

পিরামিডগুলোর অদূরে দাঁড়িয়ে স্ফিংক্স এক চিরন্তন প্রহেলিকা। এক বিশাল প্রস্তর মূর্তি, তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নবোদিত সূর্যে নিবদ্ধ, এ কীসের মূর্ত রূপ? একজন গাইড একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। প্রাচীন মিশরীয়রা সূর্যের উপাসক ছিল। স্ফিংক্স, হয় সূর্যের প্রতীক, নয় সূর্যোপাসনার প্রতিভূ। কে বলতে পারে? স্ফিংক্সের আত্মা কথা বলেনি, ধাঁধারও কোনও উত্তর

---

১. দ্য মডার্ন রিভিউ, ক্যালকাটা: এপ্রিল, ১৯৩৫, পৃষ্ঠা ৪২৬—৩১

মেলেনি। স্ফিংক্সের মাথার ওপরে একটি ছোট পাখি স্থির হয়ে বসেছিল। আমাদের কল্পনাকে আরও উস্কে দেবার জন্য গাইড বললেন, 'ওই পাখিটিই স্ফিংক্সের আত্মা। প্রত্যেকদিন সকালে আসে, তাকে সুপ্রভাত জানাতে।' ভাল করে মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তার নাক নেই। এই আরেকটি সমস্যা, আমাদের মনে হল। কিন্তু গাইডেরা তাতে দমবার পাত্র নন। 'ওই ক্ষতিটা করেছে নেপোলিয়নের একটি কামানের গোলা,' তাঁদের একজন বললেন। নেপোলিয়নের সঙ্গে পিরামিডগুলোর যোগাযোগের কথা মনে করে আমরা সে-কথা বিশ্বাস করতে রাজি ছিলাম, কিন্তু আরেকজন গাইড প্রতিবাদ করে বললেন, 'আরব মূর্তিসংহারকেরা ও কাজ করেছে, প্রাচীন মিশরীয়দের ওপর আক্রোশ মেটাবার জন্য।'

স্ফিংক্স-এর কাছ থেকে যখন বিদায় নিলাম প্রহেলিকা তখন আরোই দুর্ভেদ্য মনে হল। এবারে পিরামিডগুলোর দিকে ফিরলাম। একজন গাইড জিজ্ঞাসা করলেন 'পিরামিডের ওপরে উঠবেন?' আমরা বললাম, 'না, ধন্যবাদ। সময় নেই।' গাইড বললেন, 'একজন লোক আছে, পিরামিডের চূড়ায় উঠে, আট মিনিটে নেমে আসতে পারে।' এ আমাদের পকেট হালকা করবার আরেক ফন্দি মনে করে আমরা বললাম, দরকার নেই। তার বদলে আমরা বৃহত্তম পিরামিডটির অভ্যন্তরে কী আছে দেখতে চাইলাম। সে কোনও কঠিন কাজ নয়। পিরামিডের কেন্দ্রস্থলে যে বৃহৎ হল, সেখানে যাবার সরু রাস্তাটি বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত। যখন সেই হলে পৌঁছলাম তখন শুধুমাত্র আমাদের পিঠ কনকন করছিল, ক্রমাগত কুঁজো হয়ে থেকে সিঁড়ি বেয়ে উঠবার কারণে। পিরামিডটির উচ্চতা মোট প্রায় ৪৫০ ফিট, এবং হলটি মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত। প্রাচীন রাজাদের মমি এখানে থাকত, এখন সে হল খালি। নীচে আরেকটা অপেক্ষাকৃত ছোট হল, সেখানে রানিদের মমি থাকত।

স্ফিংক্সটি যেখানে, সেই 'গেজা'-র পিরামিডগুলি কায়রো থেকে ন' মাইল। পিরামিড মোট ন'টি, তিনটি বড়, ছ'টি ছোট। বড় পিরামিডগুলির অবস্থা সম্পূর্ণ অক্ষত, শুধুমাত্র অ্যালাবাস্টার পাথরের আবরণ অনেক জায়গায় খসে গেছে। আরও কয়েকটি পিরামিড আছে, কায়রো থেকে আরেকটু বেশি, প্রায় বিশ মাইল দূরে, প্রাচীন শহর মেমফিস-এর কাছে। প্রাচীন মিশরের কয়েকজন রাজার মূর্তি সেখানে দেখতে পাওয়া যায়।

আবার, পিরামিডের চেয়ে কিছু কম চিত্তাকর্ষক নয় কায়রোর Museum of Antiquities, যেটি হল মিশরের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের একটি সংগ্রহশালা। সেই মিউজিয়ামের মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য বিভাগটি হল, যেখানে মিশরের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত লুক্সর-এ তুতানখামেন-এর সমাধি থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন বস্তু রক্ষিত আছে। লুক্সর থেকে প্রাপ্ত যে-সব মূল্যবান বস্তু সেখানে সংগৃহীত, তার বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়, একবার কি দু'বার সেখানে গিয়ে তার সম্পর্কে যথাযথ ধারণা করাও সম্ভব নয়। প্রতি পদে-পদে অবাক হয়ে ভাবতে হয়, খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ সালের চাইতে কম প্রাচীন নয় যে যুগ, তখনকার মিশরবাসীরা শিল্প ও সভ্যতার কী উচ্চ শিখরে উঠেছিল। শিল্প বস্তুগুলি এত নতুনের মতো, দেখে মনে হয় যেন গতকালই তৈরি হয়েছে। সেগুলোর শিল্প কৌশলের যে উৎকর্ষ, তা ছাড়াও মানুষের কল্পনা যা দেখে স্তম্ভিত হতে হয়, তা হল কালের বিনাশকারী প্রভাব থেকে কী করে সেগুলোকে এমন সার্থকভাবে রক্ষা করা হয়েছে। মিশরের সঙ্গে তুলনা করলে, ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতিও কম প্রাচীন নয়, কিন্তু এ কথা, স্বীকার করতেই হয়, আমরা যা নির্মাণ করেছি তাকে রক্ষা করতে পারিনি, কারণ সংরক্ষণ বিদ্যায় আমরা তত পারঙ্গম নই। তা ছাড়া, আমার মনে হয়, জীবনের যে বস্তুগত দিক, চারু ও কারুশিল্প, তাকে আমরা অতটা বিকশিত করে তুলিনি। আমরা জোর দিয়েছি সভ্যতার ওপর ততটা নয়, যতটা সংস্কৃতির ওপর, জীবনের বস্তুগত দিকে ততটা নয়, যতটা বৌদ্ধিক এবং আধ্যাত্মিক দিকে। তাতে আমাদের সুবিধেও হয়েছে, অসুবিধেও হয়েছে।

আমাদের শ্রেষ্ঠতর চিন্তাশক্তির কল্যাণে, সাময়িকভাবে, বাহ্যিক শক্তিতে পরাভূত হলেও বহিঃশত্রুর আক্রমণের মুখে আমরা আত্মসমর্পণ করিনি, বরং কালক্রমে আমরা বহিরাগতকেও আত্মস্থ করে নিয়েছি। পক্ষান্তরে প্রাচীন মিশরিরা আরব আক্রমণকারীদের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি, সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে গেছে। অন্যদিকে, বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের ওপর বেশি জোর দেওয়ার ফলে আমরা বিজ্ঞানের বিকাশকে অবহেলা করেছি, জীবনের বস্তুগত ও দেহগত দিকে দুর্বল থেকে গেছি। আমাদের ইতিহাসের সেইটাই ছিল স্বর্ণযুগ যখন আমরা matter ও spirit-এর মধ্যে দেহ ও আত্মার মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান করতে পেরেছি, এবং তার ফলে দু'দিকেই এক সঙ্গে এগিয়ে যেতে পেরেছি। দেহ ও আত্মার মধ্যে যে সম্পর্ক তার কারণে দেহকে অবহেলা করলে জাতি শুধু যে দৈহিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে, তাই নয়, শেষ পর্যন্ত আত্মিক ভাবেও বলহীন হয়। বর্তমানে ভারতের দুরবস্থা শুধু দৈহিক দুর্বলতার কারণেই নয়, আত্মিকভাবেও সে অবসন্ন, হৃতবল। জীবনের একটি দিক যে আমরা অবহেলা করে আসছি, এ তার অনিবার্য পরিণতি। যদি আমাদের আবার নিজের প্রাপ্য ফিরে পেতে হয়, দু'-দিকেই এক সঙ্গে অগ্রগতি করতে হবে।

যে কথা বলছিলাম। সকালবেলাকার যাত্রা শেষে বিকাল বেলাটা আমরা শহরের ভেতরের দর্শনীয় স্থানগুলো দেখলাম। কায়রো মসজিদ ও সমাধিস্থলে পূর্ণ এবং প্রাচীন ইতিহাস অনেকটাই সে সবের মধ্যে নিহিত। প্রত্যেকটি মসজিদের নিজস্ব সৌন্দর্য আছে, তার নিজের কাহিনি আছে বলবার। কখনও-কখনও এমন কিছু সামনে এসে পড়ে যার সঙ্গে বাইবেলের অনুষঙ্গও জড়িত। তবে সে-সব কতটা সত্য বলা কঠিন। যেমন, বিরাট সিটাডেল (কায়রোর প্রাচীনতম দুর্গ)-এর মধ্যে গাইড আমাকে একটি অতিশয় গভীর কূপ দেখিয়ে বললেন, ওটি জোসেফের কূপ। কায়রোর অন্যতম দ্রষ্টব্যস্থান হল সিটাডেল, সেখান থেকে সমগ্র কায়রো শহরের, এক অসাধারণ সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে, যেখান থেকে এই দৃশ্যটি দেখতে হয়, সেই মোহাম্মদ আলির প্রাসাদটি এখন অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে। গাইড আমাদেরকে একটি ঘর দেখালেন। সেই ঘরে নাকি মোহাম্মদ আলি Mameluke-দের নৈশভোজে আপ্যায়িত করেছিলেন এবং অসতর্ক অবস্থায় পেয়ে তার পরেই তাদেরকে কচুকাটা করেছিলেন। একজন মাত্র Mameluke প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছিলেন। প্রাসাদের বাইরে মোহাম্মদ আলির মসজিদ। সৌভাগ্যের কথা, সেটি এখন প্রচুর অর্থব্যয় করে সংস্কার করা হচ্ছে। আর-কয়েকটি দ্রষ্টব্য স্থান সুলতান হাসানের মসজিদ, নীল মসজিদ, Mamluke-দের সমাধি, আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রাচীন মিশরের খানিকটা দেখার পর স্বাভাবিকভাবেই আমাদের আধুনিক মিশরের কথা মনে হল। আধুনিক কায়রো শহরটি সুন্দর, প্রশংসা করতেই হয়। কিন্তু আধুনিক রাজপ্রাসাদটিকে দেখে আদৌ কোনও সম্ভ্রমের সৃষ্টি হয় না মনে। এমনকী ব্রিটিশ সৈনিকদের ব্যারাকগুলিও দেখতে বেশি ভাল। আমরা শুনলাম মিশরের একজন রাজা আছেন, কিন্তু প্রকৃত সত্যটা রূঢ়ভাবে আমাদের মনে পড়ে গেল যখন দেখলাম শহরের কেন্দ্রস্থলে ব্রিটিশদের ব্যারাকের শীর্ষে এবং সিটাডেল-এর ওপরে সগর্বে উড়ছে ইউনিয়ন জ্যাক। স্বাধীনতাই বটে!

কিন্তু আধুনিক মিশরের জনগণের অবস্থাটা কী? আমি মিশরের ওয়াফদ দলের কথা (মিশরের জাতীয়তাবাদী দল) আগেই শুনেছিলাম, আগে যে দলকে অসাধারণ কুশলতায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সৈয়দ জগলুল পাশা যাঁর কথা সবাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। যিনি রেখে গিয়েছেন একজন সুযোগ্য উত্তরাধিকারীকে, তাঁর নাম মুস্তাফা এল-নাহাস পাশা। সেই বিরাট জাতীয়তাবাদী নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করলে কায়রোয় যাওয়া অর্থহীন হয়ে পড়ে। আমার হাতে সময় কম ছিল, কিন্তু আমার কপাল ভাল সেই কাঙ্ক্ষিত সাক্ষাৎকারটি আমি করতে

পেরেছিলাম। মুস্তাফা এল-নাহাস পাশার সঙ্গে ছিলেন তাঁর সর্বাপেক্ষা দুই কর্মদক্ষ সহকর্মী, মি. এম. এফ. নোকরাশি এবং মি. মাক্রাম এবেইদ। আমাদের বেশ মনোগ্রাহী কথাবার্তা হয়েছিল। আমার আগ্রহ ছিল মিশরের সম্পর্কে কিছু জানতে, এমন একজনের কাছে যিনি নিজেই প্রত্যক্ষভাবে সে দেশের অবস্থার সঙ্গে পরিচিত, আর তাঁরা আগ্রহী ছিলেন ভারতের বিষয়ে জানতে। আমি শুনে সুখী হলাম, নেসিম পাশার প্রধানমন্ত্রীত্বে মিশরে অর্ডিন্যান্স রাজত্বের অবসান হয়েছে। জাতীয়তাবাদীরা আবার খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে পারছেন। ৮ এবং ৯ জানুয়ারি ১৯৩৫ তাঁরা ওয়াফদ দলের একটি সম্মেলন করেছিলেন কায়রোতে। তাতে উপস্থিত ছিলেন ৩০,০০০ লোক। সে এক অভূতপূর্ব সাফল্য। পার্লামেন্টের নির্বাচন হতে দেরি ছিল না, এবং ওয়াফদ দল বিপুল ভাবে জয়ী হবে বলে আশা করছিল। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি জাতীয়তাবাদীদের পক্ষে খুব আশাজনক ছিল, এবং নেতারা বেশ উৎফুল্ল ছিলেন।

ভারতের প্রসঙ্গে এসে, মুস্তাফা এল-নাহাস পাশা প্রথমে মহাত্মা গান্ধীর শারীরিক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, ১৯৩১ সালে মহাত্মা যখন ভারতে ফিরছিলেন, তিনি তাঁর সেক্রেটারিকে সৈদ বন্দরে পাঠিয়েছিলেন, তাঁকে কায়রোতে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য, এবং নিজের বাড়িতে তিনি দলের প্রধান নেতাদের এক সভার আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মহাত্মা আসতে পারেননি। তার পরে আমরা হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নে চলে গেলাম; এবং যে-সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ করছেন, তাঁদের তিনি নিন্দা করলেন। যে-সব মুসলমানি নেতারা জাতীয়তাবাদী দলের সঙ্গে কাজ করছেন আর যাঁরা গভর্নমেন্টের পক্ষে আছেন, তাঁদের কথা তিনি একে-একে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, মিশরে মিশরীয় মুসলমানরা মিশরীয় ক্রিশ্চানদের (Copt নামে অভিহিত) সঙ্গে পুরোপুরি বোঝাপড়া করেছেন এবং দুই সম্প্রদায়ই একত্রে মিশরের উন্নতির জন্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছেন। তিনি আশা ব্যক্ত করেন যে অদূর ভবিষ্যতে ভারতেও তাই হবে। পরিশেষে আমি মুস্তাফাকে জানালাম, আমরা ভারতীয়েরা মিশরের জনগণের মঙ্গলামঙ্গলের বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহী, এবং স্বাধীনতার সংগ্রামে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি তাঁদের প্রতি। প্রত্যুত্তরে, তিনি স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে ভারতীয়দের প্রতি মিশরীয়দের গভীর সহানুভূতির কথা বললেন।

ব্রিটিশ এবং মিশরীয়দের মধ্যে দ্বন্দ্ব চারটি প্রধান প্রশ্ন নিয়ে। প্রথম, ব্রিটিশ দখলদার বাহিনী। দ্বিতীয়, ইউরোপীয় ট্রাইবুন্যালগুলির অস্তিত্ব— একমাত্র তারাই মিশরে ইউরোপীয়দের বিচার করতে পারে। তৃতীয়, সুয়েজ খালের ওপর নিয়ন্ত্রণ। এবং সর্বশেষ (যদিও এটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়) সুদানের মিশরে অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন। যখন মুস্তাফা এল-নাহাস প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং কয়েক বছর আগে, ইংল্যান্ডে শ্রমিক মন্ত্রীসভা ছিল, একটা আপোস-মীমাংসার জন্যে আলাপ-আলোচনা চালানো হয়েছিল। বেশির ভাগ প্রশ্নেই একটা বোঝাপড়া হয়েছিল, কিন্তু সুদানের প্রশ্নে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। শ্রমিক সরকার ক্ষমতাচ্যুত হতে সমস্ত আবহাওয়া পালটে গেল। সম্প্রতি চিনের ব্যাপারে যিনি বিখ্যাত হয়েছেন, সেই স্যর মাইলস লক হ্যাম্পসন মিশরে হাইকমিশনার নিযুক্ত হওয়ার পরে আবহাওয়ার উন্নতি হয়েছে।

কায়রোতে একটি কর্মব্যস্ত দিন কাটিয়ে আমরা ট্রেনে সৈদ বন্দরে রওনা হলাম, সেখানে জাহাজে উঠবার জন্য। ট্রেনে আমাদের কয়েকজন মিশরীয় সহযাত্রী ছিলেন, এবং তাঁদের কয়েকজন যেহেতু ইংরেজি জানতেন (সাধারণভাবে মিশরে ইংরেজির চেয়ে ফরাসিভাষার প্রচলন বেশি), অবিলম্বে আমাদের মধ্যে কথাবার্তা আরম্ভ হল। আমরা জানতে চাইলাম সাধারণ মানুষ জাতীয়তাবাদী ওয়াফদ দলকে কী চোখে দেখে। একজন যাত্রী, (তিনি ছিলেন Copt ও

সরকারি কর্মচারী) প্রথমে মুখ খুলতে চাইলেন না। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন আমরা নির্ভরযোগ্য, তিনি খোলাখুলি কথা বলতে আরম্ভ করলেন। মিশরীয় নেতাদের তিনি উচ্চ প্রশংসা করলেন, এবং এ-কথা সে-কথার পর বললেন, মিশরীয়রা, মুসলমানই হন আর ক্রিশ্চানই হন, টারবুশ অর্থাৎ ফেজ টুপি পরেন, কেননা মিশরীয়দের ওইটাই হচ্ছে জাতীয় শিরোভূষণ। (তত দিন পর্যন্ত আমার ধারণা ফেজ টুপি মুসলমানদের চিহ্ন।)

রাত এগারোটার মধ্যে আমরা জাহাজে। এক ঘণ্টার মধ্যে জাহাজ ভেসে চলল। ভূমধ্যসাগরের প্রবেশমুখে আমরা ফরাসি ইঞ্জিনিয়ার লেসেপস-এর মূর্তির কাছ দিয়ে গেলাম। তিনি সুয়েজ খাল নির্মাণ করেছিলেন। অবিলম্বে আমরা বাহির সমুদ্রে গিয়ে পড়লাম, সৈদ বন্দরের আলো ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে গেল, ঢেউগুলির আকার বৃদ্ধি পেতে লাগল। যখন ভোর হল, জাহাজ দুলছিল, আমাদের বেশির ভাগেরই শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ল।

বিদেশে ভারতীয় ছাত্রদের ব্যবহারিক শিক্ষা

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রশ্ন

কার্লসবাড (বিমান ডাকে, আগস্ট ১৯৩৫ ইউনাইটেড প্রেস-কে)

গত যুদ্ধের পর থেকে বহু সংখ্যক ভারতীয় ছাত্র ইউরোপে, বিশেষ করে জার্মানিতে আসছেন স্নাতকোত্তর শিক্ষা এবং কল কারখানায় ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্য। একদিকে ব্রিটিশ কারখানাগুলি যখন ভারতীয় শিক্ষানবিশ গ্রহণ করা সম্পর্কে নানারকম ওজর-আপত্তি তুলছে, জার্মান কারখানাগুলি এই সেদিন পর্যন্ত সাদরে তাঁদের গ্রহণ করছে। সেই কারণে ১৯২০ সাল থেকে বহু ভারতীয় জার্মান বিশ্ববিদ্যালয় ও কারখানাগুলিতে শিক্ষালাভ করেছেন এবং ফিরে গিয়ে তাঁরা জার্মানিকে আমাদের দেশে জনপ্রিয় করে তুলেছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে জার্মানিতে নতুন সরকারের শাসনে ভারতীয়দের পক্ষে অবস্থার ধীরে-ধীরে অবনতি হয়েছে। প্রথম আমি যখন ১৯৩৩ সালে জার্মানি যাই এরকম অনুযোগ শুনতে পাই যে ভারতীয়দের পক্ষে জার্মান কল-কারখানায় প্রবেশ কঠিন হচ্ছে। ক্রমে এই নালিশের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত : একজন ভারতীয় ছাত্র, যিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে Pharmaceutical Chemistry প্রধান বিষয় নিয়ে ডক্টরেট করেছেন, তাঁর পক্ষে কোনও জার্মান কারখানায় ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্য প্রবেশ অসম্ভব হচ্ছে। একজন ছাত্র, যিনি একটি জার্মান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Industrial Chemistry-তে ডক্টরেট করেছেন, তিনিও কোলটার পাতন প্রক্রিয়া শেখার জন্য কোনও জার্মান কারখানায় সুযোগ পাননি। আরেকজন ছাত্র, যাঁর মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা, যিনি ইঞ্জিনিয়ারিং-এর একটি পাঠক্রম সম্পূর্ণ করছেন, তাঁকে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দিতে অসম্মত হয়েছে সমস্ত বড় বড় কারখানা, যার মধ্যে আছে Siemens এবং Halske। আরেকজন ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র, যিনি কোনও বয়ন শিল্পকারখানায় স্পিনিং-এ প্রশিক্ষণ চান, সর্বত্র তাঁকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করা হচ্ছে। এবং শেষ পর্যন্ত Lodz-এ একটি পোলিশ কারখানা তাকে নিতে চেয়েছে।

অবস্থার ক্রমাবনতি

এখন আমি ভারতের জননেতা ও শিল্পপতিদের জিজ্ঞাসা করি, আমরা কি অবস্থার উপরোক্ত ক্রমাবনতি করজোড়ে মেনে নেব, না বর্তমান দুরবস্থার নিরসনের চেষ্টা করব? অনুরূপ অবস্থায়

অন্যান্য দেশ কী করছে সে কথা মনে রেখে আমি আমার মতামত জানাচ্ছি।

প্রথমে বলা দরকার জার্মান কলকারখানার নিজেদের ইচ্ছামতো বিদেশি শিক্ষানবিশ নিয়োগ করবার স্বাধীনতা নেই। প্রত্যেকটি নিয়োগের প্রশ্ন জার্মান সরকারের নিযুক্ত একটি বোর্ডের অনুমতির জন্য পাঠাতে হবে। Dr. Sebacht সেই বোর্ডের প্রেসিডেন্ট।

তুরস্ক, চিন, পারস্য ইত্যাদির মতো দেশ তারা যখন বিদেশি কোম্পানিকে বড়-বড় বরাত দেয়, একটা শর্ত তারা আরোপ করে, যে ওই সব কলকারখানায় তাদের দেশের লোককে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যায় প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সেই শর্ত সর্বদাই তারা মেনে নেয়। জার্মানরাও মেনে নেয়। কিন্তু পৃথিবীতে ভারতই একমাত্র দেশ যে বিদেশ থেকে প্রচুর দ্রব্য ক্রয় করে কিন্তু কোনও শর্ত আরোপ করে না। এই পরিস্থিতির জন্য সর্বাংশে দায়ী ভারত সরকার এবং ভারতীয় নেতৃবৃন্দ।

বিভিন্ন বিকল্প সমাধান

এখন প্রশ্ন, এর সমাধান কী?

আমি কয়েকটি সমাধানের প্রস্তাব করব, যে-গুলো কার্যোপযোগী হতে পারে। প্রথমত, আইন সভার সদস্যেরা ভারত সরকারকে অনুরোধ করতে পারেন, ভারত সরকার যেন, যে-সব দেশ থেকে ভারত প্রচুর পরিমাণে সামগ্রী ক্রয় করে, সে-সব দেশের সরকারকে বলে ভারতীয় ছাত্রদেরকে প্রশিক্ষণের সুযোগ দিতে। তাতে যদি ফল না হয়, কিংবা ভারত সরকার সে-কাজ করতে রাজি না হয় ভারতীয় বণিকসভা সে-সব দেশের বণিকসভার কাছে সেই মর্মে সরাসরি পত্র প্রেরণ করে। সে-ব্যবস্থা যদি না করা হয়, কিংবা যদি করা হলেও তাতে কাজ না হয়, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তাদের নিজেদের প্রতিনিধি সে-সব দেশে পাঠিয়ে এ বিষয়ে আবেদন করতে পারে। তাও যদি না করা হয়, কিংবা তাতেও যদি কাজ না হয়, যে-সব ভারতীয় শিল্পপতি বিদেশে অর্ডার দেন তাঁরা যেন কোনও বিদেশি কোম্পানিকে অর্ডার দেওয়ার সময়ে একটি শর্ত আরোপ করেন, যে সে-সব কলকারখানায় একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক ভারতীয়কে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

সব চাইতে ভাল কাজ হবে যদি ভারত সরকার সক্রিয় হয়। কিন্তু তারা কি কিছু করবে? আমাদের আইন সভার সদস্যেরা চেষ্টা করে দেখুন। তাঁরা বিফল হলেও ক্ষতি নেই। নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমি জানি, ইউরোপের এইসব দেশে সরকারের ওপর এবং বিভিন্ন শিল্প-বাণিজ্যের ওপরও বণিকসভার প্রচুর প্রভাব। ভারতের বণিকসভা যদি কোনও এক দেশের বণিকসভার সঙ্গে উপযুক্ত গুরুত্ব সহকারে এ বিষয়ে যোগাযোগ করে, তারা অবশ্যই সাড়া দেবে। সহানুভূতির সঙ্গে না হোক, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য পাছে হাতছাড়া হয়, সেই ভয়ে। অতএব, আইন সভা যদি ব্যর্থ হয়, ভারতীয় বণিকসভার উচিত বিষয়টি নিজের হাতে নেওয়া। তৃতীয় বিকল্প, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এই দায়িত্ব গ্রহণ। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি, অনেক দেশে কংগ্রেসকে অত্যন্ত মর্যাদা দেওয়া হয়, এবং লোকে জানে ভারতে কংগ্রেসই ভবিষ্যৎ গভর্নমেন্টের প্রতিভূ। সেই জন্য কংগ্রেস যদি কোনও আবেদন করে অনেক ক্ষেত্রে তার অনুকূল ফল হতে বাধ্য। অনেক দেশে লোকে জানে, যে-সব দেশে ভারতীয়দের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা হয় না, সেখান থেকে আগত সামগ্রী বয়কট করার কথা কংগ্রেসের ঘোষণা করার ক্ষমতা আছে। পরিশেষে, শিল্পপতিরা নিজেরা, যখন তাঁরা কোনও দেশ থেকে যন্ত্রপাতি কেনেন, বলতে পারেন, সে-সব কারখানায় ভারতীয় ছাত্রদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আমি কয়েকজন ভারতীয় ছাত্রের কথা জানি যাঁরা কোনও-কোনও ভারতীয় শিল্পপতির স্বদেশ প্রেম-প্রণোদিত সাহায্য লাভ করে ইউরোপের কলকারখানায় নিযুক্ত হতে পেরেছেন। সেই

শিল্পপতিরা তার জন্য জোরালো দাবি জানিয়েছিলেন। আবার আমি এমন কয়েকজন প্রথম সারির শিল্পপতির কথাও জানি, যাঁরা ভারতীয় ছাত্রদের সাহায্য করতে পারতেন, কিন্তু করতে রাজি হননি। এবং সেই শিল্পপতিরাই আমাদেরকে স্বদেশপ্রীতির কারণে তাঁদের প্রস্তুত সামগ্রী ক্রয় করতে বলেন।

ওপরে যে চারটি বিকল্প সমাধানের কথা বললাম তার সবকটিই এক সঙ্গে প্রয়োগ করা সম্ভবও নয়, উচিতও নয়। জার্মানিতে যে-সব ছাত্র ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ চান তাঁদের অবস্থা দিন-দিন কঠিন হচ্ছে, এবং দ্রুত কোনও ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

অন্যান্য দেশের সঙ্গে যোগাযোগ

১৯৩৩-এ যখন আমি জার্মানিতে অসুবিধার কথা বলেছিলাম, তখন থেকে আমি অন্যান্যদেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে যাচ্ছি, যাতে শেষ পর্যন্ত জার্মানি যদি ভারতীয় শিক্ষানবিশদের সামনে তার দরজা বন্ধ করে দেয়, তাঁরা একেবারে অসহায় হয়ে না পড়েন। সুখের বিষয়, অন্যান্য দেশে ভারতীয়দের সুযোগ আছে, এবং সে সুযোগ আরও বৃদ্ধি করা যায়। আমরা যদি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করি চেকোস্লোভাকিয়ার স্কোডার মতো কোম্পানি সানন্দে ভারতীয় শিক্ষানবিশ নেবে। ইতালির মারেল্লি এবং পিরেল্লির মতো কোম্পানিও একই রকম সুযোগ দিতে চাইছে। লজ্-এর পোলিশ বয়ন-শিল্পের কারখানাগুলোও আমাদের সহায়তা করবে। অবশ্য বলা বাহুল্য যে-সব দেশ ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের ব্যাপারে আমাদের যুবকদের সুযোগ দিতে চায়, আমাদের সেখান থেকেই বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয় করতে হবে।

শিল্প-বিকাশ

সবাই এ-বিষয়ে একমত হবেন, যে ভারতে শিল্পের বিকাশের জন্য শুধু মূলধন, শ্রম এবং রাষ্ট্রীয় সাহায্য হলেই চলবে না; কারিগরি বিশেষজ্ঞও আমাদের দরকার। শ্রমিক এবং রাষ্ট্রীয় সাহায্য পেতে অসুবিধা হবে না, যখন রাজনৈতিক ক্ষমতা আমাদের হাতে আসবে, কিন্তু কারিগরি বিশেষজ্ঞের প্রশিক্ষণে অনেক সময় লাগে। ১৯১৭ সাল থেকে রাশিয়ার যে অভিজ্ঞতা তাতে আমরা জেনেছি, যে এই সমস্যার দিকে আজ থেকেই আমাদের দৃষ্টি দেওয়া দরকার, যদি অসহায়ভাবে বিদেশি বিশেষজ্ঞদের হাতে আমাদের আত্মসমর্পণ করতে না হয়। ভারত-জাপান বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে দিল্লীতে যখন কথাবার্তা হচ্ছিল, জাপান আমাদের কাঁচা তুলা ক্রয় করবে কথা হল কিন্তু জাপানের বয়ন-শিল্প কারখানায় আমাদের শিক্ষানবিশদের প্রশিক্ষণের বিষয়ে একটি কথাও হল না।

এর থেকে আসে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য-চুক্তির কথা। আমাদের এখনই ভারত-জাপান বাণিজ্য চুক্তির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে জার্মানি, ইতালি, চেকোস্লোভাকিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-র মতো দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করা উচিত। সে-সব চুক্তি আমাদের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য এবং বাণিজ্যিক ভারসাম্য যাতে ঠিকমতো বজায় থাকে, তার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। জার্মানির মতো দেশগুলি কেন ভারত থেকে যত জিনিস কিনবে তার চাইতে বেশি ভারতে বিক্রি করবে? অপর পক্ষে, আমরা কেন চেকোস্লোভাকিয়ার মতো বিভিন্ন দেশ, যারা আমাদের দেশ থেকে অত বেশি ক্রয় করে, তাদের কাছ থেকে অত কম কিনব?

বাণিজ্য-চুক্তি

এক একটি দেশের সঙ্গে বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদন ছাড়াও আমাদের ব্যবসায়ীদের উচিত অন্যান্য দেশের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করা। অন্য সব দেশে তা করতে গেলে দরকার মিশ্র সংগঠন এবং মিশ্র বণিক সভা স্থাপন। যেমন, যদি আমরা চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ চাই, ভারতে আমাদের ইন্দো-চেকোস্লোভাকীয় সমিতি এবং ইন্দো-চেকোস্লোভাকীয় বণিকসভা স্থাপন করা দরকার। অন্য যে-সব দেশ সম্পর্কে আমরা আগ্রহী সে-সব দেশের জন্যও অনুরূপ সংস্থা প্রয়োজন। প্রাগ, ভিয়েনা এবং রোমে এই ধরনের সংস্থা ইতিমধ্যেই স্থাপিত হয়েছে। প্রয়োজন ওই সব দেশের সঙ্গে সংযোগের জন্য ভারতে অনুরূপ সংস্থা। এবং প্রয়োজন ভারতে এবং বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশে মিশ্র বণিকসভা।

রম্যাঁ রলাঁ কী ভাবছেন*

বুধবার ৩ এপ্রিল, ১৯৩৫। ঝকঝকে সকালে জেনিভাকে অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছিল। দূরে পরিষ্কার নীল আকাশের গায়ে ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে Saleve-র তুষারাবৃত শৃঙ্গগুলি। আমাদের সামনে ছবির মতো লেক জেনিভা। তার স্বচ্ছ কাচের মতো বুকে প্রাসাদোপম অট্টালিকাগুলির প্রতিবিম্ব। আমি তীর্থদর্শনে এসেছি। যে-দিন, দু'-বছর আগে ইউরোপে পদার্পণ করলাম, সে-দিন থেকে আমার আকাঙ্ক্ষা, বিরাট মানুষ, বিরাট চিন্তক, ভারত ও ভারতের সংস্কৃতির সেই মস্ত বড় বন্ধু ম. রম্যাঁ রলাঁ-র সঙ্গে দেখা করব। নানা কারণে ১৯৩৩ সাল, এবং আবার ১৯৩৪ সালে তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ সম্ভব হয়নি। কিন্তু তিন বারের বার আমার চেষ্টা সফল হতে চলেছে। আমি খুবই আশায় ছিলাম। আবার মাঝে-মাঝে একটু উদ্বেগ ও আশঙ্কাও মনের মধ্যে জাগছিল। মানুষটিকে দেখে আমি কি অনুপ্রাণিত হব, না কি আমাকে আশাহত হয়ে ফিরতে হবে? সেই স্বপ্নদর্শী সেই আদর্শবাদী, জীবনের কঠিন বাস্তব সত্যগুলি উপলব্ধি করতে পারবেন, যে-সব প্রকৃত বাধা বিপত্তি প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক দেশে যারা সংগ্রামী তাদের পথ আকীর্ণ করে রাখে? সর্বোপরি, ভারতের ইতিহাসে ভাগ্যবিধাতা কী লিখে রেখেছেন, তিনি কি পড়তে পারবেন?

তবু আমার মনে যা আশার সঞ্চার করেছিল সেটা হচ্ছে ২২ ফেব্রুয়ারি আমাকে লেখা তাঁর চিঠির অণুপ্রাণিত করার মতো কয়েকটি কথা : 'কিন্তু অবসাদ ও অনিশ্চয়তার মুহূর্তে আমাদের সামনে একটা প্রলোভন আসে, আমাদের মতো চিন্তাবিদের কর্তব্য এই প্রলোভনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। সংঘর্ষের ওপারে যে জগৎ যার নাম দেওয়া হয়েছে, ঈশ্বর, অথবা শিল্পকলা, অথবা চিত্তের মুক্তি, কিংবা যাকে বলা হয়েছে মানুষের রহস্যময় আত্মার নিভৃত নিকেতন, সেখানে আশ্রয় লাভের প্রলোভন। সেই প্রলোভনের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে। তার কারণ সংগ্রাম আমাদের করতেই হবে, কেননা আমাদের কর্তব্য মহাসাগরের এই তীরে মানুষের রণভূমিতে।'

পুরো দু'ঘণ্টা লাগল আমাদের লেক জেনিভা বেষ্টন করা পথটি অতিক্রম করতে। চমৎকার আবহাওয়া, সুইস রিভিয়েরা দিয়ে আমরা যখন যাচ্ছিলাম, যে দৃশ্যটি দেখলাম সুইজারল্যান্ডের সুন্দরতম দৃশ্যগুলির মধ্যে সেটি একটি। Villeneuve এতে এসে আমাদের গাড়ির গতি ধীর হল এবং শেষ পর্যন্ত Villa Olga-তে এসে আমরা থামলাম। এ হল একজন ফরাসি পণ্ডিতের বসতবাটি। জায়গাটি সত্যিই সুন্দর, পাহাড়ের সারি দিয়ে ঘেরা, বাড়ি থেকে দেখা যায়

* দ্য মডার্ন রিভিউ, ক্যালকাটা : সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫, পৃষ্ঠা ৩১৯-২৪ এই রচনাটি মঁসিয়ে রোমাঁ রলাঁ সংশোধন করে দিয়েছিলেন।

সরোবরটির চমকপ্রদ দৃশ্য। চারদিকে শান্তি, সৌন্দর্য, মহনীয়তা। প্রকৃতই তীর্থযাত্রার উপযুক্ত স্থান।

সদর দরজায় ঘণ্টা বাজালাম, এক মহিলা এসে দরজা খুলে দিলেন।

ছোট-খাটো মানুষটির মুখ সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ, প্রাণবন্ত। তিনি মাদাম রোম্যাঁ রলাঁ। সবে তিনি আমাদের স্বাগত জানাতে আরম্ভ করেছেন এমন সময়ে আমাদের সামনে আরেকটি দ্বার খুলে গেল। যিনি বেরিয়ে এলেন তাঁর দেহটি দীর্ঘ, পাণ্ডুবর্ণ, চোখে অপূর্ব অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। হ্যাঁ, এই সেই মুখ যা আমি অনেক ছবিতে দেখেছি, যে মুখাবয়বে মানবজাতির দুঃখের ভার। সেই মুখমণ্ডলে এমন কিছু একটা ছিল, যা গভীর, বিষাদব্যঞ্জক, কিন্তু যা পরাজয়কে, ব্যর্থতাকে স্বীকার করে না। কেননা আমাদের কথাবার্তা শুরু হওয়া মাত্র তাঁর পাণ্ডুর গণ্ডদেশে রঙের আভা ফুটে উঠল, চোখে এমন একটা আলো জ্বলে উঠল যা সাধারণত দেখা যায় না, এমন কথা তাঁর মুখ থেকে বেরোতে আরম্ভ করল, যা প্রাণশক্তিতে, আশায় ভরপুর।

সাধারণ সৌজন্য বিনিময়, ভারত এবং ভারতীয় বন্ধুদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়া ইত্যাদি সাঙ্গ হতে বেশি সময় লাগল না, তারপরেই আরম্ভ হল গুরুতর বিষয়ে কথাবার্তা। ম. রলাঁ ইংরেজি বলতে পারেন না, কিংবা বলেন না, আর আমি ফরাসি বলতে পারি না। কাজেই মাদমোয়াজেল রলাঁ এবং মাদাম রলাঁ দোভাষীর কাজ করলেন। আমার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের সর্বশেষ পরিস্থিতি ও ঘটনাবলী নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করা, এবং পৃথিবীর সামনে যে-সব বড়-বড় সমস্যা সে-সম্পর্কে তাঁর মতামত অবগত হওয়া। কাজেই, প্রথমে আমাকেই বেশির ভাগ কথা বলতে হল, ভারতের পরিস্থিতি আমি যা বুঝি, এবং যেভাবে বিশ্লেষণ করি, সেটা ব্যাখ্যা করবার জন্য। গত চোদ্দো বছর ধরে আন্দোলন দুটি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, সত্যাগ্রহ, অর্থাৎ অহিংস প্রতিরোধ এবং সমস্ত গোষ্ঠীর ভারতীয়দের অর্থাৎ পুঁজিপতি ও শ্রমজীবী, জমিদার এবং কৃষক সকলের সম্মিলিত শক্তি। ভারতের বিরাট আশা ছিল, সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ফলে শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব হবে এইভাবে: ভারতের অভ্যন্তরে সে-আন্দোলন দেশের অসামরিক প্রশাসনকে অচল করে দেবে; দেশের বাইরে সত্যাগ্রহের উচ্চ নৈতিকতা ব্রিটিশ জনসাধারণের বিবেকে নাড়া দেবে। এইভাবে এই সংঘর্ষের এমন নিষ্পত্তি হবে যার ফলে ভারত কোনও আঘাত না করেই, কোনও রক্তপাত ছাড়াই স্বাধীনতা লাভ করবে। কিন্তু সে-আশা বিফল হল। দেশের মধ্যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন অবশ্যই একটা অহিংস বিপ্লব ঘটাল, কিন্তু উচ্চতর যে প্রশাসন, সামরিক ও অসামরিক, তার গায়ে কোনও আঁচ লাগল না, রাজকীয় সরকার যেমন চলছিল মোটামুটি তেমনই চলল। ভারতের বাইরে কয়েকজন উচ্চমনা ব্রিটিশ অবশ্য গান্ধীর নৈতিক আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেন, কিন্তু সাধারণভাবে ব্রিটিশ জনসাধারণ নির্বিকার থেকে গেল। নৈতিকতার আবেদন চাপা পড়ে গেল স্বার্থপরতার নীচে।

স্বাধীনতা লাভে ব্যর্থতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীদের মধ্যে আন্তরিক আত্মানুসন্ধান আরম্ভ হল। কংগ্রেসিদের একটি অংশ আইনসভার মধ্যে থেকে সাংবিধানিক পথে প্রচেষ্টার পুরনো পন্থায় ফিরে গেলেন। মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর রক্ষণশীল অনুগামীরা আইন অমান্য আন্দোলন (অর্থাৎ সত্যাগ্রহ) স্থগিত হয়ে যাওয়ার পরে গ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে মন দিলেন। কিন্তু অধিকতর বিপ্লবপন্থী যাঁরা তাঁরা আশাভঙ্গের কারণে একটি নতুন আদর্শ, নতুন কর্মপন্থার দিকে ঝুঁকলেন, এবং তাঁদের অধিকাংশ ঐক্যবদ্ধ হয়ে গঠন করলেন Congress Socialist Party.

দীর্ঘ উপক্রমণিকার পর আমি প্রশ্ন করলাম, "সংযুক্ত ফ্রন্ট ভেঙে দিয়ে যদি নতুন একটি আন্দোলন শুরু করা হয়, গান্ধীর সত্যাগ্রহের সঙ্গে যার পুরোপুরি মিল থাকবে না, তা হলে সে-বিষয়ে ম. রল্যাঁর মনোভাব কী হবে?"

ম. রলাঁ বললেন, তিনি হতাশ হবেন, দুঃখিত হবেন, যদি গান্ধীর সত্যাগ্রহ ভারতকে স্বাধীনতা না এনে দেয়। মহাযুদ্ধের পরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও ঘৃণা যখন সমগ্র বিশ্বের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠছিল, গান্ধী রাজনৈতিক সংগ্রামের নতুন অস্ত্র নিয়ে এলেন, এক নতুন আলো ফুটে উঠল দিগন্তে। বিরাট এক আশা গান্ধী জাগিয়ে তুললেন সারা পৃথিবীতে।

আমি বললাম, "অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জেনেছি, এই জড়বাদী পৃথিবীর পক্ষে গান্ধীর পন্থা বড় বেশি উচ্চস্তরের, এবং রাজনৈতিক নেতার পক্ষে, প্রতিপক্ষের সঙ্গে তাঁর কাজ-কারবার বড় বেশি সরল ও অকপট। আমরা আরও দেখেছি, যদিও ভারতে ব্রিটিশদের কেউ চায় না, বাহুবল বেশি থাকায় ভারতে তারা তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছে, সত্যাগ্রহ আন্দোলন-জনিত নানা অসুবিধা সত্ত্বেও ও নানাভাবে উত্যক্ত হওয়া সত্ত্বেও। শেষ পর্যন্ত সত্যাগ্রহ যদি নিষ্ফল হয়, ম. রল্যাঁ কি চাইবেন জাতীয় আন্দোলন অন্য পন্থায় চলুক, নাকি তিনি ভারতীয় আন্দোলন সম্পর্কে নিস্পৃহ হয়ে পড়বেন?"

তিনি জোর দিয়ে বললেন, "যাই হোক না কেন, আন্দোলন চালিয়ে যেতেই হবে।"

"কিন্তু ইউরোপে ভারতের কয়েকজন বন্ধুর কথা আমি নিশ্চিত জানি যাঁরা আমাকে পরিষ্কার বলেছেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে তাঁদের আগ্রহ কেবলমাত্র গান্ধীর অহিংস প্রতিরোধের কারণেই।"

ম. রল্যাঁ তাঁদের সঙ্গে আদৌ একমত নন। তিনি বললেন, সত্যাগ্রহ ব্যর্থ হলে তিনি দুঃখিত হবেন, কিন্তু তাই যদি হয়, বাস্তব জীবনের কঠিন সত্যের মুখোমুখি হতেই হবে, এবং তিনি চাইবেন, আন্দোলন অন্য পন্থায় চলুক।

এই উত্তরটিই আমার সব চাইতে মনের মতো। তা হলে, এই একজন আদর্শবাদী, যিনি আকাশকুসুম রচনা করেন না, কঠিন মাটিতে পা দিয়ে চলেন।

আমি বললাম, "ইউরোপে অনেকে বলেন, ঠিক যেমন রাশিয়াতে পরপর দুটি বিপ্লব হয়েছিল, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, তেমনি ভারতেও পর-পর দুটি বিপ্লব হবে; একটি জাতীয়-গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। কিন্তু আমার মতে রাজনৈতিক স্বাধীনতার যে সংগ্রাম, তার সঙ্গে সঙ্গে চালাতে হবে সামাজিক-অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম। যে-দল ভারতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এনে দেবে সেই একই দল সামাজিক-অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সমগ্র কর্মসূচিও রূপায়িত করবে। এ বিষয়ে ম. রলাঁর কী মত?"

কোনও সুনির্দিষ্ট মত ব্যক্ত করা তাঁর পক্ষে কঠিন হল, কারণ ভারতের পরিস্থিতির সব তথ্য তাঁর জানা ছিল না।

আমি আরও বললাম, "ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের যুক্তফ্রন্ট নীতি যদি ভারতের স্বাধীনতা জয়ে ব্যর্থ হয়, এবং একটি মৌলিক পরিবর্তনকামী দলের উদ্ভব হয়, যে-দল কৃষক ও শ্রমজীবীদের স্বার্থের সঙ্গে নিজেকে এক করে দেখে, ম. রলাঁর মনোভাব সে-বিষয়ে কী হবে?"

ম. রল্যাঁর স্পষ্ট অভিমত, অর্থনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ে কংগ্রেসের এখন সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করার সময় এসেছে। "আমি গান্ধীকে ইতিমধ্যেই লিখেছি, এই বিষয়ে তাঁর মনস্থির করা উচিত।"

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে যদি বিভাজন হয়, সে ক্ষেত্রে তাঁর মত কী হবে, ব্যাখ্যা করে তিনি বললেন, "দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার আমার কোনও ইচ্ছা নেই। আমার যাতে আগ্রহ, যাকে আমি মূল্য দিই, সেটা হচ্ছে একটা উচ্চতর প্রশ্ন। আমার কাছে রাজনৈতিক দলের কোনও গুরুত্ব নেই। আমার কাছে যার মূল্য আছে সেটা হল উৎকর্ষের, যার দ্বারা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের মঙ্গলসাধন হবে। আরও স্পষ্ট ভাষায় বলতে

গেলে, দুর্ভাগ্যক্রমে গান্ধী (কিংবা যে কোনও দল) যদি শ্রমজীবীদের যে স্বার্থ, কিংবা সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের দিকে তাদের যে বিবর্তন অনিবার্য, তার বিরুদ্ধে যায়, যদি গান্ধী (কিংবা যে কোনও দলই হোক না কেন) যদি শ্রমিক স্বার্থের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যদি তা থেকে দূরে সরে যায়, তা হলে আমি চিরদিন উৎপীড়িত শ্রমজীবীদের পাশেই থাকব, তাদের প্রচেষ্টায় হাত মেলাব, কারণ ন্যায় বিচার তাদের দিকে, মানবসমাজের প্রকৃত ও অনিবার্য বিবর্তন তাদেরই অনুকূল।"

আমি যার-পর নাই আনন্দিত হলাম, বিস্মিত হলাম, কেননা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি এই বিরাট মনীষী এত খোলাখুলিভাবে, এমন স্পষ্টভাবে শ্রমজীবীদের স্বার্থকে সমর্থন করবেন।

আমাদের জোর আলোচনার ফলে ম. রলাঁর অশক্ত শরীরের কোনও ক্ষতি না হয়, আমার এই একটা ভয় ছিল। যাই হোক, আরাম পাওয়া গেল যখন চা-এর ডাক এল এবং আমরা সবাই পাশের ঘরে গেলাম।

চা-পানের সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের কথাও বলতে থাকল। আমাদের আড়াই ঘণ্টার আলোচনায় অনেক সমস্যা নিয়ে কথা হল। ম. রলাঁ Congress Socialist Party ও তার সংগঠন নিয়ে প্রবল আগ্রহ ব্যক্ত করলেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যক্তির কারাবাস যে চলছেই সে জন্য তাঁর দুশ্চিন্তা দেখলাম গভীর। মহাত্মা যা করছেন, যা বলছেন, যা লিখছেন, তার সব কিছু নিয়েই তাঁর আগ্রহ দেখে আমি অবাক হলাম। যেমন, পুরনো ফাইল থেকে তিনি মহাত্মার একটি বিবৃতি টেনে বের করলেন। তাতে মহাত্মা সমাজতন্ত্রে তাঁর আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন। মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে ও তাঁর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আমরা সুদীর্ঘ আলোচনা করলাম। আমি সাহস করে বলে ফেললাম, অর্থনৈতিক বিভিন্ন প্রশ্ন সম্পর্কে মহাত্মা সুনির্দিষ্ট মতামত প্রকাশ করবেন না। রাজনৈতিক প্রশ্নেই হোক, কিংবা সামাজিক কী অর্থনৈতিক প্রশ্নেই হোক, স্বভাবত তিনি মধ্যপন্থায় বিশ্বাসী। তারপরে আমি তরুণতর প্রজন্ম যাকে তাঁর নেতৃত্ব এবং রণকৌশলের ত্রুটি বলে মনে করে, তার কথা বললাম, অর্থাৎ সব-কিছু খোলাখুলি বলার তাঁর দুরপনেয় অভ্যাস, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে সামাজিক ভাবে একঘরে করার নীতিতে তাঁর আপত্তি, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের হৃদয়ের পরিবর্তন হবে, তাঁর এমন আশা, প্রভৃতি। তাঁর বিরুদ্ধতা করতে, এমনকী তাঁকে সমালোচনা করতেও আমাদের ভাল লাগে না, যখন দেশের জন্য তিনি যা করেছেন সাম্প্রতিক কালে অন্য কেউ তত করেননি, যখন সারা বিশ্বের চোখে ভারতকে তিনি অনেক ওপরে তুলে দিয়েছেন। কিন্তু আমরা কোনও ব্যক্তিকে যত ভালবাসি দেশকে তার চেয়ে বেশি ভালবাসি।

আমি ম. রলাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, সারাজীবন যে-সব মূলনীতির জন্য তিনি সংগ্রাম করেছেন, যে-সব নীতির তিনি প্রতিভূ, দয়া করে সংক্ষেপে তার কথা বলবেন কি না? তিনি বললেন, "সে-সব মূল নীতি হল, (১) আন্তর্জাতিকতাবাদ (যার অন্তর্গত, সমস্ত জাতির সমান অধিকার, কোনও ভেদাভেদ ব্যতিরেকে), (২) শোষিত শ্রমজীবীদের প্রতি ন্যায়বিচার। অর্থাৎ এমন এক সমাজের জন্য আমাদের সংগ্রাম করতে হবে যে-সমাজে কোনও শোষক ও কোনও শোষিত থাকবে না, সকলকেই সমগ্র সমাজের জন্যে শ্রম করতে হবে, (৩) সমস্ত নিপীড়িত জাতির জন্য স্বাধীনতা, এবং (৪) পুরুষ-নারীর সমান অধিকার, তারপর তিনি এর মধ্যে কোনও-কোনও বিষয়ের ব্যাখ্যা করলেন।

আমাদের কথোপকথন যখন শেষ হয়ে আসছে আমি বললাম, সে-অপরাহ্ণে যে-সব মত তিনি ব্যক্ত করলেন, অনেকের মধ্যে তাতে বিস্ময়ের সৃষ্টি হবে, কারণ তাঁর চিন্তা-জীবনে মনে হয় সেগুলোর প্রবেশ নতুন। এই মন্তব্যে যেন তাঁর মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে গেল, নতুন একটা চিন্তা-স্রোত বইতে লাগল। ম. রঁলা বলতে আরম্ভ করলেন, যুদ্ধের পর থেকে তাঁর সামাজিক

ভাবনাগুলি, তাঁর সমগ্র আদর্শবাদ নিয়ে নতুনভাবে চিন্তাভাবনা করতে গিয়ে তাঁকে কী মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। "আমার এই মানসিক সংঘাত চলেছে ব্যাপক ক্ষেত্র জুড়ে। অহিংসা তার একটি অংশ মাত্র। আমি যে অহিংসার বিপক্ষে কোনও সিদ্ধান্ত করেছি তা নয়, কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত করেছি যে অহিংসা আমাদের সমস্ত কার্যকলাপের কেন্দ্র হতে পারে না। অহিংসা শুধু হতে পারে তার অন্যতম উপায়, পরীক্ষা-সাপেক্ষ। আমাদের সকল প্রচেষ্টার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এক বিকল্প সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তন, অধিকতর ন্যায়সঙ্গত, অধিকতর মানবিক .....। তা যদি আমরা না করি, সমাজ বলে কিছু থাকবে না।" কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে তিনি বলেন, "... কয়েক বছর ধরে আমার কাজ হয়েছে সেইসব শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করা ..... সেই প্রাচীন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যা মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করছে, শোষণ করছে। আমস্টারডামে ১৯৩২ সালে যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী যে বিশ্ব কংগ্রেস হয়েছিল সেখানে, এবং সেই কংগ্রেস যে স্থায়ী কমিটি গঠন করেছিল তাতে আমার সেইটাই কাজ ছিল। আমি এখনও বিশ্বাস করি যে অহিংসার মধ্যে অপ্রকট হলেও এক প্রবল বৈপ্লবিক শক্তি আছে যার ব্যবহার করা যেতে পারে এবং করা উচিত।..."

এখানে এসে আমি তাঁর কথার মাঝখানে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁর বর্তমান চিন্তা-ভাবনার কথা বিশ্ববাসী কী করে জানতে পারবে? তার উত্তরে তিনি বললেন, "আমার গত পনেরো বছরের সামাজিক ধ্যান-ধারণা সম্প্রতি প্রকাশিত আমার প্রবন্ধ-সংকলনের দুটি খণ্ডে আমি ব্যাখ্যা করেছি। প্রথম যে খণ্ডটি 'Quinze ans de Combat' (পনেরো বছরের সংগ্রাম), Editions Rieder, Boulevard St. Germain 108, Paris VI, তাতে আমি বলেছি আমার অভ্যন্তরীণ সংঘাত ও আমার সামাজিক ধারণাসমূহের বিবর্তনের কথা। দ্বিতীয় গ্রন্থ, 'Par la Revolution La Paix' (বিপ্লবের দ্বারা শান্তি) Editions Sociales Internationales, 24 Rue Racini, Paris VI.। তাতে আমি আলোচনা করেছি যুদ্ধ শান্তি ও অহিংসার প্রশ্ন... এবং পুরনো সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের প্রচেষ্টার মধ্যে সমন্বয়-সাধন।" তিনি তারপর বললেন, তাঁর বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজন তাঁর সমস্ত রচনাকে স্বীকার করেননি, কেবলমাত্র যে-গুলোর সঙ্গে তাঁরা একমত, সেগুলোকেই খালি স্বীকার করেন। যাই হোক, এই দুটি গ্রন্থে[১] তাঁর চিন্তায় বিবর্তনের যথার্থ ইতিহাস লিপিবদ্ধ থাকবে।

ইউরোপের যুদ্ধের যে আশঙ্কা সবাই করছে যা নিয়ে সবাই আলোচনা করছে, তার কথা না তুলে অবশ্য আমাদের আলোচনা শেষ হল না। আমি মন্তব্য করলাম, "যে-সব মানুষ, যে-সব জাতি অবদমিত, যুদ্ধ তাদের জন্যে অবিমিশ্র ক্ষতিকারক হয় না।" "কিন্তু ইউরোপের পক্ষে যুদ্ধ হবে বৃহত্তম সর্বনাশ," তিনি বললেন, "যুদ্ধের ফলে সভ্যতার বিনাশও হতে পারে। এবং রাশিয়ার পক্ষে শান্তি যার-পর-নাই প্রয়োজন, যদি সামাজিক পুনর্গঠনের কর্মসূচি তাকে সম্পূর্ণ করতে হয়।"

ম. রলাঁর কাছে বিদায় নেওয়ার আগে, তাঁর সহৃদয়তার জন্যে গভীর কৃতজ্ঞতার এবং আমার কাছে তিনি যা ব্যক্ত করেছেন, তার জন্যে অপরিমেয় সন্তোষের কথা তাঁকে জানালাম। ভারতের প্রতি, ভারতের আকাঙ্খিত লক্ষ্যের সম্পর্কে তাঁর যে সহানুভূতি আমার চোখে এত মূল্যবান যে ভারতের সর্বশেষ পরিস্থিতি ও ঘটনাবলি সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া যখনই কল্পনা করবার চেষ্টা করেছি, উদ্বেগ ও আশঙ্কায় আমার মন পূর্ণ হয়েছে।

ভিলা ওলগা থেকে যখন বেরিয়ে আসছিলাম, জেনেভা হ্রদের নীল জলের ওপর সূর্যের আলো তখন ঝকমক করছিল। আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল তুষারমৌলি পর্বতমালা। বায়ুতে

১ আমি সদ্য এই বই দু'খানি লেখকের কাছ থেকে উপহার পেয়েছি। দুঃখের বিষয় আমি মূল ভাষায় বই দুটি পড়তে অক্ষম। ইচ্ছা হচ্ছে, শুধু ওই দুটি পড়বার জন্যে ফরাসি ভাষা শিখি।

আনন্দ ভরপুর, আমার মধ্যেও তাঁর সংক্রমণ হল। মনের ওপর থেকে বিরাট একটা বোঝা নেমে গেছে। আমার মনে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না, ভারতে অদূর ভবিষ্যতে যাই ঘটুক, ভবিষ্যতে তার কর্মপন্থা যাই হোক, এই বিরাট চিন্তক ও শিল্পী চিরদিন ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে, ভারতের পক্ষে থাকবেন। এই দৃঢ়বিশ্বাস নিয়ে আনন্দিত চিত্তে আমি জেনেভা ফিরে এলাম।[১]

কার্লসবাড
২.৭.৩৫

আবিসিনিয়ার রহস্য ও তার শিক্ষা[২]

আবিসিনিয়ার ভাগ্য এখন অনিশ্চিত। সে-দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। কিন্তু আফ্রিকার ওই অঞ্চলে যাই ঘটুক, আবিসিনিয়ার শিক্ষা মানবজাতির উত্তরাধিকার হিসাবে থেকে যাবে।

সে শিক্ষা কী?

সে-শিক্ষা হল এই, যে বিংশ শতাব্দীতে কোনও জাতি স্বাধীনতার আশা করতে পারে, একমাত্র যদি সে সাংগঠনিক ও সামরিক, উভয়তই শক্তিশালী হয়, যদি আধুনিক বিজ্ঞানের প্রদত্ত সমস্ত জ্ঞানলাভ করতে সক্ষম হয়।

প্রাচ্যজগৎ একটু-একটু করে পাশ্চাত্যের অধিকারে চলে গেছে। তার কারণ সে আত্মতৃপ্তিতে নিজেকে মুড়ে রেখেছিল, কয়েক শতাব্দী ধরে স্বর্গীয় (?) সন্তোষ নিয়ে জীবন যাপন করছিল, এবং মানবিক এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সঙ্গে সমানতালে চলতে অস্বীকার করেছিল। বিশেষত যুদ্ধবিদ্যায়। অন্যান্য প্রাচ্য দেশের সঙ্গে ভারত ও ব্রহ্মদেশও এই কারণে দুর্দশা ভোগ করেছে। জাপান, তুরস্ক ও পারস্যদেশ এখনও প্রাণবন্ত, কেননা তারা সময় থাকতে নিজেদেরকে আধুনিক করে তুলেছে।

প্রাচ্যের অবশিষ্ট অংশের মতো জাপানও একদা বিচ্ছিন্ন হয়ে শান্তিতে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু মার্কিন কামান তাদের কানে এক প্রবল চ্যালেঞ্জ-এর মতো গর্জন করে উঠল। সে দেখল, হয় তাকে এক শক্তিশালী আধুনিক জাতি হিসাবে বিশ্ব অর্থনীতি ও বিশ্ব রাজনীতির মল্লভূমিতে প্রবেশ করতে হবে, নয়ত পাশ্চাত্যের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হবে। সে প্রথম প্রস্তাবটিই বেছে নিল, সময় থাকতে নিজেকে ঝাঁকিয়ে সক্রিয় করে তুলল, এবং ৫০ বছরের মধ্যে এক শক্তিশালী আধুনিক জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল। তার স্বাধীন অস্তিত্বের সামনে একটি পাশ্চাত্যশক্তির চ্যালেঞ্জ যখন এল, তার মধ্যে সে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছে। যথা সময়ে তার সে প্রস্তুতি তাকে রক্ষা করল। এই কঠিন পৃথিবীতে একমাত্র যে যোগ্যতম সেই বাঁচতে পারে।

আবিসিনিয়া কোনও নতুন সমস্যা নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইউরোপের বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশ— ব্রিটেন, ফ্রান্স, এবং ইতালি তার দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাতে আরম্ভ

১. ভারতে বলবৎ মুদ্রণ-আইন, আমরা যতদূর বুঝতে পেরেছি, তার সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য আমরা প্রবন্ধের কোনও-কোনও অংশ বর্জন করেছি। সেই অংশগুলো ডট্ চিহ্ন-দ্বারা সূচিত। (সম্পাদক)
২. মডার্ন রিভিউ, নভেম্বর ১৯৩৫ সংখ্যায় প্রকাশিত।

করেছিল। তারা সবাই সেই সমৃদ্ধির সম্ভাবনাপূর্ণ দেশটি কব্জা করতে চাইল, কিন্তু প্রতিহত হল শুধু সাহসী রণদুর্মদ সেই জাতির জন্য নয়, সেখানকার পার্বত্য, দুর্গম ভূ-প্রকৃতির জন্যও। আবিসিনিয়াতে ম্যাগডালার লর্ড নেপিয়ার-এর নিষ্ফল সামরিক অভিযানের কথা (ম্যাগডালা আবিসিনিয়ার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত), এবং ১৮৬৮ সালে ব্রিটিশদের আক্রমণে সম্রাট থিয়োডোর-এর পতনের কথা কারও পক্ষে ভোলা সম্ভব নয়। নিজেদের মধ্যে তারা আবিসিনিয়াকে ভাগ বাঁটোয়ারা করে যখন নিতে পারল না, (অবশিষ্ট আফ্রিকা আগেই ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছিল) তারা চারিপাশের সমস্ত অঞ্চল দখল করে নিল, আফ্রিকাকে সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। তাই ম্যাপ দেখলে দেখা যাবে আবিসিনিয়াকে ঘিরে রেখেছে সুদান (ব্রিটিশ), কেনিয়া (ব্রিটিশ), ইতালিয়ান সোমালিল্যান্ড, ব্রিটিশ সোমালিল্যান্ড, ফ্রেঞ্চ সোমালিল্যান্ড এবং এরিট্রিয়া (ইতালি)।

ইতালির স্বাধীনতালাভ এবং একীকরণ হল ১৮৬১-তে, যদিও দেরি করে এবং জার্মানির একীকরণ হল ১৮৭০ সালে। ততদিনে ঔপনিবেশিক জগৎটাকে অন্য ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো ভাগাভাগি করে নিয়ে নিয়েছে। তাই ইতালি এবং জার্মানিকে দেখা গেল সাম্রাজ্যবাদী 'সর্বহারা'-দের দলে। বিসমার্কের অধিনায়কত্বে জার্মানি আশা করেছিল দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকার কিছু-কিছু অংশ, এবং ইতালির চোখ পড়েছিল আবিসিনিয়া ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলের দিকে।

আফ্রিকাতে ইতালির অনুপ্রবেশ আরম্ভ হল গত শতাব্দীর আটের দশকে, যখন আবিসিনিয়ার একীকরণ হয়নি। উভয় অংশ শাসন করতেন সম্রাট জন, এবং দক্ষিণ অংশ সম্রাট মেনেলিক। অন্যান্য সব অঞ্চল কার্যত স্বাধীন ছিল। সেই সময়কার আবিসিনিয়ার অধিবাসীরা, নৃতাত্ত্বিক কিংবা ধর্মীয়, কোন দিক থেকেই সমজাতীয় ছিল না। ১৮৮৯ সালে Dervish বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধে সম্রাট জনের মৃত্যুর ফলে সম্রাট মেনেলিক-এর অধীনে আবিসিনিয়ার একীকরণের পথ পরিষ্কার হল। মেনেলিক, যিনি Negus Negast (রাজার রাজা) পদবিতে ভূষিত হয়ে সিংহাসনে আরোহণ করলেন, তিনি সৈনিক এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানী দু'-হিসাবেই বড় ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে ইতালীয়দের সঙ্গে এক বৃহৎ সংগ্রাম আরম্ভ হল, যার পরিণতি হল ১৮৯৬ সালে আডোয়া-তে ইতালীয় বাহিনীর বিনাশে। সেই থেকে ইতালীয়রা আডোয়া-কে মনে রেখেছে এক পরাজয় হিসাবে, যার প্রতিশোধ নিতে হবে।

১৮৯৬-এর পর আবিসিনিয়া প্রায় চল্লিশ বছর রেহাই পেয়েছিল। সেই সময়ের মধ্যে যদি সে-দেশ তার মানুষকে শক্তি দিতে পারত, আধুনিক করে তুলতে পারত, যেমন জাপানিরা করেছিল, তা হলে তারা হয়তো রক্ষা পেত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে-কাজ তারা করতে পারেনি, তাই তার ভবিষ্যৎ আজ অন্ধকার। তার জন্য দোষ আবিসিনিয়ার সর্বোচ্চ শাসকবর্গের নয়। তাঁরা দেশপ্রেমিক, কর্মদক্ষ, রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ। দোষ দেশবাসীর। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বর্তমান সম্রাট এখনকার সঙ্কটকালে এমন অপূর্ব কূটনীতিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রনীতিজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন, যে-একজন প্রথম শ্রেণির ব্রিটিশ রাজনীতিকের কাছ থেকেই তা আশা করা যায়। কিন্তু বিভিন্ন উপজাতি ও বিভিন্ন রাজবংশের মধ্যে ঈর্ষা বিদ্যমান। (তার একটি দৃষ্টান্ত, সম্রাটের জামাতা, যিনি সম্রাট জনের বংশধর তার দলত্যাগ করে ১২ অক্টোবর ইতালীয়দের সঙ্গে যোগদান)। দেশবাসীর অধিকাংশ নিরক্ষর, ক্রীতদাস প্রথা এখনও বহাল এবং শেষতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আডোয়া-র জয়ের গৌরব আবিসিনিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে একটা অমূলক নিরাপত্তার অনুভূতি সৃষ্টি করেছিল। এই নিরাপত্তাবোধই তাঁদের ধ্বংস ডেকে আনবে, যখন, যুদ্ধক্ষেত্রে তারা দেখবে যে ১৯৩৫-এর ইতালীয়রা ১৮৯৬-এর ইতালীয় নয়। দেখবে, আডোয়াতে যখন তারা ইতালিকে পর্যুদস্ত করেছিল তার পর থেকে যুদ্ধবিদ্যার দ্রুত অগ্রগতি হয়েছে।

অস্ত্রবলে আবিসিনিয়াকে দমাতে না পেরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ এই শতাব্দীর প্রথম

থেকে কূটনৈতিক চক্রান্ত আরম্ভ করল। সে-কাহিনি লন্ডনের 'নিউ লিডার' তার ২৩ অগাস্টের সংখ্যায় প্রকাশ করেছে। (এই কাহিনির সঙ্গে একটি টীকা যোগ করে আমি শুধু বলব, ১৯২৩-এর সেপ্টেম্বরে আবিসিনিয়াকে জাতিসঙ্ঘের সদস্য করা হয়। ব্রিটিশ সরকারের আপত্তি সত্ত্বেও)

দেশভাগের পরিকল্পনা

এর আগে ব্রিটেন মেনে নিয়েছিল আবিসিনিয়া ইতালির প্রভাবাধীন অঞ্চল। কিন্তু তারা ইতালির পরাজয়ের সুযোগ গ্রহণ করে, নিজেদের দাবি তুলল। ১৯০৬ সালে তিনটি সাম্রাজ্যবাদীশক্তি, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালি, একটি চুক্তি স্বাক্ষর করল, যাতে ইঙ্গিত থাকল নিজেদের মধ্যে তারা আবিসিনিয়াকে ভাগ করে নেবে। সেই চুক্তিতে, সচরাচর যেমন থাকে, একটি কপট সূত্র থাকল আবিসিনিয়ার অখণ্ডতা সুনিশ্চিত করা সম্পর্কে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রিটেনকে দেওয়া হল নীল নদের উৎস নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার, ইতালিকে সার্বভৌম প্রতিষ্ঠা দেওয়া হল পশ্চিম আবিসিনিয়ায় এবং রেলপথের অঞ্চলের ওপর কর্তৃত্ব পেল ফ্রান্স।

ইতালিকে ক্রয়

এই সাম্রাজ্যবাদী তস্করতার কাহিনির দ্বিতীয় পর্যায় দেখা গেল মহাযুদ্ধের আরম্ভের সময়ে। চুক্তি অনুযায়ী ইতালির মৈত্রী ছিল জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার সঙ্গে, কিন্তু ফ্রান্স ও ব্রিটেন তাকে ক্রয় করে নিল। তারা এক গোপন চুক্তি স্বাক্ষর করল। তাতে ইতালীয় সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল তার পূর্ব আফ্রিকার উপনিবেশগুলিকে বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে, আবিসিনিয়াকে খণ্ডিত করে।

যুদ্ধের পর ব্রিটেন নীল নদের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিত করতে চাইল সানা হ্রদে একটি বাঁধ নির্মাণ করে। ইতালি সে-দাবি সমর্থন করতে রাজি হল এই শর্তে যে, পরিবর্তে ব্রিটেন পশ্চিম আবিসিনিয়াতে ইতালির একচ্ছত্র অর্থনৈতিক প্রভাব স্বীকার করে নেবে। ব্রিটেন তাতে সম্মত হল না। তার ভয় ছিল, ফ্রান্স অসন্তুষ্ট হতে পারে। সে ভেবেছিল ইতালির সমর্থন ছাড়াই কার্যসিদ্ধি করবার ক্ষমতা তার আছে। সে যেন কত নীতি-পরায়ণ, এমন একটা ভাব দেখিয়ে ইতালিকে বলল, ইতালির একচ্ছত্র প্রভাবের দাবিতে ১৯০৬-এর চুক্তির খেলাপ হবে, যে চুক্তিতে আবিসিনিয়ার অখণ্ডতা স্বীকৃত।

ছ' বছর পর অবস্থার পরিবর্তন হল। আবিসিনিয়ার সরকার ব্রিটেনের দাবি মানতে রাজি হল না। ব্রিটিশ সরকার ইতালির সমর্থন চাইল। ১৯০৬ সালের চুক্তিতে যে আবিসিনিয়ার অখণ্ডতা রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি ছিল সে-কথা তারা ১৯১৯ নাগাদ বেমালুম ভুলে গেল। সমগ্র পশ্চিম আবিসিনিয়ার ওপর ইতালির দাবি তারা স্বীকার করে নিল।

তখন অপ্রত্যাশিত ভাবে এল একটা প্রতিরোধ। আবিসিনিয়ার সরকার ব্রিটেন ও ইতালির পারস্পরিক বোঝাপড়া খারিজ করে দিয়ে ভয় দেখাল জাতিসঙ্ঘের সামনে সে এই সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ফাঁস করে দেবে।

সে-দিক দিয়ে এগোতে না পেরে ব্রিটেন অন্য কৌশল প্রয়োগ করল, আবিসিনিয়াকে সে লোভ দেখাল, ব্রিটিশ সোমালিল্যান্ডের ভিতর দিয়ে সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত ৬০০ বর্গমাইল একটি সংকীর্ণ ভূখণ্ড উপহার দেবে। এই প্রস্তাব যে গৃহীত হবে সে-বিষয়ে ব্রিটিশ সরকার এত দূর নিশ্চিত ছিল যে ১৯২৬ সালে মানচিত্র একটি প্রকাশিত হল, যাতে Zelia বন্দর

আবিসিনিয়ার অন্তর্গত হিসাবে দেখান হল। এই প্রস্তাব আবিসিনিয়া খারিজ করে দেওয়াতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা অবাক হয়ে গেল। লোভের বশে তারা স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে রাজি হল না।

যাই হোক, ১৯২৮ সালে ইতালি এবং আবিসিনিয়া একটি মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করল। তাতে ব্যবস্থা থাকল, ২০ বছর কাল সমস্ত বিসংবাদ-এর ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা স্বীকার করা হবে। একই সঙ্গে আরও একটি চুক্তি হল, যার দ্বারা ইতালীয় এরিট্রিয়াতে Assab বন্দরে আবিসিনিয়াকে একটি মুক্ত অঞ্চল প্রদান করা হল। স্পষ্টত এ পর্যন্ত দুটি দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের মনোভাব ছিল। তার পরেই অকস্মাৎ আবিসিনিয়ার বৈদেশিক নীতিতে একটা পরিবর্তন হল। কারিগরি বিশেষজ্ঞ, রাজনৈতিক পরামর্শদাতা ও সামরিক অফিসার হিসাবে বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ব্রিটেন ও সুইডেন প্রভৃতি ইউরোপের অন্য দেশের অধিবাসীদের আনা হল, এবং ইতালিয়ানদের সযত্নে বাদ দেওয়া হল। ১৯৩৪-এর প্রারম্ভে আবিসিনিয়ার সরকারের ওপর ইতালীয় প্রভাব প্রায় কিছুই থাকল না, ব্রিটেনের প্রভাব বাড়তে আরম্ভ করল। উপরন্তু বলা হতে লাগল, সানা হ্রদের জল সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার আবিসিনীয় সরকারের সঙ্গে একটি স্বতন্ত্র গোপন চুক্তি করেছে, ইতালি যার কথা জানে না এবং যাকে সমর্থন করে না। পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে মুসোলিনি লাভাল-এর সঙ্গে আবিসিনীয় সরকার সম্পর্কে একটি বোঝাপড়া করলেন এবং ফ্রাঙ্কো-ইতালিয়ান চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এই চুক্তিতে ইতালিকে আবিসিনিয়াতে ইচ্ছানুযায়ী কাজ করবার অবাধ অধিকার দেওয়া হল।

পত্রপত্রিকায় যাবতীয় লেখা এ সম্বন্ধে বেরিয়েছে, তাতে এ-প্রশ্নের উত্তর কদাচিৎ কেউ দিয়েছেন, যে ঠিক এই সময়ে মুসোলিনি কেন আবিসিনিয়ায় নামলেন। যুদ্ধে নামার দুটি কারণ, প্রথমত মুসোলিনির মনে হল, লোহিত সাগরের অন্য পারে, আরব দেশে যেমন, তেমনি আবিসিনিয়াতেও ব্রিটিশ প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং এই বৃদ্ধি যদি বিনা বাধায় চলতে থাকে, আবিসিনিয়া থেকে ইতালির প্রভাব সম্পূর্ণ লোপ পাবে। দ্বিতীয়ত, মুসোলিনির আরও মনে হল, ইউরোপের যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে তিনি দু'-তিন বছরের অবকাশ পাবেন এবং আবিসিনিয়ার যুদ্ধ শুরু করার এইটেই সুযোগ। বস্তুত, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ইউরোপে আসন্ন যুদ্ধের সঙ্গে আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সম্পর্ক ১৯১৪-১৮র মহাযুদ্ধের সঙ্গে ১৯১১-১৩র ত্রিপলি ও বল্কান যুদ্ধের সম্পর্কের মতো।

এখন প্রশ্ন, আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সঙ্গে কী কী প্রশ্ন জড়িত। এর উত্তর দিতে গেলে আবার ২৩ অগাস্ট লন্ডনের নিউ লিডার-এর শরণাপন্ন হতে হয়:

"আবিসিনিয়া আফ্রিকা মহাদেশের সর্বশেষ স্বাধীন রাষ্ট্র। আফ্রিকার অন্য সব অঞ্চল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো ভাগাভাগি করে নিয়েছে। সবচাইতে বড় ভাগটি ব্রিটেন আগেই হস্তগত করেছে। যেটুকু অবশিষ্ট আছে, আর কোনও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কব্জা করবার আগেই ইতালি দখল করতে বদ্ধপরিকর।

চারটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আছে, যাদের নজর আবিসিনিয়ার ওপর।

ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা অত্যন্ত চিন্তিত, কারণ আবিসিনিয়াতে আছে সানা হ্রদ, নীলনদের উৎস, যে নীল নদ সুদান ও মিশরের তুলোর ক্ষেতে জল যোগায়। ব্রিটিশ পুঁজি লগ্নীকারকেরা চিন্তিত কারণ আবিসিনিয়া ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে, যেটি হল এই ব্যাঙ্ক মিশরীয় ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণাধীন।

ফরাসি পুঁজিপতি-সাম্রাজ্যবাদ একমাত্র রেলপথকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই রেলপথ, ফরাসি বন্দর জিবুটির সঙ্গে আবিসিনিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবার যোগসূত্র।

জাপানি পুঁজিপতি সাম্রাজ্যবাদ চিন্তিত কারণ তাদের দখলে বৃহৎ-বৃহৎ ভূখণ্ড যেখানে কাঁচা

তুলোর চাষ হয়, এবং তৈরি করা সুতি-সামগ্রীর আবিসিনীয় বাজার কার্যত তাদের একচেটিয়া দখলে।

কেউ যেন মনে না করেন, ব্রিটিশ এবং ফরাসি এবং জাপানি সরকার যে এখন ইতালির দাবির বিরোধিতা করছে, তার কারণ আবিসিনিয়ার প্রতি তাদের ভালবাসা, কিংবা মানবাধিকার কিংবা শান্তির তারা বড়-বড় ধ্বজাধারী।

সোজা কথা, এ হল তস্করদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ। ব্রিটিশ, ফরাসি ও জাপানি সরকারের আপত্তির কারণ, মুসোলিনি সবকিছুর ওপরেই থাবা বসাতে চাইছেন।"

ব্রিটিশ সরকার যখন প্রথম বুঝতে পারল মুসোলিনি মিথ্যা ভয় দেখাচ্ছেন না, তারা অস্পষ্ট মনোভাব দেখাল। এই নতুন মনোভাব প্রকাশ পেল 'মর্নিং পোস্ট'-এ যেটি হল জেনারেল অ্যাডমিরাল ও সামরিক বাহিনীর মুখপত্র। ২২ অগাস্ট সম্পাদকীয় মন্তব্যে পত্রিকাটি লিখল:

> "আবিসিনিয়াতে পরীক্ষা হবে আমরা কোনও ধাতুতে গড়া। এই অপমান যদি আমরা নিরীহভাবে মেনে নিই, তা হলে কি ধরে নেওয়া যায় না, যে ভবিষ্যতে আরও গুরুতর কোনও অপমান আমাদের দিয়ে স্বীকার করিয়া নেওয়া হবে? এই একটা ধারণাকে বিদেশে কোনও-কোনও মহলে উৎসাহিত করা হচ্ছে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অপেক্ষা করে আছে, অন্য সব জাতি এসে তাকে ভাগাভাগি করে নিক। ভবিষ্যৎ তাদেরই হাতে। এই ধারণার যত শীঘ্র অবসান ঘটানো যায়, পৃথিবীতে শান্তির পক্ষে ততই ভাল। এখন সময় এসেছে আমাদের সকলকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেওয়ার, যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিক্রিও হবে না, কেউ চাইলে তাকে দান করাও হবে না।"
>
> "এইসব গুরুত্বপূর্ণ কথা-বার্তার পর জনসাধারণ আরও বিচলিত এই সব খবর পড়ে যে সামরিক বিভাগ সিদ্ধান্ত নিয়েছে সুদানে আরেক ব্যাটালিয়ান সৈন্য পাঠাবে, মাল্টা এবং এডেনে সামরিক শক্তি আরও বাড়াবে, আবিসিনিয়ার রাজধানীতে জাতীয় সৈন্যবাহিনীর একটি শক্তিশালী অংশ পাঠাবে সেখানকার ব্রিটিশ দূতাবাসের প্রহরীদের শক্তিবৃদ্ধি করবার জন্য এবং ভূমধ্যসাগরের নৌবহরকে সামরিক তৎপরতার জন্য প্রস্তুত করতে।"

এক অসাধারণ বিজ্ঞপ্তি

একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়াতে বেরিয়ে পড়ে, এবং তার পরেই চাপা দিয়ে দেওয়া হয়। গত সপ্তাহে সারা ব্রিটেনে সাব-পোস্টমাস্টারেরা এই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি পেয়েছিলেন, "Partial or General Mobilization" শীর্ষক ঃ

'অগ্রিম মাশুল আদায়-ব্যতীত টেলিগ্রাম গ্রহণ। বর্তমান জরুরি অবস্থার কারণে সামরিক দপ্তরের কাজে অভ্যন্তরীণ অথবা বৈদেশিক টেলিগ্রাম অগ্রিম মাশুল আদায় ব্যতিরেকে প্রেরণের জন্য গৃহীত হবে, যদি সামরিক দপ্তরের কোনও স্থায়ী পদাধিকারী অফিসার অথবা কোনও সামরিক অফিসারের প্রদত্ত প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র থাকে।

কর্তৃপক্ষ ব্যাখ্যা করে বলেছে, এই বিজ্ঞপ্তি ভ্রম বশত প্রচারিত হয়েছিল। মনে হয়, এই ফর্ম(C18149) ৩২০০০ ছাপা হয়েছিল গত মাসে, সরকারি ছাপাখানায়। কিন্তু তৎক্ষণাৎ এগুলির ব্যবহার করার উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু বিজ্ঞপ্তটি যে রচিত হয়েছিল, সেই ঘটনাই যথেষ্ট উদ্বেগজনক।'

ওই সংখ্যাতেই 'নিউ লিডার' পত্রিকা এই সব সামরিক প্রস্তুতির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছে:

"এই ঘটনাগুলির কারণ কী? ইতালি আবিসিনিয়াতে সানা হ্রদে নীল নদের উৎসস্থল নিয়ন্ত্রণ

করবে, এবং তার ফলে সুদান ও মিশরে ব্রিটেনের তুলোর ক্ষেতে জল-সেচের ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হবে, এই আশঙ্কা; আবিসিনিয়ায় ইতালীয় আধিপত্য তাকে সুয়েজ খাল বন্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতা দেবে, লোহিতসাগর নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দেবে, ভারতে যাওয়ার সমুদ্রপথ নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষমতা দেবে, এই সব সম্ভাবনাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের যথেষ্ট শিরঃপীড়ার কারণ হয়েছিল।

মুসোলিনি আভাস দিচ্ছেন, পূর্ব ভূমধ্যসাগরে ব্রিটিশ আধিপত্য কেন বজায় থাকবে, তার কোনও কারণ তিনি দেখছেন না। পূর্বভূমধ্যসাগরে এবং উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় স্থিতাবস্থা মুসোলিনি বিপন্ন করে তুলেছেন। সোজা কথায়, মধ্যপ্রাচ্য, ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যোগাযোগের যে পথ তার কেন্দ্রস্থলটি তিনি বিপন্ন করেছেন।

ইতালির এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেহেতু জাতীয় সরকার এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা হৃদয়ঙ্গম করেছেন, সেই কারণে তাঁরা স্থির করেছেন, যে-কোনও উপায়ে মুসোলিনিকে আটকাবেন। জাতিসঙ্ঘের যে সব শান্তিমূলক ব্যবস্থা, তার প্রতি সমর্থনের এত উৎসাহ শান্তির প্রতি ভালবাসা কিংবা আবিসিনিয়াকে বাঁচাবার জন্য নয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁদের শিরঃপীড়ার প্রকৃত কারণগুলো এই সব 'নৈতিক' উদ্দেশ্যের পিছনে যে আভাস করে রেখেছেন, তার কারণ জাতিসঙ্ঘের প্রতি যারা অনুরক্ত, শান্তির যারা পক্ষপাতী তাদের সমর্থন তারা পেতে চায়। প্রকৃতপক্ষে শান্তির প্রতি যে আগ্রহ তাকে তারা কাজে লাগাচ্ছে যুদ্ধের জন্য ব্রিটিশ জনসাধারণকে প্রস্তুত করতে।

প্রথমে আবিসিনিয়ার জন্য সর্বত্র সহানুভূতির এমন একটা ঢেউ উঠেছিল, যে সম্ভবত ফ্রান্স ছাড়া, এবং অন্যত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যতীত কেউ বুঝতে পারেনি, যে গ্রেটব্রিটেনের যুদ্ধপন্থী দলটির প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ সাম্রাজ্যবাদী। জাতিসঙ্ঘের প্রতি ব্রিটেনের নবজাগ্রত প্রেম ফ্রান্স সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছিল, যে জাতিসঙ্ঘকে ইতালি অবজ্ঞা করেছিল। ফ্রান্সের অবিশ্বাসের কারণ, তাকে না জানিয়ে, তার সম্মতি ছাড়াই ইঙ্গ-জার্মান চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, এবং সেই কারণে ফ্রান্স ক্ষুব্ধ ছিল। সে-চুক্তি ভার্সাই নৌ-চুক্তি ভঙ্গ করে জার্মানির বে-আইনি অস্ত্রসজ্জাকে পুনরায় আইনসঙ্গত করেছিল। যে-সব ফরাসিরা সন্দেহ পোষণ করেছিলেন, তাঁরা নিজেদের সমর্থনে মনে করিয়ে দিলেন, যে জাপান যখন জাতিসঙ্ঘকে অগ্রাহ্য করে চিনের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করেছিল তখন, এবং বলিভিয়া এবং প্যারাগুয়ে যখন, উভয় দেশই জাতিসঙ্ঘের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও, পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল, তখন ব্রিটেন চুপ করে ছিল।

এবার বলি, ব্রিটেন যখন তার সমগ্র সাম্রাজ্যকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বার উপক্রম করেছে, সেই সময় এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটল। অকস্মাৎ দূর দিগন্তে হিটলারের ছায়াপাত হল, এবং তাতেই ব্রিটেনের যে প্রসারিত হাতখানি ইতালিকে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছিল, সেই হাতটি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেল।

ব্রিটেন তার ইতালি-বিরোধী নীতির স্বপক্ষে যে কূট কৌশলে ব্রিটেনের অভ্যন্তরে এবং বিদেশে জনমত একত্র করল তার তারিফ করতে হয়। ১৯১৪ সালে স্লোগান ছিল বেলজিয়ামকে বাঁচাও', ১৯৩৫ সালে স্লোগান হল 'জাতিসঙ্ঘকে বাঁচাও'। এমনকী ব্রিটেনের শ্রমিক দল এবং কমিউনিস্ট পার্টিও জাতীয় (রক্ষণশীল) সরকারের পথই ধরল। কেবলমাত্র Independent Labour Party-র যে ছোট একটি গোষ্ঠী, যার নেতৃত্বে ছিলেন ম্যাকসটন, ফেনার ব্রকওয়ে ও ম্যাকগভার্ন, সাহস এবং সততা সহকারে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করল, এ হবে আরেকটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, যাতে ব্রিটিশ শ্রমজীবীদের কিছু মাত্র স্বার্থ নেই। কিন্তু তাদের সে প্রচেষ্টা, সরকারের সমর্থনে যে প্রবল ঐক্যতান উঠল তাতে ডুবে গেল। এই যথার্থ জাতীয় সমর্থনের প্রাবল্যে

বলীয়ান হয়ে বিদেশ সচিব স্যার স্যামুয়েল হোরে জেনেভাতে জাতিসঙ্ঘের মঞ্চে দাঁড়িয়ে দৃঢ় কণ্ঠে ইতালি এবং বিশ্ববাসীর সামনে ভাষণ দিলেন।

ব্রিটিশ লেবার পার্টি এবং ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি কীভাবে এবং কেন এই সঙ্কটের সামনে তাদের চিরাচরিত শান্তির নীতি বিসর্জন দিয়ে বলডুইন-হোরে সরকারের পিছনে দাঁড়াল, সে প্রশ্নের মীমাংসার ভার আমি রাজনীতির ছাত্রদের ওপরই ছেড়ে দিলাম। রক্ষণশীল রাজনীতির এ নিঃসন্দেহে এক জয়।

ব্রিটেন যখন যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছিল, আরেক দিকে ইতালিও চুপ করে বসে ছিল না। ইতালির সব পত্র-পত্রিকায় চলল এক তীব্র ব্রিটিশ বিরোধী প্রচার এবং ইতালির স্বৈরতন্ত্রী একনায়ক খোলাখুলি ঘোষণা করলেন তিনি শুধুমাত্র ব্রিটেন ও ফ্রান্স তাদের বিভিন্ন ঔপনিবেশিক সংগ্রামে যা করেছে তারই অনুসরণ করছেন, এবং কোনও দিক থেকে যদি কোনও বিরোধিতা আসে, তিনি সব রকম অবস্থার জন্য প্রস্তুত। ইতালি যে সর্বশক্তিমান ব্রিটেনের সঙ্গে সম্মুখ সমরের জন্য প্রস্তুত হল, সে কি কেবলমাত্র —১৮৬১ সালে সৃষ্ট— স্ফীত আত্মাভিমানের জন্যই? আমার তা মনে হয় না। ইতালি এ বিষয়ে অবহিত ছিল যে বিগত দশকে বায়ু শক্তির বিকাশের ফলে যুদ্ধের পুরনো বিচার সব পাল্টে গেছে; এবং তার ক্ষুদ্র হলেও কর্মক্ষম নৌবহর ভূমধ্যসাগরে ব্রিটেনের তুলনায় তাকে অধিকতর সামরিক সুবিধা প্রদান করবে।

ইতালীয়রা যাই দাবি করুক, এ বিষয়ে বিশেষ কোনও সন্দেহ ছিল না যে ব্রিটেন তার বিশাল সাম্রাজ্যের সাহায্যে শেষ পর্যন্ত ইতালিকে পরাস্ত করবে। কিন্তু, আরেক দিকে আবার এও নিশ্চিত, যে ইতালির বিমানবাহিনী, পৃথিবীর মধ্যে যেটি সবচাইতে শক্তিশালী এবং সকলেরই বিশ্বাস, আজকের দিনে ব্রিটিশ বিমান বাহিনীর চেয়ে শক্তিশালী, সেই বিমানবাহিনী ব্রিটিশ নৌবাহিনীর অপূরণীয় ক্ষতি করতে সক্ষম। তার ফলে, যুদ্ধে জয়ী হলেও যুদ্ধোত্তর ব্রিটেন অনেক দুর্বল হয়ে পড়বে। এবং সেই হৃতশক্তি নৌবাহিনীকে মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে পুনরায় বিপুলভাবে অস্ত্রসজ্জিত নাৎসি জার্মানির।

সাম্রাজ্যবাদী-রণকৌশল বিশারদদের একটি ছোট গোষ্ঠী বলতে আরম্ভ করলেন, মেমেল-এ যে দূরাগত চাপা মেঘগর্জন শোনা যাচ্ছিল, সেটা আবিসিনিয়াতে ইতালির কীর্তিকলাপের চেয়ে বেশি ভীতিপ্রদ। এই সতর্কবাণী সমস্ত মতের ফরাসি রাজনীতিকেরা সমর্থন করলেন। তাঁদের দৃষ্টিতে এখন একমাত্র করণীয় কাজ ভবিষ্যতের জার্মান বিপদের জন্যে প্রস্তুত হওয়া। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা উপলব্ধি করল, বীরত্বের আস্ফালনের চাইতে সবদিক ভেবে এগোনই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তার কারণ, যদিও হিটলার আন্তরিকভাবে ব্রিটেনের প্রতি অনুকূল নীতিই অনুসরণ করে আসছেন, এবং জার্মানির পশ্চিম সীমান্তে আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বনের তাঁর কোনও উদ্দেশ্য নেই, যদিও তাঁর সমস্ত লক্ষ্য পূর্ব ও দক্ষিণ সীমান্তে, অর্থাৎ মেমেল, অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া ইত্যাদির ওপর, অধিকাংশ ব্রিটিশ রাজনীতিক পুনরায় অস্ত্রসজ্জিত জার্মানি সম্পর্কে সন্দিগ্ধ। 'তাঁদের মনে হচ্ছে, যদিও জার্মানির এখন ব্রিটেনের সঙ্গে কিংবা ফ্রান্সের সঙ্গেও যুদ্ধ করার কোনও অভিলাষ নেই, জার্মানি যখন পূর্ব এবং দক্ষিণদিকে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করবে, তখন এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে, যে, ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড তার সঙ্গে যুদ্ধে নামতে বাধ্য হবে, যদি ইউরোপে জার্মান আধিপত্য ঠেকাতে হয়। সেই পরিস্থিতিতে, এক অক্ষম নৌবাহিনী নিয়ে জার্মানির তুলনায় ব্রিটেন অনেক অসুবিধায় পড়বে। এখনই সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিমান বাহিনীর চেয়ে জার্মান বিমান বাহিনী অধিকতর শক্তিশালী। তার ওপরে এখন যেহেতু সেদেশে সামরিক বাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক, জার্মান স্থলবাহিনী অনতিবিলম্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থলবাহিনীর চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠবে। ভবিষ্যতের জরুরি অবস্থায় জন্য সামরিক বাহিনীর ভারসাম্য যাতে ব্রিটেনের অনুকূলে থাকে তার জন্য গ্রেট ব্রিটেনের বর্তমান নৌবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন।

এইসব হিসাবপত্র, বিচার-বিবেচনা যখন ব্রিটেনে চলছিল ইতালি ঘোষণা করল যে আবিসিনিয়াতে তার নীতি প্রয়োগ করতে ফ্রান্স ও ব্রিটেন যদি না দেয়, সে মধ্য-ইউরোপের রাজনীতি থেকে পুরোপুরি হাত গুটিয়ে নিয়ে হিটলারকে যা-খুশি করতে দেবে। তার ফল হল দেখবার মতো, লাঠি ঠোকা বন্ধ হয়ে গেল। এভাবে হিটলার তাঁর পুনঃ অস্ত্রসজ্জার নীতির দ্বারা ফ্রান্স ও ব্রিটেনকে সন্ত্রস্ত করে তুলল, যাতে তারা ১৯৩৫ সালে ইউরোপের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে বাধ্য হল।

এ বক্তব্য যে যথার্থ তার প্রমাণ পাওয়া যায় রক্ষণশীল দলের বোর্নমাউথ-এর সম্মেলনে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী মি. বলডুইন-এর বক্তৃতায়। তিনি বলেছেন:

"কিন্তু আমি আপনাদের জানাতে চাই, সম্প্রতিকালের ঘটনাবলী, কিছুকাল ধরে আমার এবং আমার সহকর্মীদের কাছে যে-সব সন্দেহ ও উদ্বেগের কথা বলা হচ্ছিল, তাকেই সমর্থন করে। আপনারা জানেন, যুদ্ধের পর থেকে আমরা কার্যকর নিরস্ত্রীকরণের জন্য যা করেছি অন্য কোনও দেশ তা করেনি। আর আমরা সে-পথে চলতে পারি না। জার্মানির পুনরস্ত্রসজ্জার ফলে ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের সমস্ত প্রেক্ষাপট গত এক-দুই বছরে বদলে গিয়েছে। কারও উদ্দেশ্য যে শত্রুতামূলক এমন কথা মনে করার কোনও কারণ নেই... কিন্তু এ-কথা আমি অগ্রাহ্য করতে পারি না, যে আরও একটি অস্ত্রসজ্জিত বৃহৎ শক্তির অস্তিত্বের ফলে জাতিসঙ্ঘের অধীনে আমাদের যে-সব দায়িত্ব, তার পালনের বিষয়ে ইউরোপের প্রেক্ষাপট পালটে গিয়েছে। এ-কথা আমি নিজের কাছ থেকে আর লুকিয়ে রাখতে পারি না, যে ওই সব দায়বদ্ধতার পালনের অর্থ এই দাঁড়াতে পারে যে, যে-সব জাতি ওই সব দায়িত্ব পালন করছে তা জাতিসঙ্ঘের চুক্তি অনুযায়ী অস্ত্রপ্রয়োগে তাদের রক্ষা করতে হতে পারে।"

সম্ভবত আরও একটি কারণে ইতালির সঙ্গে যুদ্ধের জন্য সরকারি মহলের যে আগ্রহ তাতে ভাঁটা পড়েছে, তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে জনমত। এই বিষয়ে ডেইলি মেল পত্রিকা (প্যারিস সংস্করণ) ২৬ সেপ্টেম্বর একটি সম্পাদকীয়তে লিখছে :

"আমাদের কয়েকটি রক্তপিপাসু শান্তিবাদী পত্রিকা আজকাল যে-সব প্রবন্ধ ছাপতে আরম্ভ করেছে তাতে বলা হচ্ছে সাম্রাজ্যের দেশগুলি অর্থনৈতিক বাধা-নিষেধ স্বেচ্ছায় সমর্থন করবে, যদি তার ফলে যুদ্ধ বাধে, তবুও। জাতি সঙ্ঘের প্রতি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জাতি কী মনোভাব গ্রহণ করে সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্রিটেনের জনসাধারণের পক্ষে এটা জানাও যার-পর-নাই দরকার, ইতালির ওপর আরোপিত বাধানিষেধ, যদি সে-রকম বিপজ্জনক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভবও হয়, সাম্রাজ্যের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে কি না, তার অভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসংবাদ তীব্রতর করবে কি না। লক্ষণ দেখে মনে হয়, করবে; মনে হয়, বিধি-নিষেধ আরোপের ফলে যুদ্ধ বাধলে সাম্রাজ্যের মধ্যে মতভেদ তীব্রতর হবে এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের মধ্যে এমন অসন্তোষ সৃষ্টি হবে, যে বিদেশে যাবতীয় সমস্যা ঘোরতর আকার ধারণ করবে।

উপনিবেশগুলির মধ্যে যেটি বৃহত্তম, কানাডা, জাতিসঙ্ঘের সনদের সম্পর্কে বরাবরই অস্বস্তি বোধ করে। ১৯২৪ সালে জাতিসঙ্ঘের অধীনে তার দায়-দায়িত্ব সে স্বীকার করতে চায়নি, এই যুক্তিতে, যে ইউরোপ থেকে তাদের দেশ অনেক দূরে।

সাধারণভাবে এই হচ্ছে তাদের মনোভাব। কানাডায় প্রধানমন্ত্রী মি. বেনেট ৬ সেপ্টেম্বরের বেতার ভাষণে ঘোষণা করেন, গভর্নমেন্টের কর্তব্য "যে কোনও ন্যায়সঙ্গত ও সম্মানজনক উপায়ে কানাডাকে ঝামেলা-ঝঞ্ঝাটের বাইরে রাখা।...কোনও রকম বিদেশি ঝগড়া বিবাদে আমরা জড়িয়ে পড়ব না...।"

অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী, Mr. Lyons অবশ্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে গভীর সহযোগিতা করবেন। সম্পূর্ণ অন্য পথ নিয়েছেন Federal Labour Party-র নেতা মি. ফোর্ড। তিনি ঘোষণা করেছেন, যে সেই শক্তিশালী সংগঠনের নীতি, 'বিদেশের কোনও যুদ্ধে

যোগদানে দৃঢ় বিরোধিতা।' নিউ সাউথ ওয়েলস-এ পার্টি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে এই দাবি করে, যে অস্ট্রেলিয়াকে জেনেভাতে তার নিরপেক্ষতা ঘোষণা করতে হবে এবং জাতিসঙ্ঘের কাজের ফলে যদি যুদ্ধ বাধে, সেখান থেকে তার প্রতিনিধিকে প্রত্যাহার করতে হবে।...দক্ষিণ আফ্রিকায় জেনারেল স্মাটস বলেছেন ইউনিয়ন জাতিসঙ্ঘের সনদের প্রতিটি অক্ষরের প্রতি দায়বদ্ধ।...'

এ বিষয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী Mr. Pirow-র দৃষ্টিভঙ্গি জেনারেল স্মাটস-এর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ১৫ সেপ্টেম্বর তিনি এক জনসভায় বলেন, 'যাই হোক না কেন, এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে দক্ষিণ আফ্রিকা-বাসীরা বন্দুকের একটি গুলিও ছুড়তে চায় না।...যাই ঘটুক, আমরা একটি গুলিও ছুড়ব না" এই মনোভাবের সমর্থন কার্যক্ষেত্রেও পাওয়া গেছে, দক্ষিণ আফ্রিকার পশুপালকেরা পূর্ব আফ্রিকা ও আবিসিনিয়ায় ইতালির সৈন্যবাহিনীকে মাংস সরবরাহের বরাত পাওয়ার জন্য ব্যস্ত।

এইসব ঘোষণা থেকে এমন একটা সম্ভাবনা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, যে সাম্রাজ্যের কোনও কোনও দেশ তফাৎ থাকতে পারে এবং জাতিসঙ্ঘের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে, যদি অসম্ভব সম্ভব হয় এবং জাতি সঙ্ঘের সদস্য সব রাষ্ট্র বাধা-নিষেধ আরোপের পক্ষে ভোট দেয়। আমাদের মধ্যে যারা জাতিসঙ্ঘের ব্যাপারে অতি উৎসাহী, তাঁদের বুঝতে হবে এই-রকম পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা অনুচিত।

অস্ট্রেলিয়া থেকে সদ্যপ্রাপ্ত খবরে প্রকাশ ইতালির ওপর বিধি-নিষেধ জারি সম্পর্কে সেখানে মতভেদ অতি তীব্র, যদি সেই বিধি নিধেষের ফলে যুদ্ধ বাঁধবার সম্ভাবনা থাকে। ১২ অক্টোবরের টাইমস (লন্ডন) লিখেছে, "আজ অস্ট্রেলিয়াকে নিরপেক্ষ ঘোষণা করতে এবং ইতালির বিরুদ্ধে বাধা-নিষেধ জারি করায় বিজ্ঞপ্তি অনুমোদন না করতে পার্লামেন্টকে সম্মত করার যে চেষ্টা শ্রমিক নেতা Mr. Beasley করেছিলেন, ২১-এর বিরুদ্ধে ২৭ ভোটে House of Representatives তা খারিজ করে দিয়েছে।" ব্রিটিশ শাসনাধীন প্যালেস্টাইনের পরিস্থিতি সম্পর্কে 'টাইমস' ১২ অক্টোবর লিখছে:

"বলা হচ্ছে, ইতালির প্রতি অনুকূল মনোভাব প্রধানত: তাঁদের মধ্যে বিদ্যমান যাঁরা হজ আমিন এফেনদি এল হুসেনি, যিনি জেরুজালেমের মুফতি তাঁর পক্ষাবলম্বী ; এবং ইথিওপিয়ার দ্বন্দ্ব শুরু হওয়ার পর থেকে মুফতির সংবাদপত্র জামিয়া এল আরাবিয়া ইতালির পক্ষ সমর্থন করে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেছে, এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী, যাঁরা নাশাশিবি দলকে সমর্থন করেন, তাঁরা একটি চিঠি ফাঁস করে দিয়েছেন, যেটি নাকি এমির শেকিব আরসলান পাঠিয়েছিলেন মুফতির কাছে, মহামান্য মুফতির ইতালির পক্ষপাতী ক্রিয়াকলাপের প্রশংসা করে। বিগত কয়েক সপ্তাহ বিভিন্ন আরব সংবাদপত্রে সাধারণভাবে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে অন্যান্য আরব জাতিগুলির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বর্তমান গণ্ডগোলের সুযোগ গ্রহণ করে সিরিয়ার দেশত্যাগী নেতা, যিনি জেনেভায় থাকেন, তাঁকে পদচ্যুত করার যৌক্তিকতা সম্পর্কে।

ইহুদিদের মধ্যে Revisionists Party কিংবা New Zionists ইতালির পক্ষাবলম্বী। তাদের সংবাদপত্র Hayarden-ই একমাত্র ইহুদি সংবাদপত্র যে ইতালির প্রতি সহানুভূতির দৃষ্টিকোণ থেকে ইতালি-ইথিওপিয়া দ্বন্দ্বের ঘটনাবলির খবর ছেপেছে।"

মিশরের কথা বলতে গেলে, এটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, নেতারা যদিও ইতালি সম্পর্কে ব্রিটিশ নীতির খোলাখুলি বিরোধিতা করছেন না, তাঁরা মিশরের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য চাপ দিচ্ছেন, যদি ব্রিটেনকে মিশরের সহানুভূতি ও সমর্থন পেতে হয়। তাঁরা এই দরকষাকষিতে কত দূর সফল হবেন— সেটা নির্ভর করছে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপর। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যদি ক্রমে শান্ত হয়ে আসে মিশরের নেতৃবৃন্দ প্রকৃত কোনও সাফল্য লাভ করতে পারবেন কি না

সন্দেহ। কিন্তু ঘটনা যাই ঘটুক, কিছু সাফল্য তাঁরা পাবেন বলেই মনে হয়। বিভিন্ন ইউরোপীয় সংবাদপত্রে ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে, ব্রিটিশদের সমর্থনে মিশরে বিদেশি নাগরিকদের বিশেষ অধিকার ও সুযোগ সুবিধা রদ হয়ে যাবে। তার অর্থ, বিদেশিদের বিচারের পূর্ণক্ষমতা মিশরের আদালত লাভ করবে। সর্বসাধারণের প্রতি প্রযোজ্য আইনের ক্ষেত্রে এ হবে মিশরের স্বাধীনতার দিকে এক পদক্ষেপ।

ব্রিটেনে সাধারণভাবে জনমত ইতালির ওপর বিধি-নিধেষ আরোপের সরকারি নীতিকে সমর্থন করছে তা হলেও মন্ত্রীসভার সদস্যেরা পরিস্থিতির ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছেন। এ কথা ঠিক নয়, যে বর্তমান মন্ত্রীসভা, এই কারণেই অবিলম্বে নির্বাচন চাইছেন যে বর্তমান পরিস্থিতি নির্বাচনের জন্য তাঁদের অনুকূল। তাঁরা জনসাধারণের নাড়ির গতিটাও বুঝতে চান, বুঝতে চান ইতালির ওপর বিধি-নিষেধ আরোপে তাঁরা কত দূর যেতে পারেন। ইতিমধ্যে—Independent Labour Party, যাঁরা এই বিষয়ে বরাবর একটি নির্ভীক ও সঙ্গতিপূর্ণ নীতি অনুসরণ করে চলেছেন, তাঁরা বিধি-নিষেধের বিরোধিতা করে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের এক জাতীয় সম্মেলনের আহ্বান করেছেন, এবং এই মর্মে একটি ইশতাহার প্রকাশ করেছেন:

"শ্রমিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, এবং কমিউনিস্ট পার্টি, জাতীয় সরকার এবং জাতিসঙ্ঘ কর্তৃক আরোপিত বিধি-নিষেধ সমর্থন করে প্রকৃত পক্ষে শ্রমজীবী মানুষদেরকে যে নীতির পিছনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে সে-নীতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে ব্যবহৃত হবে। Independent Labour Party শ্রমজীবীদেরকে সতর্ক করে দিতে চায়, যে আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিধিনিষেধ যুদ্ধের কারণ হতে পারে। ইতালির সামুদ্রিক অবরোধের জন্য পুরোদস্তুর প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। সরকারের যুদ্ধমুখী নীতি এখনই প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। (দ্য টাইমস, ১০ অক্টোবর, ১৯৩৫)

ওই তারিখের টাইমস পত্রিকাতেই খবর আছে, যে মি. এল এস এমারি-র নেতৃত্বে ৫০ জন রক্ষণশীল এম. পি-র একটি বে-সরকারি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। তাতে বিবেচিত হবে বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং ইতালি আবিসিনিয়ার যুদ্ধে ব্রিটেনের জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা; তার কারণ তাঁদের মতে বিধিনিধেধ কার্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলে যুদ্ধ বাধবে। এখন আমরা দেখব, দক্ষিণ এবং বাম দু'-দিক থেকে ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার ওপর এই চাপের ফল কী হয়।

এখন ভারতের কথা

আন্তর্জাতিক ব্যাপারে কংগ্রেস কোনও আগ্রহ দেখায় না, কাজেই এই অতিগুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেও কংগ্রেসের কোনও নীতি নেই। এ কথা ঠিক, সাধারণ মানুষের মধ্যে আবিসিনিয়ার প্রতি সহানুভূতি প্রচুর, কিন্তু সে-সহানুভূতিকে সঙ্গে-সঙ্গে নিজের কাজে লাগিয়েছে ব্রিটিশ সরকার, জননেতারা তাকে ব্যবহার করতে পারেননি। ফলে ভারতীয় সেনাদের দ্রুত আদ্দিস আবাবায় পাঠানো হয়েছে। কেন পাঠানো হল? রাজ্যসভায় যখন এ প্রশ্ন করা হল, ভারত সরকারের রাজনৈতিক মুখপাত্র উত্তরে বললেন, 'আদ্দিস আবাবায় সৈন্য পাঠানো হয়েছে ভারতীয় এবং অন্যান্য ব্রিটিশ প্রজাদের রক্ষা করবার জন্য। ভারতীয় জনগণ কি সত্যিই এত সরল যে এই বিবৃতি দিয়েই তাদের বুঝ দেওয়া যাবে?

আবেসিনিয়া এখনও এক স্বাধীন দেশ। ভারতীয়দের রক্ষার স্বার্থে সেখানে ব্রিটিশ বা ভারতীয়, কোনও সৈন্যই পাঠানো যেতে পারে না। আসল ঘটনা হল— ইংল্যান্ডে তাই বলা হয়েছে— বিশেষ আবেদনের ফলে আবিসিনিয়ার সরকার বিশেষ সুবিধা হিসেবে ব্রিটিশ দূতাবাসের জন্যে অতিরিক্ত রক্ষী পাঠাবার অনুমতি দিয়েছে। (সাধারণত এই রক্ষী আবিসিনীয়

সরকার দিয়ে থাকে)। এখন প্রশ্ন, এই অতিরিক্ত রক্ষীবাহিনী ভারত থেকে অতদূরে কেন নিয়ে যাওয়া হল? হাতের কাছেই আবিনিসিয়ার সীমানার ওপারে, কেনিয়াতে, সুদানে, মিশরে, ব্রিটিশ সোমালিল্যান্ডে, ব্রিটিশ সেনা ছিল। তাদের কেন আদ্দিস আবাবায় পাঠানো হল না? কারণটা পরিষ্কার। ভারতীয় সেনাদল প্রেরণের উদ্দেশ্য, আবিসিনিয়ায় ব্রিটিশনীতির প্রতি ভারতীয় সমর্থন দায়বদ্ধ করে রাখা, এবং আরেক দিকে ইতালিকে মনে করিয়ে দেওয়া যে ভারতের বিপুল সম্পদ গ্রেট ব্রিটেনের পিছনে আছে।

এ কথা এখন আর গোপন নেই যে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে আমরা ইউরোপে যুদ্ধের দোরগোড়ায় হাজির হয়েছিলাম। জার্মানির পুনঃ অস্ত্রসজ্জা থেকে উদ্ভূত বিপদটা যদি না থাকত, যুদ্ধ বেঁধেই যেত, এবং ভারতীয় নেতারা কিছু বুঝে উঠবার আগেই সে-যুদ্ধে ভারতকে টেনে নামানো হত, যেমন ১৯১৪ সালে হয়েছিল। তফাত শুধু এইটুকু হত, যে জার্মানির জায়গায় থাকত ইতালি আর বেলজিয়ামের জায়গায় থাকত আবিসিনিয়া। কেন্দ্রীয় আইনসভায় সেনাপ্রধান যে বলেছেন, যুদ্ধে ভারতের জড়িয়ে পড়বার যথেষ্ট আগে আমাদের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে, একমাত্র কোনও মূর্খই সে-কথা বিশ্বাস করবে। বর্তমান ক্ষেত্রে, ইউরোপযুদ্ধ যদি হত গ্রেট ব্রিটেন জয়লাভ করত। কেন না তার পিছনে আছে ভারতের ধনসম্পদ, কিন্তু আবিসিনিয়ার দশা হত প্যালেস্টাইনের মতো এবং ভারত যেমন পরাধীন তেমনি পরাধীনই থাকত। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় জেনেভাতে ব্রিটেনের মুখপাত্র অম্লানবদনে বললেন, ভারত সম্পর্কে ব্রিটেনের আচরণের দ্বারাই প্রমাণ হয় ইতালির চেয়ে ব্রিটেনের উচ্চতর নৈতিকতা। এদিকে, যখন তিনি বক্তৃতা করছেন, তখন সীমান্ত প্রদেশের নারী ও শিশুদের মাথায় বৃষ্টিধারার মতো বোমা পড়ছে, এবং ভারত সরকার ভারতবাসীদের জন্য নতুন শৃঙ্খল গড়ছেন ফৌজদারি আইন সংশোধন করে।

আশ্চর্যের বিষয়, ইতালি অন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে প্রবল প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে এই আশায় যে তার দ্বারা আবিসিনিয়াতে সে যে অন্যায় করছে তার লাঘব হবে। সে দেশের আধা-সরকারি মুখপাত্র Signor Gayada ইটালির সংবাদপত্রে লিখেছেন:

"Committee of Thirteen বলেছে, যে জাতিসঙ্ঘ আবিসিনিয়া আক্রমণ বিবেচনার মধ্যে আনতে পারে না কারণ ইতালি জেনেভাতে তাদেরকে অস্বীকার করেনি। এ কথা ভুল। সে-সব কীর্তিকলাপকে ফ্রান্স নিন্দা করেনি যে-সব কাজের বলে মরক্কোতে তাকে যুদ্ধ আরম্ভ করতে হয়েছে; ইংল্যান্ডও জেনেভাকে জানায়নি কী এমন পরিস্থিতি ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে সৃষ্টি হয়েছিল, যার কথা কেউ জানে না, যে সেখানে যে-সব স্বাধীন জাতি যারা ব্রিটিশের অধীন নয়, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হল।" (টাইমস, লন্ডন, ৭ অক্টোবর)

এই যে প্রচারটা চলছেই, এর প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে ইউরোপের কোনও-কোনও দেশেও, যেমন পোল্যান্ডের সরকারি মুখপাত্র The Gazetta Polska কয়েকদিন আগেই লিখেছে:

"যে-ব্রিটেন নিজেই অশ্বেতকায় জাতিগুলোর বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগে এত নির্মম, তারা কেন এত জোর গলায় ইতালির আবিসিনিয়া সংক্রান্ত পরিকল্পনার বিরোধিতা করে?"

ইউরোপের বিভিন্ন গভর্নমেন্টের মধ্যে অস্ট্রিয়া, এবং হাঙ্গেরি, যারা ইতালির প্রভাবের ক্ষেত্রের অন্তর্গত, তারা খোলাখুলি জেনেভাতে জানিয়ে দিয়েছে, যে তারা ইতালির বিরুদ্ধে বাধা-নিষেধ জারির বিরোধী। জার্মানি, যেহেতু তারা জাতিসঙ্ঘের বাইরে, এখনও বাধা-নিষেধের প্রশ্নে তাদের মনোভাব জানায়নি, তবে সম্ভবত তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যত জাতীয় স্বার্থের অনুকূল হবে যে-নীতি তাই তারা অনুসরণ করবে। এমনকী যে-সব দেশ সরকারিভাবে ইতালির বিরুদ্ধে বাধা-নিষেধ জারির প্রশ্নে জাতিসঙ্ঘকে সমর্থন করছে, তারাও ব্রিটেনের যে নিঃস্বার্থপরতার কথা গর্বের সঙ্গে বলা হয়, তার সম্পর্কে সন্দিগ্ধ।

সে-সব দেশের সংবাদপত্রের সুর থেকে সেটা বোঝা যায়। যথা, এই সে-দিন আমি ইউরোপের সংবাদপত্রে পড়লাম যে আবিসিনিয়া ল্যাঙ্কাশায়ারের কারখানায় পরিধান বস্ত্রের এক বিশাল বরাত দিয়েছে। অত বড় বরাত বহুদিন ল্যাঙ্কাশায়ার বিদেশ থেকে পায়নি। তেমনি, ব্রিটিশেরা এডেনের কাছে তাদের উপনিবেশের আয়তন বাড়াচ্ছে, লোহিত সাগরের অপর পারে ইতালির শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধির জবাব হিসেবে।

এখন ভবিষ্যতের কথা

যেহেতু ইউরোপীয় মূল ভূখণ্ডের যে রাজনীতি, যার মধ্যে জাতিসঙ্ঘও পড়ে, তাতে এখন ফ্রান্সের আধিপত্য, এই বিষয়ে, মনে হয়, কোনও সন্দেহ নেই, যে দুটি ঘটনা ঘটবে। জাতিসঙ্ঘের মর্যাদা বাহ্যত রক্ষা করবার জন্য, কার্যত যার অর্থ দুই বৃহৎ শক্তি ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মর্যাদা, যৌথভাবে কিছু একটা করা হবে, অর্থাৎ অর্থনৈতিক বাধা-নিষেধ আরোপ। সে-পদক্ষেপের রাস্তা মুসোলিনি নিজেই পরিষ্কার করে দিয়েছেন, ২ অক্টোবরের বক্তৃতায় তিনি খোলাখুলি বলেছেন, অর্থনৈতিক বাধা-নিষেধ তিনি সহ্য করবেন, তাতে অসুবিধা যতই হোক। দ্বিতীয়ত, কোনও সামরিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না ইতালির বিরুদ্ধে, এবং এমন কোনও ব্যবস্থাও নেওয়া হবে না, যাতে আবিসিনিয়াতে ইতালির লক্ষ্য পূরণে বাধা হয়। মুসোলিনি পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে সে-রকম কিছু করা হলে তিনি সেটাকে যুদ্ধের কারণ বলে মনে করবেন। উপরন্তু ইতালি খোলাখুলি ইঙ্গিত দিয়েছে যে আবিসিনিয়া বাধাপ্রাপ্ত হলে তার শোধ নিতে সে মধ্য ইউরোপ থেকে হাত গুটিয়ে নেবে এবং জার্মানিকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করবার স্বাধীনতা দেবে। তবু, এ-রকম ভাবলে বড় বেশি আশা করা হবে, যে যুদ্ধের আশঙ্কা দূর হয়েছে। ব্রিটিশ নৌবহর এখনও ভূমধ্যসাগরে হাজির, এবং তাকে সরিয়ে নেওয়ার ইতালির অনুরোধ ব্রিটেন অগ্রাহ্য করেছে। তা ছাড়া, ব্রিটেনের বামপন্থী বিভিন্ন সংবাদপত্রে বলা হচ্ছে সম্ভাব্য রণক্ষেত্রে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী ও যুদ্ধ সরঞ্জাম পাঠানো চলছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ব্রিটেন অগত্যা নিজের আগেকার অবস্থান থেকে পিছিয়ে এসেছে, এলেও তার যুদ্ধং দেহি মনোভাব এখনও ত্যাগ করেনি। তবে, সে তার পশ্চাদপসরণকে 'যৌথ-কর্মসূচি'র আড়ালে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে।

লোকে বলে সব মন্দের মধ্যেই কিছু ভাল থাকে। আবিসিনিয়ার বেলাতেও তাই হয়েছে। আবিসিনিয়া যুদ্ধ করতে-করতে পরাজিত হবে কিন্তু বিশ্বের বিবেককেও সে নাড়িয়ে দিয়ে যাবে। আরেক দিকে অশ্বেতকায় দুনিয়ায় এক নতুন চেতনা আনবে। এই চেতনা পদদলিত জাতিসমূহের মধ্যে নতুন জীবন জাগিয়ে তুলবে। সাম্রাজ্যবাদীরা সবাই এই ঘটনায়—অস্বস্তিবোধ করছে, এবং জেনারেল স্মাটস তাঁর একটি সাম্প্রতিক বক্তৃতায় সেটা প্রকাশ করেছেন। অপরপক্ষে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে আরম্ভ করেছেন, উপনিবেশ প্রথা কি আদৌ সমর্থনযোগ্য? যেমন, অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কি 'ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকায় প্রস্তাব দিয়েছেন আফ্রিকায় সব ব্রিটিশ কলোনি জাতিসঙ্ঘকে দিয়ে দেওয়া হোক। সম্প্রতি Mr. Lansbaryও একই কথা বলেছেন, অতএব, সাম্রাজ্যবাদী 'মালিক' পক্ষেরও বিবেক দংশন শুরু হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদের অবসান হতে পারে দু'ভাবে, অধীনস্থ দেশে সাম্রাজ্যবাদীশক্তির পরাভবের ফলে, কিংবা সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে অন্তর্কলহের ফলে। ইতালির সাম্রাজ্যবাদের বাড়-বাড়ন্ত হওয়ার ফলে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি যদি প্রবল হয়ে ওঠে, আবিসিনিয়ার দুঃখভোগ বৃথা যাবে না।

ভারতের ভবিষ্যৎ[১]

প্রত্যেক ভারতীয় কংগ্রেস সম্পর্কে গর্বিত, যে-কংগ্রেস সমস্ত ভারতবাসীর সহযোগিতার প্রতীক।

ভারত এক সদ্যোজাত শিশু। লক্ষ্যে পৌঁছতে আমাদের এখনও অনেক দেরি, কিন্তু আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে, যে-ভবিষ্যৎ হবে অতীতের চাইতে উজ্জ্বলতর, মহত্তর।

একাকীত্ব ভাল নয়। আমাদের যুব সম্প্রদায়কে বিশ্বের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে। বর্তমানে বিদেশে বাস করে ভারতীয়দের কেবলমাত্র ছোট-ছোট গোষ্ঠী, কিন্তু সে-দিন দূরে নয়, যে-দিন সর্বত্র আমাদের নিজেদের দূতাবাস থাকবে।

জামসেদপুরে শ্রমজীবী—অন্য আরেক ছবি[২]

জামসেদপুরের টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল ওয়ার্কস-এর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ জে. এল. কিনান-এর কলম থেকে যে প্রবন্ধটি বেরিয়েছে এবং ডিসেম্বর, ১৯৩৫-এর 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সেটি একাধিক কারণে লক্ষণীয়। লক্ষণীয় এই কারণে যে ইস্পাত প্রস্তুতের প্রসঙ্গ ছেড়ে এটি ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। তা ছাড়া যে অবিচল আত্মতৃপ্তি সহকারে লেখক প্রবন্ধটি লিখেছেন, এবং প্রবন্ধের মধ্যে যে বহুসংখ্যক অসঙ্গতি সেটাও লক্ষণীয়।

ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিষয়গুলি সম্পর্কে একটি কথা। মি. কিনান যখন ইস্পাত প্রস্তুতের কথা বলেন শক্ত জমির ওপর দাঁড়িয়ে বলেন। তখন তাঁর আত্মবিশ্বাস তাঁর সম্পদ। কিন্তু তিনি যখন প্রাচীন ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের বিতর্কিত ক্ষেত্রে পা বাড়ান তাঁর আত্মবিশ্বাস তাঁর পক্ষে অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মি. কিনান বলছেন, "তিনি (জে. এন. টাটা) উপলব্ধি করেছিলেন, যে সেই মনুর যুগ থেকে ভারতের ভাগ্য এই ছিল, যে ভারত হবে পুঁজিপতি ও ক্রীতদাসদের দেশ।" (পৃ. ৭০৫)। অর্থনীতিতে এ কথা সকলেরই জানা যে পুঁজিবাদের জন্ম সাম্প্রতিক কালে, বহুল পরিমাণ উৎপাদনের ফলে। মনু কিংবা তাঁর পরবর্তী যুগে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা কী করে থাকল, আমার বুদ্ধির অগম্য। এমনকী যে জমিদারি প্রথা আমরা আজকাল দেখতে পাই, তারও জন্ম বেশি দিন হয়নি। তা ছাড়া, প্রাচীন যুগে রাষ্ট্রও ধন সঞ্চয় করত না। তখনকার দিনে প্রচলিত বিশ্বাস ছিল (সে রাজতন্ত্রই হোক আর প্রজাতন্ত্রই হোক), যে, রাষ্ট্র সব কিছু প্রজাদের মধ্যে বিলিয়ে দেবে। তার এক দৃষ্টান্ত, রাজা হর্ষবর্ধন, যিনি পাঁচ বছর অন্তর তাঁর রাজকোষ খালি করে দিতেন।

---

১. ৮ জানুয়ারি ১৯৩৬ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জয়ন্তী উপলক্ষে ভিয়েনা হিন্দুস্থান অ্যাকাডেমিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন-এর উৎসবে সুভাষচন্দ্র বোস-প্রদত্ত ভাষণের কয়েকটি অংশ।

২. মডার্ন রিভিউ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬ সংখ্যায় প্রকাশিত এবং 'সুভাষ সি. বোস, থ্রু কংগ্রেস আইজ' (কিতাবিস্তান, এলাহাবাদ এবং লন্ডন, ১৯৩৮)-এ পুনর্মুদ্রিত।

তারপর মি. কিনান বলছেন, "আমরা (টাটা) জানি যে তাঁর আগে 'শ্রমজীবী' নামটিই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাব ব্যক্ত করত" (পৃ. ৭০৫)। 'শ্রমজীবী' শব্দটি মি. কিনান যদি 'কারিগর' অর্থে ব্যবহার করে থাকেন, তাঁর এ কথা ভুল। ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতিতে কারিগর— বা ছুতোর, বা কামার, বা কুম্ভকার যাই হোক, তাকে কখনওই হেয় জ্ঞান করা হত না। গ্রামীণ অর্থনীতির তারা ছিল অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অন্য গ্রামবাসীদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল সদ্ভাবের, বন্ধুত্বের। কল-কারখানার শ্রমিক অর্থে যে শ্রমজীবী, সে ধনতন্ত্রের অবাঞ্ছিত ফল, সে অর্থে ভারতীয় সৃষ্টি নয়। শ্রমিকদের (কলকারখানায় সর্বহারাদের) যদি ভারতে হেয় করা হয়ে থাকে অন্য সব দেশেও তাই হয়। ইউরোপের কল-কারখানায় ভারতীয় শিক্ষানবিশের কাছ থেকে আমি শুনেছি, যে ইউরোপের কলকারখানায় শ্রমিকদের সঙ্গে অফিসারদের যে ব্যবধান তা অত্যন্ত বিস্তৃত।

তারপর তাঁর এ কথাও ভ্রান্ত, যে, "সাধারণ নিয়মে কোনও শ্রমজীবীকে ধন সঞ্চয় করতে দেওয়া হত না, এবং ক্রীতদাসকে তার প্রভু মুক্তি দিলেও সে ক্রীতদাসই থাকত" (পৃ. ৭০৫)। এই মূল্যবান তথ্যটি মি. কিনান কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন, আমার জানতে ইচ্ছে করে। বরং আমরা জানি, ভারতে জন্মসূত্রে যে নিম্নশ্রেণির তেমন মানুষও প্রায়ই সর্বোচ্চ স্থানে উঠতে পারত নিজের গুণে। আমরা যদি বর্তমান কোনও-কোনও মহারাজা কিংবা ভূম্যধিকারী অভিজাত শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তির অতীত ইতিহাস নিয়ে অনুসন্ধান করি, এ বিষয়ে মূল্যবান তথ্য পেতে পারি। দৃষ্টান্ত হিসাবে বঙ্গদেশের কৈবর্ত রাজাদের কথাও বলতে পারি, যাঁদের জন্ম হয়েছিল সমাজের তথাকথিত নিম্নতর স্তরে।

মি. কিনান যে পার্থক্য করেছেন 'প্রয়োজনের শ্রম' আর 'প্রগতির শ্রম'-এর মধ্যে, সেটাও কৃত্রিম, এবং যদি অনুমতি দেন তো বলি, উদ্ভট। প্রাচীনযুগেও সমস্ত শ্রম প্রয়োজনের শ্রম ছিল না। লোকে সব সময়েই ক্ষুণ্নিবৃত্তির জন্য পরিশ্রম করত না। অনাহারেও থাকত না। অধিকাংশ লোক কাজ করত খানিকটা ক্ষুধার তাড়নায়, খানিকটা কাজ করার আনন্দে। এবং প্রাচীন কালে কর্ম মাত্রই ছিল উৎপীড়ন, এ রকম কথাও অতিশয়োক্তি। শিল্পকর্মের যে-সব বিশাল-বিশাল নিদর্শন এখনও বর্তমান, যেমন মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, তাজমহল, মথুরা, কোনারক, তাতে কি প্রগতির চিহ্নও দেখা যায় না? এ কথা ঠিক প্রাচীন কালে শিল্প থেকে এখনকার মতো বিপুল পরিমাণ লভ্যাংশ পাওয়া যেত না। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে প্রচুর লভ্যাংশ একান্তভাবে শিল্পবিপ্লবের, অর্থাৎ বিপুল উৎপাদনেরই দান। তা ছাড়া, এই যে প্রচুর লাভ এটাকে খুব বাঞ্ছনীয়, বা খুব বড় কৃতিত্ব বলা যায় না। সর্বত্র চিন্তাশীল ব্যক্তিরা স্বীকার করছেন, শিল্পভিত্তিক ধনতন্ত্রের যে কুফল তার মূল কারণ মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়া, এবং অস্বাভাবিক পরিমাণ লাভ, যে লাভ আসছে হয় শ্রমিকের শোষণের ফলে নয়তো উপনিবেশ কিংবা আধা-উপনিবেশের বিভিন্ন দেশের ক্রেতাদের শোষণের ফলে।

মি. কিনান শিষ্টতার সীমা লঙ্ঘন করে বলেছেন, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, একদল নির্বোধ অধ্যাপকের সহায়তায় বর্তমান মন্দা থেকে বেরিয়ে আসবার পথ খুঁজছেন। আমি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের হয়ে ওকালতি করতে চাই না, সেই মহান প্রেসিডেন্টের তার প্রয়োজনও নেই। কিন্তু এমন কি কেউ আছেন, যিনি অস্বীকার করতে পারেন রাশিয়ার বাইরে বেকারি ও মন্দা কাটিয়ে উঠবার জন্য পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পরীক্ষা চলছে এখন আমেরিকায়? লেখককে আমি মি. এইচ জি. ওয়েলস-এর একটি চমৎকার বই, The New American in the World পড়তে বলি। তাতে তিনি আমেরিকায় এই পরীক্ষার কথা আলোচনা করেছেন এবং রাশিয়ার সঙ্গে তার তুলনা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে বলি, মি. কিনান যাদেরকে আত্মতৃপ্তি সহকারে নির্বোধ বলে অভিহিত করেছেন, সেই অধ্যাপকদের সাহায্যে মি. রুজভেল্ট কেন চেয়েছিলেন, সে প্রশ্নও

মি. ওয়ালস আলোচনা করেছেন। বোধহয় মি. কিনানের উষ্মার কারণ, বড়-বড় অঙ্কের লভ্যাংশের ওপর মি. রুজভেল্ট হাত দিয়েছেন শোষিত সর্বহারাদের মধ্যে, অংশত হলেও, সেগুলো বিতরণ করার জন্য এবং তিনি এও বলেছেন যে নিয়োগকর্তাদের উচিত সংগঠিত শ্রমিক ইউনিয়নগুলিকেই স্বীকার করে নেওয়া এবং তাদের সঙ্গে সমকক্ষ হিসাবে আচরণ করা।

মি. কিনান শুধু আত্মতৃপ্ত নন, আরও কিছু। তিনি বলেছেন, "ভারতে ইস্পাত প্রস্তুতের ব্যাপারে সেই কম্পানি (টাটা) ইস্পাত শিল্পে মন্দার অবসান ঘটিয়েছে, এবং আমার মনে হয় কোম্পানির তার জন্য গর্ব বোধ করা উচিত" (পৃ. ৭০৭)। কিন্তু আমি মি. কিনানকে প্রশ্ন করতে চাই, "ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মন্দার অবসান" ঘটানোর অর্থ কী? তার অর্থ বেশি বাজার পাওয়া এবং যথেষ্ট পরিমাণ মূলধনও সংগ্রহ করতে পারা, যতদিন না বাজার পাওয়া যায়। মন্দার সময়ে ভারতের জনসাধারণ সরকারের মাধ্যমে যে বিপুল বদান্যতা প্রদর্শন করেছে, তারই দৌলতে যত দিন না বাজার, কিংবা বরাত পাওয়া গেছে, কোম্পানি কাজ চালিয়েছে। কোম্পানি যে আজ বেশি লাভ করতে পারছে তার দুটি কারণ, প্রথমত, বিদেশি, বিশেষ করে ইউরোপীয় মূল ভূখণ্ডের ইস্পাতের ওপর বসানো শুল্ক, যার দরুন লোক টাটার পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারছে, দ্বিতীয়ত ভারত সরকারের টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানিকে সরাসরি বরাত দেওয়া। অতএব ইস্পাত শিল্প মন্দার অবসানের জন্য কৃতিত্ব প্রকৃতপক্ষে ভারত সরকার ও ভারতবাসীর প্রাপ্য, যদি অবশ্য মন্দার অবসান প্রকৃতই হয়ে থাকে। তাদের কোনও ধন্যবাদ মি. কিনান জানাননি, যদিও তিনি অবস্থার সাম্প্রতিক উন্নতির জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন কোম্পানিকে, অর্থাৎ নিজেকে।

সেপ্টেম্বর ১৯২৮ থেকে টাটা কোম্পানির বিষয়ে আমি কিছু-কিছু খোঁজ-খবর রাখছি। আমি জানতে চাই, টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি কি আজ বেঁচে থাকত, যদি মন্দার বছরগুলোতে সরকারি বদান্যতা তাকে বাঁচিয়ে না রাখত, বড়-বড় অফিসারদের মোটা মোটা মাইনের ব্যবস্থা না করে দিত, যখন হাজার হাজার শ্রমিক বেকার ভাতা পাননি, বিমার সুবিধা পাননি এবং কোনও সুযোগ না পেয়ে রাস্তায় দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন? আরও জানতে চাই, মন্দা কাটিয়ে উঠতে কি পারত টাটা কোম্পানি, আমদানি করা ইস্পাতের ওপর উচ্চহারে শুল্ক না বসানো হলে, জনসাধারণের এবং ভারত সরকারের সহানুভূতি ও সমর্থন ব্যতিরেকে? লেখকের চিন্তায় যে বিভ্রান্তি স্থানে-স্থানে প্রকট হয়েছে তা দেখলে দুঃখ হয়, মনে হয়, ভাল হত যদি তিনি ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের চেয়ে অর্থনীতির চর্চায় বেশি মনোযোগ দিতেন। তাঁর যুক্তি-প্রণালীর একটি উদাহরণ: "১৯২৯ ও ১৯৩০ সালে আঙুলে গোনা যায়, এমন কয়েকজনকে বাদ দিলে, আমাদের শ্রমিকেরা ছিলেন 'প্রগতির শ্রমিক'। স্টিল কোম্পানি গত বছরে লাভ করেছিল, এবং সঙ্গতকারণেই স্টিল কোম্পানি তাদের 'প্রগতির শ্রমিক'-দেরকে অতিরিক্ত কর্মপ্রচেষ্টার জন্যে পুরস্কৃত করেছিল" (পৃ ৭০৭)। এ কথা পড়লে মনে হয়, কোম্পানির আর্থিক অবস্থার উন্নতির কারণ ১৯৩১ সালে এবং তার পরে কর্মীদের কাজের উন্নতি। প্রকৃতপক্ষে, আর্থিক অবস্থার উন্নতির একমাত্র কারণ, আগের অনুচ্ছেদে যা বলেছি, টাটা কোম্পানির বেশি-বেশি অর্ডার পাওয়া। কেউ যদি ঘুরে-ঘুরে এক-এক করে কর্মীদের জিজ্ঞাসা করে, দেখা যাবে ১৯২৯-৩০ সালে তাঁরা যে কাজ করেছিলেন এবং ১৯৩১-৩৩ সালে যা করেছিলেন তার মধ্যে কোনও তফাত নেই। আমার স্পষ্ট মনে আছে ১৯২৯ এবং ১৯৩০ সালে জেনারেল ম্যানেজার অনুযোগ করতেন যে বরাতের অভাবেই তাঁকে মজুরি কমাতে হয়েছে, ব্যাপক ছাঁটাই করতে হয়েছে, জামসেদপুরে টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানির কোনও-কোনও বিভাগ বন্ধ করে দিতে হয়েছে।

এক জায়গায় লেখক বলছেন, "বর্তমান সময়ে, আমার মতে, অর্থনৈতিক কারণে, ইস্পাতের

জগতে সমগ্র শ্রমিক বাহিনী, টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানির শ্রমিকেরা ছাড়া, ভুলে গেছেন যে তাঁরা 'প্রগতির শ্রমিক' এবং 'প্রয়োজনের শ্রমিক'....আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আমার মতে, অন্তত শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে এমন কেউ নেই যাঁরা 'প্রয়োজনের শ্রমিক'-দের শ্রেণি থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছেন। ...এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে আমাদের প্রত্যেকের বোঝা উচিত ১৯২৮ থেকে ১৯৩৩ ভারতে একটা মন্দা চলছিল, একই মন্দা অন্য দেশেও চলছে। আমার হিসাবে, টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিলই ইস্পাত শিল্পে এমন একটি মাত্র যারা অগ্রগতি করেছে" (পৃ. ৭০৬-৭)।

ওপরের কথাগুলি পড়ে ধারণা হতে পারে জামসেদপুর ইস্পাত শ্রমিকদের স্বর্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে, পৃথিবীর অন্য সব দেশের কোম্পানিগুলির পক্ষে অনুকরণীয় একটি আদর্শ। কিন্তু প্রকৃত অবস্থাটা কী? প্রবন্ধে আগে এক জায়গায় লেখক বলেছেন, পৃথিবীর মধ্যে আমেরিকার ইস্পাত শ্রমিকদের মজুরি সবচাইতে বেশি। ৩০ জানুয়ারি ১৯৩৫-এর আমেরিকান আয়রন অ্যান্ড স্টিল ইনস্টিটিউটের একটি প্রতিবেদন উদ্ধৃত করে লেখক বলেছেন, "আমেরিকায় শ্রমিকরা নভেম্বর ১৯৩৪-এ গড়পরতা প্রতি ঘণ্টায় ৬৪.৭ সেন্ট রোজগার করতেন, ...১৯৩৩ সালে জাপানে মজুরির হার ছিল প্রতি ঘণ্টা ৯.৭ সেন্ট এবং ভারতে ৮.৬ সেন্ট।" (ইউরোপের দেশগুলির হার ছিল প্রতি ঘণ্টা ২৫ সেন্টের মতো)। ভারতের গড়পরতা মজুরি যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক অষ্টমাংশ হয় এবং টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি যদি ভারতে বৃহত্তম ইস্পাত কোম্পানি হয়, আমার মতে টাটার জেনারেল ম্যানেজারের অর্থহীন বড়াই না করে লজ্জায় মাথা হেঁট করে থাকা উচিত।

প্রবন্ধটি তিনি যখন লিখতে আরম্ভ করেন তখন লেখক যে কোম্পানির দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন সেটা ৭০৫ পৃষ্ঠার নিম্নলিখিত মন্তব্য থেকেই বুঝতে পারা যায়: 'আমার মতে আমরা কাজ ভাল করছি; আমাদের হাসপাতালগুলির কথা আমরা গর্ব করে বলে থাকি, আমরা যে মজুরি দিই, তার কথাও সগর্বে বলি, কিন্তু একটু থেমে আমরা কি ইউরোপ কি আমেরিকার সঙ্গে ভারতের তুলনা করি? আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি, করি না। ...আমরা যে পারিশ্রমিক আমাদের শ্রমিকদের দিয়ে থাকি, এবং ইউরোপে যে মজুরি দেওয়া হয়, তার মধ্যে তুলনা আমাদের করতেই হবে।'

এবারে বলব যে-সব গুরুতর অভিযোগ টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানির বিরুদ্ধে আনা যায়, তার কথা, সে-সব অভিযোগ নিম্নলিখিত তিন বিষয়ে:

১) ভারতীয়করণ সম্পর্কে মনোভাব

২) অপচয় নিয়ন্ত্রণে অক্ষমতা

৩) শ্রমিকদের প্রতি মনোভাব

এই তিন বিষয়ে আমি যা বলতে চাই, তার মুখবন্ধ হিসাবে উল্লেখ করি, টাটার ডিরেক্টরেরা সব সময়ে দাবি করে এসেছেন, তাঁদের শিল্প হল 'জাতীয়' শিল্প এবং সেই কারণ দেখিয়ে সরলমতি জনসাধারণের সহানুভূতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু একটু পরেই দেখাব যে জামসেদপুরে টাটার যে কারবার সেটা ভারতীয় শিল্পপতিদের কাপড়ের কারখানার তুলনায় অনেক কম জাতীয়, যে শিল্পপতিরা জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম ইত্যাদির অজুহাতে জনসাধারণের অর্থ লুট করে থাকেন।

২৫ বছর আগে, স্টিল কোম্পানিটি যখন আরম্ভ করা হয়েছিল, অনেক বিদেশি, যার অধিকাংশই আমেরিকান ও ব্রিটিশ, তাঁদেরকে চুক্তি করে উচ্চ পদে নিয়োগ করা হয়েছিল। তাদেরকে রাজকীয় বেতন দেওয়া হত, এবং সেই রকম রাজকীয় বোনাসও দেওয়া হত, এবং আমি এমন ঘটনার কথাও জানি, যে মাইনের চেয়েও বোনাস বেশি এবং সে-বোনাস উৎপাদন

কিংবা লাভের ওপর নির্ভর করত না। আমার ধারণা যদি ভুল না হয়, জেনারেল ম্যানেজার নিজে পেতেন মাসে ১০০০০ টাকা—ভারতের প্রধান-প্রধান প্রদেশের রাজ্যপালের সমান মাইনে। জনসাধারণকে বলা হয়েছিল, যথেষ্ট সংখ্যক ভারতীয়কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হলেই ওই সব উচ্চপদে তাঁদের নিয়োগ করা হবে। সে-প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা হয়নি। ১৯২৮ থেকে ১৯৩১-এর মধ্যে বারে-বারে আমরা ভারতীয়করণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছি, কিন্তু বিশেষ ফল হয়নি। এখন অবস্থাটা এ-রকম, অনেক বিভাগে ভারতীয়েরা সেই কাজই করছেন যা করতেন চুক্তিতে নিযুক্ত বিদেশিরা, কিন্তু বেতন পাচ্ছেন তাঁদের অর্ধেক কিংবা এক-তৃতীয়াংশ। তা ছাড়া, ওই সময়ে, যখন জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, আমি অভিযোগ করেছিলাম কয়েকজন চুক্তিবদ্ধ অফিসারের সঙ্গে নতুন করে চুক্তি করা হচ্ছে আরও বেশিদিন কাজ করার জন্য, যদিও তাঁদের জায়গায় কাজ করার জন্য যোগ্য ভারতীয়ের অভাব ছিল না। আমার অভিযোগ বৃথা গেল। কোনও নিরপেক্ষ তদন্ত যদি হয়, কতজন বিদেশি জামসেদপুরে কাজ করেন, তাঁরা কী বেতন পান, টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানির দোষ প্রমাণিত হবে।

নিঃসন্দেহে টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি এক বৃহৎ কোম্পানি এবং সেই জন্য অপচয় নিবারণের জন্য কড়া নজর রাখা দরকার। কিন্তু এই বিষয়ে অবস্থাটা মোটেই সন্তোষজনক নয়। ডিরেক্টরেরা সকলেই অন্যত্র থাকেন, কোম্পানির কাজ কর্মের বিষয়ে বিশেষ খোঁজ রাখেন না। সবাই তাঁরা ব্যস্ত মানুষ, অনেক রকম তাঁদের ধান্দা, এবং জামসেদপুরের কলকারখানার বিষয়ে বেশি কিছু জানার তাঁদের সময় নেই, এমনকী ইচ্ছাও নেই। তার ফল এই হয়েছে, যে সেই বিরাট কারখানায় কাজ কর্ম পুরোপুরি বিদেশিদের হাতে ন্যস্ত, এবং সেই বিদেশিদের জবাবদিহির দায় একমাত্র অনুপস্থিত ডিরেকটরদের কাছে, যে ডিরেকটরেরা পুরোপুরি তাঁদের অঙ্গুলিহেলনে চলেন। বোর্ডের অসহায়তা আমি প্রথম উপলব্ধি করলাম যখন ১৯২৮-এর সেপ্টেম্বরে ধর্মঘটীদের পক্ষ থেকে তাঁদের সঙ্গে মীমাংসার সূত্র নিয়ে আমাকে আলোচনা করতে হল। যে-কোনও বিষয়ে ম্যানেজার যদি বলেন 'হ্যাঁ', বোর্ড তাতে রাজি, যদি ম্যানেজার বলেন 'না,' বোর্ডও বলে 'না।'

মীমাংসা যে আদৌ হল তার কারণ তৎকালীন জেনারেল ম্যানেজার মি. আলেকজান্ডার মীমাংসা চাইছিলেন। একবার আমি বোর্ড অব ডিরেকটরসের চেয়ারম্যানকে পরামর্শ দিয়েছিলাম, তাঁর এবং বোর্ডের শ্রমিকদের সঙ্গে আরও বেশি যোগাযোগ থাকা উচিত এবং সে-উদ্দেশ্যে, ভাল হয়, যদি তাঁরা কোম্পানির অফিসারদের সঙ্গে না নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে ঘোরেন। মনে হয়েছিল চেয়ারম্যানের আমার পরামর্শটা পছন্দ হয়েছিল, কিন্তু সেটা কাজে লাগানো গেল না, কারণ জেনারেল ম্যানেজার তার বিরোধিতা করলেন, তা হলেও আমার বিশ্বাস বোর্ড তাদের অবস্থাটা বুঝতে আরম্ভ করল, কারণ তার অল্পদিনের মধ্যে একজন ডিরেকটরকে তাঁরা জামসেদপুরে এবং পরে কলকাতায় পাঠালেন, বোর্ড এবং ম্যানেজমেন্টের মধ্যে সংযোগকারী হিসাবে কাজ করবার জন্য। তাঁর নিযুক্তির পর থেকে জামসেদপুরে ঢিলেঢেলা ভাব খানিকটা কমানো হয়েছে। কলকাতায় এবং অন্যত্র বেশিরভাগ খবরের কাগজকে বিজ্ঞাপন দিয়ে কিনে নেওয়া হয়েছে, যার ফলে জাতীয় সংবাদপত্রগুলোতে টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানির সমালোচনা সামান্যই বেরোয়। কিন্তু আসল যেখানে ত্রুটি, অপচয় ও অদক্ষতা, সেটা থেকেই গেছে।

ওপরে যাঁর কথা বললাম সেই ডিরেকটর একজন আই. সি. এস এবং দক্ষ প্রশাসক; কিন্তু কারিগরি জ্ঞানের তাঁর অভাব আছে, যা না থাকলে ম্যানেজমেন্টকে দিয়ে কিছু করিয়ে নেওয়া যায় না। তার একটা ফল হয়েছে এই যে ভারতীয়করণে অগ্রগতি সন্তোষজনক হয়নি। চুক্তিবদ্ধ

বিদেশি অফিসার অনেক আছেন যাঁদের জায়গায় সহজেই দক্ষ ভারতীয়দের নিয়োগ করা যেত, অনেক কম বেতনে। আমি উদ্ধৃত করে দেখিয়েছি ১৯৩৩ সালে ভারতীয় গড়পড়তা বেতন দৈনিক ৮.৬ সেন্ট। কিন্তু উচ্চ বেতনভোগী বিদেশিদের বাদ দিলে, সেই গড় নিঃসন্দেহে অনেক নীচে নেমে আসবে।

তবে, মাথামোটা প্রসাশন, জামসেদপুরে যে অপচয় চলছে তার একটি ক্ষুদ্র অংশ, মালগুদাম যদি কেউ পরিদর্শন করেন, এবং পরীক্ষা করে দেখেন যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ইত্যাদির জন্য বার্ষিক কী পরিমাণ অর্ডার দেওয়া হয়, খানিকটা আন্দাজ করতে পারবেন কী অপচয় জামসেদপুরে চলছে। প্রায় ৭-৮ বছর আগে একজন ভারতীয় চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইনজিনিয়ার, যিনি ছিলেন কোম্পানির সবচাইতে জনপ্রিয় অফিসারদের অন্যতম, তাঁকে হঠাৎ বরখাস্ত করা হয় এবং তাঁর জায়গায় বিদেশ থেকে একজনকে আমদানি করা হয়। তারপরই আরম্ভ হয় বিদ্যুৎ বিভাগ অপচয়, ত্রুটিযুক্ত ও অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাজ-কর্মের জন্য। অপচয়ের আরেকটি উৎস জ্বালানি খরচ। টাটার মতো অত বড় কোম্পানির জন্য একান্তভাবে আবশ্যক অপচয় হ্রাসের উদ্দেশ্যে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাসমূহের প্রয়োগ, এবং সে-বিষয়ে নিরন্তর গবেষণা। কিন্তু এ দিক থেকে টাটা কোম্পানি পিছিয়ে আছে। এই অপচয় এবং মাথা-ভারী প্রশাসনের কারণেই টাটা কোম্পানি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারছে না, সর্বদা রাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করে আছে, আর্থিক সাহায্যের জন্য নয়তো আমদানির ওপর শুল্কের আড়ালে আত্মরক্ষার জন্য। যে দেশে শ্রমিক এত সুলভ, কোনও সুসংগঠিত ইস্পাত কোম্পানির রাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়াই চলতে পারা উচিত। জামসেদপুরে এমন কয়েকটি স্বাধীন সংস্থা আছে যারা লোহার ছাঁট, বিদ্যুত ইত্যাদি টাটা থেকে ক্রয় করে এবং উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি করে লাভ করে। তার একমাত্র কারণ, তাদের অপচয় নেই, মাথাভারী প্রশাসন নেই।

সবশেষে— এবং আমাদের বক্তব্যের প্রসঙ্গে এইটাই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়— আমি বলব শ্রমিকদের প্রতি টাটা কোম্পানির মনোভাবের কথা। জামসেদপুরে প্রথম শ্রমিক ইউনিয়ন সংগঠিত হয়েছিল ১৯২০-র জানুয়ারিতে। ততদিনে এত অভিযোগ জমা হয়েছিল যে, ১৯২১-২২ সালে সেখানে গুরুতর শ্রমিক গণ্ডগোল দেখা গেল। এই সময় নাগাদ প্রয়াত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সহানুভূতি জামসেদপুরের শ্রমিকদের দিকে গেল, এবং তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, তাদেরকে তিনি পূর্ণ সমর্থন দিয়েছেন। কিন্তু এই সমর্থনে কোনও কাজ হয়নি, যতদিন না ১৯২৩-এর নির্বাচনে স্বরাজ পার্টি ভারতীয় আইনসভায় সবচাইতে শক্তিশালী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। দেশবন্ধু দাশের সঙ্গে যোগ দিলেন মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, এবং টাটা কোম্পানি তখন দেখল ওই জাতীয়তাবাদী নেতাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করা দরকার, কেননা সভায় অবিলম্বে টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানির জন্য রাষ্ট্রের সাযায্যের প্রশ্ন বিবেচিত হবে। টাটা তখন ট্রেড ইউনিয়নটিকে (তার নাম লেবার অ্যাসোসিয়েশন) স্বীকৃতি দিতে, বেতনের দিন ইউনিয়নের চাঁদা সংগ্রহ করতে, এবং সাধারণভাবে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি করতে রাজি হল। কিছুদিনে জন্য শ্রমিকদের অবস্থার রীতিমতো উন্নতি দেখা গেল। কিন্তু দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর অবস্থার আরও অবনতি আরম্ভ হল।

দেশবন্ধুর স্থলাভিষিক্ত হলেন মি. সি. এফ. অ্যান্ড্রুজ। বিধানসভায় কংগ্রেস দলের সমর্থনে তিনি পতাকাটি উড্ডীন রাখলেন কিন্তু কোম্পানির অফিসারদের নির্মম হৃদয়হীন আচরণের ফলে ১৯২৮ সালে এক গুরুতর ধর্মঘট আরম্ভ হল। তারপর থেকে শ্রমিকদের প্রতি কোম্পানির যে মনোভাব সেটা এক আমলাতান্ত্রিক সরকারের উপযুক্ত, কোনও 'জাতীয়' শিল্পসংস্থার শোভা পায় না। জামসেদপুরের শ্রমিকদের সঙ্গে আমার সম্পর্কের শুরু ১৯২৮-এর অগাস্টে যখন ধর্মঘটীরা এবং তাঁদের নেতা মি. হোমি আমার ওপর প্রবল চাপ দিলেন তাঁদের

পক্ষ নিয়ে লড়াই করবার জন্য। কোম্পানি যখন দেখল আমি শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার ফলে অবস্থাটা তাদের পক্ষে খুব কঠিন হয়ে পড়েছে, তারা কর্মীদের দাবি মানতে রাজি হল, কিন্তু একমাত্র এই শর্তে, যে মি. হোমি, যাঁর বিরুদ্ধে তাদের অনেক অভিযোগ, তাঁর সঙ্গে তাদেরকে আলোচনা করতে হবে না। প্রথমে মি. হোমি সরে দাঁড়াতে সম্মত ছিলেন, যদি তাতে কর্মীদের পক্ষে মঙ্গলজনক কোনও মীমাংসায় পৌঁছনো সম্ভব হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মীমাংসা যখন লিপিবদ্ধ করা হল এবং কর্মীরা এক সাধারণ সভায় তার অনুমোদন করলেন, মি. হোমি তাঁর মত পরিবর্তন করে মীমাংসার বিরোধিতার জন্য এক নতুন সংগঠন স্থাপন করলেন।

মীমাংসার কিছুদিন পরেই তার কোনও-কোনও গুরুত্বপূর্ণ শর্ত কোম্পানি পালন করতে অস্বীকার করল। তার ফলে অনেক শ্রমিক মি. হোমির দলে গিয়ে যোগ দিলেন। কয়েক মাস কোম্পানি হোমির সংগঠনকে স্বীকৃতি দিল না, কিন্তু হঠাৎ এক সুপ্রভাতে কোম্পানির রণকৌশল বদলে গেল। জেনারেল ম্যানেজার এতাবৎকালের শত্রু মি. হোমিকে আমন্ত্রণ জানালেন, এবং তাঁর সংগঠন স্বীকৃতি লাভ করল। পুরনো সংগঠন, লেবার অ্যাসোসিয়েশনকে অগ্রাহ্য করা হল, এবং মীমাংসাটি যাঁরা রচনা করেছিলেন, এবং তার প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছিলেন, তাঁদেরকে পরিত্যাগ করা হল। কয়েক মাস পরে, দৃশ্যপটের আবার পরিবর্তন। বিবিধ অভিযোগে মি. হোমির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হল এবং তাঁর জেল হল। মি. হোমির অন্তর্ধানের পর তাঁর সংগঠন বন্ধ হয়ে গেল।

জানুয়ারি ১৯৩০-এ অ্যাসেমব্লি থেকে কংগ্রেস দলের প্রত্যাহারের ফলে কর্মীদের প্রতি কোম্পানির মনোভাব হল কঠোর। মি. হোমির কারারুদ্ধ হওয়ার পরে যখনই কর্মীদের সভা হত সেখানে হাজির হত লাঠিসোটা নিয়ে একদল গুণ্ডা এবং জোরজবরদস্তি করে সভা ভেঙে দিত। ১৯৩১ সালে আমি সে-রকম একটা সভায় সভাপতিত্ব করেছিলাম। সে-সভাও ওই ভাবে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। কাজেই আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি। এই অবস্থায় চলল কয়েক বছর এবং ১৯৩৪ সালেও অবস্থাটা এত খারাপ ছিল যে সেই শহরে একবার যখন মহাত্মা গান্ধী এসেছিলেন, এক জনসভায় তিনি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে বিসংবাদের মীমাংসা লাঠির আগায় হচ্ছে জেনে তিনি দুঃখিত।

কর্মীদের চূড়ান্ত কঠিন থেকে এ-অভিযোগ করা যায় যে ১৯৩০ সাল থেকে কোম্পানি তাদের সঙ্গে নির্মম আচরণ করছে। দুটি শ্রমিক সংগঠন থেকেই স্বীকৃতি তুলে নেওয়া হয়েছে, বেতনের দিন চাঁদা তোলা বন্ধ হয়ে গেছে, এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের হয় নির্যাতন করা হচ্ছে নয়তো জামসেদপুর থেকে দূরে বদলি করা হচ্ছে। ১৯৩৪-এর জানুয়ারিতে যখন সেখানকার সরকারি অফিসারেরা ৪০ জন গুণ্ডার একটি দলের নামে মামলা রুজু করেছিলেন, টাটার বড়-বড় অফিসারেরা সে-বিষয়ে আদালতের বাইরে মিটমাটের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

অবস্থা সঙ্গিন হয়ে উঠল ১৯৩৫ সালে। কোম্পানি লেবার অ্যাসোসিয়েশনকে তাদের সেক্রেটারির এবং অফিসের জন্য ব্যবহৃত ঘরটির চার বছরের ভাড়া দাবি করে নোটিস দিল। অথচ চার বছর আগে ম্যানেজিং ডিরেক্টর মি. দালালের সঙ্গে আমার এই মর্মে একটি বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছিল যে, কোম্পানি ভাড়া মকুব করবে। কোম্পানি ভেবেছিল অ্যাসোসিয়েশন ভাড়া দিতে পারবে না, তার ফলে উৎখাত হবে, এবং যেহেতু জামসেদপুরের সমস্ত বাড়িরই মালিক কার্যত কোম্পানি, জায়গার অভাবে অ্যাসোসিয়েশনের অস্তিত্ব লোপ পাবে। অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি এমন কথাও বললেন যে, ভবিষ্যতে তাঁরা ভাড়া দেবেন এবং বকেয়া ভাড়া কিস্তিতে শোধ করবেন। কিন্তু কোম্পানি কোনও আপোসে রাজি হল না এবং তার দ্বারা প্রমাণ করল যে আসলে তারা যা চেয়েছিল তা ভাড়া নয়, জামসেদপুরে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের অবসান।

এই খেলাই কোম্পানি মনের আনন্দে চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আবার ভারতীয় আইনসভায় প্রবেশ করবার সিদ্ধান্ত নিল, কোম্পানি তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানত যে দু'-তিন জন এম.এল.এ-র অভ্যাস আছে শ্রমিকদের প্রতি আচরণ সংক্রান্ত কিছু-কিছু অসুবিধানজক প্রশ্ন তোলা। তাদের মনে হল, আবার তাদের কৌশল পরিবর্তন করাই বুদ্ধির কাজ হবে। তখন একটি নূতন গোষ্ঠী, মেটাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন-এর জন্ম হল কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায়, এবং কারখানার শ্রমিকদের পরামর্শ দেওয়া হল সেই গোষ্ঠীতে যোগ দিতে। এই গোষ্ঠী এখনও কোম্পানির নেক নজরে আছে, এবং তাদের অন্যতম প্রধান কাজ সরকার ও কোম্পানির অফিসারদের টি-পার্টিতে আপ্যায়িত করা, এবং জেনারেল ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া। কোম্পানির এই নতুন নীতির উদ্দেশ্য হল নিন্দুকদের দেখিয়ে দেওয়া, টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপ দমন করে না।

সংগঠিত শ্রমিকদের প্রতি কোম্পানির মনোভাব নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করলাম, এখন দু'-চার কথা বলব ব্যক্তি হিসেবে কর্মীদের সঙ্গে তাঁরা যে-রকম ব্যবহার করেন, তার বিষয়ে। আমার সামনে এখন আছে মেটাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (যাকে জামসেদপুরের লোকে বলে 'কোম্পানির ইউনিয়ন') কর্তৃক জেনারেল ম্যানেজারকে প্রদত্ত তাদের আবেদনের একটি মুদ্রিত প্রতিলিপি। তাতে কথাগুলি আছে:

'টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানিতে কর্মরত কর্মীদের অধিকাংশের চাকরির শর্তাবলী যথোচিত নয়। তাঁদের অনেককেই বরখাস্ত, বাধ্যতামূলকভাবে ছুটিতে যাওয়া, ইত্যাদির নির্দেশ দেওয়া হয় যথোপযুক্ত বিবেচনা ছাড়াই। দু' বছর কাজ করার পরও এমন নোটিস পেয়েছেন, সে-রকম লোকের সংখ্যা কম নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, পুরনো রোলিং মিলের কর্মী যাঁরা দীর্ঘকাল কোম্পানিতে কাজ করেছেন, এবং কোম্পানি বর্তমানে ইস্পাত শিল্পের কোম্পানিগুলির মধ্যে যে স্থান অধিকার করেছে তার জন্য যাঁদের অবদান কম নয়, তাঁদেরকে ছুটি নিতে বাধ্য করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি কোম্পানি এক নতুন নীতি অবলম্বন করেছে; অস্থায়ীভাবে নিয়োগ এবং লক্ষণীয়, এই 'অস্থায়ী'র কোনও সময়-সীমা নেই। সে-রকম লোক দু' বছরের বেশি কাজ করেছেন এ-ঘটনা বিরল নয়। এই উপায়ে বোনাস না দিয়ে 'ওয়ার্কার্স সার্ভিস রুল' অনুযায়ী প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা থেকে তাঁদের বঞ্চিত করে কোম্পানি অনেক টাকা বাঁচিয়েছে। সে-সব সুযোগ সুবিধা কেবল মাত্র স্থায়ীভাবে নিযুক্ত কর্মীরাই ভোগ করতে পারেন।

সাময়িকভাবে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া, এ হামেশা হয়। ম্যানেজমেন্টের কয়েকটি নির্দেশ আছে, কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগের উত্তর তাঁকে দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে, তা সত্ত্বেও, কয়েকটি ক্ষেত্রে হয় সে নির্দেশ পালন করা হয় না, নয় অভিযুক্ত কর্মীর বক্তব্যের প্রতি অবিলম্বে মনোযোগ দেওয়া হয় না। একই কথা বলা যায় বেতন হ্রাসের মতো দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ক্ষেত্রেও।

কর্মীর পদোন্নতি এবং বেতনবৃদ্ধির এমন কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম নেই যা সর্বদা অনুসরণ করা হয়। কিছুদিন যাবৎ কোম্পানির নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে উচ্চ বেতনের পদ খালি হলে, যতদূর সম্ভব তুলে দেওয়া, এবং কম বেতনের কর্মীদের দিয়ে সেই অতিরিক্ত কাজ যথেষ্ট পারিশ্রমিক না দিয়ে করানো।

যদিও বোনাস ব্যবস্থার মধ্যে যে উৎসাহ দানের মনোভাব আমরা তার প্রশংসা করি, আমাদের মনে হয় এ ব্যবস্থা শুধু অল্প কয়েকজন কর্মীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। তার ওপরে, অপারেটিং ও মেনটেনান্স কর্মীদের মধ্যে বিভাগীয় বোনাসের ব্যাপারে পার্থক্য করা হয়েছে।...

সাপ্তাহিক মজুরিতে শ্রমিক নিয়োগের প্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল যখন নির্দিষ্ট সময়ের কাজের জন্য কোম্পানির লোকের প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন থেকে আমরা দেখছি, কোনও-কোনও বিভাগে স্থায়ী কাজের জন্য সাপ্তাহিক ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ করা হচ্ছে, জামসেদপুরে সে-রকম

শ্রমিকের সংখ্যা (নারী-পুরুষ মিলিয়ে) প্রায় ৫০০০ অর্থাৎ মোট কর্মীর প্রায় ২০ শতাংশ। ওই শ্রেণীর শ্রমিকের অধিকাংশ এর মধ্যেই ৫ বছরের বেশি কাজ করেছেন। সে-রকম সাপ্তাহিক মজুরির শ্রমিকেরা মজুরি পান দিনে ৫ আনা থেকে ৮ আনার মধ্যে। নীচে যে পরিসংখ্যান দেওয়া হল তাতে দেখা যাচ্ছে শ্রমিক সংক্রান্ত রয়্যাল কমিশনের প্রতিবেদনে স্পষ্ট দেখানো হয়েছে, উল্লিখিত দুটি জায়গা শোলাপুর ও আহমেদাবাদের চেয়ে জামসেদপুর জীবনযাত্রার ব্যয় অনেক বেশি।...(এর পরে প্রদত্ত পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে মাসিক ব্যয় শোলাপুরে ৩৭ টাকা ১৩ আনা ১১ পাই, এবং আহমেদাবাদে ৩৯ টাকা ৫ আনা ৮ পাই। কিন্তু জামসেদপুরে ৫০০০ শ্রমিক মজুরি পান দৈনিক ৫ আনা থেকে ৮ আনা।

উল্লিখিত বিবৃতি, যা দিয়েছেন কোনও গরম-রক্ত আন্দোলনকারী নয়, কোম্পানির অনুগত ইউনিয়ন, সেটি দেখে আমি কি মি. কিনানকে জিজ্ঞাসা করতে পারি, জামসেদপুরে 'প্রগতির শ্রমিক' কত জন আছেন? আমার ধারণা, জেনারেল ম্যানেজার এবং উচ্চপদস্থ চুক্তিবদ্ধ অফিসারদের বাদ দিলে, মুষ্টিমেয় ভারতীয় কর্মীকেই 'প্রগতির শ্রমিক' আখ্যা দেওয়া যাবে।

প্রবন্ধটির একটিমাত্র অংশ সম্পর্কে আমি কৃতজ্ঞ বোধ করতে পারি, যেখানে লেখক টাটার খনিগুলিতে শ্রমিকদের অবর্ণনীয় অবস্থার কথা বলেছেন। আমার আশা, মিসেস কিনানের সহানুভূতির সহযোগে জেনারেল ম্যানেজার বেচারি খনিশ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করতে পারবেন।

স্পষ্টতই লেখক শুধু লৌহ-খনির শ্রমিকদের কথাই বলেছেন। কিন্তু কয়লা খনিগুলির অবস্থা কী? কয়েক বছর আগে, যখন আমি টাটা কোলিয়ারিজ লেবার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ছিলাম, টাটার কয়লা খনিগুলির ভিতরের অবস্থা আমার দেখবার সুযোগ হয়েছিল। সেই সময়ে কয়েকটি খনি বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছিল, এবং হাজার-হাজার কর্মীকে বরখাস্ত করা হচ্ছিল। স্বাভাবিকভাবেই আমরা চাইছিলাম, খনিগুলোর কাজ চলুক, কিন্তু আমাদের দাবির বিরুদ্ধে দুটি যুক্তি দেখানো হচ্ছিল, প্রথমত কয়েকটি কলিয়ারির সঙ্গে কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি ছিল এবং এখনকার সরবরাহের পথে তাদের নিজেদের খনিগুলি থেকে কোম্পানির আর সরবরাহের প্রয়োজন হবে না, এবং দ্বিতীয়ত কোম্পানির খনিগুলিতে উৎপাদন ব্যয় বাজারের চালু দরের চেয়ে বেশি।

বাইরের লোকের পক্ষে বোঝা কঠিন কোম্পানি কেন দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতে গেল, আবার সেই সঙ্গে কয়লাখনি কিনবার জন্য অর্থও লগ্নি করল। প্রথমত লাভজনক নয় এমন দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি করা উচিত হয়নি। দ্বিতীয়ত, সেইরকম চুক্তিই যখন করল, কোনও কয়লার খনি তাদের ক্রয় করা উচিত হয়নি। তৃতীয়ত, একবার যখন ওই সব খনিতে কাজ আরম্ভ হল খনিগুলি তাদের বন্ধ করা উচিত হয়নি, কারণ খনিতে যখন কাজ হয় না তখন তাকে ভাল অবস্থায় রাখা অতি ব্যয়সাধ্য। চতুর্থত, কয়লা খনি বিভাগেও তাদের মাথাভারী প্রশাসন বজায় রাখবার কোনও কারণ ছিল না—তাতে উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যায়। পরিচালন দক্ষতায় এই সব অভ্যাসের কারণে কোম্পানির ভুলের মূল্য রাষ্ট্রকে দিতে হয় এবং ভারতীয় কর্মীদের কম বেতন পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

জামসেদপুরে টাটার কর্মীদের যদি 'প্রগতির শ্রমিক' হয়ে উঠতে হয়, মাথামোটা প্রশাসনের সংস্কার করতে হবে, চুক্তিবদ্ধ অফিসারদের বিদায় দিতে হবে এবং অপচয় ও অদক্ষতার অবসান করতে হবে। সামান্য যে বোনাস সামান্য মজুরির শ্রমিকদেরকে তাঁদের পূর্ববর্তী বছরের কাজের জন্য দেওয়া হয়ে থাকে, তাতে জামসেদপুরের কর্মীদের অবস্থার তেমন কোনও পরিবর্তন হয় না, এবং তার দ্বারা কোম্পানি এ দাবিও করতে পারে না যে অন্যদের চেয়ে শ্রমিকদের নিয়োগকর্তা হিসাবে তারা উৎকৃষ্ট।

পোল্যান্ডে ভারতের এক বন্ধু[১]

১৯৩৩ সালে আমি যখন পোল্যান্ডে গিয়েছিলাম, কয়েকজন আকর্ষণীয় ব্যক্তির সঙ্গে আমার পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে কয়েজন ভারত সম্বন্ধে অতিশয় আগ্রহী ছিলেন। সাধারণভাবে ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের প্রতি একটা সহানুভূতি ছিল। পোলেরা যেহেতু তাদের স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম করেছিল, এবং সেই স্বাধীনতা অল্প কিছুদিন আগে তারা লাভ করেছে, সেহেতু, যে জাতি তাদের জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে, তার প্রতি তারা গভীর সহানুভূতিশীল। আমার মনে আছে, ওয়ারস-র কয়েকজন পোলিশ বন্ধু আমাকে দেশের অভ্যন্তরে কৃষকদের জীবন দেখবার জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন। আমাদেরকে একটি গ্রামীণ কৃষি-বিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কৃষকদের সন্তানদেরকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৃষি শিক্ষা দেওয়ার জন্য সরকার যে বিদ্যালয়গুলি স্থাপন করেছে, এটি তার অন্যতম। তত্ত্বাবধায়ক এক বৃদ্ধা মহিলা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন। দেখা যখন শেষ হল, তিনি সহৃদয়ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন মহাত্মা গান্ধী কেমন আছেন এবং তখন তিনি কী করছেন। তাঁর কথা আমার অন্তর স্পর্শ করল।

পোলিশ জাতির এখন চেষ্টা, কত তাড়াতাড়ি দেশটাকে শিল্পপ্রধান দেশ বানাতে পারে। সেই উদ্দেশ্যে তারা নিজেদের একটি বন্দর তৈরি করেছে Gdyina। তার ফলে তারা আর আগেকার জার্মান বন্দর Danzig-এর ওপর নির্ভরশীল নয়। তাকে এখন আন্তর্জাতিক বন্দর বানানো হয়েছে। তারা আরও চেষ্টা করছে, বৈদেশিক বাণিজ্য বাড়িয়ে তুলতে। সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে তারা দূতাবাস খুলছে। ভারতে বোম্বেতে পোলিশ দূতাবাস খোলা হয়েছিল ১৯৩৩ সালে। পোল্যান্ড বস্ত্রশিল্প অতি উন্নত। তার একটি বড় কেন্দ্র Lodz-এ। সম্প্রতি লৌহ ও ইস্পাত শিল্পও উন্নতি করছে।

পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারসতে একটি ওরিয়েন্টাল সোসাইটি আছে, তার বিশেষ আগ্রহ প্রাচ্য সংস্কৃতি সম্পর্কে। ওরিয়েন্টাল সোসাইটির আয়োজনে এক সামাজিক সম্মেলনে আমি আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। সেখানে আমি একটি পোলিশ-ইন্ডিয়ান সোসাইটি সম্পর্কে আমাদের ইচ্ছার কথা বলেছিলাম। সেই সোসাইটি আমাদের দুই জাতির মধ্যে সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন ও উন্নয়নের চেষ্টা করবে।

ছাত্রেরা, নারী ও পুরুষ সবাই, অতি সচেতন। বিশেষ করে মহিলারা ভারতসহ বিদেশি দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে অতি উৎসাহী। তাঁরা ভারতে আমাদের ছাত্র ও যুব-সংগঠনগুলির বিষয়ে জানতে চাইলেন। তাঁদের সংগঠনটির নাম Liga, সেই Liga-র মধ্যে প্রত্যেক দেশের জন্যে তাঁদের আলাদা-আলাদা অংশ আছে। সে-সব দেশের সঙ্গে তাঁরা যোগাযোগ করতে চান।

এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে আমি বিশেষভাবে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির কথা বলতে চাই যাঁর সঙ্গে আমার ওয়ারসয় পরিচয় হয়েছিল, Professor Stanislaw F. Michalski, তিনি একজন ভারত প্রেমিক, সারাজীবন অতিবাহিত করেছেন সংস্কৃত ও ভারতীয় সাহিত্যের চর্চায়।

Professor Michalski-Iwienski-র জন্ম হয়েছিল পোল্যান্ডে, ১৮৮১ সালে। তিনি সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় সাহিত্য অধ্যয়ন করেছেন ১৯০৫ থেকে ১৯১১ সালে ভিয়েনাতে Professor Leopold V Schroder-র কাছে, এবং ১৯১৪ সালে Professor Oldenburg -এর কাছে জার্মানির Gottingen-এ। কয়েক বছর তিনি Warsaw-Wolna Wszechnica-র পোলিশ ফ্রি

---

১. মডার্ন রিভিউ, ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬ সংখ্যায় প্রকাশিত এবং 'সুভাষ সি. বোস, থ্রু কংগ্রেস আইজ (কিতাবিস্তান, এলাহবাদ এবং লন্ডন, ১৯৩৮-এ) পুনর্মুদ্রিত।

ইউনিভার্সিটিতে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য অধ্যাপনা করেন। ১৯২০ সালে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উনি স্বেচ্ছায় যোগদান করেন। তদবধি Prof. Michalski সমস্ত সময় সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক কাজে নিয়োজিত করেছেন। ১৯২৩ সালে কয়েকজন পোলিশ প্রাচ্য-বিদ্যাবিশারদদের সহযোগে উনি Warsaw Scientific Society-র প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন।

Prof. Michalski ভারত ও ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে বেশ কয়েকখানি বইয়ের প্রণেতা। তার কয়েকটির নাম দিলাম:

(১) ভগবদ্‌গীতা, ১৯১২, ২য় সংস্করণ ১৯২০; ৩য় সংস্করণ ১৯২৬।

(২) উপনিষদ (নির্বাচিত), ১৯১৩, ২য় সংস্করণ, ১৯২২।

(৩) রামের আকাঙ্ক্ষা (Rama's Longing) (রামায়ণের একটি কাণ্ড) ১৯২০।

(৪) ধম্মপদম (অনূদিত), ১৯২৪।

(৫) ঋকবেদের চল্লিশটি স্তোত্র, ১৯১৪।

(৬) আত্মবোধ, ১৯২৩।

(৭) ভগবদ্‌গীতা (মূল পাঠ্য— সংস্কৃতে ও তৎসহ ভূমিকা ও টীকা), ১৯২১।

Prof. Michalski রামায়ণ ও Odyssea-র মধ্যে সম্পর্কের কথা Odyssea-র পোলিশ সংস্করণের (ওয়ারস) ভূমিকায় বলেছেন, এবং দেখিয়ে দিয়েছেন হোমার সম্পর্কে গবেষণার সূত্রে 'রামায়ণ' অধ্যয়ন প্রয়োজন।

গত কয়েক বছর Prof. Michalski একটি বৃহৎ পোলিশ বিশ্বকোষ প্রণয়নে ব্যস্ত আছেন। তাতে তিনি ভারত এবং ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য, ভারতীয় ইতিহাস, ভারতীয় ভূতত্ত্ব, ইত্যাদি বিষয়ে কয়েকটি নিবন্ধ লিখেছেন। ভারতের সম্বন্ধে দীর্ঘ নিবন্ধটির সঙ্গে আছে অনেকগুলি চিত্র ও একটি বহুবর্ণের মানচিত্র।

১৯২৪ সালে অধ্যাপক ওয়ারসতে ভারতের মহাকাব্য সম্পর্কে একটি আলোচনা করেছিলেন। ১৯৩৫-এ তিনি রোটারি ক্লাবের ওয়ারস শাখায় সাধারণভাবে ভারত সম্পর্কে পর্যালোচনা করে একটি ভাষণ দিয়েছিলেন।

কয়েক বছর ধরে অধ্যাপক ভারত-বিষয়ক গ্রন্থের একটি সংগ্রহ তৈরি করছেন। বর্তমানে সেই সংগ্রহে আছে ২০০০-এর অধিক বই সংস্কৃত এবং প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের ওপর।

গৃহকর্তা হিসাবে Prof. Michalski অতীব অতিথিপরায়ণ। আমাকে তিনি এক নৈশ ভূরিভোজে আপ্যায়িত করেন ও বিদায়কালে দক্ষিণা হিসেবে দেন তাঁর প্রকাশিত রচনাবলির একটি গুচ্ছ।

শুনে আগ্রহ বোধ করছি, আরেকজন পোলিশ অধ্যাপক, Lwow-এর Prof. Stasiak এখন ভারতে আছেন। Prof. Stasiak একজন সুপরিচিত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ, এবং ইউরোপে কয়েকটি বড়-বড় জায়গায় প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও দর্শন বিষয়ে বক্তৃতা করেছেন।

পোল্যান্ডে একটি Polish-Indian Society-র জন্য জমি প্রস্তুত হয়েছে। ভারতে তার একটি শাখা থাকতে পারে। শুধু দরকার এ বিষয়ে নেতৃত্ব দানের মতো একজন।

জার্মানিতে ভারতীয়[১]

জার্মানিতে নতুন শাসন ক্ষমতায় আসার পর থেকে সেখানকার ভারতীয় অবস্থার রীতিমতো অবনতি হয়েছে। সমস্যা প্রধানত চারটি। প্রথমত, ভারতীয় ছাত্রেরা, তার মধ্যে বিভিন্ন জার্মান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাঁরা গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন তারাও আছেন, দেখছেন যে জার্মানির কলকারখানায় হাতে কলমে প্রশিক্ষণ লাভ তাঁদের পক্ষে কঠিন হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, ভারত-বিরোধী প্রচার, সংবাদপত্র এবং ফিল্মে, বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভারত-অনুকূল প্রচার কার্যত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয়ত, নতুন জাতি-সংক্রান্ত আইন সমস্ত এশিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। চতুর্থত, জার্মানি ভারতে যত সামগ্রী বিক্রি করছে, ভারত থেকে ক্রয় করছে তার চেয়ে অনেক কম।

এই সব সমস্যার মধ্যে কয়েকটি হয়তো এত বড় যে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে তা নিয়ে কিছু করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমার আশা অ্যাসোসিয়েশন যথাসাধ্য করবে, তার কারণ বার্লিনে ভারতীয়দের আর কোনও সংগঠন নেই। আমি আরও আশা করি, বার্লিন Indian Chambers of Commerce and Industry-র নতুন প্রতিনিধি, ড. কে. এল গাঙ্গুলির সহায়তা ভারতের বাণিজ্য সংক্রান্ত ও অন্যান্য অভিযোগের নিরসনে কার্যকর হবে। ড. গাঙ্গুলি এর মধ্যেই Ministry of Commerce থেকে আশ্বাস পেয়েছেন, যে ভারতীয় শিক্ষানবিশ ছাত্রদের অভিযোগের বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পরিশেষে, আমি শুনে দুঃখিত হলাম, কুখ্যাত ফিল্ম Bengali সম্পর্কে প্রতিবাদ জানাবার জন্য Islamic Association-এর ডাকা একটি সভা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। আশা করি ভবিষ্যতে সেখানকার ভারতীয়েরা এ ধরনের হস্তক্ষেপ বিনা প্রতিবাদে মেনে নেবেন না।

ডাবলিন ভ্রমণ[২]

একটি নোট

তিনি (বোস) বুধবার রাত্রে ডাবলিন ত্যাগ করেন। তবে, সোমবার আপনাকে চিঠি দেওয়ার পর তিনি কৃষি ও ভূমি মন্ত্রীর সঙ্গে আরও কথাবার্তা বলেছেন। বড়-বড় সম্পত্তি কিনে নিয়ে কৃষকদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার তাঁর যে নীতি সে-বিষয়ে তাঁর সঙ্গে বোস আলোচনা করেন। সে নীতি ভারতে অবলম্বন করা যায় কিনা, তা নিয়েও কথা বলেন,

Sinn Fein-এর প্রেসিডেন্ট এবং অন্যান্য পদাধিকারীদের সঙ্গে কথাবার্তায় তিনি ভারতের এবং আয়ারল্যান্ডের জাতীয় পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। সেই সংগঠনের কাজকর্ম তাঁর অসাধারণ বলে মনে হয়েছে, যদিও তার অনেক কিছু তিনি পুরোপুরি সমর্থন করতে পারেন না।

---

১. ৪ ফেব্রুয়ারি বার্লিনের ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনে প্রদত্ত ভাষণের কয়েকটি অংশ।

২. এস. সি. বোস আয়ারল্যান্ড ত্যাগ করেন (এস. সি. বোস সম্পর্কিত খবর) ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬।

যাই হোক, এ বিষয়ে তাঁরা একমত, যে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্তি লাভের তাদের যে সংগ্রাম, ভারত ও আয়ারল্যান্ডের মধ্যে যোগাযোগের ফলে সে-ব্যাপারে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্রবের কারণে Fianna Fail Party-র মুখপত্র Irish Press-এর ডিরেকটরেরা তাঁকে তাঁদের কার্যালয়ে আমন্ত্রণ করেছিলেন। জেনারেল ম্যানেজার এবং সম্পাদক তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। সেই প্রধান জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের প্রকাশ যাঁদের দায়িত্ব, তাঁদের সাংগঠনিক ক্ষমতা দেখে তিনি চমৎকৃত হন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় স্বাভাবিকভাবেই তিনি Irish Press-এর বৈদেশিক নীতির প্রশ্ন তোলেন। আইরিশ সাংবাদিকদের কাছে তিনি ভারতীয় মালিকানার জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির প্রধান অসুবিধাগুলি ব্যাখ্যা করেন। এবং প্রেস-সংক্রান্ত যে-সব আইনে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিশেষভাবে খর্ব হচ্ছে, তার কথাও বলেন।

প্রথাগত ভারতীয় সৌজন্যের নিদর্শন স্বরূপ তিনি কর্ক-এ যাওয়ার আগে মেলবোর্ন হোটেলে একটি সম্বর্ধনার আয়োজন করেছিলেন।

একটি ভাষণে তিনি বলেন, ভারতবাসীরা আয়ারল্যান্ড সম্পর্কে বহুকাল ধরে আগ্রহ বোধ করছে, এবং তার কারণ অনেক। শুধু যে রাজনৈতিক দিক থেকেই আয়ারল্যান্ড সম্পর্কে ভারতের আগ্রহ, তা নয়। আয়ারল্যান্ডে তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী মানুষের মধ্যে ভারত সম্পর্কে আগ্রহ দেখতে পেয়েছেন। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন মাদাম গন ম্যাকব্রাইড, মিসেস উডস্, ড. হ্যানিনজেন। নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনেরও অনেকে ছিলেন, কারণ ইউনিভার্সিটিস রিপাবলিকান-এর মি. টি ও'ক্যারল এবং আইরিশ প্রেস-এর সম্পাদিকা মিস মেরি কমফারফোর্ড-এর সঙ্গে আমাদের গল্পগুজব করবার সুযোগ হয়েছিল।

বুধবার রাত্রে তাঁর ডাবলিন ত্যাগের সময়ে ভারতের স্বাধীনতার আইরিশ ও ভারতীয় বন্ধুদের এক বৃহৎ সম্মেলন তাঁকে ব্যাগট স্টেশন থেকে কর্ক-এর উদ্দেশ্যে রওনা করে দেন। পরের দিন তিনি আমেরিকার জাহাজ প্রেসিডেন্ট হার্ডিং-এ প্যারিস রওনা হন। ডাবলিন ছেড়ে যাওয়ার আগে তিনি শেষ বারের মতো Executive Council-এর Vice-President Mr. Sean T. O'Kelly-র সঙ্গে কথা বলেন। তাঁরা ভারত ও আইরিশ ফ্রি স্টেট-এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিনিময়ের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। আমি শুনেছি Mr. O'Kelly তাঁকে কথা দিয়েছেন, বিষয়টি তিনি মনে রাখবেন।

সেই ভারতীয় নেতার সঙ্গে, তাঁর রওনা হওয়ার আগে কয়েক মিনিট কথা-বার্তা বলবার সুযোগ আমিও গ্রহণ করেছিলাম। 'বাঙালি নেতা' না বলে 'ভারতীয় নেতা' আমি সঙ্গত কারণেই বলছি, কারণ, একজন আইরিশ বন্ধুর কাছে আমি তাঁর কথা বলবার সময়ে যখন 'সুপরিচিত বাঙালি নেতা' বলেছিলাম, তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। আমি বুঝতে পারিনি, না-জেনে আমি তাঁর প্রতি অবিচার করেছিলাম। তিনি বললেন, 'আমাকে বাঙালি নেতা কেন বললেন? আমি প্রাদেশিক নই।' আমি তাঁর যুক্তি অবশ্যই স্বীকার করি। গত কয়েক বছর তাঁর বক্তৃতা ও লেখাগুলি আমি পড়বার সুযোগ পেয়েছি, এবং এ-কথা আমি নির্ভয়ে বলতে পারি যে সব সময়েই আমার মনে হয়েছে, তিনি সর্বপ্রথমে ভারতীয়, সব শেষে বাঙালি।

আমি যখন তাঁকে জানালাম শহরে গুজব সাদা পোশাকের কিছু লোক তাঁর ওপরে নজর রাখছে, চূড়ান্ত অগ্রাহ্যের ভাবে তিনি সেটা উড়িয়ে দিলেন। তাঁর মতে, সে গুজবের কোনও ভিত্তি নেই, যদিও তাঁর আইরিশ বন্ধুর ধারণা অন্য রকম ছিল। এ কথা আমাকে জোর দিয়ে বলতে হবে, এমন কয়েকজন আইরিশ যদিও আছেন যাঁরা ব্রিটিশ সরকারের টাকা খেয়ে থাকেন, তার মানে এই নয় যে একজন গড়পরতা আয়ারল্যান্ডবাসী তাঁর দেশের প্রতি, কিংবা

ব্রিটেনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে তা বলতে যা বোঝায়, সে ব্যাপারে, বিশ্বাসঘাতক। তিন বছর আগেকার একটা ঘটনা আমার মনে পড়ছে। ডাবলিনে আগত একজন ভারতীয়কে একজন আইরিশম্যান অনুসরণ করছিলেন। তিনি তাঁর পিছন-পিছন লন্ডনে গিয়ে হাজির হন এবং স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে তাঁর গতিবিধির কথা জানান। পরদিন সকালে সেই ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের একজন লোক সেই ভদ্রলোকের বাসস্থানে উপস্থিত হন, উদ্দেশ্য তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা। আমি যেটা শুনে আমোদ পেলাম, সেটা হচ্ছে, সেই দুই ভদ্রলোক তাঁর বাসস্থানে বৃথাই ২৪ ঘণ্টা তাঁর জন্য অপেক্ষা করার পর, সবার অলক্ষ্যে, চুপচাপ তিনি আবার লন্ডন থেকে ডাবলিন ফিরে গিয়েছিলেন।

সাংবাদিক বৈঠক[১]:
ভারতের পরিস্থিতি, ভারত এবং জার্মানি, জাতিসঙ্ঘ

ভারতে যে-সব বন্ধুরা আছেন তাঁদের সঙ্গে কথা না বলে নির্দিষ্ট কোনও উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে এই পর্যায়ে এই সামান্য কয়েকটি কথা শুধু বলতে পারি। ভারতের পরিস্থিতি এবং সে-বিষয়ে আমাদের কী কর্তব্য তা নিয়ে গত কয়েক মাস ধরে পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে আমার অনেক কথাবার্তা হয়েছে। আমার মনে হয়, ব্যক্তিগত কারণে এবং রাজনৈতিক কারণে আমার উচিত যথাসাধ্য সহযোগিতা ও সমর্থন তাঁকে দান করা। আমার মনে হচ্ছে, লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেসকে যে বড় বিপদটার সম্মুখীন হতে হবে, সেটা হচ্ছে, দ্রুত সাংবিধানিক পন্থা বর্জনের দিকে যাওয়া।

সাধারণভাবে ইউরোপের পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন, এই প্রশ্নটি সবিস্তারে আলোচনা করব, আমার মনের অবস্থা এখন তেমন নয়। শুধু একটি বিষয়ের কথা আমি বলব। গত কয়েক সপ্তাহ, জার্মানির ফুয়েরার ভারতীয়দের সম্পর্কে যেসব অপমানজনক উক্তি করেছেন, তাতে আমার মন অতিশয় ক্ষুব্ধ। নাৎসি জার্মানির প্রধান নেতৃবৃন্দের ভারতকে অপমান করা, এই প্রথম নয়। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, জার্মানি এখন ভারতকে অপমান করে ব্রিটেনের নেকনজরে পড়তে চাইছে। জার্মানরা যদি ব্রিটিশদের পদলেহন করতে চায়, তাতে আমার কোনও আপত্তি থাকতে পারে না, কিন্তু যদি তারা ভেবে থাকে এই ১৯৩৬ সালে ভারতকে অপমান করলে আমরা তা চুপচাপ হজম করে যাব, তা হলে মস্ত ভুল করছে। এ বিষয়ে ভারতের জনমত যে ইতিমধ্যেই জাগ্রত হয়েছে, তার লক্ষণ দেখে আমি খুশি হয়েছি এবং আমার আশা আমরা দেখিয়ে দেব ভারতকে অপমান করে কেউ পার পেয়ে যাবে না।

জাতিসঙ্ঘ

জাতিসঙ্ঘের প্রসঙ্গে মি. বোস বলেন, জাতিসঙ্ঘ ভারতের বিষয়ে কিছু আগ্রহ দেখানোতে, এবং জনৈক মি. পেল্ট, যিনি ডিরেকটর অব ইনফরমেশন সেকশন, তাঁকে ভারত পরিদর্শন করে রিপোর্ট দিতে পাঠানোয় খুশি হয়েছেন।

---

১ ১৯৩৬-এর মার্চে জেনেভায় সুভাষচন্দ্র বোস এই বিবৃতি দিয়েছিলেন।

'আমার কাছে খবর আছে যে উক্ত ভদ্রলোক ভারতের প্রতি নিরতিশয় সহানুভূতিহীন। এই ভদ্রলোকই প্রথম আমাকে কোনও তথ্য জানাতে অস্বীকার করেন এবং একমাত্র আমি যখন সরাসরি জাতিসঙ্ঘের সেক্রেটারি জেনালেরকে চিঠি লিখলাম তখনই তিনি বাধ্য হয়ে অধিকতর সন্তোষজনক উত্তর দিলেন। বর্তমানে ভারত জাতিসঙ্ঘকে প্রায় ২,০০,০০০ টাকা চাঁদা দেয়, তবু আন্তর্জাতিক শ্রম দপ্তরে মাত্র চারজন সাধারণ ভারতীয় আধিকারিক এবং সঙ্ঘের মহাকরণে একজন ভারতীয় করণিক নিযুক্ত আছেন। জাতিসঙ্ঘের উচ্চতর মহলে যদিও সাধারণভাবে ভারতের প্রতি বিরূপ মনোভাব বিদ্যমান, মি. পেল্ট-এর মতো বিভাগীয় প্রধানরা যদি আরেকটু কম ভারত-বিরোধী হতেন, ভারত হয়তো আরেকটু ভাল ব্যবহার পেত। যদি দেখা যায় মি. পেল্ট ভারতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন, আমি যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হব, কিন্তু এই মুহূর্তে আমার কাছে খবর, তিনি নিঃসন্দেহে ভারত-বিরোধী।'

১৪ ফেব্রুয়ারির 'টাইমস অব ইন্ডিয়া'-তে দেখছি সেই কাগজের এক প্রতিনিধিকে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, যে তাঁর ভারতে আগমনের একটি উদ্দেশ্য ভারতীয় জননেতা ও রাজনৈতিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যোগাযোগ করা। শুনে মনে হয়, তাতে কোনও আপত্তির কারণ নেই, কিন্তু আপনাদের সংবাদদাতার লোভ হল একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে। জাতিসঙ্ঘের ডিরেকটর অব ইনফরমেশন সেকশন কি কখনও জেনেভাতে যে-সব নেতৃস্থানীয় ভারতীয়েরা গিয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে দেখা করবার কষ্ট স্বীকার করেছেন? ভারতীয় পরিস্থিতি কি তিনি কখনও ভাল করে বুঝবার চেষ্টা করেছেন? তিনি কি আমাদের বলবেন, ভারতে কী ধরনের মানুষের সঙ্গে তিনি দেখা করতে চান?

ভারতীয় পরিস্থিতি ও বিশ্ব জনমত[১]

বক্তৃতায় তিনি (বোস) বলেন, সভায় তাঁকে ভারতের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলে তিনি অতিশয় কৃতজ্ঞ, কারণ বহির্জগৎকে ভারতের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করা নিরতিশয় প্রয়োজন। তিনি বলেন, 'আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিতের পর বাহ্যত আন্দোলনটি "থেমে গেছে", যার ফলে বিদেশে এই রকম একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছে, যে ভারতে এখন পূর্ণ শান্তি বিরাজ করছে। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, যদিও আইন-অমান্য আন্দোলন যে স্থগিত রাখা হয়েছে, সে কথা ঠিক। তার অর্থ এই নয় যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ঘুমিয়ে পড়েছে। তার অর্থ শুধু এই, যে কংগ্রেসের কাজের একটি মাত্র অংশ স্থগিত করা হয়েছে।

কংগ্রেস এখনও তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, শিক্ষায়, সমাজসেবায়, আগেকার চেয়ে বেশি উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে। অন্য সব সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগঠনও রয়েছে কংগ্রেস ছাড়া, যারা কাজ করে চলেছে কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে। অতএব এ ধারণা আপনাদের মন থেকে দূর করে দিন যে, ভারতে এখন সব কিছু ঠাণ্ডা। তা কখনই হতে পারে না, যতদিন না আমরা জাতীয় স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছচ্ছি।

---

১. ১৭ মার্চ ১৯৩৬, প্যারিসে প্রদত্ত ভাষণ

'নতুন সংবিধান ভারতকে দারুণভাবে হতাশ করেছে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও অন্যান্য সংগঠন নতুন সংবিধানের নিন্দা করেছে, অসন্তোষজনক বলে এবং তার ফলে ভারতের পরিস্থিতির আরও অবনতি হবে বলে। এর ফলে পরিস্থিতির মধ্যে নতুন-নতুন অশুভ উপাদান প্রবেশ করেছে, যে কারণে এমন কী, যারা সাধারণত ব্রিটিশ সরকার সম্পর্কে অনুকূল মনোভাব পোষণ করে, সেই Liberal Federation এবং অনুরূপ কোনও-কোনও সংগঠনও কঠোরতম ভাষায় এই সংবিধানটিকে ধিক্কার জানিয়েছে। তার অর্থ ভারতে এমন কোনও দল নেই বললেই চলে যারা সংবিধানটির নিন্দা করেনি। বস্তুতঃ ভারতে আমাদের এখন অবস্থা যুদ্ধের পরে যেমন ছিল ঠিক তেমনই, যখন মহাত্মা গান্ধী তাঁর আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন।

আজ এই যে আমি আপনাদের সামনে কিছু বলবার সুযোগ পেলাম, এতে আমি খুশি হয়েছি, তার কারণ ভারতের এই ধারণা ক্রমশ প্রবল হচ্ছে, যে সেখানকার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাম্রাজ্যবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা উচিত। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা এই সংযোগ স্থাপন আরও সহজ করেছে, এবং আমাদের উচিত তার সুযোগ নেওয়া। এই জাতীয় যোগাযোগ যাতে বজায় থাকে তার জন্যে ব্যবস্থাদি আমরা এখনও স্থাপন করতে পারিনি, কিন্তু এ কথা সাধারণভাবে ভারতবাসীরা উপলব্ধি করছেন, যে সাম্রাজ্যবাদ এবং ফ্যাসিবাদের মতো বস্তু সমগ্র মানবজাতির পক্ষেই বিপদস্বরূপ। তাই আমাদের বিশ্বাস, ভারতের প্রশ্নটা যদি বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা যায়, সারা পৃথিবীতে আমরা সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করব। আমরা সহানুভূতি পাচ্ছি, চাইছি বলে নয়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে। ভারতের অবস্থা যদি আমরা বিশ্ববাসীকে জানাই, তাতে বিশ্বের উপকার হবে।

ভারতের আন্দোলনকে দু'-ভাগে ভাগ করা যায়, (১) জাতীয় মুক্তি সংক্রান্ত; এই আকাঙ্ক্ষাটি সারা বিশ্বের স্বাধীনতা-প্রেমীরা উপলব্ধি করতে পারবেন; (২) সামাজিক ন্যায়ের ভিত্তিতে এক নতুন সমাজব্যবস্থা সৃষ্টির প্রচেষ্টা।

নতুন সমাজ ব্যবস্থা কেমন হবে, কল্পনা করা কঠিন। আমরা জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যারা সংগ্রাম করছি, তারা একটি ছোট জমিদার গোষ্ঠীর হাতে আমাদের দেশকে তুলে দিতে চাই না। শ্বেত-আমলাতন্ত্রের বদলে বাদামী-আমলাতন্ত্র আমরা চাই না। আমরা এক নতুন সমাজ ব্যবস্থার পত্তন করতে চাই যাতে মানুষ হবে স্বাধীন, উচ্চ-নীচ বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র ভেদ যাতে অবলুপ্ত হবে।

সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে ভারতকে মুক্ত করা যদি কঠিন হয়, দেশে নতুন সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন করাও কম কঠিন নয়। সমাজতন্ত্রর অর্থ এক-এক দেশ এক-এক রকমভাবে বুঝেছে। আমরা এমন এক নতুন সমাজ চাই যাতে মনুষ্যকৃত ভেদাভেদের চিহ্ন মাত্র থাকবে না। মানবজাতির সামনে ভারতের কথাটা যদি ঠিকমতো তুলে ধরতে পারি, নিঃসন্দেহে আমরা প্রচুর সহানুভূতি পাব।

সমগ্র বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে যাঁরা বিশেষভাবে আগ্রহী—তাঁদের কাছে ভারত বিশেষ আগ্রহের বিষয়। ভারতে আমাদের ধারণা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পত্তনে আমাদের অবদানই প্রধান। ভারত না থাকলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মূল্য কী থাকত? সেই জন্যই আমরা ভাবতে আরম্ভ করেছি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার জন্য অংশত আমরা দায়ী। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, সারা বিশ্বে ভারত সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য করেছে। যে ভূমিকা আমাদের পালন করতে বলা হচ্ছে, সেটা গুরুত্বপূর্ণ এবং দুরূহ। ভারতের স্বার্থের সঙ্গে সারা বিশ্বের স্বার্থ জড়িত।

ভারত সম্পর্কিত প্রশ্নের আরেকটি দিক আছে, এশিয়াতে জাপানি সাম্রাজ্যবাদের দ্রুত প্রসার অনেকের বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। কী উপায়ে এশিয়ায় জাপানি সাম্রাজ্যবাদের অগ্রগতি রোধ করা যায় তা নিয়ে আমাদের চিন্তা করা উচিত। কাল যদি চিন ঐক্যবদ্ধ ও

শক্তিশালী হয়ে ওঠে, কাল যদি ভারত স্বাধীন হয়, আমি নিশ্চিত এশিয়াতে শক্তির ভারসাম্যের ওপর তার প্রভাব পড়বে, জাপানি সাম্রাজ্যবাদের প্রসার তাতে বাধা পাবে। সেই কারণে আমাদের কর্তব্য এশিয়ায়, চিনে, ভারতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন আমাদের সমর্থন করা উচিত। জাপানকে বাধা দিলে সমগ্র বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

ভারতে আমাদের বিভিন্ন আন্দোলন সম্পর্কে কয়েকটি কথা। বিদেশে অনেকের ধারণা, গান্ধীর প্রভাবের অবসান হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতি যদি আমাকে নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করতে হয়, আমাকে বলতে হবে, গান্ধী তাঁর প্রভাব হারাননি।

জাতীয়তাবাদী দলের মধ্যে তাঁর বণকৌশলের বিরূপ সমালোচনা হয়েছে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তাঁর জনপ্রিয়তায় ভাঁটা পড়েছে। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা তাঁর খ্যাতি বৃদ্ধি করেছে। গান্ধীর বিভিন্ন রাজনৈতিক ভুল সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী দলের মধ্যে যে সমালোচনা হয়েছে আমি তার উল্লেখ করেছি। এই ধারণা ক্রমে বৃদ্ধি পাবে যে সামাজিক প্রশ্নে জাতীয়তাবাদী দলের কী মনোভাব, তাদের সে-কথা পরিষ্কার করে বলা উচিত, আমাদের আন্দোলনের লক্ষ্য শুধু জাতীয় স্বাধীনতাই নয়, সামাজিক মুক্তিও। এই ধারণা এখন প্রবলতর হয়েছে যে আমাদের দেশ জমিদার এবং রায়ত ও মূলধনের মালিক শ্রমিক সংক্রান্ত প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। এমন লোকের সংখ্যাও বাড়ছে যাঁরা মনে করেন, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উচিত স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা, তারা জনসাধারণের পক্ষে। এই সমালোচনার ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, জাতীয়তাবাদী দলের মধ্যে লোকে সামাজিক প্রশ্ন নিয়ে বেশি করে ভাবতে আরম্ভ করেছে। আমরা সমাজতন্ত্রের দিকে যাচ্ছি। জাতীয়তাবাদী দলের মধ্যে দুটি ভাগ আছে। একটি গোষ্ঠী যদি ওই সব সামাজিক দাবির প্রতি প্রতিকূল মনোভাব প্রদর্শন করে, বিভেদ সৃষ্টি হবে।

তিনি আশ্য ব্যক্ত করেন, গান্ধী সামাজিক পুনর্গঠনের স্বপক্ষেই থাকবেন। ভারত যদি নিজের পন্থায় নিজের জাতীয় ও সামাজিক মুক্তি আনতে পারে, বহির্জগতের পক্ষেও তার মূল্য কম হবে না। তিনি বলেন, ইচ্ছা করেই তিনি ভারতীয় প্রশ্নের খুঁটি-নাটির মধ্যে প্রবেশে বিরত থেকেছেন, এবং চেষ্টা করেছেন বিশ্বের পটভূমিকায় প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির একটা মোটামুটি রূপরেখা প্রদান করতে।

আয়ারল্যান্ডের অভিজ্ঞতা*

আমি President De Valera-র কাছে কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমাকে আইরিশ ফ্রি স্টেট-এ যাওয়ার এবং আমার দীর্ঘ দিনের লালিত আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবার অনুমতি দিয়েছেন। আমি আরও কৃতজ্ঞ ডাবলিনে আমি যে সাদর ও আন্তরিক অভ্যর্থনা পেয়েছি তার জন্য। পরলোকগত মি. ভি. জে. প্যাটেল-এর ইচ্ছা ও আদেশ ছিল যে আমি যেন দেশে ফিরবার আগে ডাবলিন যাই এবং যে Indian Irish league স্থাপনে তিনি সহায়তা করেছিলেন, তার কাজ-কর্ম আবার শুরু করার চেষ্টা করি। আমি আশা করি আমার আয়ারল্যান্ড যাওয়াতে সে-রকম কিছু কাজ হয়েছে।

---

* সোমবার, ৩০ মার্চ ১৯৩৬-এ লুসান-এ এস. সি. বোসের প্রদত্ত আয়ারল্যান্ড সম্পর্কে অভিজ্ঞতার বিবরণ

যখন আমি আয়ারল্যান্ড ছিলাম, চেষ্টা করেছিলাম যতগুলি দল এবং যতজন ব্যক্তির সঙ্গে পারি দেখা করতে। উদ্দেশ্য ছিল সে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের একটি সঠিক চিত্র পাওয়া। আমার বিশ্বাস আমি অনেক কিছু শিখেছি, যা ভারতে আমাদের কাজে লাগবে।

পার্লামেন্টে (Dial) President De Valera-র সংখ্যাগরিষ্ঠ দল Fianna Fail। শ্রমিক দলের মি. নর্টনও তাঁদের সমর্থন করে। বিরোধী পক্ষ মি. কসগ্রেভ-এর Fine Geel দল। মি. কসগ্রেভ-এর দলে অনেক ভাল-ভাল বক্তা আছেন, ভাল তার্কিক আছেন, কিন্তু সব মিলিয়ে দেশের মানুষ Fianna Fail-কেই সমর্থন করে, কারণ মনে করা হয় মি. কসগ্রেভ-এর দল ব্রিটিশপন্থী এবং ইউনিয়নিস্ট-বা (যাঁরা ব্রিটেনের সঙ্গে একীকরণ চান) তাঁরা প্রায় সবাই সেই দলকেই সমর্থন করেন। মি. কসগ্রেভ-এর দলের শক্তি কমে গেছে জেনারেল O' Duffy-র দলত্যাগের ফলে। তিনি হলেন Blue Shirt-দের সংগঠক এবং ফ্যাসিস্টদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে National Corporate Party স্থাপন করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই তাতে দেশে Fianna Fail-এর শক্তি বেড়েছে।

বর্তমান আইরিশ রাজনীতির একমাত্র দুর্ভাগ্যজনক দিক হল Fianna Fail এবং Republican-দের মধ্যে বিভেদ। Republican-দের অভিযোগ President De Valera তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের দিকে যাচ্ছেন না, এবং তাঁর গভর্নমেন্ট রিপাবলিকানদের নামে মামলা করছে, যাঁদের মধ্যে ২৫ জনের জেল হয়েছে। সরকার মনে করে রিপাবলিকানরা অতিশয় অধৈর্য, এবং কৌশলে কার্যোদ্ধার করতে জানেন না এবং এই বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত নয়, যে দেশে একটি ব্রিটিশপন্থী দল আছে, এবং আয়ারল্যান্ড যে দু'ভাগে বিভক্ত সেটা একটা বাস্তব সত্য। এই কারণে এখনই প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা দুরূহ এমন কী হয়তো অসম্ভব। Fianna Fail দলের সদস্যেরা বলেন প্রজাতন্ত্রের কথা। কিন্তু প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা প্রকৃতই করতে গেলে সেটা কয়েকটি বস্তুর ওপরে কিংবা শর্ত পুরণের ওপরে নির্ভর করে। মোটের ওপর, এমন একটি রিপাবলিকান দল যদি থাকে যেটা সরকারি দলের ওপর নির্ভরশীল নয়, তবে তা হবে আমার মতে একটা আশীর্বাদ স্বরূপ। তা হলে একটা গ্যারান্টি থাকবে যে Fianna Fail তার সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য ভুলে যাবে না, কেননা তা হলে লোকে তাদের সমর্থন প্রত্যহার করে নেবে। আমি শুধু চাই Fianna Fail এবং প্রজাতান্ত্রিক দলের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক আরেকটু ভাল হোক, যে-রকম সম্পর্ক ছিল De Valera প্রথম যখন ক্ষমতায় এসেছিলেন, ১৯৩২ সালে। কিন্তু ব্যক্তিগত কারণে এবং মতভেদের কারণে তাঁদের মধ্যে সম্পর্কের অচিরে অবনতি ঘটল।

Mr. De Valera-র সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা ছাড়াও আমি অধিকাংশ Fianna Fail মন্ত্রীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে সাক্ষাৎ করেছি। তাঁরা সকলেই নিরতিশয় সহানুভূতিশীল, সহৃদয় এবং তাঁদের সঙ্গে সহজে দেখাও করা যায়। এখনও তাঁরা 'বড় মানুষ' হয়ে ওঠেননি। যখন তাঁরা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছিলেন, তখন তাঁদের অধিকাংশই পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, এবং দেখতে পেলেই তাঁদের গুলি করা হত। এখনও তাঁরা জবরদস্ত আমলা হয়ে উঠতে পারেননি, এবং সরকারি আবহাওয়া এখনও তাঁদেরকে ঘিরে ধরেনি। ভূমিসংক্রান্ত মন্ত্রীর সঙ্গে আমি আলোচনা করেছি জমির বড়-বড় মালিকানায় কী করে তাঁরা উচ্ছেদ করেছেন তাই নিয়ে। তাঁরা বৃহৎ ভূসম্পত্তিগুলি কিনে নিয়ে সে-জমি কৃষকদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছেন। কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছে জেনে তাঁদের খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জনের চেষ্টা নিয়ে। জেনে আগ্রহ বোধ করলাম, এখন বড়-বড় জমিতে গম ও সুগার-বীট-এর চাষ হচ্ছে, এবং কৃষির উন্নতির ফলে গবাদি পশুর পালনের ওপর দেশের নির্ভরতা কমছে, এবং তার ফলে ইংলন্ডের বাজারের ওপর নির্ভরতাও কমছে। তাঁর সঙ্গে

আমি ভারতে পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণের কথাও আলোচনা করলাম। সে-দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হলে তিনি এই সমস্যাটির কীভাবে মোকাবিলা করতেন, সে-বিষয়ে তিনি মূল্যবান পরামর্শ দিলেন। শিল্পমন্ত্রীর সঙ্গে আমি সরকারের শিল্পবিষয়ক নীতি নিয়ে আলোচনা করলাম। তিনি আমাকে বুঝিয়ে বললেন, তাঁরা দেশকে শুধু কৃষিতে নয়, শিল্পেও স্বয়ম্ভর করতে চান। তার ফলে দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে, এবং ভবিষ্যতে যদি তার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক প্রতিশোধ-মূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়, সে ক্ষেত্রে দেশের আত্মরক্ষার অক্ষমতা দূর হবে। মাত্র কয়েক বছরেই নতুন-নতুন শিল্প স্থাপনে বিপুল পরিমাণ কাজ হয়েছে! তবে শিল্প পুনরুজ্জীবনে যে-কাজ সরকার করেছে এবং এখন করছে, তার প্রশংসা করেও, আমার মনে হয়েছে, শিল্প পুনরুজ্জীবনের জন্য তাঁরা আরও সবকারি শিল্পোদ্যোগে হাত দিতে পারতেন। সব মিলিয়ে আমার মনে হল, Fianna Fail যে কাজ করেছে ভারতের পক্ষেও তা মূল্যবান ও অনুধাবনযোগ্য হতে পাবে, যখন রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের সাহায্যে আমাদের জাতি-গঠনের কাজ হাতে নিতে হবে।

এত কিছু আয়ারল্যান্ডে শিখবার ছিল, এবং আমার সেখানে থাকা এতই কমদিনের ছিল, যে, আমি ভেবে অবাক হই, আমার দেশবাসী, যাঁরা বছরের পর বছর ইংলন্ডে কাটান, তাঁদের মধ্যে কত অল্প জন কষ্ট করে আয়ারল্যান্ডে যান, যে আয়ারল্যান্ড ইংলন্ডে পাশের বাড়ি বললেই হয়, সেখানকার জগৎ ইংলন্ড থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

বিস্মিত হলাম, এবং আমার ভাল লাগল, যখন দেখলাম, আয়ারল্যান্ডে রাজনৈতিক দলগুলি ভারতের প্রতি এবং ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার প্রতি একই রকম সহানুভূতিশীল, যদিও তাদের পরস্পরের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে এত মতভেদ। সেখানে থাকার সময়ে ভারতের পক্ষে প্রচারও করলাম সানন্দে। কয়েকটি সম্বর্ধনা সভায় এবং জনসভায় আমাকে ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা বলতে বলা হল। নিজেদের দেশের বাইরে যে দুটি দেশ সম্পর্কে তাদের সর্বাধিক আগ্রহ সে দুটি দেশ হল ভারত ও মিশর।

৩০ মার্চ, ১৯৩৬

স্বাধীনতা ও নতুন সংবিধান

সম্পাদকের প্রতি পত্র, ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান, ২ এপ্রিল, ১৯৩৬

মহাশয়,

কয়েকদিন আগে আমি ভিয়েনায় ব্রিটিশ কনসাল-এর কাছ থেকে একটি পত্র পাই। তাতে ছিল:

১২ মার্চ ১৯৩৬

মহাশয়,

আজ আমি বিদেশ মন্ত্রকের রাষ্ট্রসচিবের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়েছি এই মর্মে আপনাকে সতর্ক করে দিতে যে ভারত সরকার সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতি

থেকে জানতে পেরেছেন যে আপনি এই মাসে ভারতে প্রত্যাবর্তন করতে চান, এবং ভারত সরকার আপনাকে পরিষ্কার জানাতে চায় আপনি যদি সে কাজ করেন তা হলে আপনি মুক্ত থাকবার আশা করতে পারেন না।

ভবদীয়
J. W Taylor
His Majesty's Consul

আমাকে ভারতে জানুয়ারি ২, ১৯৩২ তারিখে গ্রেপ্তার করা হয়, এবং ফেব্রুয়ারি ২২ ১৯৩৩ পর্যন্ত বিনা বিচারে জেলখানায় বন্দি করে রাখা হয়। আমি বারবার বলা সত্ত্বেও আমার বিরুদ্ধে ভারত সরকারের কী অভিযোগ আমাকে কখনওই জানানো হয়নি। যখন আমি গুরুতর অসুখে পড়লাম এবং আমাকে পরীক্ষা করবার জন্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কয়েকটি মেডিক্যাল বোর্ড সুপারিশ করল, হয় আমাকে ছেড়ে দেওয়া হোক, কিংবা চিকিৎসার জন্য ইউরোপ যেতে দেওয়া হোক, ভারত সরকার আমাকে ইউরোপ যাত্রা করবার অনুমতি দিল, এবং আটক রাখবার আদেশ প্রত্যাহার করল। আমি প্রায় তিন বছর ধরেই ইউরোপে আছি। এই সময়ের মধ্যে কেবল একবার ভারতে গিয়েছিলাম তা ডিসেম্বর ১৯৩৪-এ, মৃত্যুশয্যায় আমার বাবাকে দেখবার জন্য, এবং ছ'সপ্তাহ ছিলাম। ভারতে আমার স্বল্পকাল বাসের সময়ে আমাকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছিল।

এখন আমি দেশে ফিরতে চাই, এবং এই রকম সরকারি ভীতি আমাকে প্রদর্শন করা হয়েছে। আমাকে গত বারে জেলে পাঠানোই যথেষ্ট নিন্দনীয় হয়েছিল, আইনের চোখে এবং নৈতিকতার দৃষ্টিতে। কিন্তু ভারতে ফিরে গেলে এই যে আমাকে আবার কারারুদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে, এটা আগেকার সব কিছুকে ছাড়িয়ে যাবে। আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি, ভারতে ব্রিটিশ আইনের প্রয়োগ কি এইভাবেই চলবে। নতুন সংবিধান যে বৃহত্তর স্বাধীনতা আমাদের জন্য নিয়ে আসবে, এই কি তার নমুনা?

ভবদীয়
সুভাষচন্দ্র বোস
(সভাপতি, বেঙ্গল কংগ্রেস কমিটি)

Kurhaus Hochland
Badgastein Austria
১৭ মার্চ

পঞ্জাব[১]

৬ অক্টোবর ১৯৩৬

কংগ্রেস যদি তার পতাকার তলায় দেশবাসীকে একত্র করতে না পারে, মুসলিম লীগের মতো সাম্প্রদায়িক সংগঠন প্রদেশে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করবে। পাঁচ বছরের মধ্যে কংগ্রেস পঞ্জাবকে বিধান সভায় কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দান করতে পারে, কিন্তু তারা কি সে-কাজ করবে?

১. ৬ অক্টোবর ১৯৩৬ পঞ্জাব ত্যাগের আগে সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতি।

মহানুভবতার অভাব

একজন পর্যবেক্ষক বন্ধু হিসাবে আমার মনে হয়, প্রদেশের সর্বোচ্চ নেতৃবৃন্দের মধ্যে মহানুভবতা ও মানসিক উদরতার অভাব আছে।

কংগ্রেসকে ঐক্যবদ্ধ করবার জন্য পঞ্জাবের দরকার একজন কিংবা একাধিক নেতা যাঁদের এমন দৃষ্টির প্রসারতা এবং হৃদয়ের উদারতা থাকবে যাতে তাঁরা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উঠে সব মানুষের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। প্রদেশের সাধারণ কর্মীরা যখন আমূল পরিবর্তন পন্থী এবং মনের দিক থেকে নির্দোষ, পঞ্জাবে কংগ্রেস অচিরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, শুধু যদি নেতারা নিজেদের কর্তব্য করতে পারেন।

কংগ্রেসের দৃষ্টিতে

ব্রিটিশ ভারতের এগারোটি প্রদেশের মধ্যে সাতটির বিধানসভায় এখন হয় কংগ্রেসের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা, কিংবা কার্যত তাই। এই সাতটি প্রদেশ হল যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি, বম্বে প্রেসিডেন্সি, এবং সীমান্ত প্রদেশ। সেই অনুযায়ী—ওই সব প্রদেশে শাসনভার কংগ্রেস হাতে নিয়েছে। আসামে সরকারের অবস্থা এমন যে বারে বারে তাদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে হচ্ছে, বারে-বারে বিধানসভায় তার পরাজয় হচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার পদত্যাগের কোনও অভিপ্রায় দেখা যাচ্ছে না। বঙ্গদেশের বিধানসভার অবস্থা 'যত গর্জায় তত বর্ষায় না।'

জনসাধারণের দৃষ্টি এখনও পর্যন্ত সেই প্রদেশগুলিতেই নিবদ্ধ যেখানে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিরঙ্কুশ। কিন্তু আমি বলি, 'সংখ্যালঘিষ্ঠ' প্রদেশগুলির দিকেই কংগ্রেসের প্রধান নেতৃবৃন্দের বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত।

এখন দেখা যাক ওই সব প্রদেশে কংগ্রেস কেন ব্যর্থ হল।

সীমান্ত প্রদেশের অবস্থাটা সহজেই বোঝা যায়, জননেতা খান আবদুল গফুর খান ও তাঁর যোগ্য ভ্রাতা ডা. খান সাহেবের নির্বাসনের পর থেকে যে সাংঘাতিক দমনপীড়ন সে প্রদেশে চলছে, তার ফলেই সেখানকার কংগ্রেস দল সাময়িকভাবে মনোবল হারিয়ে ফেলেছে, অন্যথায়, কংগ্রেস দল নিঃসন্দেহে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জিততে পারত। খান আবদুল গফুর খানের প্রত্যাবর্তনের পর, দেরিতে হলেও, পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। 'সংখ্যালঘিষ্ঠ' কংগ্রেস দল সহযোগীদের সাহায্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হয়েছে, ডা. খান সাহেব প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, অনতিবিলম্বে সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস দল নিজের জায়গা করে নিতে পারবে, কারণ সীমান্ত মুসলিমদের চেয়ে ভাল কংগ্রেসী প্রদেশে কোথাও পাওয়া যাবে না।

সিন্ধু প্রদেশেই সম্ভবত কংগ্রেসের সবচেয়ে কঠিন সমস্যার ক্ষেত্র। সেখানকার অধিবাসীর সমস্যার ক্ষেত্র। সেখানকার অধিবাসীর ৭৪ শতাংশ মুসলিম। অতএব এটা পরিষ্কার, পাশ্ববর্তী সীমান্ত প্রদেশের মতো সেখানেও মুসলিমরা যদি সাগ্রহে কংগ্রেসে যোগ না দেয়, সিন্ধু প্রদেশে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কোনও আশা নেই। কিন্তু তা কি সম্ভব হবে? কেন নয়? সিন্ধু দেশের বিধানসভায় মুসলিম দলের বর্তমান নেতারা ভূম্যধিকারী অভিজাতদের প্রতিনিধি। তাঁরা কখনও জনসাধারণের নেতা হতে পারেন না। সিন্ধু দেশে কংগ্রেস যদি তার

বুর্জোয়া চরিত্র ঝেড়ে ফেলে দিয়ে কৃষকদের পার্টি হয়ে উঠতে পারে, যে-প্রদেশের নির্বাচনে কংগ্রেস বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে। তা যদি কংগ্রেস না করে, একটি অকংগ্রেসি কৃষক পার্টির অভ্যুদয় হবে, যেমন বঙ্গদেশে হয়েছে, এবং তার ফলে কংগ্রেস আন্দোলন রীতিমতো পিছিয়ে যাবে।

পঞ্জাবে মুসলিমরা জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ, কিন্তু বিধানসভার ১৭৫ জন সদস্যের মধ্যে তাদের আসন ৮৬টি এবং হিন্দু ও শিখদের মিলিত আসনের সংখ্যা ৭৫। কংগ্রেস দল যদি শক্তিশালী হত, তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হতেন, যদি মুসলিমদের একটা অংশ তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতেন। কিন্তু অসুবিধাটা দ্বিবিধ, মুসলিম সদস্যদের মধ্যে মন্ত্রীসভার দল (The Unionists)-এর সমর্থন বিপুল। তা ছাড়া কংগ্রেস দল অভ্যন্তরীণ কোন্দলে দুর্বল, এবং শিখেরা অন্য পথে চলতে চাইছে। কংগ্রেস যদি তাঁর তুচ্ছ ঝগড়া বিবাদ ভুলে একটা মৌলিক পরিবর্তনের অর্থনৈতিক পন্থা গ্রহণ করতে পারে, জনসাধারণের কাছে যার আবেদন থাকবে, তাদের ধর্মীয় পরিচয় যাই হোক না কেন, প্রদেশে কংগ্রেস দল প্রধান হয়ে উঠতে পারবে। তা কি সম্ভব হবে? বলা কঠিন। কাজটা দুরূহ, এবং অনেক কিছু নির্ভর করবে প্রদেশের মধ্যে থেকে কীরকম নেতৃত্ব বেরিয়ে আসে তার ওপরে।

বেচারি আসামের দুর্গতির কারণ বঙ্গদেশের নৈকট্য। সাধারণ আসন (হিন্দু)-র সংখ্যা কমিয়ে ১০৮ জনের মধ্যে করা হয়েছে ৫৫ জন, এবং তথাকথিত পশ্চাদপদ অঞ্চল সমূহ এবং উপজাতিদের দেওয়া হয়ছে ৯টি আসন ও যাদের কায়েমিস্বার্থ তাদের জন্য, (অর্থাৎ প্রধানত ইউরোপীয় চা-বাগানের মালিকদের স্বার্থে) ১১টি আসন।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সংক্রান্ত যে সুপারিশ (সিদ্ধান্ত বলাই ভাল), তার পিছনে উদ্দেশ্য একটি ছিল, আসাম ও বঙ্গদেশে কংগ্রেস যেন সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায় (দ্রষ্টব্য: হাউজ অব কমনস-এ ২৭ মার্চ ১৯৩৩ তারিখ স্যার স্যামুয়েল হোরে-এর বক্তৃতা) তা সত্ত্বেও, অন্তত আসামে কংগ্রেস দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারত, যদি কয়েকটি ঘটনার আকস্মিক যোগাযোগ না ঘটত। আসাম কংগ্রেসের এতাবৎকালের নেতা শ্রীযুক্ত টি. আর. ফুকনের পদত্যাগ দলকে ক্ষতিগ্রস্ত করল, এবং অবস্থা আরও খারাপ হল, যিনি নেতৃপদে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন, সেই শ্রীযুত এন সি বরদলৈ-এর অকালমৃত্যুতে। নিবার্চনের সময়ে কংগ্রেসের প্রধান নেতৃবর্গ আসামকে সম্পূর্ণ অবহেলা করেছিলেন। যখন যুক্ত প্রদেশের মতো অন্যান্য প্রদেশের দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল। আসামের ভবিষ্যৎ আদৌ অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়, যদি সেই প্রদেশের দিকে কংগ্রেসের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কিছু মনোযোগ দেন। এখনও বর্তমান মন্ত্রীসভার অবস্থা টলমলে, যে কোনও দিন বরখাস্ত হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ক্ষমতায় আসতে পারে এক জোট সরকার, যার মধ্যে প্রাধান্য থাকবে কংগ্রেসের। কিন্তু, পরিতাপের বিষয়, বর্তমান বিধানসভার আয়ুষ্কালে কংগ্রেসকে সংখ্যালঘু হয়ে থাকতে হবে।

আর বঙ্গদেশ? সেখানে কোনও আশা নেই। সেখানকার অধিবাসীর ৪৪ শতাংশের বেশি যখন হিন্দু, ২৫০ জনের বিধানসভায় (যার মধ্যে ৩০টি আসন তপশিলী জাতিগুলির জন্যে সংরক্ষিত) হিন্দুর সংখ্যা ৮০ এবং মুসলিমদের আসন সংখ্যা ১১৯। কায়েমি স্বার্থসমূহ, ইউরোপীয় ও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা, কব্জা করে নিয়েছে, কম নয়, ৩৯টি আসন। বর্তমান সংবিধানে, কিংবা বলা ভাল বর্তমান সাম্প্রদায়িক বন্দোবস্তে বঙ্গীয় বিধানসভায় কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ অতিশয় অন্ধকারাচ্ছন্ন।

কিন্তু আমরা কি হাল ছেড়ে দেব? তাতে রাষ্ট্রনীতিজ্ঞানের কিংবা দেশপ্রেমের পরিচয় দেওয়া হবে না। কংগ্রেসকে আমাদের আমূল-পরিবর্তন পন্থী করতে হবে এবং

জনসাধারণের স্বার্থের সঙ্গে নিজেদেরকে এমনভাবে একাত্ম করতে হবে যাতে সে প্রকৃত গণসংগঠন হয়ে ওঠে। কেবল মাত্র সেই উপায়েই আমরা সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ অতিক্রম করতে পারব, সিমলার এবং হোয়াইটহলের সংবিধানবাজদের চক্রান্ত বানচাল করতে পারব। কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ নিহিত আছে বঙ্গীয় কৃষকদের একটি সংগঠনে তাকে রূপান্তরিত করাতে। তা যদি হয়, আবার কংগ্রেস প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে।

এ কাজ পাঁচ বছর আগে করা উচিত ছিল, কিন্তু আদৌ না করার চেয়ে দেরিতে করা ভাল।

বিদেশে ভারত

বিদেশে ভারতকে পরিচিত করার প্রয়োজনের বিষয়ে বোধহয় দেশবন্ধু সি আর দাশ-ই প্রথম আমার চোখ খুলে দেন। তাঁর উপলক্ষ্যটা ছিল, যখন প্রয়াত দেশবন্ধু ও প্রয়াত পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ১৯২৩-এর ফেব্রুয়ারিতে যে স্বরাজপার্টির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার নতুন কর্ম-পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করা। এই নতুন কর্ম-পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা আরম্ভ হয়েছিল অনেক দিন আগে ১৯২২-এর এপ্রিল মাসে, যখন আমরা সবাই জেলে ছিলাম। দেশবন্ধুর পরিকল্পনার মধ্যে দুটি বিষয় ছিল, যাতে তাঁর নিজের বিশেষ আগ্রহ ছিল, কিন্তু সে সময়ে তা নিয়ে আর বিশেষ কেউ আগ্রহ দেখাননি। কেননা তখন লোকের দৃষ্টি ছিল বিধান সভায় এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে ক্ষমতা দখল করার দিকে। সেই দুটি বিষয় ছিল, বিদেশে ভারতের প্রচার এবং প্যান-এশিয়াটিক লিগ সংগঠন।

আবার যখন বিদেশে ভারতের প্রচারের কথা নিয়ে আন্দোলন আরম্ভ হল, তার মধ্যে কয়েক বছর কেটে গেছে। ১৯২৮-এর প্রথম দিকে আমি যখন কলকাতায় ছিলাম একজন মার্কিন সাংবাদিক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। (এই মুহূর্তে তাঁর নামটা আমার মনে পড়ছে না)। আমাদের কথাবার্তার মধ্যে তিনি উজ্জ্বল বর্ণনায় আমার চোখের সামনে তুলে ধরলেন, চিন কীভাবে সমগ্র সভ্য জগতের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। তাঁর মতে ভারতের উচিত কোনওভাবে বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে নিজেকে তুলে ধরা। সে-কাজ কীভাবে করা যেতে পারে, সেই পদ্ধতিটা ভারতবাসীদেরকেই ঠিক করতে হবে, কিন্তু ভারতের স্বার্থে সে কাজ অবশ্যকরণীয়। আরও দুটি কারণে আমার এ বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে, যে বিদেশে ভারতের প্রচার ভারতের অগ্রগতির জন্য একান্ত প্রয়োজন, (১) গত দু'বছরে ইউরোপে আমার অভিজ্ঞতা, (২) আমার ইতিহাস অধ্যয়ন। বিগত দু'বছর আমি ইউরোপের অনেক দেশে ভ্রমণ করেছি। সর্বত্র দেখেছি ভারতের বিষয়ে বিপুল অজ্ঞতা, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই আবার সাধারণভাবে ভারত সম্পর্কে সহানুভূতি ও আগ্রহ। এই সহানুভূতিকে সহজেই প্রসারিত করা যায়, বিকশিত করে তোলা যায়, যদি আমাদের দিক থেকে আমরা যা প্রয়োজন তা করতে পারি। কিন্তু আমরা এ বিষয়ে উদাসীন থাকলে কী হবে, মিশনারিরা এবং অন্যান্য যাঁরা অসভ্য মানুষকে সভ্যতা শেখানোর ব্রত গ্রহণ করেছেন, তাঁরা বসে নেই। কয়েক দশক ধরে তাঁরা ভারত বলে এমন এক দেশের ছবি আঁকছেন যেখানে বিধবাদের পোড়ানো হয়, ৫/৬ বছর বয়সের মেয়েদের বিবাহ দেওয়া হয়, এবং লোকে জামাকাপড় পরতে জানে না বললেই চলে। আমার স্পষ্ট মনে আছে ১৯২০ সালে আমি যখন

ইংল্যান্ডে ছিলাম, এক দিন আমি একটা বক্তৃতা-ভবনের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। হলের সামনে একটি সচিত্র বিজ্ঞাপন ছিল, একজন মিশনারি ভারত সম্পর্কে বক্তৃতা দেবেন। সেই বিজ্ঞাপনে অতিশয় কুৎসিত-দর্শন, ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ অর্ধনগ্ন নরনারীর ছবি ছিল। বোঝা যাচ্ছিল, বক্তা চাঁদা তুলতে চাইছিলেন, ভারতে মানুষকে সভ্য করার কাজের জন্য, এবং সেই জন্যই এই ভাবে ভারতকে চিত্রিত করেছেন, কোনও দ্বিধা সংকোচ না করে। ১৯৩৩ সালের শেষ দিকে, এক জার্মান নারী সাংবাদিক, যিনি নাকি সম্প্রতি ভারত ভ্রমণে গিয়েছিলেন, মিউনিকের একটি সংবাদপত্রে লিখেছেন যে তিনি ভারতে বিধবাকে পোড়ানো হতে দেখেছেন, এবং দেখেছেন বম্বের রাস্তায় মৃতদেহ পড়ে আছে, কেউ সে-দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। সম্প্রতি ভিয়েনাতে একটি সচিত্র পত্রিকায় (Wiener Bilder, ৩০ জুন তারিখের) কীটে আচ্ছাদিত একটি মৃতদেহের ছবি ছাপা হয়েছিল। একটি পাদটীকায় বলা হয়েছিল মৃতদেহটি এক সাধুর, এবং কয়েক দিন সেটিকে সরানো যায়নি কারণ, হিন্দুদের বিশ্বাস সাধুর মৃতদেহ সাধারণ লোক সরাতে পারে না। আমার যেটাতে অবাক লাগে সেটা হল, ইউরোপে যাঁরা প্রচারকার্যে রত তাঁরা ভারত সম্পর্কে ছবি সযত্নে নির্বাচন করেন যাতে ভারতকে যত দূর সম্ভব নিকৃষ্ট ভাবে চিত্রিত করা যায়। এ কথা সচিত্র পত্রিকাগুলি সম্পর্কে যেমন বলা যায় তেমনি ফিল্ম সম্পর্কেও বলা যায়। যে ভারত-বিরোধী প্রচার 'India Speaks' এবং 'Bengali'-র মতো ফিল্মে করা হয়, সে বিষয়ে বলি, ভারতে ব্যাপারটা খানিকটা জানাজানি হয়েছে, এবং এ নিয়ে আমার বেশি বলবার দরকার নেই। কিন্তু 'Everybody Loves Music' ফিল্মটিতে যে দুষ্কর্ম করা হয়েছে তার কথা বিশেষ কেউ জানে না। ফিল্মটিতে মহাত্মা গান্ধীকে দেখানো হয়েছে তাঁর নিজস্ব বেশে, একজন ইউরোপীয় মেয়ের সঙ্গে নাচছেন।

এই জাতীয় প্রচার যদি অন্য দেশে চলতে থাকে, তবে এতে কি অবাক হওয়ার কিছু আছে, যে ভারতীয়দের বলা হবে blackie (যা ইংলন্ডে কখনও-কখনও হয়ে থাকে), কিংবা neger (negro, জার্মানিতে মাঝে-মাঝে শোনা যায়)? এই অবস্থায় আমাদের কী করা উচিত? প্রথমেই, এবং সব চাইতে সহজে যে কাজটি আমরা করতে পারি, সেটি হল, চোখ বন্ধ করে থাকা। নয়তো সেই অপেক্ষাকৃত কঠিন কাজটি করা যায়— আমাদের নিজস্ব প্রচার। আমার মনে আছে, ১৯৩৩ সালে একজন তুর্কি কূটনৈতিকের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল, বিদেশে প্রচার নিয়ে। আমি অনুযোগ করেছিলাম, আধুনিক তুরস্ক সম্পর্কে বিদেশিদের জন্য কোনও বই নেই, যা তুর্কিদের নিজেদের লেখা। তিনি কতকটা আত্মরক্ষার ভাবেই বললেন, তুর্কিরা প্রচারে বিশ্বাস করে না (এ কথা পুরোপুরি সত্য নয়, তুর্কিরা নিজেরাই তাদের প্রচার আরম্ভ করে দিয়েছে)। আমার সন্দেহ আছে, এই প্রচারের যুগে এমন আর কোনও জাতি আছে কিনা যারা নিজেদের প্রচারের অভাবের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাবে। যাই হোক, ইউরোপের কথা বলতে গেলে, প্রচারকে আজকাল মনে করা হয় গভর্নমেন্টের স্বাভাবিক ও আইনসঙ্গত কাজ। ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে ইংল্যান্ড এবং রাশিয়া প্রচারে সিদ্ধহস্ত, তার পরেই ইতালি ও জার্মানি। এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে চিন এখন বিদেশে প্রচারে সবচাইতে সক্রিয়। পশ্চিম গোলার্ধের দেশগুলি, আমেরিকা, কানাডা, ইত্যাদি সাধারণভাবে ইউরোপে প্রচারের ব্যাপারে নিস্পৃহ, কিন্তু আমার বিশ্বাস জাতিসঙ্ঘ এখন আটলান্টিকের এপারে-ওপারে সেতুবন্ধনে সহায়তা করছে। ১৯৩৪ সালে, যখন আমি জেনেভায় ছিলাম, কয়েকজন দক্ষিণ আমেরিকানের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গিয়েছিল। তখন আমি বুঝলাম, এমনকী দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলিও ইউরোপে প্রচার চালাতে ব্যস্ত।

আমি প্রথমে বলেছি, দুটি কারণে জাতির উন্নতির জন্য বিদেশে জাতীয় প্রচার যে অবশ্য প্রয়োজনীয়, আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে: (১) ইউরোপে আমার অভিজ্ঞতা, (২) ইতিহাস অধ্যয়ন। দ্বিতীয়টি সম্পর্কে আমি বলতে পারি, সম্প্রতিকালে যে-সব দেশ স্বাধীনতা জয় করেছে

তাদের ইতিহাস পাঠ করলে এই প্রচারের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে। আশা করি আমার পাঠকেরা জানেন, ১৯২০-২১ সালে Sinn Fein দল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কী ব্যাপক প্রচার চালিয়েছিল। সেই প্রচার সংগঠন এবং পরিচালনার জন্য তাঁরা তাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটিকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং Mr. De Valera। ইউরোপেও দলটির প্রচার কেন্দ্র আছে। বিদেশে প্রচারের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্তটি কিন্তু পাওয়া গেছে চেক নেতাদের কাছ থেকে। কুড়ি বছর ধরে Dr. Masaryk, Dr. Benes এবং অন্যেরা বিভিন্ন দেশে, বিশেষত ইংল্যান্ডে, ফ্রান্সে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমানভাবে অবিরত প্রচার চালিয়ে গেছেন। দুটি দশক কেটে গেল, তারপরে সেই প্রচারের ফসল ঘরে উঠল। সবাই স্বীকার করবেন, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহানুভূতি সমর্থন ছাড়া স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে চেকোস্লোভাকিয়ার জন্ম হত না।

এমন নয় যে নিয়মিত প্রচার শুধু পরাধীন দেশগুলিই চালায়। এমনকী স্বাধীন দেশগুলোও এখন সে-পথ ধরেছে। ইউরোপে হাঙ্গেরি এবং এশিয়ায় চিনের মতো যে-সব দেশের কোনও জাতীয় অভিযোগ আছে, তারা বিদেশে প্রচারকে মূল্য দিয়ে থাকে। হাঙ্গেরির আশা তার বর্তমান সীমানার শান্তিপূর্ণ উপায়ে বদল হবে, যে-সীমানা Treaty of Trianon অনুযায়ী স্থির করা হয়েছিল, যে শান্তি-চুক্তিকে হাঙ্গেরি মনে করে অন্যায্য, তার প্রতি অবিচার। সেই জন্য সে-দেশ তার দাবির প্রতি আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করছে। চিন সম্প্রতি ইউরোপে ব্যাপক প্রচার আরম্ভ করেছে, এবং জেনেভা তার কেন্দ্র। জেনেভায় তারা একটি ভিলা নিয়েছে এবং চিনের বিষয়ে যারা কিছু জানতে চায় তাদের জন্য একটি লাইব্রেরি স্থাপন করেছে। তাদের সোসাইটি ফরাসি ও ইংরেজিতে বই প্রকাশ করে, ইউরোপে চিনা সংস্কৃতি প্রচারের জন্য। তারা জেনেভাতে আরও একটি বাড়ি নিয়েছে, যেখানে মাঝে-মাঝে তারা প্রদর্শনীর আয়োজন করে। ১৯৩৪ সালে তারা বয়স্কদের জন্য চিত্রের একটি প্রদর্শনী করেছিল, এবং সেটি অত্যন্ত সফল হয়েছিল। জেনেভায় প্রদর্শনের পর চিত্রগুলি ইউরোপের অন্যান্য রাজধানীতে পাঠানো হয়েছিল, এবং সেখানেও ওরকম প্রদর্শনী হয়েছিল। ১৯৩৫-এর এপ্রিলে আমি যখন আবার জেনেভায় যাই, তারা ছোটদের আঁকা চিত্রের একটি প্রদর্শনী করেছিল, এবং আমাকে বলা হয়েছিল সেই প্রদর্শনীটি একে-একে ইউরোপের অন্যান্য রাজধানীতেও ঘুরিয়ে আনা হবে। সে-রকম একটি প্রদর্শনী দেখার পর সবাই এই ধারণা নিয়ে আসবেন যে চিনারা এক অতিশয় প্রতিভাবান ও সংস্কৃতিবান জাতি। ১৯৩৫-এর নভেম্বরে লন্ডনের বার্লিংটন হাউসে একটি শিল্প প্রদর্শনীর জন্য এক জাহাজ চিনা শিল্পদ্রব্য লন্ডনে আনা হয়েছিল। এখানে না বলে পারছি না, নিরন্তর প্রচারের ফলে চিন সমগ্র সভ্য জগতের সহানুভূতি লাভে সমর্থ হয়েছে। সেটা বোঝা গেল মাঞ্চুকুও নিয়ে চিন-জাপান বিবাদের সময়ে যখন, জাপানের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও চিন জাতিসঙ্ঘের সমর্থন লাভ করেছিল। সেই কষ্টার্জিত সমর্থনের পূর্ণ সদ্ব্যবহার যে চিন করতে পারেনি তার জন্য দায়ি চিনের সামরিক দুর্বলতা। তা সত্ত্বেও চিনারা প্রচারের মূল্য সম্পর্কে এত দূর অবহিত হয়েছে যে তার জন্য তারা এখন একটি ব্যাপক পরিকল্পনা কার্যকর করতে আরম্ভ করেছে। যদিও নানকিং সরকার এই পরিকল্পনার পিছনে আছে, প্রয়োজনীয় অর্থের বৃহত্তর অংশ আসে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে।

এমনকী যে-সব স্বাধীন দেশের কোনও জাতীয় অভিযোগ নেই তারাও বিদেশে প্রচারে অনেক অর্থ এবং মনোযোগ দিয়ে থাকে। সাধারণত তাদের উদ্দেশ্য দ্বিবিধ, সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক। তারা এক দিকে চায় তাদের সংস্কৃতির সঙ্গে অন্য দেশের মানুষের পরিচয় হোক, এবং আরেক দিকে চায় অন্য দেশের সঙ্গে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যও বেড়ে উঠুক। আমার মতে হয়তো ব্রিটিশদের প্রচারকার্য অন্যন্য দেশের চেয়ে বেশি ফলপ্রসূ, কারণ সে প্রচার অধিকতর স্বাভাবিক ও বৈজ্ঞানিক। তাদের প্রচারের ধারাটা মোটামুটি এই রকম:

১) দৈনন্দিন খবরের হেরফের করে '...'-এর মতো সংবাদ-প্রতিষ্ঠান সূক্ষ্মভাবে ব্রিটেনের অনুকূল প্রচার চালিয়ে থাকে।

২) যে কোনও আন্তর্জাতিক সম্মেলন, যেখানেই হোক না কেন, ব্রিটিশেরা সেখানে হাজির থাকবেই।

৩) প্রত্যেক দেশে সেই দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিকশিত করে তুলবার জন্য তাদের বিশেষ সংস্থা আছে। যেমন ভিয়েনাতে একটি সংস্থা আছে, তার নাম Anglo-Austrian Friends। অনুরূপ সংগঠন আছে ইউরোপ এবং আমেরিকার প্রত্যেকটি দেশে, এবং ওই সমস্ত সংস্থারই সংশ্লিষ্ট সংগঠন আছে গ্রেট ব্রিটেনে।

৪) জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে বহু সংখ্যক ব্রিটিশ প্রতি বছর বিদেশে গিয়ে ব্রিটিশ সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তৃতা দেন। এই কাজে ব্রিটিশ শিল্পীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

৫) বিদেশিরা এবং বিদেশি ছাত্রেরা ব্রিটেনে আমন্ত্রিত হয়ে আসেন। কোনও-কোনও ক্ষেত্রে বিদেশি ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়া হয়।

৬) Quakers, All-Peoples Association প্রভৃতি অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা আছে, তাদের সদর দপ্তর লন্ডনে, এবং শাখা সারা ইউরোপে। তাদের মাধ্যমে ব্রিটেনের অনুকূল সূক্ষ্ম প্রচারকার্য চালানো হয়। এই সব সংস্থার লাইব্রেরিতে ব্রিটিশ গ্রন্থ মজুত থাকে।

৭) ইউরোপের প্রায় প্রত্যেক রাজধানীতে একটি করে English-speaking Club আছে। তার প্রত্যেকটিই ব্রিটিশ প্রচারের কেন্দ্র।

৮) গ্রেট ব্রিটেন সংক্রান্ত গ্রন্থ ইত্যাদি প্রত্যেক ভাষায় প্রকাশ করা হয়।

উপরোক্ত প্রচার কার্য পরিচালিত হয় প্রধানত বেসরকারি সংস্থাসমূহের দ্বারা। তার সঙ্গে দূতাবাসগুলির সরকারি প্রচার তো আছেই। ব্রিটিশ প্রচার প্রকট নয়, এবং যাদের দিকে তার লক্ষ তারা প্রায় বুঝতেই পারে না যে সচেতনভাবে প্রচার চালানো হচ্ছে। যখন প্রচারকার্যটি স্পষ্ট, যেমন মিস মোয়ার 'মাদার ইন্ডিয়া'তে, কিংবা ফিল্ম 'বেঙ্গলি'-তে সাধারণত সেটা কোনও তৃতীয় পক্ষের পরিচালিত, যাতে কেউ বলতে না পারে, ব্রিটিশেরা তার পিছনে আছে। সে তুলনায় জার্মান প্রচার, স্থূল, প্রকট, এবং তার ফলে তার উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যায়।

বিগত দু' বছর মাঝে-মাঝে আমি উপলব্ধি করেছি, তাদের প্রয়োজনের সঙ্গে যার সঙ্গতি নেই এমন কোনও প্রচার সম্পর্কে ব্রিটিশ জনগণ কত স্পর্শকাতর। মনে করা স্বাভাবিক ব্রিটিশদের মতো এত শক্তিশালী একটি জাতি, অন্যরা তাদের বিষয়ে কী ভাবল, কী বলল তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না, কিন্তু প্রকৃত সত্য তার বিপরীত। এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে, ১৯৩৪ সালের একটি ঘটনা। বেলগ্রেডের ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত এমন একটি কাজ করলেন যা তিনি সচরাচর করেন না, বিদেশ দপ্তরকে তিনি অনুরোধ করলেন, যুগোস্লাভিয়ার সংবাদপত্রে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রকাশ করা বন্ধ করতে। স্যার ওয়াল্টার স্মাইলস, সাংসদ সেপ্টেম্বর মাসে জেনেভাতে আমার বক্তৃতায় কতখানি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, তাও আমার মনে পড়ছে। (স্যার ওয়াল্টার স্মাইলস চেয়েছিলেন, সেই বক্তৃতার জন্য ভারতে ফিরে এলে আমাকে যেন জেলে পাঠানো হয়। আমি যখন তাঁকে বললাম, আমার বক্তৃতায় কোনও ভুল কথা থাকলে তিনি যেন তা সংশোধন করে দেন, তিনি কোনও উত্তর দিলেন না।) বিদেশিদের মতামতের বিষয়ে তাদের এই মাত্রাতিরিক্ত স্পর্শকাতরতার জন্য ব্রিটেন এখন বিদেশে তাদের প্রচার আরও জোরদার করবার ব্যবস্থা করছে। সম্প্রতি একটি সংস্থা, 'British Council of Relations with Foreign Countries' স্থাপন করা হয়েছে, H. R. H the Prince of

Wales.-এর পৃষ্ঠপোষকতায় তার উদ্দেশ্য অন্যান্য দেশে ব্রিটিশের পক্ষে প্রচার। ২ জুলাই ১৯৩৫ His Royal Highness-কে উদ্দেশ্য করে সংস্থার সভাপতি Lord Tyrell বলেন, সংস্থাটি স্থাপিত হয়েছে বিদেশ দপ্তরের প্রস্তাব অনুযায়ী, পাঁচটি সরকারি বিভাগের সক্রিয় সহযোগিতায় এবং সরকারি কোষাগার এর জন্য মঞ্জুর করেছে ৬০০০ পাউন্ড। লন্ডনের 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' এই প্রচেষ্টাকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করে ৩ জুলাই লিখেছে:

'এখন ফ্রান্স ও জার্মানি প্রত্যেকে জাতীয় প্রচার ও আত্মমর্যাদার স্বার্থে বছরে দশ লক্ষ পাউন্ড বরাদ্দ করেছে, জাপান সম্প্রতি আগামী বছরের জন্য অনুরূপ উদ্দেশ্যে বাজেট করেছে এক লক্ষ পাউন্ড এবং জার্মানি প্রচার মন্ত্রকের বিশাল অর্থভাণ্ডার আরও বর্ধিত করা হচ্ছে, বিদেশে এবং স্বদেশে। আমরা যদি আমাদের কথা জানাতে চাই ৬০০০ পাউন্ডের অনেক বেশি অর্থ প্রয়োজন হবে, যদিও তার সব টাকা সরকারের তহবিল থেকেই যে আসতে হবে এমন কোনও কথা নেই।'

এখন, ভারতের কথায় বলি, আমাদের এখন কী করা উচিত? এই প্রসঙ্গে দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে অপেক্ষাকৃত প্রবীণদের মধ্যে বিদেশে ভারতীয় প্রচার সম্পর্কে আদৌ কোনও উৎসাহ আমি দেখতে পাইনি। শ্রীভুলাভাই দেশাই ও ইন্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্মার-এর সম্পাদক এ বিষয়ে যে মত ব্যক্ত করেছেন, সাধারণভাবে সেটাই প্রবীণদের মত। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদের মত তুলনায় খানিকটা প্রগতিবাদী। এই জাতীয় প্রচার তিনি বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন, কিন্তু তিনি দুঃখিত যে সে কাজের জন্য কংগ্রেসের যথেষ্ট সঙ্গতির অভাব। কাজেই মনে হয়, প্রবীনতর প্রজন্ম মনে করেন এ কাজ একটা বিলাসিতা, অবশ্য প্রয়োজনীয় কিছু নয়। যদি তাঁরা একে অবশ্য প্রয়োজনীয় মনে করতেন, এর জন্যে অর্থের সংস্থান অবশ্যই করতেন।

ভারতীয় নেতাদের মধ্যে একমাত্র পরলোকগত শ্রীযুক্ত ভিঠলভাই প্যাটেল বিদেশে প্রচারের মূল্য সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতেন, এবং বুঝতেন কীভাবে সে-কাজ করতে হয়। এ কথা বললে অতিশয়োক্তি হয় না, যে তাঁর মূল্যবান জীবন এই প্রচারের স্বার্থেই তিনি বিসর্জন দিয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এই ধারণাটা নিয়ে তিনি ফিরে এসেছিলেন যে আমেরিকায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একজন স্থায়ী প্রতিনিধি থাকা দরকার। এই প্রস্তাব যথারীতি মহাত্মা গান্ধীকে দেওয়া হয়েছিল। পরলোকগত শ্রীযুত বিঠলভাই মনে করতেন, আমাদের প্রচার কার্যের জন্য জেনেভায় আমাদের সদর কার্যালয় এবং সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকায় তার শাখা থাকা দরকার। তাঁর জীবিতকালেই সে-রকম একটি শাখা তিনি ডাবলিনে স্থাপন করতে পেরেছিলেন, ইন্দো-আইরিশ লিগ নামে। তাঁর শোকাবহ অকাল মৃত্যুর মাসখানেক আগে যে তিনি জেনেভা গিয়েছিলেন, তা সেখানে একটি কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তুতির জন্যই। কিন্তু নিয়তি সে-কাজ তাকে সম্পূর্ণ করতে দিল না।

বিদেশে প্রচার যদি স্বাধীন দেশের, এবং যে-সব দেশ স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম করছে, তাদের জন্যে দরকার হয়, তাহলে ভারতের মতো দেশ, যারা বাহুবল এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথ পরিহার করেছে, তাদের জন্য তা অপরিহার্য। সে রকম শান্তিপূর্ণ ও সংবিধানসম্মত কাজ সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারেরও কোনও আপত্তি থাকতে পারে না। খোলাখুলি, শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিশ্বের সহানুভূতি অর্জনের চেষ্টা করবার আমাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে, এবং ব্রিটিশ সরকার পরোক্ষভাবে সে-অধিকার স্বীকার করেছে জাতিসঙ্ঘে ভারতের সদস্যপদের উদ্যোগ নিয়ে, যার অর্থ পুরোদস্তুর একটি জাতি হিসাবে যাবতীয় অধিকার ভারতের আছে।

কোনও-কোনও মহলে এ-রকম একটা ধারণা থাকতে পারে, যে বিদেশি প্রচার খুব সম্ভবত গোপন, বিপ্লবাত্মক ও ব্রিটিশ বিরোধী হবে। কিন্তু সে-ধারণা যদি কারও থেকে থাকে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। প্রচার এমনই জিনিস যে তা প্রকাশ্য এবং উন্মুক্ত হতে বাধ্য, এবং প্রচারের পদ্ধতি

স্বভাবতই গোপন ও বিপ্লবাত্মক পন্থা থেকে পৃথক। তা ছাড়া, এই প্রচার ব্রিটিশ-বিরোধী হবে না, হবে ভারত-অনুকূল। ইউরোপে প্রচার কার্য সম্পর্কে কিছু অভিজ্ঞতা আমার আছে, এবং আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে মুহূর্তে আমরা ব্রিটিশ-বিরোধী প্রচারের উদ্যোগ নেব, তৎক্ষণাৎ আমাদের উদ্দেশ্য বিফল হবে। ব্রিটিশদের প্রচারের জন্য বিশাল ব্যবস্থা আছে, দূতাবাস, অসংখ্য বে-সরকারি সংস্থা ইত্যাদি, যার সাহায্যে তারা আমাদের যাবতীয় কাজকে প্রতিহত করতে পারে। উপরন্তু, আমরা যদি ব্রিটিশদের আক্রমণ করতে আরম্ভ করি, সহানুভূতি পাওয়ার বদলে আমরা সহানুভূতি হারাব। পক্ষান্তরে যতক্ষণ আমরা ভারতের পক্ষে প্রচার করব, আমাদের আবেদন হবে অপ্রতিরোধ্য। এবং আমাদের আইনসঙ্গত প্রচারে যদি ব্রিটিশরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে, তারা অন্যায় করবে এবং সর্বত্র সহানুভূতি হারাবে।

আমার মতে বিদেশে ভারতীয় প্রচারের লক্ষ্য হওয়া উচিত, নিম্নলিখিত রূপ:

১) ভারত সম্পর্কে অপপ্রচার খণ্ডন,

২) এখনকার ভারতের প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে বিশ্বকে অবহিত করা,

৩) প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারতের কৃতিত্বের সঙ্গে বিশ্বকে পরিচিত করা।

শেষোক্ত লক্ষ্যটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বিশ্ববাসীকে আমাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কে আমরা যদি সঠিক ধারণা দিতে পারি, ভারত সম্পর্কে যাবতীয় মিথ্যা বিশ্বাস দূর হবে, এবং সভ্য জগতের দৃষ্টিতে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং সর্বত্র আমরা সহানুভূতি লাভ করব,

এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অন্যান্য ব্যবস্থার সঙ্গে নিম্নলিখিত কাজগুলিও করতে হবে,

১) প্রত্যেক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতকে উপস্থিত থাকতে হবে,

২) বিদেশি পত্র-পত্রিকায় ভারতের সম্পর্কে প্রবন্ধাদি লিখতে হবে,

৩) ইউরোপ এবং আমেরিকার বিভিন্ন ভাষায় ভারত সম্পর্কে বই প্রকাশ করতে হবে,

৪) ইউরোপের বিশেষ-বিশেষ কেন্দ্রে অন্তত একটি করে যথেষ্ট সংখ্যক গ্রন্থ-সম্বলিত গ্রন্থাগার থাকতে হবে, যেখানে ভারত সম্পর্কে যাঁদের আগ্রহ আছে তাঁরা সকলে প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারেন।

৫) ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক যাঁরা উপস্থাপিত করতে পারেন, এমন প্রধান-প্রধান ভারতীয়েরা নিয়মিত বিদেশে যাবেন।

৬) ভারত সম্পর্কে চলচ্চিত্র বিদেশে দেখাতে হবে।

৭) বিদেশে ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে ভারত সম্পর্কে বক্তৃতার আয়োজন করতে হবে।

৮) বিদেশি পণ্ডিত ব্যক্তিদের ভারতে আমন্ত্রণ করে আনতে হবে, এবং সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেণির ভারতীয়দের সঙ্গে তাঁরা যাতে যোগাযোগ করতে পারেন, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

৯) প্রত্যেক দেশে ভারতীয়দের এবং সে-দেশের নাগরিকদের নিয়ে মিশ্র সংস্থা গঠন করা উচিত, যাতে ভারতের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হতে পারে। সে-রকম প্রত্যেকটি সংস্থার একটি পালটা সংস্থা ভারতে থাকতে হবে। তার একটি দৃষ্টান্ত ইন্দো-চেকোস্লোভাকিয়ান সোসাইটি।

১০) সে-রকম প্রত্যেক দেশে সংস্থা গঠন করতে হবে ভারত এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নতির জন্যও। (তার একটি উদাহরণ ভিয়েনায় ইন্ডিয়ান-সেন্ট্রাল ইউরোপিয়ান সোসাইটি) অনুরূপ সংস্থা ভারতেও স্থাপন করা দরকার।

১১) প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ রাজধানীতে মিশ্র বণিক সভা (যথা, ইন্দো-চেকো-স্লোভাক বণিকসভা, ইন্দো-ইতালিয়ান বণিকসভা, ইত্যাদি) সংগঠিত করতে হবে, প্রত্যেকটি ইউরোপীয় দেশে ওই রকম বণিকসভা আছে। একমাত্র ভারতই এখনও তার গুরুত্ব উপলব্ধি করেনি।

১২) জেনেভার International Committee for India-র মতো যে-সব সংস্থা এত দিন স্বাধীনভাবে কাজ করেছে, তাদেরকে নিয়মিত সহায়তা প্রদান করতে হবে। ইউরোপ এবং আমেরিকায় ওই জাতীয় সংস্থা কয়েকটি আছে। তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা দরকার।

দীর্ঘকাল প্রতিকূল প্রচারের ফলে সারা পৃথিবীতে অনেক মহলে এই রকম একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছে, যে আমরা এক অসভ্য জনগোষ্ঠী, আমাদের নারীরা ক্রীতদাসী, এবং আমরা কোনও জাতিই নই, যেহেতু আমাদের সমাজ বহুধা বিভক্ত। আমরা কি ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে রেখে বিশ্ববাসীর আমাদের সম্পর্কে কী ধারণা সে-বিষয়ে উদাসীন থাকতে পারি? পারি না। ভালই হোক আর মন্দই হোক, আধুনিক জগতে আমরা মানবজাতির সকলের জীবনযাত্রায় অংশগ্রহণ করতে বাধ্য। সেই কারণে আমরা আমাদের সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারি না, উপরন্তু, আমরা নিজেদের চোখে দেখতে পাচ্ছি নিয়মিত প্রচার কার্যের দৌলতে অন্যান্য জাতি কী করতে পেরেছে। ইতিহাস এই শিক্ষা দেয়, যে পরাধীন এবং পদানত জাতিদের পক্ষে, এবং বিশেষ করে যারা হিংসার পথ পরিহার করেছে, তাদের পক্ষে সভ্যজগতের সহানুভূতি অপরিহার্য এবং সেই সহানুভূতি লাভের জন্য নিয়মিত প্রচার কার্য করতেই হবে। স্বামী বিবেকানন্দ, ড. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মহাত্মা গান্ধীর মতো বিশিষ্ট ভারতীয়েরা অতীতে বিদেশে কিছু প্রচার করেছেন, এবং তাঁরা যা করেছেন তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভারতের বিদেশি বন্ধুদের কাজ। তার ফলে এক প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতা হিসাবে ভারতের একটা খ্যাতি এখনও আছে। কিন্তু এ বিষয়ে আরও অগ্রগতি যদি করতে হয়, অবশ্য প্রয়োজন নিয়মিত প্রচার আরম্ভ করা, যার পিছনে থাকবেন ভারতবাসীরা যাঁদের আর্থিক সামর্থ্য বেশি না থাকলেও এ-কাজে যাঁরা হবেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একটাই প্রশ্ন, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কি এই মহামূল্যবান কাজের দায়িত্ব নেবে এবং কার্যকরভাবে, দক্ষতার সঙ্গে এ কাজ করবে?

ভারত-ব্রিটিশ বাণিজ্যের পঞ্চাশ বছর (১৮৭৫-১৯২৫)

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের যে বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে, সে-প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, গত পঞ্চাশ বছর ধরে কিংবা তারও অধিককাল ব্রিটেনের সঙ্গে বাণিজ্যের শতাংশ পরিমাণের ক্রমাগত হ্রাস, যদিও প্রকৃতভাবে ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্যের পরিমাণ প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছে। তার অর্থ আমাদের মোট বহির্বাণিজ্যের বৃদ্ধির সঙ্গে ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্যের গতি তাল রাখতে পারেনি। অর্থাৎ ব্রিটেনের সঙ্গে আমাদের যে বাণিজ্য, তার চেয়ে অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যের বৃদ্ধি হয়েছে আরও দ্রুত হারে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৃদ্ধি এবং ব্রিটেনের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যের বৃদ্ধি প্রায় সমার্থক ছিল।

ব্রিটেন কীভাবে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে একচ্ছত্র অধিকার কায়েম করেছিল তার সূত্রপাতের ইতিহাস অনুধাবন করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়।[১] পরবর্তী কালে আমাদের আমদানি-রপ্তানি দুই-ই দিক-পরিবর্তন করেছে, ব্রিটেনের তুলনায় অন্যান্য দেশের সঙ্গে তার

১. ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্যের প্রথম দিকের এই ইতিহাস পাওয়া যাবে Dr. Balkrishna-র *Commercial Relations between India and England* ও Prof. C. J. Hamilton-এর *Trade Relations between England and India*-তে।

পরিমাণ বেড়েছে, বিশেষত ইউরোপের অন্যসব দেশের সঙ্গে, আমেরিকা ও জাপানের সঙ্গে। তার ফল কী হয়েছে আগেই বলেছি। নীচের হিসাব থেকে ব্যাপারটা বোঝা যাবে:

ভারতের মোট বাণিজ্যে ব্রিটেনের শতাংশ।

১৮৭৫-৭৬	৬২.২
১৮৮০-৮১	৫৮.৭
১৮৯০-৯১	৫০.৯
১৯০০-০১	৪৫.১
১৯০৫-০৬	৪২.৯
১৯১০-১১	৩৯.১
১৯১৫-১৬	৪৭.৪[১]
১৯২০-২১	৪১.৮
১৯২৫-২৬	৩২.১

ব্রিটেনের বাণিজ্য শতাংশর এই অবনমন প্রধানত আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যেই লক্ষণীয়। এ কথা ঠিক, ব্রিটেনের অংশ আমাদের আমদানিতেই বরাবর বেশি থেকেছে আমাদের রপ্তানির চাইতে, কিন্তু আমাদের রপ্তানি পরিমাণে কম হলেও, সম্প্রতিকালে আমাদের আমদানির তুলনায় রপ্তানির হ্রাস আরও বেশি লক্ষণীয়, নীচের পরিসংখ্যান থেকে সেটা স্পষ্ট:

ভারতের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে ব্রিটেনের শতাংশ

	আমদানি	রপ্তানি
১৮৭৫-৭৬	৮৩.০	৪৮.৩
১৮৮০-৮১	৮২.৮	৪১.৬
১৮৯০-৯১	৭৬.৪	৩২.৭
১৯০০-০১	৬৫.৬	৩০.৭
১৯০৫-০৬	৬৮.৫	২৫.১
১৯১০-১১	৬২.১	২৪.৮
১৯১৫-১৬	৬০.৪	৩৮.১
১৯২০-২১	৫৮.৮	১৯.৪
১৯২৫-২৬	৫০.৯	২১.০

আমাদের আমদানিতে মোট বাণিজ্যের অর্ধেকের বেশি ব্রিটেনেরই এবং তাদেরই আধিপত্য। তার পরেই যে দেশের স্থান, সেই জাপানের অংশ ১০২৫-২৬-এ মাত্র ৮ শতাংশ, কিন্তু ভারতীয় সামগ্রীর ভোক্তা হিসাবে অনুরূপ স্থান সে-দেশ অনেকদিন আগেই হারিয়েছে। তার ঠিক পিছনেই আছে—জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে ব্রিটেন জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৯২৫-২৬ সালে যথাক্রমে ২১.০, ১৫.০ এবং ১০.৪।

১. যুদ্ধের সময়ে অস্ত্র-শস্ত্র, গোলাবারুদ ইত্যাদি নির্মাণের জন্য ভারত থেকে কাঁচা-মাল প্রচুর পরিমাণে রপ্তানির ফলে সাময়িকভাবে ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্রিটেনের অংশের এই হ্রাসের কারণ সহজবোধ্য। আগে যে এ-ক্ষেত্রে সেই দেশের আধিপত্য ছিল, তার কারণ ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে সে-দেশ কতকগুলি সুবিধা ভোগ করত যা অন্য কোনও দেশের ছিল না।[১]

এ-দেশে ব্রিটেনের ছিল রাজনৈতিক আধিপত্য। আমাদের বাণিজ্য প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভর করত ব্রিটিশ জাহাজের ওপর, আমদানি-রপ্তানির কোম্পানিগুলির অধিকাংশই ছিল ব্রিটিশদের, বিনিময় ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানিগুলিও তাই। ভারতের রেল স্থাপিত হয়েছিল প্রধানত ব্রিটিশদের মূলধনে এবং পরিচালিত হত ব্রিটিশ কোম্পানির দ্বারা ব্রিটিশের স্বার্থে।[২] কৃষিজাত শিল্পের মধ্যে অনেকগুলি (তার মধ্যে কয়েকটি ব্রিটিশ মূলধন-নিয়োগে) আরম্ভ করা হয় এবং বাড়িয়ে তোলা হয় ব্রিটেনের বাজারের দিকে তাকিয়ে (যেমন চা, কফি)।

সরকারের কৃষি-নীতিরও উদ্দেশ্য ছিল পাট, তুলা, গম, তৈলবীজ প্রভৃতি এমন সব কাঁচা মালের এবং খাদ্যশস্যের উৎপাদন, যেগুলি ব্রিটেনে রপ্তানি হতে পারে। অপরপক্ষে যুক্তরাজ্য ছিল পৃথিবীর সর্বাগ্রগণ্য শিল্পসমৃদ্ধ দেশ এবং শিল্পজাত সামগ্রীতে ভারতের যা চাহিদা, তার অধিকাংশই সে-দেশ সরবরাহ করত। তার কয়েকটির ক্ষেত্রে (যথা, তুলাজাত শিল্পসামগ্রী) আমদানিতে সহায়তা করত ভারত সরকারের শুল্ক সংক্রান্ত আইন। সেই আইনের ফলে, পরোক্ষভাবে, ভারতের যে-সব শিল্প ব্রিটেন থেকে আমদানির ব্যবসার বৃদ্ধিতে বাধা দিতে পারে, সেগুলির বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হল।

অতএব, আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যে যুক্তরাজ্যের প্রাধান্য ঘটেছিল দুটি বিষয়ের সম্মেলনের ফলে, সে দেশের ভারতের উপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য এবং পৃথিবীর দেশগুলির মধ্যে শিল্পক্ষেত্রে ব্রিটেনের প্রাধান্য।

পরবর্তী কালে পৃথিবীর প্রায় সব দেশের সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হল এবং তাদের সঙ্গে বাণিজ্যের ক্রমোন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে ব্রিটেনের অংশ কমতে থাকল। অবশ্য অব্রিটিশ দেশগুলির সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যের বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল ভারতীয় বাজার সম্পর্কে ব্রিটেনের অবাধ বাণিজ্য নীতি অনুসরণের ফলে। বিশেষ যে কারণটি দেখতে পাওয়া যায় সেটি হল, যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্রিটেন একমাত্র বৃহৎ শিল্পোন্নত দেশ ছিল, পরবর্তীকালে জার্মানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানের মতো দেশে শিল্পে অগ্রগতির কারণে সে-সব দেশ থেকেও অধিকতর পরিমাণে শিল্পজাত সামগ্রী আমদানি হতে লাগল। ফলে লোকসান হল ব্রিটেনের।

পক্ষান্তরে, ওইসব শিল্পোন্নত দেশ দেখল ভারত কার্যত কাঁচা মালের একটি খনি, যে-সব কাঁচা মাল তাদের শিল্পগুলিকে পুষ্ট করতে পারে। কিন্তু নিজেদের শিল্পসামগ্রী বিক্রি করবার জন্য ব্রিটেনের হাত থেকে ভারতের বাজার দখল করে নিতে যে কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, সে-রকম কোনও প্রতিযোগিতা কাঁচা মাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে ছিল না। কারণ অনান্য দেশ থেকে আমাদের আমদানিকে ব্রিটেন প্রতি পদে বাধা দিচ্ছিল, তার বৃদ্ধি প্রতিরোধ করছিল, কিন্তু নিজের কাঁচা মাল ভারত যে-কোনও দেশ, যার কাছ থেকে সবচাইতে ভাল দাম পাবে, তার কাছে বিক্রি করতে পারত। সেই কারণে অব্রিটিশ দেশগুলির পক্ষে ভারতীয় সামগ্রী বেশি

১. দ্রষ্টব্য: Dr. S G. Panandikar-এর *Economic Consequences of the War for India* পৃঃ ৬৬-৭; এবং Prof. R. M. Joshi-র Indian Export Trade পৃঃ ১৬০-৬১ এবং ১৬৪।

২. প্রসঙ্গত, ভারতে রেলপথের প্রসারে ব্রিটেন থেকে আমদানি বৃদ্ধি পায়, কারণ রেল সংক্রান্ত যাবতীয় নির্মাণকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করা হয় সেই দেশ থেকে।

করে কেনা, ব্রিটেনের রপ্তানিকৃত শিল্পজাত দ্রব্যের জায়গায় নিজেদের সামগ্রী বিক্রি করার চেয়ে অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল।

অতএব অব্রিটিশ দেশগুলির অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে এবং তাদের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য ক্রমশই বেশি পরিমাণে সেইসব দেশের সঙ্গে স্থাপিত হতে আরম্ভ করল।

৩

এতক্ষণ যা বলা হল তা থেকে এমন ধারণা করা ঠিক হবে না যে ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্যের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে, প্রকৃতপক্ষে ভারত এবং অন্য কোনও দেশের মধ্যে বাণিজ্যের বৃদ্ধির মধ্যে ব্রিটেনের সঙ্গে বাণিজ্যেই সর্বাধিক বৃদ্ধি ঘটেছে। নীচে প্রদত্ত পরিসংখ্যান থেকে সেটা স্পষ্ট হবে:

ভারত ব্রিটেন বাণিজ্য:
লক্ষ টাকার হিসাবে মূল্য

যুক্তরাজ্যে রপ্তানি	যুক্তরাজ্য থেকে আমদানি	ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্যের মোট পরিমাণ
১৮৭৫-৭৬	২৮০৯	৩২২৮	৬০৩৭
১৮৮০-৮১	৩১০৫	৪৪০৩	৭৫০৮
১৮৯০-৯১	৩২২৭	৫৫০২	৮৭৭৯
১৯০০-০১	৩২০৫	৫৩১০	৮৫১৬
১৯০৫-০৬	৪০৭০	৭৬৮৫	১১৭৫৫
১৯১০-১১	৫২২৪	৮৩১১	১৩৫৩৩
১৯১৫-১৬	৭৬০০	৮৩৫২	১৫৯৫২
১৯২০-২১	৫২৯৭	২০৪৬০	২৫৭৫৭
১৯২৫-২৬	৮০৯৭	১১৫৩২	১৯৬২৯

অর্থাৎ, ১৮৭৫-৭৬ থেকে ১৯২৫-২৬-এ ব্রিটেনের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় ১৩৬ কোটি টাকা। এই বৃদ্ধির পরিমাণই অন্য যে কোনও দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের পরিমাণের চেয়ে বেশি। যুক্তরাজ্যের ভাগের শতাংশ যে ক্রমে হ্রাস পেয়েছে, তার কারণ সাধারণভাবে ভারতের বহির্বাণিজ্যের বৃদ্ধি যে-হারে ঘটেছে তার সঙ্গে সে-দেশ তাল রাখতে পারেনি। এই পিছিয়ে পড়া স্পষ্ট হবে নিম্নে প্রদত্ত সূচক থেকে:

	মোট ভারতীয় বাণিজ্য	ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্য
১৮৭৫-৭৬	১০০	১০০
১৮৮০-৮১	১৩১	১২৪
১৮৯০-৯১	১৭৭	১৪৫

১৯০০-০১	১৯৪	১৪১
১৯০৫-০৬	২৮২	১৯৪
১৯১০-১১	৩৫৪	২২৪
১৯১৫-১৬	৩৪৮	২৬৪
১৯২০-২১	৬৩৪	৪২৬
১৯২৫-২৬	৬৩০	৩২৫

আগেই বলা হয়েছে, ব্রিটেনের প্রাধান্য ভারতের আমদানি বাণিজ্যেরই বেশি। সেটা বোঝা যায় এই থেকে, যে, আমাদের মোট আমদানির পরিমাণ যুক্তরাজ্যে ওই বস্তুগুলির গতিপ্রকৃতির অনুরূপ। আমাদের মোট আমদানির হ্রাস বৃদ্ধি ঘটেছে ব্রিটেন থেকে আমদানির হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে একই হারে। আমাদের রপ্তানির ক্ষেত্রে কিন্তু তা হয়নি। কোনও কোনও বছর এমন হয়েছে, যে আমাদের মোট রপ্তানির হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে ব্রিটেনে আমাদের রপ্তানির হ্রাস-বৃদ্ধি মেলেনি। তার কারণ অবশ্য, ব্রিটেনে আমাদের রপ্তানি আমাদের মোট রপ্তানির এক ভগ্নাংশ মাত্র, কিন্তু ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে সে দেশের এমনই প্রাধান্য যে অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে যাই হোক, ব্রিটেন থেকে আমাদের আমদানির সঙ্গে তাল রেখেই আমাদের মোট আমদানি বাণিজ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে।

ব্রিটেনের সঙ্গে আমাদের মোট আমদানি বাণিজ্যের সর্বপ্রধান সামগ্রী তুলাজাত দ্রব্য। পৃথিবীর মধ্যে তুলাজাত দ্রব্যের সবচেয়ে বড় প্রস্তুতকারক ব্রিটেন এবং তার সবচাইতে বড় খরিদ্দার ভারত। বস্তুত পৃথিবীতে তুলাজাত দ্রব্যের আমদানি-কারক দেশগুলির মধ্যে ভারতের স্থান সর্বোচ্চে। ওই একটি সামগ্রীই যুক্তরাজ্য থেকে ভারতের আমদানির পঞ্চাশ শতাংশের অধিক।

অন্যান্য বড়-বড় আমদানিকৃত বস্তু হল ধাতু, কলকব্জা এবং রেলগাড়ি সংক্রান্ত সামগ্রী ইত্যাদি। সর্বশেষ যে বছরের হিসাব নেওয়া হয়েছে, সে বছর এই সব সামগ্রীর প্রত্যেকটির মূল্য ছিল দশ কোটি টাকার বেশি। এগুলো ছাড়া অনেক ছোটখাটো জিনিসও ছিল। প্রধানত আমদানি হত অবশ্য তুলাজাত বস্তু, ধাতু এবং ধাতুনির্মিত বিভিন্ন বস্তু, এবং ভারত ব্রিটেন বাণিজ্যের যে অগ্রগতি হয়েছে তা মূলত ওই সব সামগ্রীতেই।

ব্রিটেনে যা রপ্তানি করা হত তার মূল্য ব্রিটেন থেকে আমদানি করা বস্তুর চেয়ে যে কম, সেটা ছাড়াও আরেকটি পার্থক্য লক্ষণীয়। আমদানির দিকে, বাণিজ্যের প্রায় সবটাই তুলাজাত দ্রব্য, কিন্তু অপরপক্ষে রপ্তানির দিকে সে-রকম কোনও সামগ্রী নেই যার অত প্রাধান্য আছে। আমদানিতে প্রধান-প্রধান সামগ্রীগুলি বরাবরই তাদের প্রাধান্য বজায় রেখেছে, রপ্তানির বস্তুগুলোর বৃদ্ধি এবং তুলনামূলক প্রাধান্যের বিপুল হেরফের ঘটেছে।

প্রথম দিকে কাঁচা তুলাই ছিল প্রধান রপ্তানির দ্রব্য। একদম ১৮৮৪-৮৫ সাল পর্যন্ত তার উৎপাদন এবং রপ্তানিতে অত্যধিক উৎসাহ দিয়েছিল Dundee-তে পাট-শিল্পের পত্তন ও অগ্রগতি। ফলে কাঁচা তুলারই স্থান ছিল সর্বোচ্চ। তার পরে প্রথম, ১৮৯০ সালে চা সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করল। ভারতে চা-শিল্পের দ্রুত বৃদ্ধির ফলে সেই চা চিনা চা-কে দ্রুত ব্রিটেনের বাজার থেকে হঠিয়ে দিতে আরম্ভ করেছিল। ফলে ১৮৯০-৯১-তে চা, খাদ্যশস্য, কাঁচা পাট এবং তুলা যথাক্রমে অধিকার করল প্রথম চারটি স্থান, এবং এর প্রত্যেকটির রপ্তানির মূল্য ছিল ৪ থেকে ৫ কোটির মধ্যে।

তারপর থেকে কাঁচা তুলার রপ্তানিতে যেমন বিপুল হ্রাস ঘটেছে এবং ১৮৯৯-১৯০০-তে দাঁড়িয়েছে মাত্র ২১ লক্ষ টাকায়, অন্য তিনটি সামগ্রীর রপ্তানির পরিমাণ বেড়েই চলেছে, এবং পরবর্তী তিন বছর সেই সামগ্রীগুলো প্রথম তিনটি স্থান নিজেদের মধ্যেই অদল-বদল করে নিয়েছে। কিন্তু শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে চা স্পষ্টত প্রথম স্থান দখল করে ফেলল,

এবং যদিও কোনও-কোনও অস্বাভাবিক বছরে খাদ্যশস্যের রপ্তানি চা-কে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, সেই থেকে চায়ের স্থানই সর্বোচ্চ। খাদ্যশস্য ও পাটের তুলনায় চায়ের প্রাধান্যে ক্রমবৃদ্ধি ঘটেছিল নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য:

ভারত যেহেতু এক ঘনবসতিপূর্ণ দেশ এবং সে-দেশে খাদ্যশস্যের অভাব ও দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব, খাদ্যশস্যের রপ্তানির বৃদ্ধি সেখান থেকে সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য, এবং বিপুল পরিমাণে তার হ্রাস-বৃদ্ধি অনিবার্য। পাটের ক্ষেত্রে, ভারতে ও অন্যত্র পাটজাত দ্রব্যের শিল্পের অগ্রগতির ফলে যুক্তরাজ্যে রপ্তানি সীমাবদ্ধ হয়ে যায়, কিন্তু চায়ের রপ্তানিতে এ-রকম কোনও জোয়ার-ভাঁটা খেলেনি। দেশের মধ্যে চা-পান ছিল সামান্য, অন্যান্য দেশেও চায়ের তেমন কোনও চাহিদা ছিল না। চা-শিল্পের পত্তন ও প্রসার করাই হয়েছিল ব্রিটেনের চাহিদার দিকে তাকিয়ে, এবং ব্রিটেনই কার্যত ভারতীয় চায়ের একমাত্র বাজার হয়ে থেকে গিয়েছে। অন্যান্য দেশে রপ্তানি তেমন কিছু নয়। চা যদি না থাকত, যুক্তরাজ্যে রপ্তানি আরওই পড়ে যেত।

সে-দেশের সঙ্গে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের অন্য যে-সব গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী সেগুলি পশুচর্ম, পাটজাত দ্রব্য, তৈলবীজ, কাঁচা পশম, লাক্ষা, কফি ও সেগুন কাঠ।

৪

ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্যের এই বিবরণ থেকে দেখা যাচ্ছে, যে আমদানি-রপ্তানির অধিকাংশ বস্তুকে দ্বিমুখী প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে হয়েছিল।

রপ্তানির প্রধান-প্রধান সামগ্রী, আগেই দেখিয়েছি, ছিল তুলাজাত দ্রব্য ও ধাতু-নির্মিত বস্তু। সেই দুইয়েরই সর্বদা দেশে ও বিদেশে প্রতিযোগিতা ছিল। প্রথমটির ক্ষেত্রে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদনের ক্রম বৃদ্ধি এবং জাপানের তীব্র প্রতিযোগিতা ব্রিটেনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুত সাম্প্রতিক কয়েক বছরে ব্রিটেন থেকে তুলাজাত বস্তুর আমদানির পরিমাণ যথেষ্ট পড়তির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ধাতু এবং ধাতুজাত সামগ্রীতেও আগেকার দিনে ব্রিটেনের সামনে যদিও কোনও প্রতিযোগী ছিল না, গত শতাব্দীর শেষ দিকে বেলজিয়াম ও জার্মানি তার তীব্র প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়াল। বস্তুত এই শতাব্দীর প্রথমে বিশেষ-বিশেষ ধাতু দ্রব্যে, বিশেষত লোহা এবং ইস্পাতে, বেলজিয়াম এবং জার্মানি থেকে আমদানি করা সামগ্রী বহুলাংশে ব্রিটেনের জায়গা দখল করে নিল। ইদানীং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তারপরে আবার, ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পেরও বাড়-বাড়ন্ত হল, সেও মাথা তুলে দাঁড়াল আমদানির ওপরে সুসম্বন্ধ আড়াল পেয়ে। রপ্তানির ক্ষেত্রে পাট, চর্ম ইত্যাদি কাঁচামালের বাণিজ্যও বাধা পেল অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের তীব্রতর চাহিদার দরুন। সে-সব বস্তু ব্রিটেনের দিকে না গিয়ে অন্যান্য দেশের দিকে যেতে আরম্ভ করল, তেমনই আবার কফি, চা, তুলার সামনেও এল অন্যান্য দেশের প্রতিযোগিতা, তারাও ব্রিটেনের বাজারকে সরবরাহ করতে আরম্ভ করল। তৃতীয় আর-একটি শ্রেণির সামগ্রীর খাদ্যশস্য, এবং পশমের রপ্তানি সীমাবদ্ধ ছিল, দেশের অভ্যন্তরে তা কতটা পাওয়া যায় এবং বিদেশি প্রতিযোগিতা কত, তার দ্বারা। দেখা যাচ্ছে চা ব্যতীত (তারও রপ্তানিকে বিদেশি প্রতিযোগিতার মোকাবিলা করতে হয়) অন্য সমস্ত সামগ্রীর রপ্তানি ব্রিটেনের দিক থেকে অন্য দিকে চলে যাচ্ছে। ব্রিটেন ভারতীয় কাঁচা তুলা কিংবা পাটজাত সামগ্রীর আমদানি করবে না, এবং ভারত শুধু ওই দুটি সামগ্রী নয়, কাঁচা পাট, তৈলবীজ, চর্ম এবং অন্যান্য কাঁচা মালের জন্যও অন্যান্য বাজার পেয়ে গেল।

ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্য সম্পর্কে আরেকটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই, যে ব্রিটেনের বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গে সেটা এক তালে চলেছে। অর্থাৎ, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্রিটেনের গুরুত্ব আপেক্ষিকভাবে কমে গেলেও, ব্রিটেনের বৈদেশিক বাণিজ্যে নিজের গুরুত্ব ভারত সম্পূর্ণ বজায় রেখেছে। বস্তুত বিগত মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত ভারতের আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধিই পাচ্ছিল। ব্রিটেনের মোট বৈদেশিক বাণিজ্যর চেয়ে ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্যের বৃদ্ধি হচ্ছিল উচ্চতর হারে। তারপর থেকে ভারতের অবস্থানে একটু অবনতি হয়েছে। যুক্তরাজ্যের বৈদেশিক বাণিজ্য পরবর্তী কালে যে-হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, ভারতের সঙ্গে তার বাণিজ্য সে-হারে বাড়েনি। মোটের ওপর ব্রিটেনের বাণিজ্যে ভারতের শতাংশ ভাগ প্রায় একই থেকেছে, কিন্তু ভারতের বাণিজ্যে ব্রিটেনের শতাংশ ভাগ ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে। অতএব ভারতে ব্রিটেনের বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার প্রসঙ্গে এটা লক্ষ করা দরকার, যে অন্যান্য দেশের সঙ্গে যতটা, ভারতের সঙ্গে তার বাণিজ্যও ব্রিটেন ততটাই অগ্রগতি করেছে।

নীচে সূচক সংখ্যাগুলি দ্রষ্টব্য:

		যুক্তরাজ্যের মোট বাণিজ্য	ভারত- ব্রিটেন বাণিজ্য
গড়পড়তা	১৮৭৫-৭৯	১০০	১০০
গড়পড়তা	১৮৮৫-৮৯	১০৪	১৪৪
গড়পড়তা	১৮৯৫-৯৯	১২১	১৪১
গড়পড়তা	১৯০৫-০৯	১৭৮	২১০
গড়পড়তা	১৯১০-১৩	২০৮	২৬৫
গড়পড়তা	১৯১৪-১৮	৩০১	২৭০
বছর	১৯২০	৫৮৫	৪২৮
বছর	১৯২১	৩২২	৩২৭
বছর	১৯২৫	৩৮৮	৩২৬

লক্ষণীয়, ব্রিটেনের মোট বাণিজ্যে ভারতের শতাংশ ভাগ এমন নয় যে তাতে ভারতের কাছে ব্রিটেনের যত গুরুত্ব, ব্রিটেনের বাণিজ্যে ভারতের ততখানি গুরুত্ব হবে। ব্রিটেনের মোট বাণিজ্যে ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্য এক ভগ্নাংশ মাত্র। এ কথা ঠিক, ব্রিটিশ সামগ্রীর ভোক্তা হিসাবে ভারতের স্থান সর্বাগ্রে, কিন্তু আমাদের মোট আমদানির শতকরা ৫০ ভাগ ব্রিটিশ সামগ্রী হলেও, ব্রিটেনের মোট রপ্তানির তা ১২ শতাংশও হবে কি না সন্দেহ। ভারতীয় সামগ্রীর ভোক্তা হিসাবে ব্রিটেনের সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। ১৯২৪-২৫-এ আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যে ব্রিটেনের ভাগ ছিল ২৫.৫ শতাংশ আর ব্রিটেনের আমদানি বাণিজ্যে ভারতের ভাগ ছিল, ১৯২৪ সালে, মাত্র ৫.৭ শতাংশ।

ব্রিটেনের বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতের অবস্থান নিম্নে প্রদত্ত পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট হবে:

সাল ১৯২৪		মূল্য দশ লক্ষ পাউন্ডে	
ব্রিটেন থেকে রপ্তানি		ব্রিটেনে আমদানি	
ভারত	৯০.৬	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২২২.৬
অস্ট্রেলিয়া	৬০.৭	আর্জেন্টিনা	৭৫.২
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৫৩.৮	ভারত	৬৫.১
জার্মানি	৪২.৬	কানাডা	৬২.৭

সব মিলিয়ে ১৯২৪ সালে যুক্তরাজ্যে মোট বাণিজ্যে ভারতের ভাগ ছিল মাত্র ৮ শতাংশ, আর ভারতের বাণিজ্যে যুক্তরাজ্যের ভাগ ছিল ৩৬ শতাংশের কম নয়।

৬

দেখা যাচ্ছে, আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের যুক্তরাজ্যের ভাগের শতাংশে হ্রাস, সেদেশে আমাদের রপ্তানির ক্ষেত্রে যতটা সে-দেশ থেকে আমাদের আমদানির ক্ষেত্রে ততটা নয়।

তবে, যুদ্ধের পর থেকে একটি বড় রকমের পরিবর্তন দেখা গেছে। ভারত থেকে রপ্তানি প্রাক-যুদ্ধ কালের মতোই থেকে গেলেও, যুক্তরাজ্য থেকে আমদানির পরিমাণ অনেক কমে যায়। ১৯২০-২১ থেকে ১৯২৫-২৬-এর মধ্যে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যে ব্রিটেনের অংশ শতকরা ৫৮.৮ থেকে কমে শতকরা ৫০.৯-তে দাঁড়ায়, কিন্তু সেই সময়েই আমাদের আমদানি বাণিজ্যে ব্রিটেনের অংশ শতকরা ১৯.৪ থেকে বেড়ে হল শতকরা ২১.০, যুক্তরাজ্যের বাণিজ্যেও একই জিনিস দেখা গেল।

যুক্তরাজ্যের রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যে ভারতের শতাংশ

	রপ্তানি	আমদানি
১৯১০	১০.৬৯	৫.৫৩
১৯১৩	১৩.৩৮	৫.৪৮
১৯২২	১২.৮০	৪.২৫
১৯২৩	১১.২৪	৫.৭৬
১৯২৫	১১.১২	৫.৭৬

১৯২২-এর আগে ভারতের আপেক্ষিক গুরুত্ব ব্রিটেনের রপ্তানি বাণিজ্যে বাড়ছিল, আমদানি বাণিজ্যে কমছিল। পরবর্তী কালে পরিবর্তন হয় তার বিপরীতমুখী। ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতিতে এই পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধান করলে ভারতের বাজারের ওপর ব্রিটেনের দখলদারী সম্পর্কে কয়েকটি তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে।

যুদ্ধের সময়ে স্বাভাবিক কারণেই ভারতে ব্রিটিশ সামগ্রীর আমদানি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল এবং জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশ সে অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে নিজেদের সামগ্রীর

বিক্রি বাড়িয়ে তুলেছিল। ফল এই দাঁড়াল, যে ব্রিটেন যখন আবার তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে গেল, তখন বাজার বহুলাংশে ওই দুটি দেশের দখলে চলে গেছে এবং সেখান থেকে তাদের বহিষ্কার করা অতি দুরূহ। জাপান শুধু ভারতের বাজারেই নয়, অন্যত্রও তাদের শক্তিধর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে তুলাজাত দ্রব্যের সরবরাহের ক্ষেত্রে, যেটি ছিল ব্রিটেনের সঙ্গে আমাদের আমদানি বাণিজ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী, উপরন্তু আমদানি শুল্কের লোপ এবং আবগারী শুল্কের প্রত্যাহারের ফলে ভারতীয় শিল্পপতিরা এমন একটা সুযোগ পেয়ে গেলেন যা তাঁরা আগে কোনও দিন ভোগ করেননি। অর্থাৎ যুদ্ধোত্তর কালে ব্রিটেন থেকে তুলাজাত বস্তুর আমদানির ওপর চোট এসে পড়ল দেশের ভিতর থেকে এবং জাপান থেকেও। পক্ষান্তরে, জার্মানি এবং বেলজিয়াম যে, যুদ্ধের সময়ে ভারতের সঙ্গে তাদের বাণিজ্য সম্পূর্ণ ভেঙে পড়া সত্ত্বেও অত দ্রুত তাদের ভারতের বাজার ফিরে পেতে পেরেছিল, আর ব্রিটেন পারেনি, তাতেই বোঝা গেল বিশেষ-বিশেষ সামগ্রীর ক্ষেত্রে ওই সব দেশের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্রিটেনের অক্ষমতা। ভারতে নতুন-নতুন শিল্পের বিকাশও ব্রিটেন থেকে আমদানির বাধা হয়ে দাঁড়াল, যেমন ইস্পাত ও লৌহ শিল্পে। অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধোত্তর কালে ব্রিটেন থেকে আমদানি দেশের ভিতর ও বাইরে থেকে কঠিন প্রতিযোগিতার মুখে পড়ল।

ভারত থেকে রপ্তানির ক্ষেত্রে সে-রকম কিছু হল না। যুদ্ধের সময়ে রপ্তানি যে জোর পেয়েছিল তার ফলে রপ্তানি বাণিজ্য পরে আরও বৃদ্ধি পেল। তা ছাড়া, Imperial Preference (ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশ-সমূহকে সুবিধা প্রদান)-এর নীতি, এবং যুক্তরাজ্যে কোনও-কোনও ভারতীয় সামগ্রীকে বিশেষ সুবিধেজনক শুল্কের আওতায় আনার ফলে সে-দেশে আমাদের রপ্তানি খানিকটা বৃদ্ধি পেল।

এই সব কারণেই যুদ্ধোত্তর কালে ভারত থেকে যুক্তরাজ্যে রপ্তানি যতটা বৃদ্ধি পেল, সেখান থেকে এ-দেশে আমদানি তত বৃদ্ধি পেল না। এতদিন অবস্থাটা ছিল তার বিপরীত।

উল্লিখিত বিবরণ থেকে ভারত-ব্রিটেনে বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায়। এ কথা ঠিক, সাম্প্রতিকতম ঘটনাবলী এ প্রসঙ্গে বিবেচনা করা হয়নি, বিগত চার বছর আমাদের হিসাবের বাইরে রাখা হয়েছে। সাম্প্রতিক স্বদেশী আন্দোলনের কী প্রভাব আমাদের বাণিজ্যের ওপর পড়তে পারে, বিশেষ করে ব্রিটেনের সঙ্গে আমাদের যে বাণিজ্য তার ওপরে, তারও হিসাব নেওয়া হয়নি। তা হলেও, আমাদের মতে, অর্ধ্ব শতাব্দীর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এ বিষয়ে অধিকতর নির্ভরযোগ্য ইঙ্গিত বহন করে কয়েকটি অস্বাভাবিক বছরের ঘটনাবলীর চেয়ে। যেহেতু ভারতের আমদানি বাণিজ্যে ব্রিটেন ভিতর থেকে এবং অন্যান্য দেশ থেকেও বৃহত্তর প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়েছে, এবং আমাদের প্রয়োজনীয় বিবিধ সামগ্রী সরবরাহ করতে সে-সব দেশ অধিকতর সক্ষম অতএব আমরা আশা করতে পারি, ব্রিটেনের সঙ্গে আমাদের আমদানি বাণিজ্য বিশেষ বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাক হ্রাসও হতে পারে।

ভারত থেকে রপ্তানির ক্ষেত্রে আমরা অল্প কিছু বৃদ্ধি আশা করতে পারি, বিশেষ করে এই কারণে, যে সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলি থেকে আগত বস্তুর আমদানিতে ব্রিটেন উৎসাহ দিচ্ছে। এবং সে-সব দেশে উৎপন্ন দ্রব্যাদি অধিকতর পরিমাণে যাতে ব্যবহৃত হয় তার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে এ ক্ষেত্রেও ভবিষ্যৎ খুব আশাব্যঞ্জক নয়। কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়া, যাদের কৃষি সম্পদ বিপুল, তারা ব্রিটেনে রপ্তানিতে অধিকতর অগ্রগতি করছে। এ অসম্ভব নয়, ভবিষ্যতে ভারতের কোনও-কোনও সামগ্রীর ওই সব উপনিবেশের সামগ্রীর দ্বারা স্থানচ্যুত হতে

পারে। গমের ক্ষেত্রে তারা ভারতকে ব্রিটেনের বাজার থেকে প্রায় পুরোপুরি হঠিয়ে দিয়েছে।

উপরন্তু, ভুললে চলবে না, ভারত-ব্রিটেন মোট বাণিজ্য এখন ভারতের মতো একটা দরিদ্র দেশের পক্ষে এত বড় আকার ধারণ করেছে যে আর বেশি বৃদ্ধি সম্ভব নয়। ভারতে ব্রিটিশ সামগ্রীর আমদানির বৃদ্ধি সীমাবদ্ধ হচ্ছে ভারতের এবং বিদেশের প্রতিযোগিতার কারণে এবং ভারত থেকে রপ্তানিও বেশি বাড়তে পারবে না বিভিন্ন উপনিবেশ থেকে ব্রিটেনে সামগ্রী সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার কারণে এবং ব্রিটেন ছাড়া অন্যান্য দেশে ভারতীয় বস্তুর অধিকতর চাহিদার জন্য।

মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি

যে-সব প্রদেশে কংগ্রেস দল সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে কংগ্রেস সদস্যদের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সর্বোচ্চ কার্যকরী সমিতি অনুমতি দানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখন, আমাদের সামনে যে বিপদ সে সম্পর্কে আমাদের সতর্ক হওয়া কর্তব্য। যদিও ব্রিটিশ ভারতের এগারোটি প্রদেশের মধ্যে মাত্র ছ'টিতে কংগ্রেসি মন্ত্রীসভা গঠিত হবে, (যুক্ত প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি, মধ্যপ্রদেশ ও বম্বে প্রেসিডেন্সি), এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে সমগ্র ভারতে কংগ্রেসিদের এবং জনসাধারণের মনোযোগ আগামী কিছুকাল মন্ত্রীরা এবং বিধানসভাগুলি কী রকম কাজ করেন তার ওপর নিবদ্ধ থাকবে। সাংবিধানিক কাজকর্মই প্রধান হবে, এবং সংবিধান-বহির্ভূত কর্মপদ্ধতি, যেমন আইন অমান্য আন্দোলন, এতদিন যা ছিল কংগ্রেসের প্রধান অস্ত্র, সে-সব গৌণ হয়ে পড়বে। এর ফলে জনসাধারণের মনে একটা মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন আসতে বাধ্য, এবং অনেক কংগ্রেসির মনে চুপিসারে ঢুকে পড়বে মন্ত্রীত্বের মিঠাই-মণ্ডার চিন্তা। যে-বিদ্রোহী মনোভাব কংগ্রেসকে অনেকদিন ধরে গড়ে তুলতে হয়েছিল, তার জায়গায় আবার আসবে আত্মতৃপ্তি, জাড্য। আজ যে-সব সম্ভাবনা বড় আকার নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, এ হল তারই কয়েকটি।

যাঁরা মনে করেন, মন্ত্রীত্ব গ্রহণ নীতিগতভাবেই অনুচিত, আমি তাঁদের দলে নই। বিধানসভায় প্রবেশ এবং মন্ত্রীত্ব গ্রহণের জন্য অবশ্যই ব্রিটিশরাজের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে হবে, কিন্তু চিরকালই আমার ধারণা, সে-শপথ নিছক সাংবিধানিক প্রথা। ১৯২২ থেকে ১৯২৫, যখন বিধানসভায় প্রবেশের প্রশ্ন নিয়ে জোর বিতর্ক চলছিল কংগ্রেস মহলে, বিরোধীপক্ষের যুক্তি, যে সেই প্রবেশের জন্য ব্রিটিশরাজের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ আবশ্যিক, আমার কখনই গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। মি. ডি ভ্যালেরা Dail-এ প্রবেশ করবার জন্য ব্রিটিশ রাজের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিলেন, তারপর সেই শপথের প্রথা লোপ করেছিলেন। তাঁর সে কাজে আমি অনৈতিক কিছু দেখি না। প্রশ্ন নীতির নয়, প্রয়োজনের, এবং আমি ও-সব প্রশ্ন দেখি বাস্তবমুখী দৃষ্টিকোণ থেকে।

পুর-প্রশাসনে আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমার মনে হয় প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য প্রয়োজন অসংখ্য খুঁটি-নাটির ওপর পরিপূর্ণ দখল। সেই কারণে প্রশাসনিক কাজে নিজেকে পুরোপুরি নিযুক্ত করলে বৃহত্তর বিষয়গুলিতে হাত লাগানোর সময় এবং শক্তি প্রায় থাকেই না। এ রকম লোক কদাচিৎ দেখা যায় যিনি প্রশাসনের পুঙ্খানুপুঙ্খ নিয়ে মাথা ঘামাতে পারেন এবং

একই সঙ্গে অধিকতর মৌলিক যে-সব সমস্যা তার কথাও চিন্তা করতে পারেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমি যখন ১৯২৪ সালে কলকাতা পুরসভার প্রধান কর্মসচিব ছিলাম পুর-প্রশাসনের খুঁটিনাটি কাজে এমন ভাবেই ডুবে গিয়েছিলাম যে কংগ্রেসের কোনও কাজ আমার দ্বারা হত না। কিন্তু সে কাজে আমি সব জেনে-শুনেই ঢুকেছিলাম, কারণ আমার ভরসা ছিল, পূর্ণ উদ্যমে কংগ্রেসের কাজ চালাবার মতো লোকের অভাব হবে না।

বরাবরই আমার ধারণা, স্বাধীনতার জন্য যারা লড়াই করবে, স্বাধীনতা লাভের পর 'যুদ্ধোত্তর' পুনর্গঠনের কাজও তাদেরই হাতে নিতে হবে। 'আমাদের ব্রত সমাধা হয়েছে', এই অজুহাতে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া চলবে না। অতএব কোনও রাজনৈতিক দল, যখনই সে সংগ্রামে জয়লাভ করবে, তার উচিত সব মন-প্রাণ দিয়ে প্রশাসন এবং সামাজিক পুনর্গঠনের কাজে নেমে পড়া এবং তার দ্বারা প্রমাণ করা যে সে যত ভাল ভাঙতে পারে, তত ভাল গড়তেও পারে। কিন্তু সে দায়িত্ব গ্রহণ করবার আগে রাজনৈতিক দলটিকে দেখতে হবে সেই কাঙ্খিত মুহূর্ত এসেছে কি না, স্বাধীনতার সংগ্রামে জয় এসেছে কি না। এখন আমাদের সামনে যে প্রশ্নটি উপস্থিত, সেটি হল, আমরা যার জন্য লড়াই করে আসছি Government of India Act 1935 কি আমাদের সে-বস্তু দিচ্ছে? এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয়টি এখনকার মতো বাদ দিলেও, প্রদেশে কি এই আইন প্রকৃত স্বায়ত্বশাসন দিচ্ছে? এ প্রশ্নের উত্তর অতি স্পষ্ট, 'না'।

অবশ্য এই যুক্তি দেখানো হবে যে যেমন সামরিক, তেমনি রাজনৈতিক যুদ্ধেও লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে-হতে যে কোনও সুবিধাজনক স্থান দখল করে নিয়ে আমাদের উচিত নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করা। খুব ঠিক। কিন্তু এ বিষয়ে কি আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, ক্ষমতার আসনের যতখানি মূল্য, সেইটুকুর জন্যই সে আসনটি দখল করে আমরা প্রশাসনের গোলকধাঁধায় আটকে পড়ব না, এবং যে কোনও রাজনৈতিক অগ্রগতি যেখান থেকে শুরু হয়, সেই বিদ্রোহের মনোভাব ত্যাগ করতে আরম্ভ করব না? স্পষ্টতই কংগ্রেস এখন একটা উভয়সংকটের মধ্যে পড়েছে। স্বাধীনতার যে-সংগ্রামে এখন পর্যন্ত অর্ধেক জয় ও লাভ করা হয়নি, তা চালিয়ে যেতে গেলে তার সমস্ত প্রথম সারির নেতাদের নিয়ে মন্ত্রীপদে যোগ দিলে চলবে না। পক্ষান্তরে প্রকৃতই সুযোগ্য ব্যক্তিরা যদি বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসি মন্ত্রী না হন, সংবিধান আমাদেরকে ক্ষমতার এবং প্রভাবের যে আসনে বসাচ্ছে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার আমরা করতে পারব না। কেবলমাত্র পরলোকগত ভি জে প্যাটেলের মতো প্রথম শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিভাই ভারতীয় আইনসভার প্রেসিডেন্ট হিসাবে ১৯২৫-৩০, জনসাধারণের দাবি তুলে ধরতে পেরেছিলেন, একটি সংসদীয় রীতির সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন এবং সরকার পক্ষের সদস্যদের তাদের অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করা থেকে নিবৃত্ত করতে পেরেছিলেন। তাঁর চেয়ে ছোট মাপের কোনও মানুষের পক্ষে সে-কাজ কখনই সম্ভব হত না। ভি জে প্যাটেলের পক্ষে সম্মুখম চেট্টি এবং আবদুর রহিমকে মনে হয় নগণ্য অমেরুদন্ডী জীব।

মন্ত্রিত্ব গ্রহণের যাঁরা পক্ষপাতী তাঁরা অবশ্য এ-যুক্তিও দেখাতে পারেন, এবং দেখাবেন যে কোনও রাজনৈতিক দলের পক্ষে প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং নতুন সংবিধানে সেই অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ আছে। কিন্তু এ-যুক্তির প্রয়োগে বাড়াবাড়ি করে ফেলা খুব সহজ। প্রশাসনের অভিজ্ঞতা আর সংগঠনের অভিজ্ঞতা একই এবং যে কোনও দলের পক্ষে শেষোক্ত অভিজ্ঞতা মূল্যবান হলেও প্রথমটি অসুবিধার কারণই হতে পারে। সর্ব দেশে সর্ব কালে যেমন, তেমনি যুদ্ধোত্তর ইউরোপেও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশাসকেরা, যখন তাঁরা পূর্বসূরীদের হাত থেকে প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, তখন তাঁরা বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ ছিলেন, প্রশাসনে অনভিজ্ঞ ছিলেন। লেনিন, স্ট্যালিন, হিটলার, মুসোলিনি, কামাল পাশার মতো সফল প্রশাসকদের কথা মনে করলেই আমার যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করা যাবে। প্রকৃতপক্ষে, একটি

বিপ্লবের পর (সে সহিংসই হোক আর অহিংসই হোক) নতুন প্রশাসনের জন্য প্রয়োজন হয় সম্পূর্ণ অন্য ধরণের নীতি ও কৃৎ-কৌশল, যাতে তাঁরা নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলায় সফল হতে পারেন। তার জন্য প্রয়োজন সাহস, কল্পনাশক্তি, উদ্ভাবনীশক্তি। সোভিয়েট রাশিয়ার পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত, তুরস্কে নয়া প্রজাতন্ত্র স্থাপন, ইটালির নতুন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, অরাজকতা, ভ্রষ্টাচারের মধ্যে থেকে নয়া পারস্য সৃষ্টি, এ-সব কি অভিজ্ঞ প্রশাসকেরা করেছিলেন?

এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠার কেন্দ্রীয় দুর্গটি (ভারত সরকার) এখনও ব্রিটিশদের দখলে, দূরের ঘাঁটি, অর্থাৎ প্রাদেশিক সরকারগুলিই শুধু আমাদের হাতে এসেছে, তাও পুরোপুরি নয়। এই পরিস্থিতিতে যদি আমাদের দলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রশাসনের খুঁটি-নাটির মধ্যেই ডুবে থাকতে চান, তাহলে মূল বিষয়গুলি ভুলে না গিয়ে, আমাদের প্রারম্ভের উদ্যম ও উৎসাহ না হারিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম কি আমরা চালিয়ে যেতে পারব?

পূর্বাহ্ণেই এ-প্রশ্নের উত্তর দিলে তার বিশেষ কোনও মূল্য থাকবে না, যথা সময়ে ঘটনাবলিই সঠিক উত্তর আমাদের জানিয়ে দেবে। কিন্তু মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পক্ষপাতীদের বিশ্বাস সঠিক বলে প্রমাণিত যদি হয়, আমাদের আগে থেকে জানা দরকার, এবং প্রস্তুত থাকা দরকার কী-কী দুর্দৈব অদূর ভবিষ্যতে ঘটতে পারে সে বিষয়ে, যার কথা প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে। কংগ্রেসের সর্বোচ্চ কার্যকারিণী যে প্রশ্নের মীমাংসা করেই ফেলেছে, তা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক আরম্ভ করা আজ আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু দেখতে চাই, স্বাধীনতা লাভের লক্ষ্যের দিকে যদি আমরা অগ্রসর হতে চাই, এবং নতুন সংবিধানের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে চাই, পথের কী-কী বিপদ সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত।

একজন ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিজ্ঞর সামনে বড়-বড় যে সব সমস্যা আসবে, সেগুলো হল দারিদ্র্য, বেকারত্ব, ব্যাধি এবং নিরক্ষরতা। সে-সব সমস্যার সমাধান করতে পারে একমাত্র একটি জাতীয় সরকার যার হাতে থাকবে যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ। সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টা করতে গেলে আমাদের প্রয়োজন হবে প্রয়োজনীয় সংগঠন ও আর্থিক সঙ্গতি। বড় আকারে জাতীয় পুনর্গঠনের কাজ হাতে নেওয়ার মতো সংগঠন ও অর্থ কি বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসি মন্ত্রীরা হাতে পাবেন? সংগঠনের প্রশ্ন, বলতে হয়, উচ্চতর পদগুলিতে প্রধানত ব্রিটিশরা অধিষ্ঠিত, যাঁরা সম্পূর্ণ অন্য ধারায় তৈরি হয়ে উঠেছেন, এবং যাঁরা এ বিষয়ে সর্বদাই সচেতন থাকবেন, যে তাঁদের বেতন, পেনশন সংবিধানের দ্বারা সুরক্ষিত, মন্ত্রীদের তার ওপরে কোনও হাত নেই। যে-সব নতুন নীতি কংগ্রেসি মন্ত্রীদের প্রবর্তন করতে হবে, সেই কর্মসচিবেরা কি তার অনুসরণ করে চলবেন? যদি না চলেন, মন্ত্রীদের ভাগ্যে কী ঘটবে? উদ্দেশ্য তাঁদের যতই মহৎ হোক, আমলাতন্ত্রের তরফ থেকে অনবরত বাধা পেতে থাকলে তার সঙ্গে লড়াই করে তাঁরা কি জিততে পারবেন? উচ্চতর পদে আমলাদের অদলবদল তাঁরা করতে পারবেন না, কারণ সেই কর্মসচিবেরা 'সংরক্ষিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত', মন্ত্রীদের নাগালের বাইরে, কাজেই তাঁদের নিয়েই মন্ত্রীদের যা পারেন তাই করা হবে, মন্ত্রীরা যদি দেখেন তাঁদের কাজ কর্মসচিবদের প্রতিবন্ধকতার ফলে বানচাল হয়ে যাচ্ছে, তবুও। আবার, কোনও-কোনও প্রদেশে এমন অদ্ভুত পরিস্থিতিও দেখা দেবে কংগ্রেসি সরকার প্রধানত চালাবেন ব্রিটিশ কর্মসচিবরা, এবং সেই কর্মসচিবদের এতদিন যাঁরা অনুগ্রহভাজন ছিলেন, তাঁরা।

আর দুরূহ হয়ে উঠবে আর্থিক সমস্যা। কংগ্রেস দল এমন কতগুলি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছে, যার ফলে সরকারি রাজস্বে হাত পড়বে, এবং তার ফলে বৃহদাকারে জাতি-গঠনের কাজ আরম্ভ করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য হবে। ভূমি রাজস্ব হ্রাস এবং আবগারী ক্ষেত্রে, মদ্যপান নিষিদ্ধ করার নীতির প্রবর্তনের ফলে, মন্ত্রীকে বাজেট ঘাটতির মুখেও পড়তে হতে পারে। অন্য কোনও দেশ হলে অর্থমন্ত্রী অবিলম্বে ব্যয় হ্রাসের ব্যবস্থা করতেন। ভারতের বিভিন্ন

প্রদেশে উচ্চতর পদের বেতন ইত্যাদিতে হাত দেওয়া চলবে না, এবং অন্যান্য পদের বেতন এত কম যে সেখানে অর্থ সাহায্যের কোনও সুযোগ নেই অতএব এক্ষেত্রে ব্যয়সংকোচনের প্রশ্ন ওঠে না। সৈন্যবাহিনী, রেলপথ, ডাক-তার, শুল্ক ইত্যাদি যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয়, ও-সব কোনও বিভাগে ব্যয়সংকোচ কিংবা আয়-বৃদ্ধিও সম্ভব হবে না। মুদ্রাস্ফীতির সাহায্যে যে অতিরিক্ত অর্থের সংস্থান করবে, কোনও প্রাদেশিক সরকারের সে ক্ষমতাও নেই, যদিও ভারতের স্বর্ণ ভান্ডার বৃহৎ, সে কাজ সহজেই করা যায়, কেননা মুদ্রাও কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয়। এই অবস্থায় কোনও প্রাদেশিক সরকার একমাত্র যা করতে পারে, তা হল বিভিন্ন জাতি-গঠনমূলক কাজের জন্য বৃহদাকার ঋণ গ্রহণ। কিন্তু সে-রকম ঋণ রাজ্যপাল কি প্রাদেশিক বিধানসভার অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করবেন? এবং লর্ড লিনলিথগোর প্রতিক্রিয়াশীল কেন্দ্রীয় সরকার কি তা মঞ্জুর করবে, যেখানে সংবিধান অনুযায়ী সে রকম মঞ্জুরির প্রয়োজন হবে? তা যদি না করা হয়, কংগ্রেসি মন্ত্রীরা দেখবেন, সামনে হতাশা ছাড়া কিছু নেই।

এই সব কথা মনে রেখে দেখা যাক প্রকৃত কী ভাল কাজ কংগ্রেসি মন্ত্রীরা করতে পারেন। প্রথমত, তাঁরা রাজবন্দিদের মুক্তি দিতে পারেন, দমনমূলক আইন ও অধ্যাদেশগুলি বাতিল করতে পারেন, জনসাধারণকে অধিকতর স্বাধীনতা দিতে পারেন। দ্বিতীয়ত, তাঁরা প্রাদেশিক প্রশাসনে একটা নতুন মানসিকতার, স্পিরিটের সঞ্চার করতে পারেন, সব শ্রেণির সরকারি কর্মচারীর মধ্যে, বিশেষ করে পুলিশের মধ্যে জনসেবার এক নতুন মান স্থাপন করতে পারেন। বর্তমান কর্মসচিব ও কর্মীদের কাছ থেকে তাঁরা বেশি কাজ আদায় করতে পারেন, প্রশাসনের মান উন্নত করতে পারেন। তৃতীয়ত, কংগ্রেসের গঠনকর্মে তাঁরা শক্তি সঞ্চার করতে পারেন যেখানেই সম্ভব সরকারি সহযোগিতা প্রদান করে। চতুর্থত, স্বদেশী শিল্পকে, বিশেষত খাদিকে (হাতে কাটা ও হাতে বোনা বস্ত্র) উৎসাহ দিতে পারেন সরকারের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করবার সময়ে দেশী দ্রব্যকে আমদানি করা বস্তুর ওপরে অগ্রাধিকার দান করে। পঞ্চমত, বিভিন্ন বিষয়ে (যথা, সমাজকল্যাণ, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি) কাঙ্খিত আইন প্রণয়ন করতে পারেন, বিশেষত যখন সেই আইনের ফলে ব্যয়বৃদ্ধি ঘটবে না। ষষ্ঠত, সুনির্বাচিত ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে তাঁরা প্রদেশে জাতীয়তাবাদী শক্তিসমূহকে শক্তিশালী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহকে দুর্বল করতে পারেন। সপ্তম, তাঁরা প্রদেশগুলির ব্যাপক অর্থনৈতিক সমীক্ষা করতে পারেন, যার উদ্দেশ্য হবে জনসাধারণের সম্পদ, তাদের করযোগ্যতা, এবং বেকারত্বের পরিমাণ নির্ণয় করা। অষ্টমত, কোনও-কোনও বিভাগে তাঁরা কিছু-কিছু ছাঁটাই করতে পারেন। নবমত, তাঁদের সরকারি পদের ব্যবহার করে, তাঁরা কেন্দ্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন রোধ করতে পারেন। সব শেষে (এ কাজও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়) নিজেদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তাঁরা অন্য পাঁচ প্রদেশের অকংগ্রেসি মন্ত্রীসভাগুলির ওপর সুস্থ প্রভাব বিস্তার করতে পারেন।

তবে, যাই হোক, এ-সবই ছোটখাটো সংস্কার। কিছু কালের জন্য তাতে লোক সন্তুষ্ট থাকতে পারে, বেশি দিন নয়। এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই মৌলিক সমস্যাগুলি, অর্থাৎ দারিদ্র, বেকারত্ব, ব্যাধি, নিরক্ষরতা ইত্যাদি গুরুতর আকার ধারণ করবে, আশু সমাধানের দাবি উঠবে। কেন্দ্রে প্রতিক্রিয়াশীল সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারের আর্থিক অসচ্ছলতা এই অবস্থায় সে-দাবি কি কংগ্রেসি মন্ত্রীসভাগুলি সামলাতে পারবে? দারিদ্র এবং বেকারত্বের লাঘবের জন্য প্রয়োজন কৃষিতে উন্নতি এবং জাতীয় শিল্পসমূহের পুনরুজ্জীবন, এবং তার সঙ্গে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ও ঋণগ্রহণের সুবিধার দ্রুত প্রসার। এর সব কিছুর জন্যই দরকার অধিকতর অর্থ। ব্যাধি নির্মূল করতে, এক দিকে প্রতিষেধক ও চিকিৎসা ব্যবস্থা, অন্য দিকে খেলাধূলা এবং শরীর-চর্চা প্রসার ঘটানোর জন্য চাই প্রচুর অর্থ। এবং নিরক্ষরতা দূর করার জন্য আগে চাই বিনা ব্যয়ে এবং

বাধ্যতামূলকভাবে ছোটদের এবং বয়স্কদের জন্য শিক্ষা, যা সম্ভব হবে একমাত্র তখনই যখন মন্ত্রীদের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ থাকবে।

এই সব মৌলিক সমস্যা, যার সন্তোষজনক সমাধান আজকের অগ্রগণ্য কোনও জাতিও করতে পারেনি, ভারত তার সমাধান একমাত্র তখনই করতে পারবে যখন দিল্লিতে ক্ষমতায় থাকবে জনগণের নির্বাচিত কোনও সরকার এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের মধ্যে থাকবে সর্বাত্মক সহযোগিতা। এবং, এও আমার দৃঢ়বিশ্বাস, যে ভারতের মতো একটি পশ্চাদপদ এবং দরিদ্র দেশ, যাকে অনেকটা নষ্ট সময় পুষিয়ে নিতে হবে, তার আর্থিক প্রয়োজন চিরাচরিত সাবেকি অর্থনৈতিক পথে মিটতে পারে না। অতএব মনশ্চক্ষে আমি স্পষ্ট দেখতে পারি অদূর ভবিষ্যতে কী ঘটবে—কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি তাদের ছোটখাটো সংস্কারের কর্মসূচি যখন প্রায় সম্পন্ন করে এনেছে, তখন বুঝবে আর অগ্রগতি দিল্লিতে নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠিত না হলে, যত দিন ক্ষমতা পুরোপুরি দেশবাসীকে হস্তান্তরিত না হচ্ছে, সম্ভব নয়।

কিন্তু এ কথাও ভাবা ভুল হবে যে সে-পর্যন্ত কংগ্রেসি মন্ত্রীসভা তাদের কাজকর্ম নির্বিঘ্নে চালাতে পারবে। সরকারি কাজে যে দুটি অসুবিধা তাদের পদে-পদে ভোগ করতে হবে, তার কথা আগেই বলেছি, অর্থাভাব এবং উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিতদের বিশেষ ক্ষমতাবলি। প্রথম বক্তব্যটির বেশি ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন, দ্বিতীয়টির দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। তার একটি ভারতীয় চিকিৎসা পরিষেবা। পুরনো ব্যবস্থায় ভারতীয় চিকিৎসা পরিষেবা (Indian Medical Service)-য় ব্রিটিশ ছিলেন ৩৮৬ জন ও ভারতীয় ২৬৩ জন। নতুন ব্যবস্থায় ব্রিটিশদের সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকবে, কিন্তু ভারতীয়দের সংখ্যা কমিয়ে করা হবে ১৯৮, এবং তাঁদের মধ্যে ৫৮জন কর্মসচিব থাকবেন স্বল্পকালীন কমিশনে (Short Service Commission)। IMS কর্মসচিবদের মূল বেতন ভবিষ্যতে কমানো হবে, কিন্তু সে-ক্ষতি ব্রিটিশদের ক্ষেত্রে পুষিয়ে দিয়ে আরও বেশি কিছু দেওয়া হবে, তাঁদের, বিদেশ বাসের ভাতা বৃদ্ধি করে। IMS-এর ভারতীয় সদস্যরা অবশ্য সে ভাতা পাবেন না। অর্থাৎ, নতুন ব্যবস্থায়—ব্রিটিশ সদস্যদের তুলনায় IMS-এর ভারতীয় সদস্যদের অবস্থা, আজকে যা আছে, তার চেয়ে খারাপ হবে। অবস্থা আরও শোচনীয় হবে এই কারণে, যে দেশের সবচাইতে ভাল জেলাগুলি এবং মেডিক্যাল কলেজের সর্বশ্রেষ্ঠ পদগুলি ব্রিটিশদের জন্য সংরক্ষিত হবে। এই অবস্থার জন্য দায়ী কংগ্রেসি মন্ত্রীরা হবেন না, শিক্ষিত লোক, যাঁরা এ সব বিষয়ে খোঁজ-খবর রাখেন, তাঁরা কংগ্রেসি মন্ত্রীদের অসহায়তা বুঝতে পারবেন, ঠিকই। সাধারণ লোক কিন্তু উচ্চতর পদগুলিতে ভারতীয়দের বসানোর কিংবা এখন যাঁরা সে-সব পদে বসে আছেন তাঁদের অত্যধিক বেতনাদি হ্রাস করায় ব্যর্থতার দায় থেকে কংগ্রেসি মন্ত্রীদের অব্যাহতি দেবে না। ছ'টি প্রদেশে কংগ্রেসি মন্ত্রীদের অবস্থার মধ্যে অসঙ্গতি থেকে যাবে। নামে তাঁরা IMS কর্মসচিবদের ওপর কর্তৃত্ব লাভ করবেন, কিন্তু তাঁদের একটি বিশেষ ক্ষমতাতেও মন্ত্রীরা হাত দিতে পারবেন না। প্রশাসনের অন্যান্য বিভাগের অবস্থাও IMS-এর মতোই হবে।

ছ'টি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভারই ভবিষ্যৎ যদি এই হয়, অন্য পাঁচটি প্রদেশে, যেখানে মন্ত্রীদের অধিকাংশই হবেন মেরুদন্ডহীন প্রাণী, যাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা মন্ত্রিত্ব বজায় রাখা, সেখানে মন্ত্রীরা কী রকম কাজ দেখাতে পারবেন, সহজেই অনুমান করা যায়। যেমন, বঙ্গদেশে গত চার মাসে মন্ত্রীসভার কৃতিত্ব, কিংবা অকৃতিত্ব থেকেই ভবিষ্যতের আভাস পাওয়া যেতে পারে। যে কোনও প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের যেটা ছিল প্রথম কর্তব্য অর্থাৎ রাজবন্দিদের মুক্তিদান, সেটা করবার সাহসই তাঁরা এ পর্যন্ত সঞ্চয় করে উঠতে পারলেন না। তা হলে দুরূহ যে পাট সমস্যা, যার সন্তোষজনক সমাধানের ওপর অন্তত তিন কিংবা চার কোটি লোকের মঙ্গলামঙ্গল, আর্থিক সচ্ছলতা নির্ভর করবে, তার সম্বন্ধে সে মন্ত্রীসভার কাছ থেকে কী আশা করা যায়?

মনে পড়ছে, ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমি যখন ডাবলিনে ছিলাম, কৃষি এবং শিল্প মন্ত্রীদের সঙ্গে আমি খানিকটা একই ধরনের সমস্যা, আইরিশ ফ্রী-স্টেট-এ বীট চাষ, চিনির কলগুলির প্রয়োজনের তুলনায় বেশি বাড়তে না দেওয়া, এবং সে-দেশে উৎপন্ন চিনি বাজার জাত করার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তখন আমি উপলব্ধি করেছিলাম, বঙ্গদেশের পাট-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান কত সহজেই করা যেতে পারত, শুধু যদি কলকাতা এবং দিল্লিতে জাতীয় এবং গণতান্ত্রিক সরকারের শাসন থাকত। আমার বিশ্বাস, বঙ্গদেশে একটি জনপ্রিয় সরকার সংবিধানের সীমার মধ্যে থেকেও পাট-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের জন্য অনেক কিছু করতে পারে, যদি কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে লড়াই করবার সাহস তার থাকে, যদিও পাটচাষিদেরকে অর্থ যোগানোর জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হলে তখন তার কাজ বাধাপ্রাপ্ত অবশ্যই হবে, তবে, বর্তমান প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রীসভা অবশ্য কিছুই করতে পারবে না। তার যোগ্যতারও অভাব, সাহসেরও অভাব।

তা হলে কি আমাদের এই সিদ্ধান্ত করতে হবে যে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে তেমন কিছুই কাজ হবে না। অবশ্যই নয়। যদিও অধিকাংশ কংগ্রেসি আজকাল যেমন মনে করেন, কংগ্রেসি মন্ত্রীরা সুদূর-প্রসারী সংস্কার সাধন করতে পারবেন, আমি তা মনে করি না। তা হলেও আমি বিশ্বাস করি, মন্ত্রিত্ব গ্রহণের নীতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। কিন্তু তার জন্য আমাদেরকে সজাগ থাকতে হবে, দেখতে হবে যেন কংগ্রেস অধঃপতিত হয়ে Liberal League-এর একটি রাজসংস্করণ হয়ে না দাঁড়ায়। কংগ্রেসের ভিতরেই এমন লোকের অভাব নেই যাঁরা সুযোগ পেলে আরামদায়ক সাংবিধানিক পথ অবলম্বন করতে চাইবেন।

মন্ত্রিত্বগ্রহণের বড় লাভ এই হবে, জনসাধারণের মনে তার ফলে বিশ্বাস জন্মাবে, কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী, এবং সময় হলে সমগ্র সরকারি যন্ত্রটি কংগ্রেসের হাতে চলে যাবে। মানসিকতার দিক থেকে এতে অপরিমেয় লাভ হবে, এবং আমার মতে তার মূল্য, কংগ্রেস মন্ত্রীদের অনুগ্রহে আমাদের ভাগ্যে বৈষয়িক লাভ যদি কিছু জোটে, তার চেয়ে অনেক বেশি। দ্বিতীয়ত, যে-সব কংগ্রেসি দুর্বলচিত্ত, তাঁরা যদি একবার ক্ষমতার স্বাদ পান, দুঃখভোগ এবং আত্মত্যাগ যে-সব কাজে দরকার সে কাজেও তাঁদের উৎসাহ বাড়বে, তাঁদের নিজেদের ওপর আস্থাও বাড়তে পারে। তৃতীয়ত, এর ফলে কংগ্রেস যুক্তরাষ্ট্রের প্রবর্তনে বাধা দিতে পারবে, শুধু বাইরে থেকে নয়, প্রাদেশিক সরকারের মাধ্যমেও। এবং এই দ্বিবিধ প্রতিরোধের ফলে, শেষ পর্যন্ত যদি যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনার বিনাশ হয়, কংগ্রেসের সেটি হবে আরেকটি কৃতিত্ব।

পরিশেষে (কিন্তু এর মূল্যও কম নয়), মন্ত্রিত্ব গ্রহণের দ্বারা কংগ্রেস তার নিজের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা থেকে ভারতবাসীকে এবং বিশ্ববাসীকে দেখাতে পারবে যে ১৯৩৫-এর সংবিধানের মধ্যে থেকে সুদূরপ্রসারী সামাজিক পুনর্গঠনের সুযোগ সামান্যই। এই অভিজ্ঞতার ফলে কংগ্রেস এবং দেশ মানসিকভাবে দিল্লি ও কলকাতার ক্ষমতার দুর্গে শেষ আঘাত হানবার জন্য প্রস্তুত হবে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি অতিশয় খুশি হব যদি ওই চতুর্বিধ সুফল মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে পাওয়া যায়। আমরা যারা নীতি হিসাবে মন্ত্রিত্ব গ্রহণে বিশ্বাস করি না, কিন্তু বাস্তব ঘটনা হিসাবে তাকে মেনে নিতে বাধ্য, তাদের উচিত আমাদের দেশবাসীকে সতর্ক করে দেওয়া, কোনও-কোনও কংগ্রেস নেতা যাঁরা হয়তো ভবিষ্যতের জন্য স্থিরীকৃত নীতি হিসাবে সাংবিধানিক পথ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাঁরা কংগ্রেস মন্ত্রীসভা সমূহের জন্য দশ-বার্ষিক কার্যক্রমের কথা তার ওপর যেন ভরসা না রাখেন।

সুখের বিষয়, সর্বোচ্চ কংগ্রেসি নেতারা, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখ শুধু মন্ত্রিত্বের পদ থেকেই নয়, আইনসভা থেকেও দূরে আছেন। এতে এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়, যে সংসদীয় ক্রিয়াকলাপের গোলকধাঁধায় কংগ্রেস পথভ্রষ্ট হবে না, এবং তার ফলে একটি নিছক সাংবিধানিক দলেও পর্যবসিত হবে না। (আমি 'সাংবিধানিক' শব্দটি সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করছি।) তাঁরা দেখবেন, কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি নিজেদের অধিকারের বাইরে যেন না যান, এবং কংগ্রেস হাই কমান্ড-এর নির্দেশ পালন করেন। সর্বোপরি, মহাত্মা গান্ধী, যিনি সাময়িকভাবে তাঁর অবসরগ্রহণ সত্ত্বেও সদা জাগ্রত আছেন, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে প্রত্যেকটি ঘটনা লক্ষ করে যাচ্ছেন, তাতেই সকলে বুঝতে পারবেন যে সে-রকম পরিস্থিতির উদ্ভব হলে (হওয়ারই সম্ভাবনা) তিনি পথে বেরিয়ে আসতে দ্বিধা করবেন না, কংগ্রেসকে ডাক দেবেন সাংবিধানিক কাজকর্ম বর্জন করতে, উত্তোলন করবেন গণ সত্যাগ্রহের পতাকা, যাতে ভারতের 'পূর্ণ-স্বরাজের' দাবিতে কংগ্রেস তার শেষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারে।

কলকাতা*

কলকাতার প্রাক্তন মেয়রের অভ্যর্থনা
শ্রীসুভাষ বোসের প্রতি জনগণের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন

বন্ধুগণ,

আপনাদের স্নেহ ও আন্তরিকতা যে-ভাবে আপনারা প্রকাশ করলেন, তাতে আমি অভিভূত। আপনাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা কীভাবে ব্যক্ত করব জানি না, এবং তার ভাষা যদি এই মুহূর্তে আমার মুখে না জোগায়, সে-দোষ পুরোপুরি আমার নয়। রাজনৈতিক জীবনে আমি যে দুঃখ ভোগ করেছি, যা-কিছু আমি করতে পেরেছি, আপনারা তার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ কথা যদি আমি বলি তা হলে বিনয় করা হবে না, যে প্রকৃত কাজ আমি বিশেষ কিছুই করে দেখাতে পারিনি। আমি একজন সৈনিক মাত্র, একদণ্ড কোথাও স্থির হয়ে থাকি না। আমাদের লক্ষ্য এখনও আমরা জয় করতে পারিনি, আমাদের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, কণ্টকাকীর্ণ। আমাদের দীর্ঘ ক্লান্তিকর যাত্রার পথে আমাকেও দুঃখ ভোগের একটা অংশ বহন করতে হয়েছে; কিন্তু আমাদের জাতীয় সৈনিক দলে কাকে তা করতে হয়নি? আর, দেশের জন্য যাঁরা সর্বস্ব দিয়েছেন আমি তাঁদের তুলনায় এমন কী কষ্ট ভোগ করেছি?

১৭ মার্চ যেদিন হঠাৎ আমি মুক্তি পেলাম, সঙ্গে আমার তাঁদের কথা মনে হল যাঁরা বছরের পর বছর কারান্তরালে বাস করছেন, কিংবা শৃঙ্খলিত হয়ে আছেন অন্যভাবে, বিধিনিষেধের দ্বারা। আমি তাঁদের সঙ্গে একই দুঃখের পেয়ালা থেকে পান করেছি, তাদের প্রিয়জনদের চোখে অশ্রু দেখেছি, এটাই কি যথেষ্ট নয়, আমার অন্তরের বেদনা গভীর করবার জন্য? কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজে আমার পাশের কেবিনেই আমাদের সদাজাগ্রত পুলিশের কড়া নজরের মধ্যে একজন রাজবন্দির মৃত্যু হল এবং আমাদের পবিত্র নদীর তীরে

* ৬ এপ্রিল ১৯৩৭, কলকাতায় একটি জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ। দ্য ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট-এ প্রকাশিত।

তার দেহ ভস্মীভূত হওয়া পর্যন্ত সেই পুলিশ তার সঙ্গ ছাড়ল না। অতএব আপনারা বুঝতে পারছেন কেন আজ আমার অন্তর ভারাক্রান্ত, কেন আমি সময় হলে, আমাদের হৃদয়হীন প্রশাসনযন্ত্রের যারা বলি তাদের প্রতি আপনাদের অন্তরে গভীরতর সহানুভূতি জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করব।

উন্মুক্ত নীল আকাশের নীচে দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ বছর পরে আবার আমি আপনাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। শেষ যখন আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছিলাম তারপর হুগলি দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে, আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে ভালমন্দ অনেক কিছু ঘটেছে। অতীত স্মৃতির একটা ঝড় আমার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, তার কিছু প্রিয় কিছু অপ্রিয়। সবচেয়ে বেদনাদায়ক যে চিন্তা তা হল ভারতমাতার সর্বশ্রেষ্ঠ ক'টি সন্ধান, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সভাপতি ভি. জে. প্যাটেল, ড. এম. এ. আনসারি, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ শাসমল এবং আরও অনেকে আর আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু যদিও তাঁরা এ-জীবন থেকে বিদায় নিয়েছেন একটি অনুপ্রেরণা, একটি বার্তা তাঁরা রেখে গিয়েছেন, তাঁদের জীবনের যা সাধনা তা আমরা যেন এগিয়ে নিয়ে যাই, তাকে পূর্ণ করি। দেশের এই অংশে অন্যকিছুর চেয়ে অবশ্য বেশি অনুভূত হবে দেশপ্রিয় সেনগুপ্তের অভাব। তাঁর নেতৃত্ব হারিয়ে বঙ্গদেশ আজ দুর্ভাগ্যের অন্ধকারে আচ্ছন্ন এক প্রদেশ, এবং তাঁর আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত, গভীর বেদনাদায়ক মৃত্যুতে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হল, আংশিকভাবেও তা পূরণ করতে আপনাদের সমস্ত শক্তি, সমস্ত সামর্থ্য একত্র করতে হবে।

বঙ্গদেশে, এবং দেশের অন্যত্র, ঘরে-ঘরে সরকারি যন্ত্রের দমন পীড়নের ফলে মানুষের যে দুর্ভোগ, যন্ত্রণা, তা ছাড়াও আমি দেখেছি শ্রমজীবীদের ও কৃষকদের আর্থিক অবস্থার গত পাঁচ বছরে বিশেষ অবনতি হয়েছে। তার প্রকাশ দেখা যাচ্ছে সভা, মিছিল ইত্যাদিতে, ধর্মঘটে। যেমন, বঙ্গদেশে পাটশ্রমিকদের ধর্মঘট যাতে, আমি শুনেছি, অন্তত ৮০,০০০ জন শ্রমিক যোগ দিয়েছেন। আমার অন্তঃকরণ তাঁদের প্রতি সহানুভূতিতে পূর্ণ, রুটি-রুজির, কাজের তাদের যে মৌলিক দাবি, সেই দাবি পূরণের জন্য এই শোষিত শ্রমিকরা অহিংস সংগ্রামে রত।

আমি অতিশয়োক্তি করছি না, কারাবাস দেশান্তরী ও বন্দিত্বের পর আপনাদের মধ্যে ফিরে এসে আমার নিজেকে মনে হচ্ছে রাজনৈতিক রিপ ভ্যান উইংকল-এর মতো। কাজেই আপনাদের আমাকে একটু সময় দিতে হবে ছিন্ন সূত্রগুলো আবার জোড়া দিতে, নিজের অবস্থানটা ঠিক মতো বুঝে নিতে ও তারপরে ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে। তারপর আমার বর্তমান স্বাস্থ্যের অবস্থার কথা আপনারা জানেন, জানেন যে নিজের স্বাভাবিক কাজকর্মে ফিরে যাওয়ার মতো স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে আমার কয়েকমাস লাগবে। এ বিষয়েও আপনারা আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করবার আগে আমার নিজের এবং আমাদের সকলের যে অভিন্ন উদ্দেশ্য তার জন্য, উচিত হবে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করা। দেশ আবার নেতৃত্বের জন্য তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। আমাদের সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং অন্য প্রধান নেতাদের সঙ্গেও আলোচনা করতে হবে। অতএব আজকের দিনে যে-সব জ্বলন্ত প্রশ্ন, তার সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ বিবৃতি দান ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত না রেখে আমার উপায় ছিল না।

বিগত, বছরে আমার প্রচুর অভিজ্ঞতা হয়েছে, আমি অনেক কিছু শিখেছি, এবং বোধহয়, আগে যা শিখেছিলাম তার অনেক কিছু ভুলেছি। এক দিক থেকে বর্তমান সরকারের কাছে আমি কৃতজ্ঞ কারণ তারা এমন-এমন জায়গায়, এমন-এমন অসুখকর অবস্থায় মধ্যে আমাকে রেখেছেন যা আমি পারলে পরিহার করতাম। কিন্তু তার ফলে আমি যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করেছি আধুনিক জগৎ সম্পর্কে। আমার বিশ্বাস, এখন আমার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহের সম্পর্কে যে অন্তর্দৃষ্টি আমি লাভ করেছি, এবং আধুনিক ইউরোপের শ্রেষ্ঠ

মনীষীদের কয়েকজনের সঙ্গে আমার সে সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। তার ফলে, আমার মনে হয় বিশ্বজনীন ব্যাপারসমূহ এবং ভারতীয় সমস্যাবলি এখন আমি সঠিকভাবে দেখতে সক্ষম।

ভারতের যে কোনও সমস্যার যে সমাধানের কথাই আমাদের মনে হোক, কতকগুলি ধারণার বিষয়ে আমাদের মধ্যে কোনও মতভেদ থাকা উচিত নয়। আমাদের সকলেরই উপলব্ধি করা দরকার যে আজকের পৃথিবী এক এবং অখণ্ড, এবং ভারতের ভাগ্য অবশিষ্ট জগতের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত। অতএব ভারতের আন্দোলনের রণকৌশল স্থির করবার আগে আজকের এবং আগামীকালের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, সাম্রাজ্যবাদ, যে কোনও রূপ ধরেই তা আসুক না কেন, অন্যদের স্বাধীনতার পক্ষে এবং আধুনিক বিশ্বের শান্তির পক্ষে বিপজ্জনক। সাম্রাজ্যবাদ কোথাও গণতন্ত্রের ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারে, যেমন পশ্চিম ইউরোপে, কোথাও ফ্যাসিবাদের একনায়কতন্ত্রী পোশাক পরতে পারে, যেমন মধ্য ইউরোপে। কিন্তু আমরা যারা স্বাধীনতা-প্রেমী, শান্তির পক্ষপাতী তাদের সেই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেই হবে।

তৃতীয়ত, ভারত বহির্বিশ্বের মতো নয়, ভারত এক অখণ্ড দেশ, তার বিভিন্ন প্রদেশ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে একই পতাকার তলায় একই নীতির অধীন সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে, যদি আমাদের দেশবাসীকে দ্রুত অধীনতা-পাশ থেকে মুক্ত করতে হয়। বিভেদ সৃষ্টির যে-সব প্রবণতা, প্রাদেশিক কিংবা গোষ্ঠীগত, এক পরাধীন জাতির পক্ষে তাকে বৃহত্তম অভিশাপ বলে বিবেচনা করা উচিত, এবং স্বাধীনতা-প্রেমী মাত্রেরই উচিত এমন এক ব্যাপক আর্থ-সমাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করা যা দেশবাসীর বন্ধন-মোচন করবে, যা প্রাদেশিক ও গোষ্ঠীগত ভেদাভেদ অতিক্রম করে যাবে।

চতুর্থত, আমাদের রণ-কৌশলের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত শ্রমজীবী কৃষক ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর এক ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ফ্রন্টের ভিত্তি স্থাপন করা ও তাকে মজবুত করা। আজকের দিনে সর্বপ্রথম প্রয়োজন আমাদের লক্ষ লক্ষ নিরন্ন পদানত দেশবাসীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ছত্রতলে দেশের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তি সমূহের এক ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট। এবং এ কথাও ভুলে গেলে চলবে না, আমাদের সংগ্রাম যেন অহিংস অসহযোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

আজই আমি আমার ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা জানাতে পারছি না ঠিকই, তবে এটা আমি আপনাদের কাছে পরিষ্কার করে বলতে চাই যে আগামী দিনে আমার সময় এবং শক্তির একটি বড় অংশ সর্বভারতীয় সমস্যা এবং কর্মোদ্যোগে ব্যয় করব মনস্থ করেছি। আমাদের মুক্তি, তা সে রাজনৈতিক হোক আর সামাজিকই হোক, নির্ভর করবে, বৈদেশিক প্রভুত্ব এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের ওপর। একটি প্রদেশের কাজেই ডুবে থেকে দেশের অন্যান্য অংশে আমাদের যে কর্তব্য তা অবহেলা করা চলবে না। সর্বভারতীয় বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েও বঙ্গদেশের বিষয়ে যত্নশীল হয়তো আমি হতে পারব, কিন্তু সেটা নির্ভর করবে বিশেষ কতকগুলি শর্তের ওপর। প্রথমত, বিভিন্ন গোষ্ঠীর কর্মীরা, যাঁরা এতদিন অর্থহীন অন্ধকলহে লিপ্ত আছেন, তাঁদের নিজেদের অতীতের বিবাদ-বিসংবাদ ভুলে যেতে হবে, গোষ্ঠী মানসিকতার ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। একটি অভিন্ন আর্থ-সামাজিক কর্মসূচির ভিত্তিতে বঙ্গদেশকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, শুধু যে কংগ্রেসের সমস্ত গোষ্ঠীকেই ঐক্যবদ্ধ করবে, তা নয়, হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণকেও একসঙ্গে মেলাবে। সে-একতা একমাত্র আমাদের অতীতের বিবাদ-বিসংবাদের সমাধির ওপরই নির্মাণ করা সম্ভব হয়, ওইসব গোষ্ঠীকে মাটির তলায় অনেক গভীরে কবরস্থ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, বঙ্গদেশকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব অনুসরণ করতে হবে, নীতির ক্ষেত্রে পন্থার ক্ষেত্রে তা থেকে বিচ্যুত হলে

চলবে না। তৃতীয়ত, বঙ্গদেশে কংগ্রেসের কাজ সক্ষমভাবে চালাবার জন্য যথেষ্ট অর্থের ব্যবস্থা করতে হবে। চতুর্থত, কলকাতা পুরসভা, হাওড়া পুরসভা এবং অন্যান্য স্থানীয় সংস্থার সম্পর্কে কংগ্রেসের নীতি, বিগত পাঁচ-ছ'বছরে ওই সব সংস্থার কংগ্রেসের কাজের আলোকে পুনর্বিবেচনা করতে হবে। বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির কাজ আমি হাতে নিতে পারব কি না, সে-বিষয়ে একমাত্র আমার সক্রিয় কর্মক্ষেত্রে ফিরে আসার পরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হবে। ইতিমধ্যে আমি চাই, বঙ্গদেশে আমার বন্ধু এবং সহকর্মীরা সবাই ভেবে দেখুন, প্রাদেশিক ব্যাপারে আমার সহযোগিতা যদি তাঁরা চান, আমি এখন যে-সব কথা বললাম, তার আলোকে বঙ্গদেশে কংগ্রেসের সংগঠন এবং কার্যসূচির মৌলিক পরিবর্তন সাধনের জন্য তাঁদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

বন্ধুগণ, আজ সন্ধ্যায় আপনারা আমার প্রতি যে আন্তরিক প্রীতি প্রদর্শন করলেন তার জন্য অন্তরের অন্তস্তল থেকে আমি আবার আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আজকের অনুষ্ঠান দীর্ঘকাল আমার মনে থাকবে, দুঃখ-দুর্ভোগের সময়ে অনুপ্রেরণা যোগাবে। প্রতিদান দেওয়ার মতো আমার কিছুই নেই। আমি শুধু দেশমাতার সেবায়, তাঁর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য আবার আমার সর্বস্ব পণের অবিচল সংকল্প ঘোষণা করতে পারি। আমার স্বদেশবাসীর আশীর্বাদ ও শুভকামনা কখনও নিষ্ফল হতে পারে না এবং আমি আশা করছি কয়েক মাসের মধ্যে আমি আবার সুস্থ হয়ে উঠে—আমার স্বাভাবিক জীবন ও কার্যকলাপ আরম্ভ করতে পারব। এখন আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমি এক দীর্ঘ বিশ্রাম ও বায়ু-পরিবর্তনের জন্য কলিকাতা ত্যাগ করছি। ফিরে এসে ভারতের বর্তমান সমস্যাবলী বিষয়ে আমার মতামত, ও আমার ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা পুরোপুরি ব্যক্ত করব। আজ আমি যা বললাম, ও ভবিষ্যতে যা বলব সে-সব বিবেচনা করে—আপনারা ঠিক করবেন আমার সঙ্গে আপনারা পূর্ণ সহযোগিতা করবেন কি না, যে সহযোগিতা আমি আপনাদের কাছে প্রার্থনা করি, এবং পাব বলে আশা করি।

প্রগতিশীল আদর্শবাদের অভাব[১]

প্রগতিশীল আদর্শবাদের অভাব
পুরসভা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রাক্তন মহানাগরিক সুভাষচন্দ্র বসু
"লজ্জায় মাথা নত হয়ে যায়"

আপনি আমার সহায়তা চেয়েছেন। আমার যদি ক্ষমতা থাকত সানন্দে সহায়তা দিতাম। কিন্তু নিজের অসহায়তায় আমি বেদনা বোধ করি। আমার প্রভাব সম্পর্কে আপনার ধারণা অতিরঞ্জিত। যদি মানুষের ওপর আমার কোনও প্রভাব থেকে থাকে, পুরসভার চার দেওয়ালের মধ্যে অবশ্যই তার অস্তিত্ব নেই। যদি থাকত, বিগত কয়েক বছরে অনেক কিছু ঘটেছে, তা ঘটত না। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে কংগ্রেস সদস্যরা পুরসভার বড়-বড় উচ্চপদস্থ কর্মীদের বেতনাদি বৃদ্ধি করে দরিদ্রতর কর্মীদের বর্তমান বেতনক্রমেই রেখে দেওয়ার জন্য প্রবেশ করেননি। যে

---

১. এই পত্রের বিষয়বস্তু দ্য ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট, ১৪ আগস্ট ১৯৩৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

সংস্থায় কংগ্রেস সদস্যদের প্রচুর প্রভাব আছে, কিংবা থাকা উচিত, যাতে গত কয়েক বছরে স্বজন-পোষণের প্রাবল্য, তার কাজ-কর্ম দেখে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যায়। কয়েক মাস আগে Chief Executive Officer যখন কয়েক মাসের ছুটির জন্য দরখাস্ত করেছিলেন তখন তাঁর প্রতি যে আচরণ করা হয়, সেটি তার একটি দৃষ্টান্ত। গরিব কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদি বৃদ্ধির দাবি অগ্রাহ্য করবার জন্যে যে-সব যুক্তি সাধারণত দেখানো হয়ে থাকে, মার্কা-মারা আমলাদের মুখেই তা শোভা পায়। মানুষ-হিসাবে আমার যে সুবিচার বোধ এবং কংগ্রেসি হিসাবে আমার বিবেক তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। কিন্তু বর্তমানে আমি নিরুপায়।

মুক্তি পাওয়ার পর থেকে পুরসভার অভ্যন্তরীণ কাজকর্ম নিয়ে আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। যে-সব গুজব এবং খবর আমার কানে পৌঁছচ্ছে, তার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও যদি সত্য হয়, মানুষকে জোর ধাক্কা দেওয়ার পক্ষে সেটা যথেষ্ট। আমি দেখে খুশি হলাম যে বর্তমান মেয়রের অধীনে পুরসভার বিভিন্ন বিভাগের যে-সব গ্লানি তার আচ্ছাদনের একটি কোনা অন্তত তুলে ফেলা হয়েছে। কিন্তু আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, যা এখনও অন্ধকারে ঢাকা, তার তুলনায় যা প্রকাশ পেয়েছে সেটা কিছুই নয়।

কংগ্রেসি হিসাবে পুরসভায় যা ঘটছে তার জন্য আমারও কিছু দায়িত্ব আছে, এবং সে-বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অবহিত। এই দায়িত্ববোধ শুধু গরিব কর্মচারীদের প্রতি অবিচার নিয়েই নয়, তা ছাড়াও আরও অনেক ক্ষেত্রে প্রসারিত। এ-সমস্যার সমাধানের চেষ্টা নিকট ভবিষ্যতেই করতে হবে। আমি কাজে ফিরে এলে কীভাবে কাজ করব আজ আপনাকে বলতে পারছি না, শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, বঙ্গীয় রাজনীতির সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক যদি থাকে, কলকাতা পুরসভার এই নরকের জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে বিদায় করতেই হবে, নয়তো পুরসভার কাজকর্ম সম্পর্কে যাবতীয় দায়িত্ব কংগ্রেসকে ত্যাগ করতে হবে।

আমার মতে, পুরসভায় যা ঘটেছে সেটা থেকে বঙ্গ দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে যা চলছে তার পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের লোকজনকে একটা নৈতিক জাড্য গ্রাস করেছে। একটা গতিশীল আদর্শবোধের অভাব হয়েছে। আমাদের যা-কিছু আদর্শবোধ ছিল মনে হয় তার সবই জেলখানায়, বন্দিশালায় তালাবন্ধ হয়ে আছে। আর বাইরে যারা আছে তারা যেন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে লেফট-রাইট করছে, নয় পিছিয়ে পড়ছে। তাই সব দিকেই দেখছি ক্ষুদ্র বাদ-বিবাদ, সামান্য বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব যার ফলে প্রকৃত এবং গভীরতর সমস্যাগুলো অবহেলিত হচ্ছে। এ থেকে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র পথ নৈতিক পুনরুত্থান, আদর্শবোধের এখন এক জোয়ার যা ভাসিয়ে নিয়ে যাবে যা কিছু ক্ষুদ্র, হীন, প্রতিক্রিয়াশীল, যেমন আমাদের রাজনৈতিক জীবনে তেমনি আমাদের হৃদয়েও ফিরিয়ে আনবে, যার এখন খুবই প্রয়োজন, বিশ্বাস, সততা, নিঃস্বার্থ আনুগত্য। আমি অনুভব করছি, বিশ্বাসহীনতা এবং প্রতিক্রিয়াশীলতার এই পর্বের শেষে বিরাট নৈতিক পুনর্জাগরণের দ্বারপ্রান্তে আমরা দাঁড়িয়ে আছি।

ভারতীয় স্থাপত্য এবং কলকাতা পুরসভা[১]

শ্রীসুভাষচন্দ্র বোসের দৃষ্টিভঙ্গি

আপনি আমাকে যে চিঠিগুলি দিয়েছেন তার জবাব দিতে দেরি হওয়ায় আমি দুঃখিত। দেরির প্রধান কারণ আপনি যে-সব উদ্দেশ্যর কথা ভাবছেন, সে-সব সম্পন্ন করবার ব্যাপারে আমি নিজেকে অসহায় মনে করছিলাম। ভারতীয় স্থাপত্যের পুনরুদ্ধারের বিষয়ে আমার কী মনোভাব, জাতির পুনরুজ্জীবনে তার গুরুত্বের বিষয়ে আমার কী ধারণা, আপনি খুব ভাল জানেন। একটি জাতির আত্মার সূক্ষ্মতর এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রূপটি প্রকাশ করে তার শিল্প ও স্থাপত্য। এবং জাতির আত্মা যখন জেগে ওঠে, স্বাভাবিকভাবেই তার প্রকাশ ঘটে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিল্প ও স্থাপত্যের দ্বারা। আমার অন্তরের এই গভীর বিশ্বাসের জন্য আপনার কাজকর্ম আমি বিপুল আগ্রহ সহকারে অনুধাবন করে আসছি। অসীম যে-উৎসাহ ও উদ্দীপনা আমি দেখেছি আপনার মধ্যে আপনার জীবনের ব্রত সম্পর্কে, তার জন্য আমি আপনাকে প্রচুর সাধুবাদ জানাই, এবং প্রার্থনা করি বাধা যতই দুর্লঙ্ঘ্য হোক আপনার সহজাত আশাবাদ এক কণাও যেন হারিয়ে না যায়। আপনার সাফল্যের গোপন রহস্যটি ওই আশাবাদ।

আপনার চিঠির যা মুল বিষয়, তার সম্পর্কে আমি বলতে পারি ভারতীয় স্থাপত্যের শ্রীবৃদ্ধিতে কলকাতা পুরসভা অবশ্যই সাহায্য করতে পারে। এমনকী আমি একথাও বলতে পারি, যে পুরসভার ব্যাপারে আমার যদি কোনও হাত থাকত, আপনার কোনও-কোনও চিন্তা-ভাবনা অবশ্যই আমি কাজে রূপান্তরিত করতাম। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন আর না করুন, ওদের ওপর প্রভাব খাটানোর অবস্থায় আমি নেই। আপনার মনে হতে পারে, পুরসভার ভিতরে কংগ্রেস থাকা সত্ত্বেও এ-রকম কী করে হয়? কিন্তু অবস্থাটা তাই।

আইনগত জটিলতার জন্য, শুধুমাত্র ভারতীয় স্থাপত্যই যাতে গৃহীত হয়, সে ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে কি না জানি না। কারণ কাউকে পুরসভা বিশেষ কোনও রীতির স্থাপত্য অনুযায়ী গৃহ নির্মাণ করতে বাধ্য করতে পারে না। তা হলেও পুরসভা পরোক্ষভাবে ভারতীয় স্থাপত্যকে উৎসাহ দিতে পারে। ভারতীয় স্থাপত্যের একটা দপ্তর থাকতে পারে নাগরিকেরা কোন রীতি অনুযায়ী বাড়ি বানাবেন সে বিষয়ে বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়ার জন্য। নাগরিকদের ব্যবহারের জন্য বাড়ির নক্সা, পুস্তিকা ইত্যাদি সেই দপ্তরে থাকতে পারে। ভারতীয় স্থাপত্য যাতে জনপ্রিয় হয় সে জন্য নানাভাবে প্রচারও তারা করতে পারে। কলকাতাবাসীদের মধ্যে ভারতীয় স্থাপত্য জনপ্রিয় করে তুলবার জন্যে প্রদর্শনীর সাহায্যও নিতে পারে। এবং কলকাতা যদি দৃষ্টান্ত দেখায়, অন্য সব ভারতীয় শহর অবশ্যই অনুসরণ করবে।

কিন্তু আসল কথা হল, আমার পরামর্শ শুনবে কে? ছোট-ছোট ঝগড়া-ঝাঁটি, বাদ-বিতণ্ডা নিয়ে সবাই এত ব্যস্ত যে বড়-বড় বিষয়ে মাথা ঘামাবার কারও সময় নেই। কাজেই কিছু কাজ করানো যাবে বলে আমার বিশেষ কোনও আশা নেই। আপনি বলতে পারেন, সে-ক্ষেত্রে কংগ্রেসের পুরসভায় থেকে কোনও লাভ নেই। বোধ হয় সে কথাই ঠিক, এবং ছাড়া পাওয়ার পর থেকে এ-কথাটা নিয়ে আমি ভাবছি। স্বাভাবিক কাজকর্মে ফিরে গিয়ে আমি কী করব বলতে পারছি না। কিন্তু আজ হোক কাল হোক এই সমস্যাটা নিয়ে কিছু করতে হবে। ততদিন আমি শুধু আপনাকে আমার শুভকামনাই পাঠাতে পারি, এবং আশা করতে পারি আপনি আপনার আশাবাদ কখনও হারাবেন না।

---

* এই পত্রের বিষয়বস্তু দ্য ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট, ২৮ আগস্ট ১৯৩৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

ইউরোপ আজ ও আগামীকাল[১]

আজকের রাজনীতিতে বিভিন্ন জাতিকে 'haves' ও 'have-nots' এই দুইভাগে ভাগ করার একটা রীতি প্রচলিত হয়েছে। "Haves' হল তারা, যথা গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, যারা মহাযুদ্ধের পরে Versailles, Trianon এবং Neuilly-র চুক্তির দ্বারা লাভবান হয়েছে। 'Have-nots' তারা যারা ওইসব চুক্তির মধ্যে কোনও কোনওটির ফলে ভূমি হারিয়েছে, কিংবা ওই সব চুক্তির বিশেষ-বিশেষ শর্তাবলী সম্পর্কে যাদের কোনও অভিযোগ আছে। ইউরোপে have-notsদের মধ্যে আছে গ্রেট ব্রিটেন ফ্রান্স এবং সেই সব উত্তরাধিকারী রাষ্ট্র যেগুলো অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের অঙ্গচ্ছেদ করে গঠিত হয়েছে। অপর পক্ষে—জার্মানি, ইতালি, হাঙ্গেরি, অস্ট্রিয়া ও বুলগেরিয়া 'have-notes'-দের মধ্যে পড়ে। গত মহাযুদ্ধের ফলে রাশিয়ার যদিও অনেক জমি হাতছাড়া হয়েছে সে-দেশ এখন স্থিতাবস্থা বজায় রাখতেই আগ্রহী, সেই কারণে haves-দের দলে পড়ে। পক্ষান্তরে ইতালি যুদ্ধের পরে অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্য থেকে ভূমিলাভ করা সত্ত্বেও have-not বলে পরিগণিত, কারণ যুদ্ধের ফলে তার অধিকতর প্রাপ্তির প্রত্যাশা। ইতালিকে মিত্রপক্ষ ১৯১৫ সালে লোভ দেখিয়ে তাদের দলে যোগ দিতে রাজি করিয়েছিল; এক গোপন চুক্তিতে বলা হয়েছিল ডালমেশন কোস্টসহ কয়েকটি প্রাপ্তি তার হবে। সেই ডালমেশন কোস্ট পরে শান্তি সম্মেলনে যুগোশ্লাভিয়াকে দিয়ে দেওয়া হয়। (Peace Treaty-তে সে দেশকে বলা হয় Serbs, Croats ও Slovenes-দের রাজ্য।)

Have-nots-দের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শান্ত বুলগেরিয়া। তার ভূমি তার সব প্রতিবেশী রাষ্ট্রের হাতেই চলে যায় (রুমানিয়া, গ্রিস এবং সার্বিয়া, এখন যুগোশ্লাভিয়া) ১৯১২ সালের বলকান যুদ্ধের এবং মহাযুদ্ধের ফলে। কিন্তু তার ক্ষোভ সে সংগোপনে নিজের মনে পুষে রেখেছে এবং কখন আবার সুদিন আসবে ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। যদিও এখন শত্রু রাষ্ট্র পরিবৃত অবস্থায় সে অসহায় বোধ করছে। প্রচারের দিক থেকে দেখল, হাঙ্গেরি এখন অধিকতর সক্রিয়। তার পক্ষের প্রবক্তারা সারা ইউরোপ টহল দিচ্ছেন এবং তার সীমান্ত পুনর্নির্ধারণের জন্য বৃহৎ শক্তি সম্প্রদায়ের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। সামরিক দিক থেকে হাঙ্গেরি আজ তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় কারণ তার ভূভাগের এবং জনসংখ্যাটি অর্ধেকের বেশি চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া (আগের সার্বিয়া) ও রুমানিয়ার হাতে চলে গিয়েছে।

এই সেদিন পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়াকে মনে করা হত বিরাটকায় এক বিস্ফোরক শক্তি, সারা পৃথিবীতে যে বিদ্রোহ উস্কে দিতে মহাব্যস্ত, কিন্তু এখন অবস্থাটা সে-রকম নয়। লেনিনের মৃত্যু ও ট্রটস্কির অপসারণের পর স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত রাশিয়ার আগ্রহ এখন একমাত্র সোভিয়েত সীমানার মধ্যে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলায়। জার্মানির আকস্মিক অভ্যুত্থান সেই ইচ্ছাটাকেই আরও প্রবল করেছে। সেই কারণেই রাশিয়া জাতিসঙ্ঘে যোগ দিয়েছে যে জাতিসঙ্ঘে, প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, এখন পুঁজিবাদী শক্তিসমূহের প্রাধান্য এবং সার্বিক সুরক্ষার ধুয়ো তুলে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে ইউরোপে স্থিতাবস্থা যাতে বিঘ্নিত না হয়। আজকের ইউরোপে প্রকৃত বিস্ফোরক শক্তি ফ্যাসিবাদী ইতালি ও নাৎসি জার্মানি। তার বিরুদ্ধে দল বেঁধে দাঁড়িয়েছে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েট রাশিয়া। ইউরোপের জটিল দাবা বোর্ডে অসংখ্য চাল চালা হচ্ছে এবং দিনে-দিনে পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে।

মহাযুদ্ধের আগে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা হত শক্তির ভারসাম্য বজায় রেখে। স্থিতাবস্থা রক্ষা করায় যাদের আগ্রহ ছিল, তাঁরা নিজেদের মধ্যে গোপন আঁতাত করছেন এবং শত্রু হয়ে দাঁড়াবার

১. মডার্ন রিভিউ, সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ সংখ্যায় প্রকাশিত এবং সুভাষ সি. বোস, থ্রু কংগ্রেস আইজ (কিতাবিস্তান, এলাহবাদ এবং লন্ডন, ১৯৩৮)-এ পুনর্মুদ্রিত।

যাদের সম্ভাবনা ছিল, যাঁরা তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতেন না, তাঁদের পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পরকে উসকে দেওয়ার চেষ্টা করতেন। ১৯১৯ সালে স্থাপিত জাতিসঙ্ঘের উদ্দেশ্য ছিল গোপন কূটনৈতিক তৎপরতা ও বিভিন্ন শক্তিগোষ্ঠীর মধ্যে পৃথিবীকে ভাগ করে দেওয়া বন্ধ করা। যুদ্ধের একটা ভয় ওই ভাবে লোকের মনে জাগিয়ে রাখা হত। তার বদলে এমন একটা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হল যাতে সমস্ত জাতিকেই জাতিসঙ্ঘের সভ্য করা হল, সব জাতিই একত্রে সম্মিলিত নিরাপত্তা এবং শান্তির দায়িত্ব গ্রহণ করল। জাতিসঙ্ঘে এবং তার এই নতুন ব্যবস্থা তাদের উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হল, কারণ কোনও-কোনও রাষ্ট্র স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে আগ্রহী ছিল না, এবং তাদের মধ্যে জাপান ও জার্মানি এখন আর জাতিসঙ্ঘের সদস্য নয়, এবং বিশ্বরাজনীতিতে যার শক্তি সবচাইতে বেশি, সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনও দিনই সদস্য ছিল না।

ইউরোপের সাম্প্রতিক অশান্তির তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য বুঝতে গেল ফ্যাসিবাদী ইতালি ও নাৎসি জার্মানির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা দরকার। ১৯২২ সালে মুসোলিনি যখন ক্ষমতায় এলেন তারপর থেকে ইতালি জোর করে নিজের অধিকৃত এলাকা বৃদ্ধি করতে চাইছে, চাইছে পৃথিবীতে একটা যথাযোগ্য স্থান, রোমান সাম্রাজ্যের পুনরুজ্জীবন। কিন্তু ১৯৩৫-এর জানুয়ারির আগে পর্যন্ত ইতালি নিজেই জানত না তার আত্মবিস্তারের নীতি কোন পথে এগোবে। যুগোশ্লাভিয়া, যে তার ডালমেশিয়ান সমুদ্র-উপকূল দখল করে নিয়েছে, তার বিরুদ্ধে ইতালির অভিযোগ ছিল। ফ্রান্স দখল করে নিয়েছে ইতালিয়ান অধ্যুষিত দুটি অঞ্চল Savoy এবং Nice, দখল করে নিয়েছে উত্তর আফ্রিকার তিউনিসিয়া যেখানে প্রচুর ইতালিয়ানের বাস এবং Corsica দ্বীপ, ভৌগোলিক দিক থেকে সে অঞ্চল ইতালির। সেই ফ্রান্সের দিকে ইতালি দাঁত খিঁচোচ্ছিল। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন ইতালির মাল্টা-র ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছে এবং ফ্রান্সের সহযোগিতায় ভূমধ্যসাগরকে ব্রিটিশ সরোবরে পরিণত করেছে। ব্রিটেনের প্রতি ইতালির মনোভাব ছিল শত্রুতার।

ইতালি এবং ফ্রান্সের মধ্যে মন কষাকষি বিশেষ তীব্র হয়ে উঠল এবং তার ফলে ইতালি ও ফ্রান্সের মধ্যবর্তী সীমানার দু' ধারেই প্রচুর প্রতিরক্ষা ও সমরপন্থার ব্যবস্থা করা হল। তারপরে ১৯৩৩ সালে হঠাৎ একদিন রঙ্গমঞ্চে অতিকায় নাৎসি-শক্তি আভির্ভূত হল, ইউরোপের সমগ্র দৃশ্যপট বদলে গেল। ফ্রান্স শরণাপন্ন হল ইংলন্ডের এই নতুন বিপদের বিরুদ্ধে সমর্থনের জন্য, সম্মিলিত হওয়ার জন্য, কিন্তু ব্রিটেন "হ্যাঁ-না" কিছুই বলল না। সম্ভবত অন্তরের অন্তস্তলে সে খুশিই হয়েছিল ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে ফ্রান্সের আধিপত্য খর্ব হওয়ার সম্ভাবনায়। সে হয়তো আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যে চিরাচরিত ধারা, সেটাই অনুসরণ করেছিল। ফ্রান্স কিন্তু তাতে অখুশি হল এবং ইতালি ও সোভিয়েট রাশিয়ার দিকে ফিরল। সে চাইল ইতালির সীমান্ত থেকে তার সৈন্য বাহিনী প্রত্যাহার করে জার্মানির বিরুদ্ধে তাকে সন্নিবেশিত করতে এবং আরও চাইল জার্মানির পূর্ব সীমান্তে নিজের একজন মিত্র থাকুক। এইভাবে জন্ম হল Laval-Mussolini Pact ও Franco-Soviet Pact-এর।

১৯৩৫-এর Laval-Mussolini Pact ইতালির ভবিষ্যৎ প্রসার কোন দিকে হবে সেটা নির্দিষ্ট করে ছিল। ফ্রান্সের সঙ্গে ইতালি তার বিবাদ মিটিয়ে নিল, ইউরোপের রাজ্যবিস্তারের অভিলাষ ত্যাগ করল, প্রতিদানে ফ্রান্স ইতালিকে আফ্রিকায় নিজের ইচ্ছামতো কাজ করার স্বাধীনতা দিতে সম্মত হল। এর ফলে স্বাধীনতা হারাল আবিসিনিয়া।

আবিসিনিয়া জয়ের পর মুসোলিনি একটি বক্তৃতা দিলেন, তাতে বললেন, ইতালি এখন একটি সন্তুষ্ট রাষ্ট্র। আবিসিনিয়া জয় ইংল্যান্ডের চোখে ছিল আফ্রিকায় তার অধিকারে হস্তক্ষেপ এবং ওই বক্তৃতাতে ইংল্যান্ড ইঙ্গ-ইতালি বন্ধুত্বের পুনঃস্থাপনের একটা ইঙ্গিত যেন দেখতে পেল। সে-প্রত্যাশা কিন্তু পূর্ণ হল না। যদিও আবিসিনিয়ার প্রশ্নে ব্রিটেন ইতালিকে চ্যালেঞ্জ

জানিয়ে পরে মুসোলিনির হম্বিতম্বির মূলে তড়িঘড়ি পিছু হঠেছিল, নিজের হতমান হওয়ার কথা সে ভুলতে পারেনি। ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির চোখে তার সে-মর্যাদা হানি ঘটল, তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সে ভূমধ্যসাগরে তার নিজের নৌঘাঁটি ও বিমান ঘাঁটির শক্তি বৃদ্ধি করতে আরম্ভ করল। নৌসেনা-প্রধান স্যার স্যামুয়েল হোরে ভূমধ্যসাগর পরিদর্শনে গেলেন।

পরিদর্শনের শেষে তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, যে ও-অঞ্চল থেকে ব্রিটেন হাত গুটিয়ে নেবে না। অ্যান্থনি এডেন-এর মতো অন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরাও এই মর্মে ঘোষণা করলেন, যে ভূমধ্যসাগরের ওপর ব্রিটেনের জীবনমরণ নির্ভর করে, সেটা তার রক্তচলাচলের প্রধান ধমনী।

ভূমধ্যসাগরে নিজের অবস্থান বজার রাখা এবং তাকে আরও দৃঢ় করার এই যে ব্রিটেনের সংকল্প, ইতালি তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, ব্রিটেনকে প্রতিপক্ষ জ্ঞান করতে আরম্ভ করেছে, কারণ ইতালিও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভূমধ্যসাগরে সে তার প্রভাব বৃদ্ধি করবে এবং নৌবহর এবং বিমান বহরের আকার বৃদ্ধি করবে। এইভাবে ইতালির প্রভাব বাড়তে পারে একমাত্র ব্রিটেনের প্রভাব কমিয়ে এনে। অতএব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, বর্তমান ইঙ্গ-ইতালীয় মনকষাকষি Il Duce'এর বদমেজাজের কারণে ঘটেনি, এবং সহজে দূর হওয়ায় নয়। এ চলবে যতদিন না ভূমধ্যসাগরে ভবিষ্যতে কার আধিপত্য কায়েম হবে তার মীমাংসা হচ্ছে, এবং সে মীমাংসা হতে পারে একমাত্র দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির একটির নিজেকে সেখান থেকে প্রত্যাহারের দ্বারা, তা সে স্বেচ্ছাতেই হোক, আর পরাজয়ের ফলেই হোক। নেভিল চেম্বারলেন এবং সিনর মুসোলিনি ভ্রাতৃসুলভ পত্র বিনিময় করতে পারেন। রাষ্ট্রদূতেরা এবং বিদেশমন্ত্রীরা করমর্দন করতে পারেন, কিন্তু যে রাজনৈতিক সংঘর্ষের জন্ম হয়েছে ব্যক্তিনিরপেক্ষ কারণে তা চলতেই থাকবে যতদিন না তার কারণ দূরীভূত হচ্ছে।

ভূমধ্যসাগর সম্পর্কে ব্রিটেনের নতুন করে আগ্রহ দেখানোর প্রত্যুত্তরে ইতালি স্পেনের গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করল। এ কথা মনে করা শিশুসুলভ সরলতার পরিচয় দেওয়া হবে, যে Franco-র ফ্যাসিবাদী মনোভাব এবং কমিউনিজম সম্পর্কে ঘৃণার কারণেই ইতালি Franco-র পক্ষ অবলম্বন করেছে। Franco-র প্রতি রাজনৈতিক সমর্থন তো তার থাকতই, কিন্তু ইতালি যে তাঁর জন্য রক্ত দিচ্ছে, অর্থ দিচ্ছে প্রধানত সেটা রণকৌশলগত কারণে। জার্মানির সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়, এবং এটা যিনি বুঝতে পারেন না, তিনি স্পেনের গৃহযুদ্ধের কিছুই বোঝেন না।

অস্ত্র-সজ্জায় নিজেকে সজ্জিত করে তুলেও ইতালি ব্রিটেনের সমকক্ষ হতে পারেনি। ব্রিটেনের নবতম অস্ত্রসজ্জা আবিসিনিয়া যুদ্ধের পর সারা পৃথিবীর কাছে ইতালিকে দুর্বল প্রতিপন্ন করেছে। যাই হোক, জিব্রালটার ও সুয়েজ নিয়ন্ত্রণ করার ফলে ব্রিটেন, যদি ইতালির সঙ্গে তার যুদ্ধ বাঁধে, ইতালির নৌবহরকে অবরুদ্ধ করে ফেলতে পারে এবং এক অর্থনৈতিক অবরোধ জারি করে ইতালির সর্বনাশ করতে পারে। ইতালিকে তার বেশির ভাগ কাঁচা মালই আমদানি করতে হয়, যেমন কয়লা, পশম, তুলা ইত্যাদি এবং সামুদ্রিক বাণিজ্যের দুই-তৃতীয়াংশ আসে আটলান্টিক থেকে, আর তার আমদানির শতকরা আশি ভাগ আসে ভূমধ্যসাগর দিয়ে। তার সমুদ্র উপকূল দীর্ঘ ও অরক্ষিত, এবং আফ্রিকায় তার যে-সব উপনিবেশ, লিবিয়া, এরিট্রিয়া এবং আবিসিনিয়া, তার সঙ্গে সে যোগাযোগ রাখতে পারে একমাত্র যদি ভূমধ্যসাগরে তার আধিপত্য থাকে। এই সব কারণে অর্থনৈতিক অবরোধ, এবং তার সঙ্গে ব্রিটিশ নৌঘাঁটি মাল্টা এবং সাইপ্রাস থেকে আক্রমণ ইতালিতে বিপর্যয় ঘটাতে পারে, এমনকী তার শ্বাসরোধও করতে পারে। ইতালি তার জবাবে ভূমধ্যসাগরে ব্রিটেনের অধিকৃত স্থানগুলির ওপর, কিংবা ব্রিটেনের সামুদ্রিক বাণিজ্যের ওপর আঘাত হানতে পারে, কিন্তু ব্রিটেনকে আক্রমণ করা, কিংবা

ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের বাইরে, ব্রিটেনের কাঁচা মালের ও খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ যে-সব জায়গা থেকে আসে তাকে স্পর্শ করার ক্ষমতা ইতালির নেই। ফলে ব্রিটেনের সঙ্গে যুদ্ধে ইতালি কার্যত অসহায়, এবং আত্মরক্ষা ছাড়া কিছুই সে করতে পারবে না।

আর স্পেন যতদিন ব্রিটেনের বন্ধু থাকবে, কিংবা অন্তত নিরপেক্ষ থাকবে, ইতালির অসহায়তার কোনও সুরাহা হবে না। একমাত্র স্পেনের সাহায্যেই ইতালি তার মারাত্মক সাময়িক দুর্বলতার অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে। স্পেনকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারলে ইতালি ব্রিটেনকে আক্রমণের উদ্যোগ নিতে পারে। তখন সে জিব্রালটার ধ্বংস করতে পারে, এবং ব্রিটেনের যে-দুটি সামুদ্রিক বাণিজ্যের পথ, ভূমধ্যসাগর দিয়ে, এবং উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়ে, সে-দুটিই বিপন্ন করে তুলতে পারে। শুধু তাই নয়, অবরোধ ডিঙিয়ে সে স্পেন দিয়ে ভূমিপথে আটলান্টিকের দিক থেকে সরবরাহ নিয়ে আসতে পারে। যেমন আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময় ব্রিটেনের তুলনায় তার নৌবহরের যে দুর্বলতা, সেটা সে যথেষ্ট পরিমাণে পুষিয়ে নিতে পেরেছিল বিশাল বাহিনীর আগমনের ফলে, তেমনি স্পেনকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারলে, কিংবা অন্তত স্পেনের ভূমিতে পা রাখবার একটা জায়গাও যদি সে পায়, ইতালি তার বর্তমান মারাত্মক রকম দুর্বল এবং আত্মরক্ষাত্মক অবস্থাকে, ভবিষ্যতে যদি যুদ্ধ বাধে, পুরোপুরি বদলে ক্ষমতাশালী এবং আক্রমণাত্মক করে তুলতে পারবে।

অর্থাৎ, ইতালি গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে যুদ্ধ করছে স্পেনে, Franco-কে সে সাহায্য করছে স্পেনের ভূমিতে পা রাখার জায়গার জন্য।

এই সব রণকৌশলগত বিষয় বিবেচনা করলে ইতালি যে ফ্রাঙ্কোর সাফল্য সম্পর্কে অত আগ্রহী তাতে আর বিস্মিত হওয়ায় কোনও কারণ থাকে না, বরং এইটাই আশ্চর্যজনক মনে হয় যে ইংল্যান্ডে এমন লোকও আছেন যাঁরা Franco ও তাঁর বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। ক্যাপটেন Liddle Hart প্রখ্যাত ব্রিটিশ সমর বিশেষজ্ঞ Europe in Arms বইটিতে লিখেছেন,

'সামরিক দিক থেকে (ব্রিটেনের স্বার্থের পক্ষে) বিপদটা এতই স্পষ্ট, যে ব্রিটিশ জনসাধারণের মধ্যে যাঁরা নিজেদেরকে সর্বাপেক্ষা দেশপ্রেমিক বলে দাবি করে থাকেন, তাঁরা বিদ্রোহীদের সাফল্য সম্পর্কে অত আগ্রহী কী করে হলেন, বোঝা কঠিন।'

সম্ভবত অন্ধ রাজনৈতিক বিদ্বেষের এটি একটি দৃষ্টান্ত, (সমাজতন্ত্রবাদী ও কমিউনিস্টদের প্রতি যে বিদ্বেষ) এই বিদ্বেষ নিজেদের মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তার চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে।'

এতক্ষণ যতকিছু বললাম, তা সত্ত্বেও বলা দরকার আজ ইতালি রাষ্ট্রহিসাবে সন্তুষ্ট। ভূমধ্যসাগরে ব্রিটিশ আধিপত্য সে সহ্য করতে পাবে না, এবং মনে করে, অতীতে যেমন ছিল, আজও ভূমধ্যসাগরের রোমান হ্রদ হয়েই থাকা উচিত। কিন্তু গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে তার সংঘর্ষ তাকে খুব বেশি দূর নিয়ে যাবে না। স্পেনের গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ সে করতে পারে, কেননা সে ভাল করেই জানে, বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে কোনওটিই এখনই কোনও বিশ্বযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নয়। মুসোলিনি রাজনীতিক হিসাবে যথেষ্ট বুদ্ধি রাখেন, তিনি নিকট কিংবা দূর ভবিষ্যতে এমন কোনও অ্যাডভেঞ্চারে নামবেন না যেটা তাঁর কিংবা তাঁর দেশের বিপদের কারণ হতে পারে। অতএব আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি, ইউরোপের শান্তি বিঘ্নিত করবার কোনও উদ্যোগ মুসোলিনি নেবেন না, কিংবা জয় সুনিশ্চিত না জেনে তিনি কোনও যুদ্ধেও নামবেন না।

কিন্তু হিটলারের জার্মানি কী করবে বলা মুশকিল। যদিও জার্মান সামরিকবাহিনী Reichswehr, ঠাণ্ডা মাথায় হিসাব করেই কাজ করে থাকে। নাৎসি জার্মানি স্বপ্ন দেখছে, এমন সব-স্বপ্ন দেখছে, যার পূরণ হতে পারে একমাত্র যুদ্ধের দ্বারা। উপরন্তু জর্মানির মধ্যে অর্থনৈতিক সংকট এমন তীব্র হয়ে উঠেছে, যে অনেক পর্যবেক্ষকের মতে সে দিন দূরে নয়, যে-দিন দেশের মধ্যে যে অসন্তোষ তার মোড় ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য জার্মানিকে দেশের

বাইরে যুদ্ধ বাধাতে হতে পারে। জার্মানির ভবিষ্যৎ কী হতে পারে, এই বিষয়টির একটু গভীরে যাওয়া দরকার।

মহাযুদ্ধের পর থেকে ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে আধিপত্য ফ্রান্সের। জার্মানিকে পর্য্যুদস্ত করেই সে ক্ষান্ত হয়নি, পোলান্ড এবং Little Entente, অর্থাৎ যুদ্ধের পরে সৃষ্ট তিনটি রাজ্য চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া ও রুমানিয়ার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে ফ্রান্স জার্মানির চতুর্দিকে একটি কূটনৈতিক প্রাচীরও গড়ে তুলেছে। তারপরে আবার তুরস্কের সঙ্গে সে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যে তুরস্ক আগে জার্মানি-প্রভাবিত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। জার্মানি অসহায়ভাবে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখল সভ্য জগত থেকে সে কূটনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। তাকে বিচ্ছন্ন করার এই যে নীতি, এর বিরুদ্ধে তার একমাত্র জবাব ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে Rapallo চুক্তি।

যুদ্ধোত্তর ইউরোপে ফ্রান্সের প্রাধান্য জার্মানির দু'চক্ষের বিষ। ১৮৭০-এর Franco-Prussian যুদ্ধে ফ্রান্সের শোচনীয় পরাজয়ের পর থেকে ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে জার্মানিই ছিল সর্বেসর্বা। তারপর থেকে জার্মানি বিভিন্ন দিকে নিজের আয়তন বাড়িয়ে নিচ্ছিল। ইউরোপের বাইরে সে উপনিবেশ স্থাপন করতে আরম্ভ করল। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মনে হয়েছিল সে গ্রেট ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাল্লা দেবে। একটি শক্তিশালী নৌবহর সে গড়ে তুলল, ব্রিটেনের পক্ষে যেটা সন্দেহের কারণ হয়ে উঠল। অস্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া ও তুরস্ককে সে নিজের প্রভাবিত অঞ্চলের মধ্যে নিয়ে এল এবং বার্লিন বাগদাদ রেল পথের পরিকল্পনা করল, সে রেলপথ প্রাচ্য-ভূখণ্ডে ব্রিটেনের অধিকৃত স্থান সমূহের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করবে বলে মনে হল। কিন্তু মহাযুদ্ধ এসে এসব সাফল্য, এসব উচ্চাকাঙ্ক্ষা গুঁড়িয়ে শেষ করে দিল, দশটি বছর জার্মানি নিমজ্জিত হয়ে থাকল নিরাশায় এবং তার চিন্তাবিদেরা পাশ্চাত্যের পতনের বিষয়ে দার্শনিক চিন্তায় রত হলেন। Spengler লিখলেন তাঁর Untergand des Abend-Landes (Decline of the West)। তখন এল নতুন জাগরণ, National Socialist Party অথবা Nazi Party-র অভ্যুদয়ের মধ্যে দিয়ে।

নাৎসি পার্টির রাজনৈতিক মতবাদ সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যায় এই বলে, 'Drang Nach Osten' অর্থাৎ পূর্ব দিকে এগিয়ে যাও। এই মতবাদ প্রথম বিবৃত করেন Muller Van den Bruck তাঁর Das dritte Reich অর্থাৎ 'তৃতীয় সাম্রাজ্য' গ্রন্থে। ১৯৩৩ সালে হিটলার যখন Third Reich প্রতিষ্ঠা করেন, ততদিন তিনি আর বেঁচে নেই, ১৯২৫ সালে এক আশা ভঙ্গের ঝোঁকে তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। তাঁর চিন্তাভাবনা গ্রহণ করে হিটলার তাকে সম্প্রসারিত করলেন, তাঁর Mein Kampf (My Struggle) নামক গ্রন্থে। বইখানি জেলখানায় বসে লিখেছিলেন ১৯২৩ সালে। ওই বইখানির মূল প্রতিপাদ্য হল জার্মানিকে নৌশক্তি ভিত্তিক ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র হওয়ার চিন্তা ত্যাগ করতে হবে, তাকে মহাদেশীয় রাষ্ট্র হিসাবেই থাকতে হবে, তার প্রসার তাকে ঘটাতে হবে ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের পূর্ব দিকে। যুদ্ধ পূর্ব জার্মানির বৃহত্তম ভুল হয়েছিল উপনিবেশ স্থাপন এবং সেইভাবে ব্রিটেনের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়া।

নাৎসিদের নতুন সমাজদর্শন, হিটলারের বক্তব্য অনুযায়ী, যা চায়, তা হল জার্মান জাতির শুদ্ধীকরণ ও শক্তিবৃদ্ধি। তার জন্য প্রয়োজন ইহুদি প্রভাবের অবলোপ, ভূমিতে প্রত্যাবর্তন। Blun and Boden অর্থাৎ রক্ত এবং ভূমি। বিদেশনীতিতে, নাৎসিরা দাবি করে সমস্ত জার্মান ভাষী জাতি সমূহের ঐক্য-সাধন, এবং দ্রুত বর্ধনশীল জার্মান জাতির জন্য পূর্ব দিকে প্রশস্ততর স্থান। বাস্তব রাজনীতির ক্ষেত্রে উল্লিখিত লক্ষ্য সমূহের অর্থ, নিম্নলিখিত অঞ্চল সমূহের জার্মানির সঙ্গে একীকরণ ১) অস্ট্রিয়া (এ কথা যখন লেখা হয়েছিল, Anschluss. অর্থাৎ অস্ট্রিয়ার জার্মানির সঙ্গে একীকরণ নাৎসিরা সম্পন্ন করে ফেলেছে।) ২) Memel, যে অঞ্চল জার্মানি

থেকে নিয়ে লিথুয়ানিয়াকে দেওয়া হয়েছিল ৩) Danzig সে স্থানকে জাতিসঙ্ঘের অধীনে মুক্ত শহর করা হয়েছে, ৪) চেকোস্লোভাকিয়ার জার্মান-ভাষী অধ্যুষিত অঞ্চল সমূহ, যার লোকসংখ্যা ৩৫ লক্ষ ৫) Polish Corridor, এবং Silesian কয়লাখনি অঞ্চল, যেটা সে হারিয়েছে পোল্যান্ডের কাছে, ৬) সোভিয়েত ইউক্রেন-এর উর্বর শস্যক্ষেত্র এবং ৭) সম্ভবত সুইজারল্যান্ডের জার্মানভাষী অঞ্চল, Italian Tyrol এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দেশ।

১৯৩৬ সালের মার্চ মাসে জার্মানি Versaille চুক্তির সামরিক শর্তাবলী অস্বীকার করে, ১৯৩৬-এর মার্চ মাসে Rhineland দখল করে এবং বন্দুকের একটি গুলিও না ছুড়ে Anschluss হাসিল করে ইউরোপীয় কূটনীতিকদের সমস্ত হিসেব ওলট-পালট করে দেয়। এই রকম পরিস্থিতিতে জার্মানির ক্রমাগত অস্ত্রসংগ্রহের একটি মাত্র অর্থ থাকতে পারে— যুদ্ধের প্রস্তুতি। জার্মানির পুনরস্ত্রসজ্জা আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দিয়েছে, এবং নিছক আতঙ্কের বশে সমগ্র ইউরোপ নতুন করে অস্ত্রসংগ্রহ আরম্ভ করেছে। চারিদিকে যখন যুদ্ধের জন্য এই রকম দিগ্‌বিদিকজ্ঞানশূন্য প্রস্তুতি চলছে, একদিন একটি ছোট্ট ঘটনা থেকে বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ হতে পারে।

এখন আমাদের ভেবে দেখতে হবে, নিজের লক্ষ্য পুরণের জন্য জার্মানি কত দূর যেতে পারে, কোন অবস্থায় সে যুদ্ধে নামবে, কার সঙ্গে?

রাজনৈতিক ভবিষ্যদ্বাণী চিরকালই দুঃসাধ্য, তবে একটি বিষয় নিশ্চিত, বিগত যুদ্ধে তার পরাজয়ের ইতিহাস জার্মানি ভোলেনি। যুদ্ধে সে হারেনি, তার পরাজয় হয়েছিল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং তাকে যে খাদ্যাভাবের জন্য আত্মসমর্পণ করতে হল, তার জন্য প্রধানত দায়ী ব্রিটিশ নৌবহর। অতএব এটা নিশ্চিত যে জার্মানি যুদ্ধে নামবে না, যদি সে মনে করে ব্রিটেন তার বিপক্ষে যাবে। ১৯১৪ সালে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নির্বোধের মতো জার্মানি বিশ্বাস করেছিল যে ব্রিটেন বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের পক্ষ নিয়ে অস্ত্র ধারণ করবে না। ইতিহাসবিদেরা এখন মোটামুটি সবাই স্বীকার করেন, যে ব্রিটেন যদি পূর্বাহ্নে তার মনোভাব জার্মানিকে পরিষ্কার জানিয়ে দিত, জার্মানি Austro-Serbian সংঘর্ষ থেকে তফাৎ তাকত, এবং সেইভাবে বিশ্বযুদ্ধ এড়িয়ে যেত কিংবা অন্তত মুলতুবী রাখত।

যদিও হিটলার তাঁর বই Mein Kampf-এ ফ্রান্সের সঙ্গে একটা শেষ বোঝাপড়া চেয়েছেন, নাৎসিরা ক্ষমতায় আসার পর থেকে জার্মানির বৈদেশিক নীতির অদলবদল হয়েছে। জার্মানি এখন আর ফ্রান্সের কাছ থেকে Alsace-Lorraine কিংবা বেলজিয়ামের কাছ থেকে Malmady ফিরে চায় না। অর্থাৎ পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তার সীমারেখার পুনর্নির্ধারণ সে দাবি করে না। তার কারণ সহজবোধ্য। জার্মানি ভাল করেই জানে, ফ্রান্স কিংবা বেলজিয়াম কিংবা হল্যান্ডের ওপর সে যদি আক্রমণ করে ব্রিটেন তৎক্ষণাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে, এবং গত মহাযুদ্ধের পুনরাবৃত্তি হবে। সেই কারণে জার্মানি ক্রমাগত একটি পশ্চিম ইউরোপ চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে চাইছে। যাতে পশ্চিম ইউরোপে স্থিতাবস্থা বজায় রাখবার নিশ্চয়তা থাকবে। এমন অনেক ব্রিটিশ রাজনীতিক আছেন যাঁদের কাছে এই প্রস্তাব লোভনীয়, কারণ ব্রিটেনের স্বার্থ যাতে বিপন্ন হতে পারে এমন সবকিছু এর দ্বারা এক সঙ্গে দূরীভূত হবে। এই প্রস্তাব করে জার্মানি আন্তর্জাতিক বাজারে জোর দর কষাকষি করছে। সে চাইছে ব্রিটেন ও ফ্রান্স যেন মধ্য ও পূর্ব ইউরোপ নিয়ে মাথা না ঘামায়, অর্থাৎ পৃথিবীর মানচিত্রের সেই অংশের ইচ্ছামতো পরিবর্তন করে স্বাধীনতা যাতে তাকে দেওয়া হয়।

জার্মানি এখন ত্রিবিধ উপায়ে নিজেকে প্রস্তুত করছে। প্রথমত, সে সর্বতোভাবে নিজেকে অস্ত্রসজ্জিত করছে। দ্বিতীয়ত, খাদ্য ও মৌলিক কাঁচা মালে সে নিজেকে স্বয়ম্ভর করবার চেষ্টা করছে, (এর উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক অবরোধের বিরুদ্ধে নিজেকে প্রস্তুত করা)। এ-কাজ আরম্ভ

হয়েছে গত বছর জার্মানির চতুর্থবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী। তৃতীয়ত, সে চেষ্টা করছে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে যুদ্ধ বাঁধলে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি যাতে নিরপেক্ষ থাকতে সম্মত হয়। এই সমস্ত প্রস্তুতি সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত জার্মানি স্বেচ্ছায় যুদ্ধ বাঁধাবে কি না সন্দেহ।

ব্রিটেন যাতে নিরপেক্ষ মনোভাব গ্রহণ করে সেই উদ্দেশ্যে জার্মানি সে দেশে বড় আকারে প্রচার-কার্য আরম্ভ করেছে এবং যথেষ্ট সাফল্যও লাভ করেছে। এই প্রচেষ্টায় সে ব্রিটেনের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির মধ্যে সাধারণভাবে যে কমিউনিস্ট বিরোধী মনোভাব দেখা যায়, তাকে কাজে লাগিয়েছে। ফ্রান্স-সোভিয়েত চুক্তি এ ক্ষেত্রে তার সুবিধে করে দিয়েছে। নাৎসিরা অনবরত বলে চলেছে, ব্রিটেন যদি ফ্রান্সের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে, তার অর্থ দাঁড়াবে, পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে দাঁড়িয়ে সে-যুদ্ধ করবে অথচ, সেই অঞ্চলে ব্রিটেনের কোনও স্বার্থ নেই। সেই সঙ্গে নাৎসিরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, ভূমণ্ডলের কুত্রাপি তারা এমন কিছু করবে না যাতে ব্রিটেনের স্বার্থের কোনও হানি হয়। এই প্রচেষ্টার ফলে ব্রিটেনে একটি প্রভাবশালী নাৎসি-পক্ষপাতী গোষ্ঠী গজিয়ে উঠেছে। হাউস অব লর্ডস-এ, লন্ডনের আর্থিক ও বাণিজ্যিক মহলে, এমনকী লেবার পার্টির মধ্যেও যাঁরা ক্ষমতাসীন তাঁদের মধ্যে সেই গোষ্ঠীর সমর্থক আছেন, যদিও তাঁরা আকৃষ্ট হয়েছেন অন্য কারণে। অনেকের বিশ্বাস ব্যাঙ্ক অব ইংলন্ডের গভর্নর মন্টেগু নর্ম্যান, প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন, এবং বিদেশ দপ্তরের প্রাক্তন ক্ষমতাবান পুরুষ স্যার রবার্ট ভ্যানসিটার্ট, এঁরা সবাই নাৎসিদের পক্ষপাতী।

শেষ পর্যন্ত ব্রিটেনের বৈদেশিক নীতি সোজা পথ ধরে চলবে না আগেকার মতো একবার এদিক একবার ওদিক করবে, তা বলবার সময় এখনও আসেনি। এই মুহূর্তে ব্রিটেনের জনমত অত্যন্ত বিভ্রান্ত। প্রথমত; নাৎসি পক্ষপাতীরা আছেন, যাঁদের কথা আগেই বললাম, যাঁরা একটি পশ্চিমি চুক্তি চান, এবং মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে কোনও দায় স্বীকার করতে চান না।

দ্বিতীয়ত, আছে জার্মান-বিরোধী রক্ষণশীল দল, আর প্রতিনিধি উইনস্টন চার্চিল। তাঁরা নাৎসিদের বিশ্বাস করেন না, এবং তাঁদের আশঙ্কা, জার্মানি ইউরোপে একবার সর্বেসর্বা হয়ে উঠলে বিদেশে ব্রিটেনের স্বার্থের বিরুদ্ধতা আরম্ভ করবে। এই প্রসঙ্গে তাঁরা মনে করিয়ে দেন যে ইউরোপের বাইরে ব্রিটেনের ফ্রান্সকে ভয় করার কোনও কারণ নেই, সর্বত্র ব্রিটিশ এবং ফরাসি ঔপনিবেশিক স্বার্থ পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। তৃতীয়ত, সমাজতন্ত্রবাদী ও কমিউনিস্টরা আছেন, যাঁরা আদর্শবাদের কারণে সাধারণ ভাবে জার্মান-বিরোধী ও ফরাসি-পক্ষপাতী।

এই গোলমেলে পরিস্থিতির মধ্যে ব্রিটিশ বিদেশ দপ্তর একটি সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করে চলছে, মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে ফ্রান্সকে তার আগ্রহ প্রশমিত করতে রাজি করা। ভ্যানসিটার্ট-এর নীতি, যে-নীতি লর্ড হ্যালিফ্যাক্স চালিয়ে যাচ্ছেন, সেটা হল জার্মানিকে ইউরোপীয় মূল ভূখণ্ডের একটি শক্তি হিসেবেই থাকতে বাধ্য করা। সেই কারণেই, ব্রিটেন জার্মানির পুনরস্ত্রসজ্জায় বাধা দেয়নি। জার্মানির সঙ্গে ১৯৩৫-এর জুন মাসে নৌ-চুক্তি সম্পাদন করে, ফ্রান্সকে পরামর্শ দেয়, মার্চ ১৯৩৬-এ জার্মানির রাইনল্যান্ডে সামরিক দখলদারী যেন সে অগ্রাহ্য করে, এবং ফ্রান্সকে সতর্ক করে দেয়, স্পেন সরকারকে যেন সে সাহায্য না করে, যদিও আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী ফ্রান্সের তা-ই করার কথা ছিল। তা ছাড়া কূটনৈতিক গোপন তথ্য যাঁদের জানা আছে, তাঁরা বলেন ১৯৩৩ সালে ব্রিটেন পোল্যান্ডকে নাৎসি সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে উৎসাহিত করেছিল। (পরের বছর জার্মানি-পোল্যান্ড অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হয়)। এই ঘটনা বেলজিয়ামকেও ফ্রান্সের সঙ্গে তার মৈত্রী-চুক্তি ভঙ্গ করে নিরপেক্ষতার নীতিতে প্রত্যাবর্তন করতে, এবং যুগোস্লাভিয়াকে, ফ্রান্সের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে ইতালি ও জার্মানির সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করতে উৎসাহিত করে। এর আরও দূর ফলশ্রুতি হিসেবে চেকোস্লোভাকিয়ার নাৎসিপন্থী Henlien Party উৎসাহিত হয়ে ওঠে এবং Little Entente (চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া

এবং রুমানিয়া) এবং Balkan Entente (যুগোস্লাভিয়া, রুমানিয়া, গ্রিস এবং তুরস্ক)-এর পারস্পরিক বন্ধন টুটিয়ে দিতে বা শিথিল করতে প্ররোচিত করে। এই দুটিই হল ফ্রান্স প্রভাবিত অঞ্চল।

এইসব দেখে এ রকম সিদ্ধান্ত করা অনুচিত হবে না, যে ব্রিটিশ বিদেশ দপ্তর গোপনে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে কাজ করছিল (অন্তত ইউরোপে) এবং ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে ফ্রান্সের প্রাধান্য তার অপছন্দ। সম্ভবত এই কারণে ফ্রান্সের দক্ষিণপন্থী রাজনীতিকেরা গ্রেট ব্রিটেনের ওপর বিরক্ত এবং Laval ব্রিটেনের পরোয়া না করে ইতালি ও সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করতে অগ্রসর হন। বস্তুত এক দিক থেকে Laval-এর বিদেশ নীতিকে বলা যায় ব্রিটিশ বিরোধী। কিন্তু বামপন্থী ফরাসি রাজনীতিকরা অন্ধভাবে ব্রিটিশ বিদেশ দপ্তরের নীতি অনুসরণ করেন, কারণ তাঁরা বিশ্বাস করেন, ভাল-মন্দ যাই আসুক ফ্রান্স ও ব্রিটেনকে এক সঙ্গে থাকতে হবে।

বর্তমান জার্মানির বিদেশ দপ্তরের নীতি আক্রমণাত্মক এবং ফ্রান্সের চেষ্টা জার্মানির বিভিন্ন পদক্ষেপ ও'কাজকর্ম কী করে প্রতিহত করা যায়। ব্রিটেনের বাইরে নাৎসিরা বেলজিয়ামে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছে। সে-দেশে একটি নাৎসি-পক্ষপাতী দল (Rexists)-এর জন্ম হয়েছে এবং সে-দেশের ফ্লেমিশ-ভাষী অধিবাসীদের মধ্যে নাৎসিদের প্রচারকার্য এখন অতিশয় তৎপর। বেলজিয়াম সরকার ফ্রান্সের সঙ্গে তাদের মৈত্রী ছিন্ন করেছে, এবং ভবিষ্যতে মধ্য এবং পূর্ব ইউরোপে যুদ্ধ বাঁধলে নিরপেক্ষ থাকবে। ১৯৩৩ সালে নাৎসিরা ক্ষমতা দখল করার পরে কার্যত সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে Rapallo-র চুক্তি খারিজ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু জার্মানির সে-ক্ষতি যাতে পুষিয়ে যায়, মনে হল যেন সে-জন্যই নাৎসি সরকার পোল্যান্ডের সঙ্গে একটি অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করেছে। এই চুক্তির ফলে পোল্যান্ডে ফরাসি প্রভাব প্রভূত পরিমাণে হ্রাস পায়। গত বৎসর ফ্রান্স পোল্যান্ডে তার প্রভাব পুনরুদ্ধার করতে বিপুল প্রচেষ্টা চালায় এবং দু'-পক্ষ থেকেই পরস্পরের দেশে আসা-যাওয়া চলে। কিন্তু যতদূর মনে হয়, ফ্রান্স-পোল্যান্ড মৈত্রী আর কখনওই তেমন জোরালো হবে না, এবং ভবিষ্যতে পোল্যান্ড নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করবে, অর্থাৎ ফ্রান্স-জার্মানি কিংবা রুশ-জার্মানি যুদ্ধ বাধলে নিরপেক্ষ থাকবে।

এ-সব ছাড়াও আর যা ছিল, যা নিয়ে জার্মানি এখন খুব ব্যস্ত, তা হল Little Entente এবং Balkan Entente-এর বন্ধন শিথিল করে, এবং স্পেনের ভূমিতে নিজের দাঁড়াবার একটা জায়গার ব্যবস্থা করে, ফ্রান্সকে দুর্বল করা। কয়েকটি মৈত্রী চুক্তি এবং মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরে আজ ফ্রান্সের অবস্থান অত্যন্ত মজবুত, এবং এই অবস্থা যতদিন চলবে, তত দিন ফ্রান্স মধ্য ও পূর্ব ইউরোপ থেকে তার স্বার্থ প্রত্যাহার করে নেবে না। সে কখনই বলতে ছাড়বে না;— সোভিয়েত বিদেশমন্ত্রী Litvinov-ও তাই বলছেন— যে শান্তি অখণ্ড এবং জাতিসঙ্ঘের ছত্রছায়ায় সমস্ত রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবার জন্য একটিই ইউরোপীয় চুক্তি থাকা উচিত যা জাতিসঙ্ঘের সকল সদস্যের নিরাপত্তা বজায় রাখবে। নতুবা পশ্চিমি চুক্তি ছাড়াও আরেকটি চুক্তি থাকা উচিত, যাতে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে শান্তির নিশ্চয়তা থাকবে। তাতে জার্মানি সম্মত নয়, সম্মত হবেও না।

চেকোস্লোভাকিয়া ও সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে সামরিক মৈত্রী স্থাপন করে ফ্রান্স নিজের নিরাপত্তা সুদৃঢ় করেছে। প্রথমোক্ত দুই শক্তি আবার নিজেদের মধ্যেও একটি সামরিক মৈত্রী স্থাপন করেছে। ফলে কোনও আন্তর্জাতিক জরুরি অবস্থার উদ্ভব হলে ওই তিন শক্তি সর্বদাই ঐক্যবদ্ধ থাকবে। চেকোস্লোভাকিয়ার একটা বোঝাপড়া আছে অন্য দুই Little Entente শক্তি, যুগোস্লাভিয়া ও রুমানিয়ার সঙ্গে। এবং যুগোস্লাভিয়া ও রুমানিয়ার বোঝাপড়া আছে গ্রিস ও তুরস্কের সঙ্গে Balkan Entente-এর মাধ্যমে। জার্মানি আশা করছে, যুগোস্লাভিয়া ও রুমানিয়াকে আলাদা করে দিয়ে সে মধ্য ইউরোপে চেকোস্লোভিয়াকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে, কেননা রাশিয়ার

কাছ থেকে সাহায্য চেকোস্লোভাকিয়ায় পৌঁছতে পারে একমাত্র রুমানিয়া কিংবা পোল্যান্ডের মধ্য দিয়ে। পোল্যান্ড এখন আর জার্মানির কাছে কোনও সমস্যা নয় অনাক্রমণ চুক্তির দরুন। ব্রিটেনের মধ্যস্থায় জার্মানি এখন ফ্রান্সকে বোঝাতে চাইছে, যে সামরিক বিবেচনায় সোভিয়েত রাশিয়ার বিশেষ কোনও গুরুত্ব নেই। ফ্রান্স-সোভিয়েত চুক্তির যে সামরিক শর্ত, ফ্রান্সের উচিত সেগুলিকে অগ্রাহ্য করা। রাশিয়াতে সম্প্রতি সামরিক বাহিনীর আটজন জেনারেলকে যে প্রাণদণ্ড দেওয়া হল, পুঁজিবাদী দেশগুলো তাতে রাশিয়ার বিরুদ্ধতা করবার একটা সুযোগ পেয়ে গেল, এবং তারা জোরদার প্রচার আরম্ভ করেছে, সোভিয়েত সমরযন্ত্রে এখন বিশৃঙ্খলার চূড়ান্ত, এবং যুদ্ধ বাধলে তার ওপরে নির্ভর করা চলবে না। এবং পরিশেষে (এর গুরুত্বও কম নয়) জার্মানি প্রাণপণ চেষ্টা করছে স্পেনের ভূমিতে একটা দাঁড়াবার জায়গা পাওয়ার জন্য, যাতে ফ্রান্সের সঙ্গে যদি যুদ্ধ বাধে সে, উত্তর আফ্রিকার সঙ্গে তার যোগোযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে তাকে পিছন থেকে ছুরি মারতে পারে। ইউরোপে যুদ্ধ বাধলে ফ্রান্স সেখান থেকে চিরকাল বিপুল পরিমাণ সৈন্য ও রসদ সংগ্রহ করে আসছে। জার্মানির আশা, ফ্রান্সকে সব দিক থেকে দুর্বল করে, এবং ব্রিটিশ বিদেশ দপ্তরের মাধ্যমে তার ওপরে চাপ সৃষ্টি করে, শেষ পর্যন্ত তাকে একটি পশ্চিমি চুক্তিতে সম্মত করা যাবে। এবং তার ফলে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে জার্মানির কাজে আর বাধা দেওয়ার কেউ থাকবে না। এতে যদি ফ্রান্স রাজি না হয়, এবং শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষ নিয়ে জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধে নামে সে দেখবে ১৯১৪ সালে তার যে শক্তি ছিল এখন আর তা নেই।

কিন্তু ফ্রান্স কি জার্মানির পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করবে? দেখে তা মনে হয় না। ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে কার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল, ব্রিটেনের তাতে কিছু এসে যায় না। কারণ ব্রিটেনের স্বার্থ ইউরোপের বাইরে। কিন্তু ফ্রান্স অত সহজে তার প্রাধান্য ত্যাগ করতে পারে না, কারণ সে ব্রিটেনের মতো নয়, ঔপনিবেশিক শক্তি হওয়া সত্ত্বেও সে ইউরোপীয় শক্তিও বটে। উপরন্তু, ফ্রান্সের লড়াই শুধু ক্ষমতা ও মর্যাদার জন্য নয়, তার জাতীয় নিরাপত্তার জন্যও। ১৮৭০-এর শোচনীয় পরাজয়ের কথা সে ভোলেনি। তার জনসংখ্যার কোনও হ্রাস-বৃদ্ধি নেই, জার্মানির জনসংখ্যার সেটা দুই-তৃতীয়াংশ, এবং জার্মানির জনসংখ্যা এখনও বেড়ে যাচ্ছে, ফলে জার্মানির আক্রমণের ভয়ে ফ্রান্স প্রকৃতই ভীত। কিন্তু ব্রিটেনের সে ভয় নেই, যতদিন জার্মান নৌবহর ইঙ্গ-জার্মান নৌ-চুক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম না করছে। সর্বোপরি, জার্মানির লক্ষ্য ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে ফ্রান্সে গভীর অবিশ্বাস বিদ্যমান। সেই অবিশ্বাস তীব্রতর হয়েছে হিটলারের Mein Kampf-এ ফ্রান্সের যে প্রচণ্ড অপবাদ আছে, তার দরুন। একজন লেখক যথার্থ বলেছেন, ফ্রান্সে দক্ষিণপন্থীরা জার্মানিকে ঘৃণা করে আর বামপন্থীরা ঘৃণা করে হিটলারকে। এই পরিস্থিতিতে, ফ্রান্স মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে তার মৈত্রী চুক্তি ও মিত্রশক্তি সমূহকে কখনই অস্বীকার করবে কিনা সেটা খুবই সন্দেহের বিষয়, যতদিন প্রচণ্ড জাতীয়তাবাদী নাৎসি দল ক্ষমতায় থাকবে।

স্পেনের গৃহ-যুদ্ধের ফলাফল এখন অনিশ্চিত, জার্মানির কূটনীতি সেখানে কতদূর কার্যকর হবে এখনই বলা যাচ্ছে না। কিন্তু মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে সেই কূটনীতি বেশ খানিকটা সাফল্য লাভ করেছে। রুমানিয়ার রাজা এবং মন্ত্রীসভা মোটের ওপর জার্মানির পক্ষপাতী এবং ফরাসি প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী Titulescu-এর প্রভাব বিশেষভাবে হ্রাস পেয়েছে। একটি ইহুদি-বিদ্বেষী নাৎসী পন্থী পার্টি আছে, Iron Guard, তার নেতা Codreanu। তারা সরকারের সমর্থক। যুগোস্লাভিয়াতে প্রধানমন্ত্রী Stoyadinovitch নাৎসি পন্থী, তাঁর সরকারও তাই। কিন্তু রাজ পরিবার ব্রিটেনের প্রভাবাধীন। গ্রিসে প্রধানমন্ত্রী General Metaxas, যিনি সর্বময় ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়েছেন, নিঃসন্দেহে জার্মান প্রভাবাধীন। গ্রিস জার্মানির কাছে গুরুত্বপূর্ণ কারণ

কৃষ্ণসাগরের রুশ নৌবহর যদি ডারডানেলেস প্রণালী দিয়ে ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করে, গ্রিসীয় দ্বীপসমূহের কোনও ঘাঁটি থেকে তাদের ওপর আক্রমণ করা যেতে পারে। তারপর, হাঙ্গেরি ও বুলগেরিয়ায় দুই 'বঞ্চিত' শক্তি, আশা করা যায়, জার্মানির সঙ্গে যোগ দেবে। যদি তারা মনে করে তাদের জাতীয় অভাব অভিযোগ তার দ্বারা দূর হওয়ার কোনও সম্ভাবনা আছে। অতএব দেখা যাচ্ছে জার্মানি বলকান উপদ্বীপে ফ্রান্সের তুলনায় কার্যসিদ্ধিতে অনেকটা এগিয়ে গেছে, এবং সে প্রচুর পরিমাণে বাণিজ্যিক প্রলোভন বিতরণ করে চলেছে।

কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শেষকথা বলে কিছু নেই, সর্বত্র ফ্রান্স জার্মানির পিছন-পিছন চলেছে। গ্রিসে Metaxas-এর সরকার এবং যুগোস্লাভিয়ায় Stoyadinovitch-এর সরকার কতদিন টিঁকবে বলা কঠিন। রুমানিয়ার ফরাসিপন্থী দল, যদিও এখন ক্ষমতাচ্যুত, অবহেলা করবার মতো নয় এবং সবাই জানে বলকানবাসীরা অতিশয় চঞ্চলমতি। উপরন্তু জার্মানিকে যাঁর মোকাবিলা করতে হচ্ছে তিনি হলেন আধুনিক ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কূটনীতিক চেকোস্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রপতি এডুওয়ার্ড বেনেস।

দৃশ্যপট দিনে দিনে বদলাচ্ছে এবং রাজনৈতিক ভবিষ্যদ্বাণী আদৌ সহজসাধ্য নয়। একটা বিষয় সুনিশ্চিত। যুদ্ধ যদি বাঁধে বাঁধবে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে স্থিতাবস্থা জার্মানি মেনে নেওয়ার দরুন, কিন্তু যুদ্ধ কি বাঁধবে? এর উত্তর নির্ভর করে প্রধানত ব্রিটেনের ওপর। ১৯১৪ সালের ভুলের পুনরাবৃত্তি জার্মানি করবে না, যদি বোঝে ব্রিটেন তার বিরুদ্ধে যাবে তা হলে যুদ্ধে নামবে না। ১৯১৪ সালে যা হয়েছিল তাই হতে পারে, ব্রিটেন যুদ্ধের বাইরে থাকবে মনে করে জার্মানি যুদ্ধের ফাঁদে পড়তে পারে। মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে যুদ্ধ বাঁধলে ফ্রান্স ও ব্রিটেন যদি নিরপেক্ষ থাকতে সম্মত হয়, জার্মানি যে-মুহূর্তে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হবে সেই মুহূর্তেই যে যুদ্ধ বাঁধবে সেটা পূর্ব দিকে সূর্য ওঠার মতোই সুনিশ্চিত। এমনকী ফ্রান্স যদি সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে যোগও দেয়, ব্রিটেন নিরপেক্ষ থাকলে যুদ্ধ বাঁধতে পারে, যদিও তার ফলাফল অনিশ্চিত হবে।

Franco যদি জেতেন সে হবে ইতালি ও জার্মানির জয় এবং তার অর্থ হবে ভূমধ্যসাগরে ব্রিটিশ প্রাধান্যের অবসান, ফ্রান্সের সামনে দুর্দিন। কিন্তু রুশ দৈত্যকে নিয়ে প্রশ্ন প্রায়ই দেখা দেয়। সে প্রহেলিকা নোপোলিয়নকে ধাঁধায় ফেলেছিল। হিটলারেরও কি একই দশা হবে?

ডালহৌসি
২১ অগাস্ট ১৯৩৭

বিজয়কুমার বসু

শ্রীবিজয়কুমার বসুর মৃত্যুতে আমরা সকলেই মর্মাহত। কিছুদিন থেকে তাঁর স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছিল না। কিন্তু কেউই ভাবেনি এত তাড়াতাড়ি এত আকস্মিকভাবে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন।

শ্রীবসু কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন না। আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সত্ত্বেও রাজনীতিতে আমাদের অবস্থান ছিল দুই বিপরীত মেরুতে। এবং এদেশে সচরাচর যা হয়ে থাকে, রাজনৈতিক বিভেদ, সামাজিক সম্পর্কের ওপরেও প্রভাব ফেলেছিল। তবু আমি বিনা দ্বিধায় বলব, সবাই তাঁকে

সম্মান করত। সে শুধু তাঁর অমায়িক স্বভাবের জন্য নয়, তাঁর নিজস্ব একটা চরিত্র ছিল। তাঁর কতকগুলো নীতি ছিল, সে ভুলই হোক আর ঠিকই হোক, তাঁর 'নরমপন্থা' আন্তরিক ছিল। উপরন্তু তাঁর যোগ্যতা ছিল। সেই কারণেই সরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁকে নিয়োগ করতেন—কলকাতা পুরসভার কাউনসিল অব স্টেটে, প্রাদেশিক সরকারে, জেনেভায়। তাঁর বিচারশক্তি ছিল সুপরিণত, এবং তার মতামতের মধ্যে অন্যদের জন্যও বিবেচনার জায়গা থাকত। সেই কারণেই প্রত্যেক গোষ্ঠীর মধ্যেই তাঁর বন্ধু ছিল। কোনও বিষয়ে তিনি একবার মনস্থির করে ফেললে তাঁর ওপর নির্ভর করা যেত। নিঃসন্দেহে পুরসভায় সবাই তাঁকে পছন্দ করত। তা না হলে তিনি একাধিকবার অল্ডারম্যান নির্বাচিত হতে পারতেন না এবং কলিকাতার মেয়রও হতেন না।

শ্রীবসু পরিশ্রমী ছিলেন। তিনি যে-কাজই হাতে নিতেন, যথাসাধ্য ভাল করে করবার চেষ্টা করতেন। আমি প্রায়ই ভাবতাম, উনি কংগ্রেসে যোগ দিলে ভাল হয়। তা হলে তিনি কংগ্রেসের এক মূল্যবান সদস্য হতেন। তাঁর কোনও শত্রু নেই, তাঁর মৃত্যুতে শোক করবার অনেকে আছেন।

সর্বোপরি তিনি ছিলেন ভদ্রলোক। পৃথিবীতে তাঁর মতো ভদ্রলোক আরও দরকার।

মৃত্যুর ছায়ায় দাঁড়িয়ে আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি নীরবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭

দূর প্রাচ্যে জাপানের ভূমিকা[১]

দৈনিক সংবাদপত্র খুলে আমরা রোজই পড়ি চিন ও জাপানের মধ্যে কোনও না কোনও সংঘর্ষের কথা। সে খবর অনেকেই পড়ে দেখেন না, কেননা সে অনেক দূরের ঘটনা, ভারতের তাতে কোনও আগ্রহ বোধ করবার কথা নয়। কেউ-কেউ আবার অভ্যাস বশত সে-খবর পড়েন। কিন্তু ঘটনার যে-সব বিবরণ প্রকাশিত হয়, তার তাৎপর্য আমাদের মধ্যে কত জন বুঝতে পারেন আমি ভাবি।

জাপানিদের স্বদেশ যে-দ্বীপগুলির সমবায়ে গঠিত তাতে জনসংখ্যার চাপ অত্যধিক। ৭ কোটি মানুষের ভার সে-দেশকে বহন করতে হয়, ফলে সেখানকার ভূমির ওপর চাপ অত্যধিক। কিন্তু সমস্যার সেইখানেই শেষ নয়। জাপানিরা বহুপ্রসূ। তাদের জনসংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে অতি দ্রুত বাড়ছে। প্রতি বর্গ মাইলে চিনে বসতি ১০০ জনের আর জাপানে ৩১৩ জনের। উপরন্তু জাপানের জন্মহার গ্রেট ব্রিটেনের দ্বিগুণ, অতএব জাপানের অতিরিক্ত ভূমি দরকার তার সন্তানদের বসতি স্থাপনের জন্য, অতিরিক্ত কাঁচা মাল প্রয়োজন তার বর্ধনশীল শিল্পর জন্য এবং অতিরিক্ত বাজার তার উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য। সে-সব বস্তু উপহার স্বরূপ কেউ জাপানকে দান করবে না, তাই শক্তি প্রয়োগ করার কথা আসে। এ ছাড়া

১. মডার্ন রিভিউ, অক্টোবর ১৯৩৭ সংখ্যায় প্রকাশিত এবং সুভাষ সি. বোস, থ্রু কংগ্রেস আইজ (কিতাবিস্তান, এলাহবাদ এবং লন্ডন, ১৯৩৮)-এ পুনর্মুদ্রিত।

অন্য একটি মাত্র পথ আছে জাপানের সমস্যা সমাধানের, জন্ম নিয়ন্ত্রণের দ্বারা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, তার নিজের যা সম্পদ আছে সেই অনুযায়ীই জীবনধারণ করা। কিন্তু সে-সমাধান জাপানের পছন্দ নয়, বোঝাই যাচ্ছে। সংক্ষেপে এই হল raison d'etre অর্থাৎ জাপানের সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের সেইতাই হল কারণ।

সম্প্রসারণ করতে গেলে জাপানকে চিন, রুশ, ব্রিটিশ কিংবা মার্কিন প্রতিরোধের সম্মুখীন হতেই হবে। যদি সে সম্প্রসারণ ঘটায় এশিয়ার মূল ভূখণ্ডে কোপ পড়বে চিন কিংবা রাশিয়ার, যদি দক্ষিণ দিকে ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জের কিংবা অস্ট্রেলিয়ার দিকে রাজ্যবিস্তার করতে চায় সংঘর্ষ বাধবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অথবা গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে। যতদূর বোঝা যাচ্ছে জাপান প্রথম বিকল্পটিই বেছে নিয়েছে, যদিও Lt. Commander Ishimaru তাঁর Japan Must Fight England গ্রন্থে আবেদন করেছেন, জাপান যেন চিন, রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মিটমাট করে ইংল্যান্ডের সঙ্গে যুদ্ধ করার ওপর জোর দেয়। এশিয়ার মূল ভূখণ্ডে জাপানের নজর যার ভূমির ওপর সে হল রাশিয়া কিংবা চিন। রাশিয়া আক্রমণ করলে জাপান নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেবে, কারণ সোভিয়েত শাসনে রাশিয়া পুরোপুরি জেগে উঠেছে। তা ছাড়া তার আছে প্রথম শ্রেণির সমরযন্ত্র ইউরোপে এবং দূরপ্রাচ্যেও।

অতএব নিজের সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করতে হলে জাপানের চিনকে আক্রমণ করা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু চিনের লোকসান করে জাপান যদি নিজের সম্প্রসারণ ঘটাতেও পারে রাশিয়ার প্রতিরোধের মুখে তাকে পড়তেই হবে। তার কারণ একটু পরেই ব্যাখ্যা করব। আর, ব্রিটেনের কথা বলতে গেলে, এশিয়া মহাদেশে জাপানের শক্তিবৃদ্ধি যতই তার অপছন্দ হোক, সেই অপ্রিয় ঘটনা সহ্য করা ছাড়া তার উপায় নেই, কেন না সে জানে, তার একমাত্র বিকল্প হচ্ছে জাপানের দক্ষিণ দিকে বিস্তারলাভ, যার ফলে তার সঙ্গে জাপানের সরাসরি সংঘর্ষ অনিবার্য হবে। এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এখন যা মনোভাব নিজের স্বার্থরক্ষায় দূর প্রাচ্যে সে কখনওই যুদ্ধ করতে যাবে না।

জাপান যেহেতু এশিয়ার একটি দেশ, এবং এক বৃহৎ মহাদেশের সন্নিকটে অবস্থিত স্বভাবতই সে তার সাম্রাজ্যবাদী প্রয়োজন পূর্ণ করবার জন্য এশিয়ায় মূল ভূখণ্ডের দিকেই প্রধানত দৃষ্টি দিতে হবে। সেখানে, সে দেখছে, দাঁড়িয়ে আছে এক বিশাল রাষ্ট্র, আগে যার নাম ছিল স্বর্গীয় সাম্রাজ্য, এখন সেটি চিন প্রজাতন্ত্র, যার শাসন অপটু, যা বিভেদে দীর্ণ যার প্রাকৃতিক সম্পদ এত যে তার ব্যবহার সে ঠিক মতো করতে পারে না। এই রাষ্ট্রের বিশাল আয়তন, এর অন্তর্নিহিত সম্পদ, এবং এর অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা জাপানের সামনে এক বিরাট প্রলোভন।

এই দুই এশীয় শক্তির মধ্যে সংঘর্ষের বয়স চল্লিশ বছরের বেশি। তার সূত্রপাত হয়েছিল গত শতাব্দীর শেষ দিকে। তত দিনে আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করে জাপান তার রাষ্ট্রযন্ত্রকে আধুনিক করে ফেলেছে, এবং আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রেও সজ্জিত হয়ে উঠেছে। সে দেখেছে সব বৃহৎ ইউরোপীয় শক্তিই চিনদেশকে শোষণ করতে আরম্ভ করেছে এবং নিজেদেরকে যে সম্পদশালী করে তুলেছে তার জন্যে মূল্য দিতে হয়েছে চিনকে। তা হলে জাপান, যে চিনের নিকটতম প্রতিবেশী একটি এশীয় শক্তি, সেই-বা সে-কাজ করবে না কেন, পাশ্চাত্য শক্তিগুলোর প্রাচ্যের সম্পদ হস্তগত করা কেন বন্ধ করবে না? সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের প্রতিযোগিতায় জাপানের যোগদানের পিছনে এই ছিল যুক্তি।

বিগত চল্লিশ বছরে চিন সরকারের কাছ থেকে সুবিধা আদায়ের একটি সুযোগও জাপান ছাড়েনি, এবং এই সময়ে ধীরে-ধীরে কিন্তু সমানে পাশ্চাত্যের শোষণকারী শক্তিগুলোর প্রভাব সে খর্ব করে চলেছে। তার সবেচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল রাশিয়া, ব্রিটেন, মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্মানি। ১৯০৪-০৫-এর রুশ-জাপান যুদ্ধের সময়ে সে জারের সাম্রাজ্যকে পরাস্ত করেছিল। মহাযুদ্ধের সময়ে সে চিনদেশের মানচিত্র থেকে জার্মানিকে মুছে দিতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সে বেকায়দায় ফেলতে পারেনি। ইতিমধ্যে একদা পরাজিত রাশিয়া সোভিয়েত রাষ্ট্রের রূপ নিয়ে আবার আত্মপ্রকাশ করেছে, নতুন ভাবে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে, নতুন শক্তি নিয়ে।

চিন দেশের টুকরো-টুকরো হয়ে ভেঙে পড়া আরম্ভ হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে। ব্রিটেন, রাশিয়া, জার্মানি ইত্যাদি ইউরোপীয় শক্তিসমূহ, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চিন দেশের ওপর চাপ দিতে আরম্ভ করে এবং হংকং, সাংহাই ইত্যাদি বন্দর Treaty Ports চুক্তির ভিত্তিতে দখল করে নেয়। কার্যত সেটা হল চিনা ভূমি দখল করা। গত শতাব্দীর শেষ লগ্নে জাপান রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়, এবং চিনের ব্যাপারে পাশ্চাত্য কৌশল অবলম্বন করে।

চিনের দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত ফরমোসা দ্বীপ জাপান ১৯০৪-১৯০৫-এর যুদ্ধে দখল করে নেয়। প্রায় একই সময়ে জাপান দখল করে কোয়ানটুং রেলপথ, এবং চাইনিজ ইস্টার্ন রেলওয়ের দক্ষিণ অংশ, যে রেলপথ গেছে মাঞ্চুরিয়ার মধ্যে দিয়ে। তার ফলে দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া জাপানি প্রভাবিত অঞ্চল হয়ে দাঁড়ায়। কোরিয়া, আগে যেটি ছিল চিনের অন্তর্গত, জাপান ১৯১০ সালে খোলাখুলি নিজের অধিকারে নিয়ে আসে। লক্ষ করবার বিষয়, জাপান যখন ১৮৯৪ সালে চিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করে, কোরিয়ার স্বাধীনতা সে রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। মহাযুদ্ধের সময়ে জাপান জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে Tsingtao ও Shantang উপদ্বীপে অন্যান্য জার্মানি-অধিকৃত স্থান অধিকার করে নেয়। ১৯১৫ সাল জাপান যেন দেখল পাশ্চাত্য শক্তিগুলি সবাই যুদ্ধ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, সে চিনকে ২১ দফা দাবি জানাল। এবং তার কাছ থেকে কয়েকটি সুবিধা আদায় করে নিল। যুদ্ধের পর জাপান, যুদ্ধ থেকে লাভে তার অংশ হিসাবে, আগে যা জার্মানির অধিকৃত স্থান অধিকার করে নিল, এবং Pacific Islands শাসন করবার অধিকার লাভ করল। ওই দ্বীপগুলি এই কারণে সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ যাওয়ার সরাসরি সামুদ্রিক পথের ওপরেই সেগুলি অবস্থিত।

এর পরে কিছুকাল জাপানের সম্প্রসারণের অগ্রগতি একটু শ্লথ হয়ে পড়েছিল, কারণ যতটা ভূমি লাভ করা গেছে তাকেই ঠিকমতো হজম করবার জন্য সময়ের দরকার ছিল। আবার তৎপরতা আরম্ভ হল ১৯৩১ সালে, মাঞ্চুকুও জয়ের সঙ্গে। মাঞ্চুকুও, মাঞ্চুরিয়া আগে ছিল চিন দেশের অন্তর্গত, তাকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্থাপন করা হল, যেমন ১৮৯৫ সালে কোরিয়াকে করা হয়েছিল। ১৯২৮ সালের বিখ্যাত, কিংবা কুখ্যাত, Tanaka Memorandum-এ এশীয় ভূখণ্ডে জাপানের সাম্রাজ্য বিস্তারের ভবিষ্যত পরিকল্পনা পরিষ্কার ব্যক্ত হয়েছিল। এখন যে সম্প্রসারণের অভিযান ১৯৪১ সাল থেকে চলছে, তার মূল সেই Tanaka Memorandum এই পাওয়া যাবে। এই যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিলাম, এ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাবে, আমাদের এই ভূমণ্ডলে নিজের জন্য অতিরিক্ত স্থান সংগ্রহ করার সংকল্প থেকে জাপান বিচ্যুত হবে না। বাইরের পরিস্থিতি এই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। বরং এটাই সর্বোত্তমভাবে নির্ণীত হবে, সে কোনদিকে যেতে চায়, তার বিস্তৃতির গতি কেমন।

জাপানের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি বিজ্ঞানসম্মত ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে ১৯৩১ সাল থেকে জাপানের সামরিক অভিযানের কারণ বোঝা যাবে। জাপানের জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং তার বর্তমান আয়তন এখনকার জনসংখ্যার পক্ষেই যা অপ্রতুল। দেখলেই বোঝা যায় নিজের আয়তন বৃদ্ধি তার কেন দরকার। জাপানের শিল্পর যা রীতি তাতে তার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল, যেমন তুলা পশম, লোহা, তেল ইত্যাদি বহু দূর থেকে আমদানি করতে হয়। যেমন তার আয়তনে বিস্তার, তেমন তার শিল্পেরও আকার বৃদ্ধি প্রয়োজন তার জনসংখ্যার বৃদ্ধির

কারণে। তার বিপুল জনসংখ্যার জন্য জাপানের প্রয়োজন কাঁচামালের নিয়মিত এবং সুনিশ্চিত সরবরাহ। শিল্পের প্রসারের জন্য আবার নতুন-নতুন বাজারও দরকার।

এখন এসব প্রয়োজন পূর্ণ হবে কী করে? চিন কি জাপানের উপনিবেশ স্থাপনের জন্য স্বেচ্ছায় জমি ছেড়ে দেবে? তার কাঁচা মালের যে বিপুল ভাণ্ডার, তার যে বিশাল বাজার জাপানের হাতে কি সে তা ছেড়ে দেবে? অবশ্যই দেবে না। তার জাতীয় মর্যাদা, তার নিজের স্বার্থচিন্তা তাকে তা করতে দেবে না। তা ছাড়া ইউরোপীয় শক্তিসমূহ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছায় চিনের ওপর তার কাঁচা মালের ভাণ্ডার, তার বাজারের উপর একচেটিয়া অধিকার কায়েম করতে দেবে না। শেষ পর্যন্ত যে তারা চাইবে চিনে খোলা দরজা নীতি যাতে চিনকে দোহনের সুযোগ যাতে সবাই পায়। অতএব, জাপানকে চিনের ভূমি দখল করতে হবে জোর করে, সে তাই করে চলেছে, ক্রমে-ক্রমে, এক-এক করে খানিকটা করে জমি কামড়ে নিয়ে কিছুকাল ধরে গাল হজম করছে। প্রত্যেকটি আক্রমণের আগে সীমান্তে কিছু না কিছু ঘটনা ঘটানো হচ্ছে, আক্রমণের অজুহাত সৃষ্টি করার জন্য। কৌশল একই, তা সে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তেই হোক, কিংবা আবিসিনিয়ার ওয়ালওয়াল—এই হোক, কিংবা দূর প্রাচ্যে মাঞ্চুরিয়ার সীমান্তেই হোক।

দূরপ্রাচ্যে জাপানের সাম্রাজ্যবাদী প্রয়োজন ও দাবিসমূহ পূরণ সম্ভব একমাত্র যদি সে চিন দেশের ওপর রাজনৈতিক আধিপত্য কায়েম করতে পারে, শ্বেতাঙ্গ জাতিগুলোকে সেখান থেকে দূরে রাখতে পারে, খোলা দরজা নীতি কার্যত বাতিল করতে পারে। জাপানের রাজনীতিকেরা বারে-বারে সে-কথা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। যেমন, জাপানের মুখপাত্রেরা প্রায়ই বলে আসছেন, যে দূর-প্রাচ্যে তার বিশেষ স্বার্থ আছে। তার সঙ্গে অন্য কোনও পাশ্চাত্য শক্তির তুলনা চলে না। অর্থাৎ দূর প্রাচ্যে জাপানই হবে নিয়ন্ত্রক, সেখানকার শান্তি বজায় রাখবে সে-ই। সন্দেহ নেই নিছক অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়াও, জাপান একটি সাম্রাজ্য স্থাপনেরও উচ্চাভিলাষের দ্বারা অনুপ্রাণিত। এ বিষয়েও তারা সচেতন যে তাদের দেশ কেউ কোনও দিন জয় করতে পারেনি, তাতেই তাদের সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধা আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে, বিদেশে সাম্রাজ্য স্থাপন করতে পারলে জাপানি সমাজে ফ্যাসিবাদী শক্তি সমূহ অন্যদের ওপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

কোনও রকমে চিন যদি জাপানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভুত্ব, কিংবা জাপানের মাতব্বরি মেনে নিতে রাজি হয়, চিন-জাপান যুদ্ধের অবিলম্বে অবসান হবে। জাপানের অগ্রগণ্য কূটনৈতিক হিরোতা গত তিন বছর ধরে সেই চেষ্টাই করে যাচ্ছেন। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর বক্তৃতাগুলো থেকে মনে হয় তিনি আপোস করতে খুবই আগ্রহী, অনবরত তিনি চিন-জাপান সহযোগিতার কথা বলে যাচ্ছেন। কিন্তু এই সহযোগিতার উদ্দেশ্য কী? জাপানের অধিকতর সমৃদ্ধি কার্যত চিনের দাসত্ব। কিন্তু এই নগ্ন সত্যটি মুখে উচ্চারণ করা চলবে না, জিগির তুলতে হবে 'কমিউনিজমের বিরুদ্ধে সহযোগিতামূলক ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ।' এই স্লোগান শুধু যে জাপানের আসল লক্ষ্যটি এক চোখের আড়াল করে রাখে তাই নয়, জাপানে, চিন দেশে কিংবা অন্যত্র যে সমাজতন্ত্রবিরোধী শক্তি আছে তাদেরকেও খুশি করে। সেই জন্য ৭ অগাস্ট ১৯৩৭-এর ভারতীয় সংবাদ পত্রগুলি হিরোতার বিদেশ নীতির বিবরণ দিয়ে লিখেছিল:

'কমিউনিজমের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধই যে চিনের কাছে জাপানের আবেদনের মূল বক্তব্য, সে-কথা ঘোষণা করে House of Representative-এ মি. হিরোতা বলেছেন, চিন জাপান সহযোগিতা সম্ভব হবে যদি চিনে বিপ্লবপন্থী যারা আছে, তাদেরকে, বিশেষত কমিউনিস্টদেরকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা যায়। তিনি আরও বলেন, জাপান সরকার উত্তর-চিনের ঘটনাটির মীমাংসা সঙ্গে-সঙ্গে করতে চায়, এবং সেই সঙ্গে চায় চিন-জাপান সম্পর্কের একটা মৌলিক পরিবর্তন আসুক'।

একই ধরনের বিবৃতি, একই ধরনের ভাষায় হিরোতা দিয়ে যাচ্ছেন, বছর কয়েক আগে জাপানের বিদেশ মন্ত্রী হওয়ার পর থেকে।

চিন কি এ-সব দাবি মেনে নিতে পারে, যদি তাতে শান্তি আসে? আমার নিজের মনে হয়, নানকিং কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বময় কর্তা মার্শাল চিয়াং-কাই-শেক, যদি তাঁকে কেউ না বাধা দিত মেনে নিতেন। অন্তরে-অন্তরে তিনি প্রচণ্ড কমিউনিস্ট বিরোধী এবং কুওমিনটাং (চিনা জাতীয়তাবাদী দল) যখন ১৯২৭ সালে ভাগ হয়ে গেল, এবং তিনি তাঁর সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হলেন, চিনা কমিউনিস্ট ও তাদের মিত্রদের উৎখাত করতে চেষ্টার তিনি কোনও কসুর করেননি। কিন্তু দু' দিক থেকে মার্শাল চিয়াংকে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। চিনের পশ্চিমের প্রদেশগুলি, চিনা-সোভিয়েত প্রদেশ বলে যেগুলো অভিহিত, সেগুলো কার্যত নানকিং-এর অধীন ছিল না। তারা জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছিল এবং এ-বিষয়ে চিনা জনসাধারণের মনোভাবই মেনে চলেছিল। দ্বিতীয়ত, পাশ্চাত্য শক্তি সমূহ চিনে যাদের বিপুল স্বার্থ জড়িত ছিল, এবং প্রাচ্য জাতি সমূহের চোখে যাদের আত্মমর্যাদা বজায় রাখার প্রশ্ন ছিল, ল্যাটিন আমেরিকা (মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা) বিদেশি বিনিয়োগের সমূহ লোকসানে তাদের রাজি হওয়া কঠিন। আর, চিনদেশে যে ব্রিটিশ বিনিয়োগ সে-বিষয়ে ১৯ আগস্ট ১৯৩৭-এর লন্ডন টাইমস-এর এই বিবরণটি পাঠ করলে কিছু জ্ঞানলাভ হতে পারে:

'চিন দেশে প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ বিনিয়োগের মূল্য ২৫ কোটি পাউন্ড। তার মধ্যে, প্রায় ২০ কোটি পাউন্ড ব্যবসায়িক বিনিয়োগে এবং ৫ কোটি পাউন্ড সরকারি দায়বদ্ধতার দরুন। মোট অর্থের মধ্যে প্রায় ১৮ কোটি পাউন্ড সাংহাই-এ আটকে আছে, এবং ১৮ কোটি পাউন্ডের একটি বড় অংশ আছে সুচাউ খাঁড়ি উত্তরে সেটলমেন্ট জেলায়। এই জেলার ওপরেই এখনও গোলা ও বোমাবর্ষণ চলছে সবচাইতে প্রবলভাবে। এইখানেই অবস্থিত অধিকাংশ জনসেবামূলক অফিস ও কর্মকেন্দ্র এবং অধিকাংশ বড়-বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।'

টাইমস সক্ষোভে আরও বলেছে, আগে এই জেলায় পুলিশের কাজ চলত ব্রিটিশ অধ্যক্ষের অধীনে, এখন পুলিশ স্টেশানগুলি খালি করে দিয়ে জাপানিরা নিজেরা দখল করে নিয়েছে। কাজেই শ্বেতকায় জাতিগুলি বুঝতে পারছে, চিনে জাপানি আধিপত্যের ফলে চিনই শুধু পদানত হবে না, তাদের নিজেদেরও দূরপ্রাচ্য থেকে বিদায় নিতে হবে। কোনও দেশের রণকৌশল যেহেতু প্রায়ই তার ভূগোলের ওপর নির্ভর করে অতএব চিনদেশের প্রধান ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ করা দরকার।

চিন দেশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের পথ হল তার তিন নদী, উত্তরে হোয়াং হো (পীত নদী), মধ্য ভাগে ইয়াং সি এবং দক্ষিণে সি-কিয়াং। সি কিয়াং-এর প্রবেশ পথের নিয়ন্ত্রণ ব্রিটিশ বন্দর হংকং-এর হাতে। ইয়াং সি-র প্রবেশ পথ নিয়ন্ত্রণ করে সাংহাই, যে শহরে কর্তৃত্ব যৌথভাবে বিভিন্ন বিদেশি শক্তির, যার মধ্যে প্রাধান্য ব্রিটেন এবং আমেরিকার; হোয়াং হো-র প্রবেশপথ জাপানের আধিপত্যের অধীন। প্রথমে তারা কোরিয়ায় ঘাঁটি গেড়ে বলেছিল, এখন মাঞ্চুরিয়া (মাঞ্চুকুও) তাদের দখলে। চিনে যাবার একটি মাত্র কার্যোপযোগী স্থলপথ উত্তরের দিকে। এই পথে মোঙ্গল ও মাঞ্চুরা মূল চিনে প্রবেশ করেছিল, এবং মহাযুদ্ধের আগে রাশিয়া এবং জাপান দু' দেশেরই তার ওপর নজর ছিল। ১৯৩১ থেকে জাপান এই পথটি এবং এর নিকটবর্তী অঞ্চল দখল করবার আশায় আছে, এবং জুলাই ১৯৩৭ থেকে এখানে সংঘর্ষ চলছে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার মূল চিন দেশ উচ্চ পর্বতমালা দ্বারা প্রজাতন্ত্রের পশ্চিম অঞ্চল (সি কিয়াং অর্থাৎ চিনা তুর্কীস্তান) থেকে বিচ্ছিন্ন। তার ফলে চিন দেশে যাবার স্থলপথ এসেছে উত্তর দিক থেকে এবং দেখা গেছে মাঞ্চুরিয়া যে-দেশের হাতে, চিন দেশের ওপর আধিপত্য করার সুবিধা তাদেরই হয়।

দূর প্রাচ্যের ১৯৩১ সালের পরবর্তী ঘটনাবলী বুঝতে হলে জাপানি রণকৌশলের রূপরেখা মোটামুটি একটা ধারণা দরকার। চিনদেশে জাপানি আধিপত্য প্রতিষ্ঠা শান্তিপূর্ণ উপায়ে অনুপ্রবেশের দ্বারা যেহেতু সম্ভব হল না, জাপান সামরিক বলের সাহায্যে চিন অধিকারের কিংবা অন্তত চিনের ওপরে একটা সামরিক চাপ সৃষ্টির পরিকল্পনা করেছিল। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য জাপানের রণকৌশল দুটি পথ ধরে অগ্রসর হল, প্রথমত চিনের অখণ্ডতা ভঙ্গ করা দ্বিতীয়ত অন্য কোনও শক্তি যে চিনের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে সে পথ বন্ধ করে দেওয়া। এই উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে একমাত্র যদি চিন প্রজাতন্ত্রের সমগ্র উত্তরাঞ্চল মাঞ্চুকুও, মঙ্গোলিয়া, মূল চিনের উত্তরভাগ সমেত জাপান দখল করে নিতে পারে। এই সমস্ত অঞ্চল একত্রে এক দৃঢ়বদ্ধ ভূখণ্ড। এই ভূখণ্ডটি মূল চিন (হোয়াং হো, ইয়াং সি ও সি কিয়াং নদীর অববাহিকা)-কে রুশ সাইবেরিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। মানচিত্র দেখলেই বোঝা যাবে, এই অঞ্চল যদি জাপান দখল করে বসতে পারে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে সে বহির্মঙ্গোলিয়া ভেদ করে গিয়ে বৈকাল হ্রদে Trans-Siberian রেলপথকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে পারে। এবং রাশিয়াকে যদি প্রকৃতই বিচ্ছিন্ন করা যায়, বিপদের সময়ে চিনকে রক্ষা করতে কেউ এগিয়ে আসতে পারবে না। ১৯৩১ সাল থেকে এই অঞ্চল অধিকার করার কাজে জাপান কতটা এগিয়েছে, দেখা যাক।

প্রথমেই লক্ষ করতে হবে, জাপান কখনওই তাঁর পরিকল্পনা পুরোপুরি কাউকে বলে না। পররাজ্য গ্রাসের কাজে সে এগোয় সন্তর্পণে। এ বিষয় সে সদা সতর্ক, যাতে সে নিজে যখন খুব ব্যস্ত অন্য কোনও শক্তি তাকে আক্রমণ না করে। তা ছাড়া সে সব সময়েই একটা ঘটনা ইচ্ছে করে ঘটায়, যাতে চিনা ভূমি দখল করে নেওয়ার একটা অজুহাত পাওয়া যায়। প্রথম ঘটনাটি ঘটানো হয় ১৯৩১-এর ১৮ই সেপ্টেম্বর জাপানি ইম্পিরিয়াল আর্মি লেফটেন্যান্ট কারামোতোকে দিয়ে। তিনি দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলপথ নিরীক্ষা করছিলেন। তার ফলে পরের দিনই মুকদেন দখল করে নেওয়া হল, এবং সমগ্র মাঞ্চুরিয়া রেলপথও অল্পদিনের মধ্যেই অধিকৃত হল। সেই সময়ে সারা বিশ্ব এক তীব্র মন্দার কবলে পড়েছিল এবং রাশিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করছিল তার প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে। কাজেই জাপানের কোনও সন্দেহ ছিল না যে তার পররাজ্যগ্রাসে কেউ বাধা দিতে আসবে না। জাতিসঙ্ঘ লিটন কমিশনকে এ বিষয়ে খোঁজ নেবার জন্য নিয়োগ করে। তারা যে সংবাদ দেয়, তার ভিত্তিতে, জাতিসঙ্ঘ জাপানের মাঞ্চুরিয়া অধিকারের নিন্দা করল। কিন্তু জাতি সঙ্ঘকে জাপান তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিল, বেরিয়ে গেল জাতিসঙ্ঘ থেকে। তারপর ১৯৩৩ সালে সোভিয়েট ইউনিয়ন মাঞ্চুকুওকে চিনা পূর্ব রেলপথ বিক্রি করে দিল, এবং ১৯৩৪-এ রুশো-মাঞ্চুকুও জলপথ চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। অন্যান্য শক্তিগুলি মাঞ্চুকুওকে আইনগত স্বীকৃতি না দিলেও তাদের অধিকাংশের কাছ থেকে সে কার্যকর স্বীকৃতি পেয়ে গেল।

মাঞ্চুকুও এক বিশাল প্রদেশ। সেখানে উপনিবেশ স্থাপনের প্রচুর জায়গা, যদিও সেখানকার আবহাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর। খনিজ সম্পদও সেখানে প্রচুর। বিশেষত কয়লা। উপরন্তু রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ হলে জাপানের সেখান থেকে আক্রমণ হানার খুব সুবিধা হবে। অনেকে ভেবেছিলেন, মাঞ্চুকুওকে ঠিকমতো বিকশিত করে তুলতে জাপানের অনেক সময় লাগবে এবং তত দিন দূর প্রাচ্যে শান্তি বজায় থাকবে। কিন্তু তাঁরা ভুল করেছিলেন। অর্থনৈতিক ভয়েই হোক আর সাময়িক ভাবেই হোক, মাঞ্চুকুও একা দাঁড়াতেও পারে না। জাপানের আকাঙ্ক্ষিত সে-সব কাঁচা মাল, তার কোনও-কোনওটিই কেবল মাঞ্চুকুওতে পাওয়া যায়, এবং মাঞ্চুকুও বাজার এত বড় নয় যাতে জাপানের প্রয়োজন মিটতে পারে। তার ওপরে সামরিকভাবে মাঞ্চুকুও অত্যন্ত দুর্বল, শত্রু-পরিবেষ্টিত। কাজেই, নিজের অর্থনৈতিক প্রয়োজনে এবং নতুন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবার জন্য, জাপানকে পররাজ্য আক্রমণ চালিয়েই যেত হল।

১৯৩২ সালে আরেকটি ঘটনা মঞ্চস্থ হল সাংহাইয়ে এবং চিন-জাপানের সাংহাই যুদ্ধ আরম্ভ হল। তার ফল এই হল, যে সাংহাইয়ের কাছে একটি জায়গা থেকে চিন সামরিক শক্তি প্রত্যাহার করতে এবং জাপানের আরও কয়েকটি শর্ত মেনে নিতে বাধ্য হল। সাংহাইয়ের সামরিক গুরুত্ব ১৯৩২ সালে ততটা স্পষ্ট হয়নি, বর্তমান যুদ্ধেই (১৯৩৭) সেটা পরিষ্কার বোঝা গেল।

১৯৩৩-এর মধ্যে জাপানের হাতের ক্রীড়নক সম্রাট পু ই-র অধীনে মাঞ্চুকুওকে সংগঠিত করা সম্পূর্ণ হল এবং জাপান তার সীমানা আরও প্রসারিত করবার জন্য প্রস্তুত হল। উত্তর চিনে মাঞ্চুকুওর সীমান্তের বাইরে সংঘর্ষ হল। জাপানি বাহিনী জেহোল দখল করল, চাচার-এর একটা অংশ দখল করে পিকিং (বর্তমান Peiping)-এর প্রবেশদ্বারে গিয়ে হাজির হল। যুদ্ধে হেরে গিয়ে চিন যা অনিবার্য তাকে মেনে নিতে বাধ্য হল। তার কয়েক খণ্ড জমি জাপানের অধিকারে চলে গেল। যুদ্ধ শেষ হল ১৯৩৩-এর Tangku Truce-এ

১৯৩৪ সালে তেমন কোনও ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু ১৯৩৫ সালে আবার যুদ্ধ বাঁধল। জাপানের বেলায় যা বরাবর হয়ে থাকে, আবার আক্রমণ, তার আগে আবার মুখে শান্তির বাণী, বিদেশ নীতিতে নরমপন্থার কথা বলা। ১৯৩৫-এর ২৩ জানুয়ারি হিরোতা বক্তৃতা দিলেন, অনাক্রমণ চুক্তির গুণগান করলেন, বললেন সুপ্রতিবেশীসুলভ নীতির কথা, যাতে চিনের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়। এবার জাপানের স্লোগান হল স্বশাসিত উত্তর চিন (স্বশাসিত মাঞ্চুকুওর মতো) এবং জাপানের নতুন রাজধানী নানকিং-এ অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকরাকে বলা হল সে যেন উত্তর চিনে জাপানি কার্যকলাপ এবং উত্তর চিনের সঙ্গে তার আলাপ-আলোচনায় হস্তক্ষেপ না করে। কিন্তু নানকিং জাপানকে পুরোপুরি সন্তুষ্ট করতে পারল না, এবং ১৯৩১ সালে মাঞ্চুরিয়ার অধিবাসীরা যা করেছিল, অর্থাৎ অন্ধভাবে জাপানি ফাঁদে প্রবেশ করা— উত্তর চিনের লোকরা তা করতে চাইল না। ফলে জাপানি পরিকল্পনা ব্যর্থ হল। তা হলেও সংঘর্ষের যখন শেষ পর্যন্ত অবসান হল, দেখা গেল চিন তার দেশের মাটির আরেকটি খণ্ড খুইয়ে বসে আছে।

১৯৩৩ সালে মাঞ্চুকুও জেহোল এবং চাচার-এর একটা অংশ আত্মসাৎ করে নেয়। এখন, হোপেই প্রদেশে একটি নিরস্ত্রীকৃত এলাকা তৈরি করা হয়। পিপিং-এর ১২ মাইল পূর্বে অবস্থিত তুংচাও তার রাজধানী। এর নাম দেওয়া হয় পূর্ব হোপেই স্বশাসিত অঞ্চল। এর শাসনভার দেওয়া হয় চিনা দেশদ্রোহী ইন-জু-কেঙ-এর হাতে। সেখানে সর্বেসর্বা জাপানিরাই ছিল। (পরবর্তী কালে এই অঞ্চলে ব্যাপক চোরাচালানের কারবার আরম্ভ হয়, জাপানি প্রশ্রয়ে। উদ্দেশ্য চিনা শুল্ক বিভাগকে এড়িয়ে যাওয়া।)। তা ছাড়া হোপেই-এর অবশিষ্ট অংশ (তার অন্তর্গত পিপিং ও তিয়েন্তসিন) এবং চাচার-এর একটি অংশকে যুক্ত করে একটি স্বতন্ত্র প্রশাসনিক অঞ্চল গঠন করা হয়— জেনারেল সাং চে উয়াং-এর নেতৃত্বাধীন হোপেই-চাচার রাজনৈতিক পরিষদ-এর অধীনে। নানকিং-এর বাইরে তিনিই সবচেয়ে ক্ষমতাবান নেতা। এই কাউন্সিল খোলাখুলি জাপানের বিরোধিতা করতে সাহস করেনি। কিন্তু নানকিং-এর সঙ্গেও সম্পর্কচ্ছেদ করেনি। ১৯৩৬ সালে টোকিওতে একটি সামরিক অভ্যুত্থান হয় এবং কিছুকাল জাপানি সরকার তাই নিয়েই ব্যতিব্যস্ত ছিল। তা হলেও তারা একদম নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়নি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থানকে আরও মজবুত করবার জন্য জাপান জার্মানির সঙ্গে এক চুক্তি করে। জার্মান-জাপানি কমিন্টার্ন বিরোধী চুক্তি ১৯৩৬-এর নভেম্বরের শেষভাগে ইনার মঙ্গোলিয়া-র ভিতরে পিনিং-পাওটো রেলপথ প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়। (অনুবাদক: এখানে মনে হয় ছাপার কিছু ভুল আছে, সে-কারণে বক্তব্যটি স্পষ্ট নয়), কিন্তু জাপানের মোঙ্গোল-মাঞ্চুকুও পেশাদারি সৈনিকদের নানকিং-এর সৈন্যদের সহায়তায় জেনারেল ফু শো ই আটকে রাখেন সুইয়ান প্রদেশে।

ইতিহাসের যে কোনও ছাত্র এটা পরিষ্কার বুঝতে পারবেন যে, ১৯৩১ থেকে জাপান শুধু দূর প্রাচ্যেই নয়, সাধারণ ভাবে বিশ্ব রাজনীতিতেও নিজেদের বক্তব্য জোর গলায় ব্যক্ত করে চলেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাপান যদি নিজেদের শক্তি সম্পর্কে সচেতন না হত, চিন আক্রমণ করবার সাহস সে কখনওই করত না। মাঞ্চুরিয়া অধিকার করে নেওয়ার পর জাপানের জাতিসঙ্ঘ ত্যাগের কথা আগেই বলেছি। তার আগে ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী সে তামাদি হয়ে যেতে দিয়েছে, সম্ভবত এই কারণে যে সে মনে করেছিল তার নিজেরই যা শক্তি, তাতে সে-চুক্তির তার আর প্রয়োজন নেই।

ওয়াশিংটন নৌ-চুক্তিতে জাপান সম্মত হয়েছিল যে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার নিজের যুদ্ধ-জাহাজের সংখ্যার অনুপাত হবে ৫: ৫: ৩। সে-চুক্তি যখন ১৯৩৫ সালে তামাদি হয়ে যায়, জাপান দাবি করল সমতা এবং লন্ডন সম্মেলনে অন্য রাষ্ট্রগুলি যেহেতু আর রাজি হল না, জাপান সেই সম্মেলনকে তাচ্ছিল্য করে সেখান থেকে বেরিয়ে এল। ব্রিটেন যখন বিশ্ববাজারের ব্যাপারে জাপানের সঙ্গে একটি অর্থনৈতিক চুক্তি করতে চাইল, জাপান একমাত্র ব্রিটেনের নিয়ন্ত্রণাধীন বাজারগুলি ছাড়া অন্য কোনও বাজার নিয়ে আলোচনা করতে অস্বীকার করল। দু'-দেশের মধ্যে ১৯৩৫-এর লন্ডন সম্মেলন ভেঙে গেল। এ-সব থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, ১৯৩৭ থেকে জাপান মানসিকভাবে এবং সামরিকভাবে দূরপ্রাচ্যে একটি বড় আকারের সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত।

সব-বিষয়ে যে খুব খোঁজ-খবর রাখে তারও কখনও-কখনও ভুল হয়। ১৯৩৭-এর মার্চ থেকে জুলাই সারা পৃথিবীকে জাপান এই বলে ভুলিয়ে রাখল যে তারা খুব একটা অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে চলেছে, এবং সেই কারণে চিনের ওপর কোনও বড় আকারের আক্রমণ হানার তার ক্ষমতা নেই। কয়েকটি মার্কিন পত্র-পত্রিকায় এই বলে প্রবন্ধ বেরোল, যে অবশিষ্ট বিশ্ব যখন অর্থনীতির ক্ষেত্রে আবার আগেকার মতো উন্নত হয়ে উঠছে, জাপানের পরিস্থিতি তার বিপরীত। এই অর্থনৈতিক উন্নতির দরুন কাঁচা মালের দর খুব বেড়ে গেছে। জাপানকে চড়া দামে সে-সব জিনিস কিনতে হচ্ছে, সে জন্যে তার উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগিতা করে সাফল্য লাভ করা তার পক্ষে অসম্ভব। (এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়, যখন দেখি বর্তমানে ভারতে জাপানি বস্ত্রাদির মূল্য কম)। মার্কিন সাংবাদিকেরা বললেন, এই অর্থনৈতিক সঙ্কটের কারণে জাপান চিনের যুদ্ধে ঢিলে দেওয়া মনস্থ করেছে, তাই সে-দেশের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। আরও বলা হয়েছে, একই কারণে জাপানে সামরিক চরমপন্থীদের এখন আর কেউ পছন্দ করছে না এবং নরমপন্থী রাজনীতিকেরাই বেশি প্রাধান্য পাচ্ছেন।

এখন মনে হচ্ছে, জাপানের নরমপন্থা, তার আসল মতলবটা লোকের চোখ থেকে আড়াল করবার একটা উপায় ছাড়া আর কিছুই ছিল না, যাতে তার শত্রুরা এই ভেবে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে যে, তাদের ভয়ের কিছু নেই। ঠিক এই মুহূর্তেই জাপান কেন চিন আক্রমণ করল তার কারণ অতি স্পষ্ট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কিংবা ব্রিটেন, কিংবা রাশিয়া, কেউই এখন জাপানের সামনে রুখে দাঁড়াতে প্রস্তুত নয়। তারা সবাই এখন প্রাণপণে নিজেদেরকে তৈরি করছে, অস্ত্রের সম্ভার গড়ে তুলছে, এবং দু'-তিন বছর পরে জাপানের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে উঠবে। কাজেই জাপানের পক্ষে অবস্থাটা ছিল, কিছু করতে হলে এখনই করতে হবে। সেই জন্যই সে আক্রমণ হানল। সে সযত্নে এর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, কাজে ও কথায় নরম সুবিবেচক ভাবের পরিচয় দিয়ে। সবাই যখন বিশ্বাস করতে আরম্ভ করল জাপান শান্তিপূর্ণ পন্থার কথাই চিন্তা করছে, সে আক্রমণ আরম্ভ করল। নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত পত্রিকা 'দ্য নেশন' ২৪ এপ্রিল, ১৯৩৭ তারিখে বলল, 'পূর্ব প্রাচ্যে শান্তির সম্ভাবনা অতীতের যে-কোনও

সময়ের চেয়ে আজ বেশি উজ্জ্বল।' ওই একই পত্রিকা ২৬ জুন লিখল, জাপানের চিন আক্রমণ একটু শান্ত হয়ে এসেছে। লেখক জানতেন না, এ শুধু ঝড়ের আগে থমথমে ভাব।

জাপানের আরেকটি আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হওয়া ছাড়া দূর প্রাচ্যের বর্তমান সঙ্কটের পিছনে আরও কতকগুলো কারণ ছিল। ডিসেম্বর ১৯৩৬-এ 'Scian'-এর অভ্যুত্থান এবং মার্শাল চিয়াং কাই শেক-এর অপহরণ চিন দেশে যুক্তফ্রন্ট-এর জন্য জমি প্রস্তুত করে দিল। স্পষ্টই বোঝা গেল, যাঁরা চিয়াংকে বন্দি করেছিলেন তাঁরা তাঁকে মুক্তি দেওয়ার আগে চিন চৈনিক সোভিয়েত, নানকিং এবং চিয়াঙের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়ে গেছে জাপানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ভিত্তিতে। এই বোঝাপড়ার অর্থ, সাম্প্রতিক ইতিহাসে প্রথম চিনের অখণ্ডতা। চৈনিক সোভিয়েত তাদের কমিউনিজম ও স্বাতন্ত্র্যবাদ বিসর্জন দেয় এবং নানকিং-এর নির্দেশ মেনে চলতে স্বীকৃত হয়। চিয়াং জাপানি আক্রমণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবেন, এবং কমিউনিস্ট নেতা চু-এন-লাই ও চিয়াং-এর নিজের পুত্র তাঁর নেতৃত্ব স্বীকার করবেন। জাপান এ কথা জানতে পেরে, চিন তার ঐক্য আরও সংগঠিত করবার আগেই, আক্রমণ হানল।

জাপানের পক্ষে এই সময়টি নানা দিক থেকে সুবিধাজনক। ব্রিটিশ, রুশ ও মার্কিন অস্ত্রসজ্জা জোর কদমে এগোচ্ছে, কিন্তু আগেই বলেছি, তারা কেউই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নয়। সিঙ্গাপুরের ঘাঁটি সম্পূর্ণ করতে ব্রিটেনের এখনও সময় লাগবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে নিরপেক্ষতা আইন পাশ করেছে, তাতেই স্পষ্ট বোঝাতে যাচ্ছে, যে-কোনও আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ থেকে সে তফাৎ থাকতে চায়। ফ্যাসিবাদী যা খবর দিচ্ছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এখন চূড়ান্ত অসন্তোষ এবং অন্তত, বারো মাস আগে যতটা মনে হচ্ছিল ততটা শক্তিশালী নয়। ৪ জুলাই ১৯৩৭, তারা সোভিয়েত-মাঞ্চুকুও সীমান্ত সংঘর্ষ এবং তারপর চিনের সঙ্গে ১৮৬০-এর চুক্তি অনুযায়ী যে দ্বীপপুঞ্জ রাশিয়ার, সেই বিতর্কিত দ্বীপপুঞ্জ থেকে সোভিয়েত সৈন্যের প্রত্যাহার, এটাই প্রমাণ করে, সোভিয়েত সরকার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না।

আমুর নদী থেকে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহারের তিনদিন পরে পিপিং-এর কাছে এক নতুন ঘটনা ঘটানো হল এবং ৮ জুলাই ১৯৩৭ আবার উত্তর চিন আক্রমণ শুরু করা হল।

এ একটা প্রায় প্রবাদ বাক্যের মতো যে, দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে মানুষের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়। ওয়াকিবহাল সাংবাদিকেরা এখন খবর দিচ্ছেন, কিছুকাল থেকে জাপান যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। মাঞ্চুকুও দখল করেই সে সন্তুষ্ট নয়। জাপানি অধিবাসীদের পক্ষে সে দেশ বড় ঠান্ডা। জাপানের শিল্পের যে কাঁচামাল দরকার তার সামান্য অংশই সেখান থেকে পাওয়া গেছে। সন্দেহ নেই, জাপানের বাণিজ্যের কিছু বৃদ্ধি সে দেশের কল্যাণে হয়েছে, কিন্তু প্রশাসনের ব্যয় এবং জাপানি বাজারে মাঞ্চুরিয়ার সামগ্রীর প্রতিযোগিতার ফলে সেই লাভের গুড় পিঁপড়েয় খেয়ে গেছে। অন্য দিকে উত্তর চিন (অর্থাৎ শানটুং, হোপেই চাচার, শানসি, সুইয়ান) অর্থনৈতিকভাবে মাঞ্চুকওর চেয়ে জাপানের পক্ষে অনেক বেশি লাভজনক। চাচার, শানসি এবং দক্ষিণ হোপেই-তে মাটির নীচে লোহা আছে। শানসিতে উচ্চশ্রেণীর কয়লাও আছে। তা ছাড়া ওই পাঁচটি প্রদেশে ছড়িয়ে আছে টিন, তাম্র, স্বর্ণ এবং খনিজ তৈল। পীত নদের (হোয়াং-হো) অববাহিকা তুলা চাষের অত্যন্ত উপযোগী, যা এখন জাপানে আমদানি হয় ভারত ও আমেরিকা থেকে, যার মূল্য বছরে ৪০ কোটি ইয়েন, সেখানকার আবহাওয়াও জাপানি অধিবাসীদের পক্ষে মাঞ্চুকুওর চেয়ে বেশি উপযোগী। গবাদি পশুপালনের পক্ষেও বেশি ভাল।

এই অঞ্চলের সম্পদের ব্যবহারের পরিকল্পনা জাপান কিছুদিন আগেই করেছিল কিন্তু

যতদিন এখানে চিনের অধিকার ছিল, জাপানি মূলধন সে-কাজে এগিয়ে আসতে অনিচ্ছুক ছিল। এক্ষণে পুঁজিবাদের স্বার্থে এল সামরিক শাসন।

বর্তমান আক্রমণের পিছনে অর্থনৈতিক তাগিদ ছাড়াও, মনস্তাত্ত্বিক কারণ ছিল। এ বছরের প্রথম দিকে মার্কিন সাংবাদিকেরা জাপানের অর্থনৈতিক সঙ্কটের কথা ঠিকই বলেছিলেন, কিন্তু তাঁদের সিদ্ধান্তগুলো ভুল ছিল। তাঁদের যা বক্তব্য সেটা ঠিক নয়, কোনও একতান্ত্রিক সরকার অর্থনৈতিক সমস্যার মধ্যে পড়ে গেলে দেশের অভ্যন্তরে অসন্তোষ এড়াবার জন্য বিদেশে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে। (একই রকম সঙ্কট অদূর ভবিষ্যতে জার্মানিতেও দেখা দিতে পারে)। জাপানের ক্ষেত্রে বলা যায়, বাণিজ্যের ভারসাম্যে অবনতির জন্য জাপানের যে-অর্থনৈতিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তার ফলে যুদ্ধের মনোভাব জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

উপরন্তু উত্তর চিনের একটি প্রদেশ সুইয়ান-এর বিরুদ্ধে ১৯৩৬-এর নভেম্বরে জাপান-পরিচালিত অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পরে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে ইনার মঙ্গোলিয়ার মধ্যে যে-সব অঞ্চল সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো অধিকার করতে গেলে সমগ্র উত্তর চিনকে নিজের অধীনে আনতেই হবে। বিশেষ করে চাচার এবং সুইয়ানকে নিয়ন্ত্রণ না করে মাঞ্চুকুওর দিক থেকে ইনার মঙ্গোলিয়াতে প্রবেশ করা অসম্ভব।

ওই ইনার মঙ্গোলিয়া-র ওপর জাপানের অত নজর কেন? সে তো এক উষর দেশ, তার অর্থনৈতিক মূল্য অতি সামান্য। কারণটা অর্থনৈতিক নয়, কূটনৈতিক। আগেই বলেছি, জাপান একটি সুসংবদ্ধ ভূখন্ড লাভ করাকেই নিজের লক্ষ্য বানিয়েছিল। তার মধ্যে থাকবে মাঞ্চুকুও, উত্তর চিন ও মঙ্গোলিয়া। ইতিমধ্যে সোভিয়েত কূটনীতিও হাত গুটিয়ে বসে ছিল না। চিন প্রজাতন্ত্রের দুটি বৃহৎ প্রদেশ রাশিয়ার প্রভাবের এলাকার মধ্যে চলে গিয়েছিল, সিনকিয়াং (অথবা চিনা তুর্কিস্তান) এবং বহির্মঙ্গোলিয়া (সোভিয়েত রাশিয়ার সংলগ্ন মঙ্গোলিয়ার উত্তর অংশ)। জাপানের কাছে সিনকিয়াং-এর বিশেষ সামরিক গুরুত্ব নেই (যদিও ভারতের সঙ্গে তার নৈকট্যের দরুণ সোভিয়েত রাশিয়ার কাছে অঞ্চলটি গুরুত্বপূর্ণ) কিন্তু বহির্মঙ্গোলিয়ার গুরুত্ব আছে। বহির্মঙ্গোলিয়া নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকলে সোভিয়েত রাশিয়া সহজেই উত্তর চিনে নেমে আসতে পারে। এ প্রতিরোধ করবার এবং রাশিয়াকে চিরতরে মূল চিন থেকে বিচ্ছিন্ন করার একমাত্র উপায় ইনার মঙ্গোলিয়া (মঙ্গোলিয়ার দক্ষিণ অংশ), এবং উত্তর চিন অধিকার করে নেওয়া, এবং তার দ্বারা পশ্চিম থেকে পূর্ব একটি আঁটসাঁট গমনাগমনের পথ তৈরি করা, যা রুশ সাইবেরিয়া এবং বহির্মঙ্গোলিয়াকে মূল চিন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এই ভূখন্ডটি অধিকার করাই এখন জাপানের লক্ষ্য। সে কাজ সম্পন্ন হলে তার পরে জাপানের প্রচেষ্টা হবে এই নবলব্ধ অঞ্চলের ভিতর দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিম এক সামরিক গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ নির্মাণ। সেখানে নিজেকে বেশ মজবুত করে বসাতে পারলে জাপান তারপরে বহির্মঙ্গোলিয়ার ভিতরে ঢুকবার কথা ভাবতে পারে। তখন কী হবে আগে থেকে বলা কঠিন। বর্তমানে বহির্মঙ্গোলিয়া রাশিয়ার প্রভাবাধীন, এবং সোভিয়েত রাশিয়া স্পষ্ট ঘোষণা করেছে, জাপান যদি সে-অঞ্চলে কোনও সামরিক তৎপরতা আরম্ভ করে, তা যুদ্ধের কারণ বলে পরিগণিত হবে।

কিন্তু জাপান ভবিষ্যতে কোনও সময়ে মঙ্গোলিয়াকে নিজের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করার সব আশা ত্যাগ করেনি। সেই কারণে জাপানের প্রতিভূরা প্রায়ই মেঙ্কুকুও-র কথা বলে থাকেন, সব মঙ্গোলদেরই যা নাকি হবে উপযুক্ত রাজনৈতিক আদর্শ, এই পরিকল্পনা যদি কোনওদিন সফল হয়, মাঞ্চুকুও-র সেটা হবে পূরক প্রদেশ। এর দ্বারা মঙ্গোলরা পাবে তাদের নিজেদের রাষ্ট্র এবং Gilbertian প্রাসাদের মতো তার একটা ছদ্ম স্বায়ত্ব-শাসন থাকবে বটে, কিন্তু

প্রকৃতপক্ষে সে হবে জাপানের অভিভাবকত্বের অধীন। দূর প্রাচ্যে মঙ্গোলদের সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষের মতো। কুড়ি লক্ষ থাকে মাঞ্চুকুও-র শিংগান প্রদেশে। দশ লক্ষ থাকে বহির্মঙ্গোলিয়ায়, যার আয়তন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক, কিন্তু যার অধিকাংশ মরুভূমি। আর দশ লক্ষ থাকে ভিতর মঙ্গোলিয়ায়। দশ লক্ষের মতো ছড়িয়ে আছে সিনকিয়াং (চিনা তুর্কিস্তান), তিব্বত এবং সোভিয়েত রাশিয়ায় (Buriat প্রজাতন্ত্র)। ভবিষ্যতের মঙ্গোল রাষ্ট্র মেঙ্কুকুও যাকে ঘিরে গড়ে উঠবে, আর সেই কেন্দ্রক ইতিমধ্যেই জন্মলাভ করেছে একটি মঙ্গোলীয় রাজনৈতিক পরিষদ-এর গঠনের মধ্যে দিয়ে। মঙ্গোল নেতাদের মধ্যে যাঁরা জাপানি প্রভাবাধীন, তাঁরা হলেন Li Shouhsein এবং Prince Teh।

তবে 'স্বশাসিত' মেঙ্কুকুও জাপানের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হলেও তার বর্তমান লক্ষ্য স্বশাসিত উত্তর চিন।

জাপান মাঞ্চুকুও দখল করে নেওয়ার পর থেকে উত্তর চিনে তার প্রভাব সমানে বেড়ে চলছিল এবং সম্ভবত সেই কারণেই সে আশা করেছিল যে অদূর ভবিষ্যতে উত্তর চিনের পাঁচটি প্রদেশ নিয়ে বড় কোনও সংঘর্ষ ছাড়াই এমন একটি রাষ্ট্র গড়ে তোলা সম্ভব হবে যা হবে জাপানের হাতের পুতুল। কিন্তু সাম্প্রতিক অতীতে ক্যানটন প্রদেশ নানকিং অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ায় এবং তার পরে গত ডিসেম্বরে চিনা কমিউনিস্টদের সঙ্গে মার্শাল চিয়াং-এর বোঝাপড়ার খবরে জাপানকে সে-আশায় জলাঞ্জলি দিতে হয়। দীর্ঘকাল পরে একটি শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ চিন বিশ্ববাসীর চোখের সামনে উঠে দাঁড়াচ্ছিল, এবং সে-চিন বিনা যুদ্ধে তার উত্তরের প্রদেশগুলি ছেড়ে দেব না।

জানুয়ারি ১৯৩৭ থেকে নানকিং উত্তর চিনের অফিসারদের ওপর তার প্রভাব খাটাতে আরম্ভ করে। পূর্ব হোপেই দিয়ে জাপানিদের সহায়তায় যে চোরাচালানের কারবার চলছিল, চিন তাতে বাধা দিতে আরম্ভ করে। চিনের সম্মতি ছাড়াই জাপান যে নতুন Tientsin Tokyo বিমান পরিবহন চালু করেছিল চিন সাহস সঞ্চয় করে তা সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়। উত্তর চাচার-এ মাঞ্চুকুও ও মঙ্গোলিয়ার সৈন্যেরা জাপানের আধিপত্যের বিরুদ্ধে একটা ছোট-খাট বিদ্রোহ করে। এ-রকম জাপান-বিরোধী ঘটনা বেড়েই যেতে থাকে এবং জাপানের দাবি অবনত মস্তকে মেনে নিয়ে এইসব ঘটনার নিষ্পত্তি করা হয় না। সর্বোপরি খবর আসে নানকিং এবং চিনা কমিউনিস্টদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়েছে, যার ফলে শেষোক্তদের ৯০,০০০ হাজার অভিজ্ঞ সৈনিক জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবে।

১৯৩৭-এর ৩ জুলাই জাপানি রাষ্ট্রদূত Shigeru Kawagoe নানকিং-এর সঙ্গে আলাপ আলোচনা আরম্ভ করেন। জাপান অবস্থা বুঝে নিজেকে সংযত করে এবং প্রস্তাব করে উত্তর চিনের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ সে ত্যাগ করবে যদি নানকিং মাঞ্চুকুওকে আইনগত স্বীকৃতি প্রদান করে এবং জাপানের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহায়তার চুক্তিবদ্ধ হয়। খবর, সে-প্রস্তাব নানকিং খারিজ করেছে এবং তার বদলে সে যা প্রস্তাব করেছে সেটা জাপানি দাবী পূরণ করে না। এতেই যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, যে এক নতুন চিন জন্ম নিয়েছে, যে-চিন শীঘ্রই উত্তরের প্রদেশগুলির ওপরে তার পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। অতএব, জাপান আর দেরি না করে আঘাত হানল এবং পিপিং (পিকিং)-এর ১৮ মাইল পশ্চিমে Lukouchaio-তে একটি 'ঘটনা' ঘটানো হল। রাত্রিকালীন সামরিক তৎপরতা আরম্ভ করে জাপানি সৈন্যেরা সেখানে নিযুক্ত চিনা ঊনত্রিশতম সেনাদল-এর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হল।

আইনের চোখে জাপানিরা নিঃসন্দেহে অন্যায় করেছে। যদিও ১৯০১ সালের Boxer Protocol অনুয়ায়ি পিপিং-এর রাষ্ট্রদূতাবাসের কাছে এবং পিপিং-টিয়েনসিন রেলপথের কোথাও-কোথাও সৈন্য মোতায়েন করতে পারে, সে-সব নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে তারা তাদের

সৈন্য পাঠিয়ে দেয়, সমুদ্রের সঙ্গে যোগাযোগ, যে-উদ্দেশ্যে সেই চুক্তি স্বাক্ষরিত হল, তাতে সাহায্য না করে তাতে বিঘ্নই সৃষ্টি করে। তবে সেই সংঘর্ষের অল্পকাল পরেই জাপানিরা এইসব দাবি উপস্থাপিত করে:

১) পিপিং-এর পশ্চিমে ঊনত্রিশতম সেনাদল-এর বর্তমান অবস্থান থেকে তার প্রত্যাহার;
২) সংঘর্ষের জন্য দায়ী চিনা অফিসারদের শাস্তি;
৩) উত্তর-চিনে জাপান-বিরোধী কার্যকলাপকে যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ;
৪) কমিউনিজমের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ব্যবস্থা বলবৎ করা।

খবর পাওয়া গেছে, হোপেই-চাচার রাজনৈতিক পরিষদ ১৯ জুলাই এইসব দাবি মেনে নেয়। এই মীমাংসার শর্তাবলি টোকিওতে ২৩ জুলাই প্রকাশিত হয়। চিনাদের তরফের প্রত্যাশা ছিল, সে-অঞ্চল থেকে চিনা এবং জাপানি দু'-পক্ষই সৈন্য প্রত্যাহার করবে, এবং যতদূর সম্ভব অনিচ্ছা সত্ত্বেও নানকিং সে মীমাংসা অনুমোদন করত। কিন্তু জাপানি সৈন্যেরা যখন সে-অঞ্চল ছেড়ে গেল না, চিনা সৈন্যদলের অধস্তন অফিসার ও সাধারণ সৈনিকেরা সেখান থেকে ফিরে যেতে অস্বীকার করলেন। ২৬ জুলাই জাপানের সামরিক কর্তৃপক্ষ চিনকে চরমপত্র দিয়ে বললেন, ২৮ জুলাই দ্বিপ্রহরের মধ্যে চিনা সৈন্যদের ফিরে যেতে হবে। তারা সেখান থেকে নড়তে অস্বীকার করল, এবং জাপানিরা তাদেরকে বলপ্রয়োগে উৎখাত করতে আরম্ভ করল। ফলে যুদ্ধ বাঁধল।

যদিও নানকিং-এর একনায়ক মার্শাল চিয়াং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নন, তিনি জাপানিদের কাছে নতি স্বীকার করলেন না এবং বিনাযুদ্ধে যে তিনি পরাজয় স্বীকার করবেন, তা মনে হয় না।

জাপান দীর্ঘ যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছে, এবং জাপানি Diet সে-যুদ্ধের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করছে। শোনা গেছে ১৯৩৮-এর জানুয়ারির শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালাবার জন্য জাপানী ১১ কোটি ৭৬ লক্ষ ৫০ হাজার পাউন্ড পর্যন্ত ব্যয় করতে প্রস্তুত।

দূর প্রাচ্যের যুদ্ধের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি সাংহাই অঞ্চলের সংঘর্ষেরই প্রসারিত রূপ। ৯ অগাস্ট সাংহাইয়ের নিকট Hungjao বিমানবন্দরে নতুন একটি ঘটনা ঘটেছিল। জাপানি নৌবহরের দু'জন কর্মী বিমানবন্দরে প্রবেশের চেষ্টা করতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারালেন। সেই গুলি বর্ষণের প্রতিশোধ নিতে জাপানি নৌবহর কঠোর ব্যবস্থা নিল। তারা যা-যা দাবি করল তার মধ্যে ছিল সমস্ত চিনা সৈন্যদের সাংহাই থেকে অন্তত ৩০ মাইল দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, এবং ওই এলাকার মধ্যে প্রতিরক্ষার সমস্ত ব্যবস্থার উচ্ছেদ করতে হবে। চিনাদের তরফ থেকে এর জবাব হল, নানকিং থেকে ৮৮তম ডিভিশনকে সেই এলাকায় এনে মোতায়েন করা হল সেখানকার সৈন্যদলের শক্তি বাড়াবার জন্য। জাপানিরা মনে করল, এ ১৯৩২ সালের চুক্তির সুস্পষ্ট উল্লঙ্ঘন। কিন্তু চিনারা প্রত্যুত্তরে বলল, জাপানিরা নিজেরাই, চিনা ভূমিতে সৈন্য মোতায়েন করেছে এবং সেই অঞ্চলে বৃহৎ নৌবহর নিয়ে এসেছে। তার ফলে সে-চুক্তি মেনে চলার সব দায়িত্ব থেকে চিন মুক্ত।

এইভাবে যুদ্ধ চলছে দুটি ফ্রন্টে, পিপিং ও সাংহাই-এ। এ-প্রসঙ্গে প্রশ্ন হল সাংহাই ফ্রন্টে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ুক কোন পক্ষ চেয়েছিল। যতদূর মনে হয়, জাপানিরা।

নানকিং সেনাবাহিনী যখন হোপেই প্রদেশে প্রবেশ করল, তখন স্থলপথে বাধা পেয়ে জাপানিরা সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি দিল। মার্শাল চিয়াং-এর বাহিনী পিপিং-কে ঘিরে যে অর্ধবৃত্তাকার ব্যূহ সাজায় (যে পিপিং তখন জাপানিদের অধিকারে ছিল) সেটি ছিল একটি রণকৌশল। সরকারি সৈন্যবাহিনীর পূর্বভাগ ছিল বিখ্যাত গিরিপথ Nankow-এ, যেখানে Peiping-Paotow রেলপথ পর্বতমালা ভেদ করে গিয়েছে। অর্ধ-বৃত্তের কেন্দ্র দাঁড়িয়ে আছে Paotingfu-র ওপর, পিপিং-এর ১০০ মাইল দক্ষিণে Hankow রেলপথে। তার দক্ষিণভাগ Tientsin-এর দক্ষিণে এসে গেছে। সে শহরও জাপানিদের হাতে। এই অর্ধবৃত্তকে ('Hindenburg' line) অতিক্রম করা

অত্যন্ত দুরূহ। সেই কারণেই সাংহাই আক্রমণ করে চিনা প্রতিরোধকে দুর্বল করা রণকৌশলের দিক থেকে এত প্রয়োজন।

চিনের হৃৎপিণ্ড বলে যদি কিছু থাকে, সেটা হল ইয়াংসি নদীর মুখের কাছে অবস্থিত আর্থিক বাণিজ্যিক কেন্দ্রটি। এই হৃৎপিণ্ড জাপান আক্রমণ করছে চিনের বিদেশি-নিয়ন্ত্রিত শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থনীতির কেন্দ্রটিকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। লক্ষ্য কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে বিপন্ন করা, জাতীয়তাবোধের মনোবল ভেঙে দেওয়া ও চিনের মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলা। সাংহাই এখন বস্তুত জাপানি নৌবহরের করুণার ওপর নির্ভরশীল এবং এই সম্পদশালী সদাবৃদ্ধিশীল শহরটির ওপর আক্রমণ স্পষ্টত যুদ্ধটাকে দ্রুত শেষ করে আনার একটা উপায়। কিন্তু এই আক্রমণ কতটা ফলপ্রসূ হবে সেটা নির্ভর করবে তার ব্যবসা-বাণিজ্যকে কতটা বিপর্যস্ত করা যায়, যুদ্ধে এর কতটা ক্ষতি করা যায়, তার ওপর।

যুদ্ধ কিছুকাল চলবে। জাপান চেষ্টা করবে চিনের হৃদযন্ত্রকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করতে, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যাতে কেটে ফেলা যায়। অতএব প্রখ্যাত রণকৌশলবিদ যা বলেছেন। সেটাই ঠিক, চিনের বাঁচা-মরা নির্ভর করে সাংহাই-এর যুদ্ধের ওপরে। এই রক্তস্নানের পর চিন কি বেঁচে থাকবে? ক্যানটন-এ যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ যদি বন্ধ হয়ে না যায় এবং সাংহাইয়ের লড়াইয়ের ফলে রাজস্বের লোকসান যদি তেমন মারাত্মক না হয়, হয়তো, যত দিন না জাপানের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বিপন্ন হয়, চিন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু ওদিকে জাপান আবার চিনা বন্দরগুলি অবরোধ করবার চেষ্টা করছে এবং তা ছাড়া, জাপানি জনসাধারণও একটা যুদ্ধ-জ্বরের ঘোরের মধ্যে আছে, এবং সেই দ্বীপ-সাম্রাজ্যের সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তিদের মধ্যে তেমন একটা তফাৎ আছে বলে মনে হচ্ছে না।

চিন আরও একবার জাতিসঙ্ঘের কাছে আর্জি জানিয়েছে, যেমন জানিয়েছিল ১৯৩১ সালে। কিন্তু এরকম বিপদের সময়ে সেই মৃতকল্প সংস্থাটির কী মূল্য? বিশ্বজনমত অবশ্য চিনের পক্ষে, কিন্তু মেশিনগানের মুখে বিশ্বজনমতেরই বা মূল্য কী? চিনের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্নই বটে। সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে চিনেরই সুবিধা হবে, এ-কথাও এখন আর বলা চলে না। চিনের লড়াই সময়ের সঙ্গে। ভগবান করুন, সে যেন জয়ী হয়।

জাপান নিজের জন্য এবং এশিয়ার জন্য অনেক বড়-বড় কাজ করেছে। এই শতাব্দীর ঊষাকালে তার নবজাগরণে আমাদের মহাদেশে এক রোমাঞ্চ ছড়িয়ে পড়ে। জাপান দূর প্রাচ্যে শ্বেতাঙ্গদের হামবড়াই ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে, সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এখন আত্মরক্ষায় ব্যস্ত, শুধু সামরিক ক্ষেত্রে নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও। একটি এশীয় জাতি হিসেবে আত্মসম্মানের বিষয় সে অতিশয় সচেতন এবং সেটাই সঙ্গত। দূর প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য শক্তিসমূহকে বহিষ্কার করতে সে বদ্ধপরিকর। কিন্তু এ-সব কাজ কি সাম্রাজ্যবাদ ছাড়া, চিনা প্রজাতন্ত্রকে খণ্ড-বিখণ্ড না করে, আরেকটি গৌরবান্বিত, সংস্কৃতিবান প্রাচীন জাতিকে হতমান না করে করা যেত না? আমরা যতই জাপানের গুণগ্রাহী হই, প্রশংসা করি যেখানে প্রশংসা তার প্রাপ্য, আমাদের সমস্ত অন্তঃকরণ চিনের এই বিপদের দিনে তার প্রতি ধাবমান। চিনকে বাঁচতেই হবে, তার নিজের জন্য, মানবজাতির জন্য। অতীতে বহুবার যা হয়েছে আবার তাই হবে, ফিনিক্স পাখির মতো চিন তার ভস্ম থেকে নবজন্ম লাভ করবে।

দূর প্রাচ্যের এই যুদ্ধ থেকে আমরা যেন শিক্ষা গ্রহণ করি। এক নতুন যুগের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ভারত শপথ নিক, প্রতি ক্ষেত্রে আমরা জাতি হিসাবে চরিতার্থতা অর্জন করব, কিন্তু অন্যদেরকে যেন তার জন্য মূল্য দিতে না হয়। তা যেন সাম্রাজ্যবাদ ও পররাজ্য হ্রাসের রক্তাক্ত পথে না হয়।

১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৭

ব্যক্তিপত চিঠিপত্রে হস্তক্ষেপ[১]

যাওয়া-আসার পথে আমার চিঠিপত্রে বে-আইনি হস্তক্ষেপ নিয়ে আমি খোঁজ-খবর করে যা জেনেছি, সর্বসাধারণকে জানাচ্ছি। এখন আর এ-বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশই নেই যে এই হস্তক্ষেপ চলে ডাকবিভাগের প্রশ্রয়ে ও সহযোগিতায়। সি.আই.ডি-র কর্মীদের গুপ্তচরবৃত্তির অনেক বদনাম এর মধ্যেই হয়েছে। ডাকঘরের কর্মীদেরও সে কলঙ্কের ভাগী কেন হতে হবে না তার কোনও কারণ আমি দেখি না। সি.আই.ডি-র কর্মীরা অন্তত এ-কথা নিজেদের কাজের সাফাই হিসাবে বলতে পারেন যে গুপ্তচরবৃত্তির জন্যই তাঁরা নিযুক্ত হয়েছেন, তার জন্যই তাঁরা বেতন পান। ডাকবিভাগের কর্মীদের কিন্তু নিয়োগ করা হয় এবং বেতন দেওয়া হয় এক ধরনের কাজের জন্য। তাঁরা গুপ্তচরদের কুকর্মের সহযোগী হয়ে নিজেদের হাত কলঙ্কিত করছেন। আমি দেখে বিস্মিত এবং আহত হলাম, আমার কোনও-কোনও অসুবিধাজনক প্রশ্নের উত্তরে কয়েকজন ডাককর্মী যা বলেছেন তা মন্ত্রীদের বক্তব্যের বিপরীত। ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের অলঙ্ঘনীয়তা রক্ষা করবার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কিছু করতেই হবে।

পঞ্জাবের পরিস্থিতির বিষয়ে[২]

পঞ্জাবে যতদিন থাকব ভেবেছিলাম, বিশেষ কতগুলো কারণে তার আগেই আমায় চলে যেতে হচ্ছে। কিন্তু বিদায় নেওয়ার আগে, এই প্রদেশে পাঁচ মাস আমার অবস্থানের সময়ে আমার বহুসংখ্যক বন্ধু ও শুভাকাঙ্খী আমার প্রতি যে সৌজন্য ও আনুকূল্য প্রদর্শন করেছেন তার জন্য তাঁদেরকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই। ডালহাউসির অধিবাসী এবং বাইরে থেকে অনেকে যাঁরা আসেন, যাঁরা দেখা হলেই আমাকে সম্ভাষণ করেন, তাঁদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাই। বলা বাহুল্য আমার প্রতি তাঁদের সদয় আচরণ ডালহাউসিতে আমার অবস্থান সুখকর এবং প্রীতিপ্রদ করেছিল।

পঞ্জাবের পরিস্থিতি

বিগত কয়েক মাস আমি পঞ্জাবের পরিস্থিতি খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করবার সুযোগ পেয়েছি। আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি, এ প্রদেশ আমি ত্যাগ করে যাচ্ছি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে। মনে হচ্ছে বর্তমান সম্মিলিত সরকার এমন একটি দমনমূলক নীতি অবলম্বন করেছেন, যার সঙ্গে প্রাক্ সংস্কার যুগের সাদৃশ্য আছে। এর আগে কিছু সংখ্যক রাজবন্দিকে মুক্তি দান, সরকারের বন্দি সতীন্দ্রনাথ সেনের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার, সাম্প্রদায়িকতা প্রশমনে ব্যবস্থা, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির জন্য ঐক্য সম্মেলন আহ্বান, খান আবদুল গফ্ফর খানের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, মাংসের জন্য যে পশুবধ কেন্দ্রটি অবিবেচনার বশে স্থাপন করা

১. ৬ অক্টোবর ১৯৩৭, লাহোর থেকে কলকাতার উদ্দেশে যাত্রার প্রাক্কালে ইউনাইটেড প্রেস-কে এস. সি. বোস কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতি।

২. ৮ অক্টোবর ১৯৩৭, এস. সি. বোস কর্তৃক ইউনাইটেড প্রেস-কে প্রদত্ত বিবৃতি।

হয়েছিল সেটিকে বন্ধ করে দেওয়া ইত্যাদি উদারতা-পরিচায়ক কাজের দ্বারা সরকার অনেকের মনে একটি অনুকূল মনোভাবের সৃষ্টি করেছিল।

এই সব কাজের সুফল সরকার প্রায় নষ্ট করে দিয়েছে এখন দমন-রীতির সূত্রপাত করে। আমি খোঁজ-খবর করে যা জানতে পেরেছি, লোকের মনে একটা ধারণা জন্মেছে, সরকার তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের দিকেই দৃষ্টি দিয়েছে। খালসা কলেজের ঘটনাটি, কয়েকজন জনপ্রিয় ও বিশিষ্ট অধ্যাপকের কর্মচ্যুতি, তার একটি দৃষ্টান্ত। অভিযোগ উঠেছে, এর পিছনে আছেন সরকারি ব্যক্তিগণ। এই ধারণা যদি সত্য হয়, আমার আশঙ্কা, এখন যা মনে হচ্ছে, জাতীয়তাবাদী শিখ, জাতীয়তাবাদী মুসলিম এবং সমাজতন্ত্রবাদীদের মধ্যেই সরকারের আক্রমণ সীমাবদ্ধ থাকবে না।

জনগণের নাগরিক স্বাধীনতা

জনপ্রিয় সরকারের প্রথম পরিচয়, সে মানুষের নাগরিক স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করবে। এ দিক থেকে দেখলে সরকার যে এত বন্দিকে আটক করে রেখেছে (বিচার করে এবং বিনা বিচারে) এবং আরও লোককে গ্রেপ্তারের আদেশ দিয়েছে, তার কী যুক্তি থাকতে পারে? তা ছাড়া শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ সান্যাল এবং তার এক বন্ধুর বঙ্গদেশে প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা কীভাবে সমর্থন করা যায়? শেষোক্ত আদেশটি মন্ত্রী দপ্তর নিজেই দিয়ে থাক বা রাজ্যপালের নির্দেশেই দিয়ে থাক, উভয় ক্ষেত্রেই নিন্দার যোগ্য। মুক্তিলাভের পর শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ সান্যাল এবং তাঁর সহযোগীরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাতে যে কোন কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন সরকার জনসাধারণের মধ্যে অহিংসার মনোভাব সৃষ্টি করবার জন্য তাঁদের উপস্থিতিকে স্বাগত জানাত।

একটি রাজনৈতিক প্রহসন

এই পটভূমিকায় ঐক্য সম্মলনের আহ্বান একটি রাজনৈতিক প্রহসন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সম্মিলিত সরকার কী চাইছেন? তাঁরা কি জনসাধারণের ঐক্য চান, না সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহের ঐক্য চান? যদি প্রথমটি চান, প্রদেশে প্রতিপক্ষকে দমন করে সে কাজ হবে না।

একটি প্রতিক্রিয়াশীল দল

এ-বিষয়ে সন্দেহ বিশেষ নেই, যে সম্মিলিত দলের কার্যসূচি কাগজে-কলমে যাই হোক, আসলে দেখা যাচ্ছে, তারা একটি প্রতিক্রিয়াশীল দল। সামনে মন্ত্রীদের বসিয়ে রেখে শাসন চালান রাজ্যপাল। কিন্তু এই মুহূর্তে সম্মিলিত দলের অবস্থা এমন মজবুত যে বর্তমান বিধান সভার আয়ুষ্কালে তাদেরকে গদিচ্যুত করবার আশা কম। মেঘের মধ্যে রূপালি রেখা এই একটি মাত্র, যে সে-দলের মধ্যেই এখন প্রচুর অসন্তোষ এবং নির্বাচক মণ্ডলীর ওপর তাদের প্রভাব ক্ষীয়মান। অপরপক্ষে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা সাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। আমি দেখে বিস্মিত ও প্রীত হলাম, যারা এতদিন কংগ্রেসের প্রতি উদাসীন ছিল, এমনকী কংগ্রেস-বিরোধীও ছিল, তারা কংগ্রেসের দলে ফিরছে। এর সুযোগ নিয়ে পঞ্জাবের কংগ্রেস দল কি জনসাধারণকে তার পতাকা তলে একত্র করতে পারবে? যদি না পারে, মুসলিম লীগের মতো সাম্প্রদায়িক দল প্রদেশে এগিয়ে যাবে।

পঞ্জাবে কংগ্রেস

পঞ্জাব কংগ্রেস যদি ভেদাভেদ ভুলে যে-সুযোগটি হাতে এসেছে তার সদ্ব্যব্যবহার করতে পারে, আজ থেকে পাঁচ বছর পরে নিশ্চয় তারা সে-প্রদেশকে কংগ্রেসের গরিষ্ঠতা দিতে পারবে। কিন্তু তারা কি সে-কাজ করবে? একজন বন্ধুভাবাপন্ন পর্যবেক্ষক হিসাবে দেখে-শুনে আমার যা মনে হচ্ছে, সে-প্রদেশের সর্বোচ্চ নেতৃবৃন্দের মধ্যে মহানুভবতা ও হৃদয়ের প্রসারের কিছু অভাব আছে। কংগ্রেস দলকে ঐক্যবদ্ধ করতে পঞ্জাবের প্রয়োজন এমন একজন নেতা যাঁর দৃষ্টি হবে উদার, হৃদয় হবে প্রশস্ত, যিনি গোষ্ঠী ও উপদলের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষ মাত্রেরই প্রতিনিধিত্ব করবেন। সাধারণ কর্মীরা যদি বিপ্লবী মনোভাবসম্পন্ন হন, তাঁদের হৃদয় যদি খাঁটি হয়, পঞ্জাব দেখতে-দেখতে নিজের প্রাপ্য জয় করে নেবে। শুধু প্রয়োজন উপযুক্ত নেতৃত্ব। আমি আশা করি, আমি প্রার্থনা করি সে-ঘটনা অবিলম্বে যেন ঘটে।

কৃষিজীবী সম্প্রদায় ও ভারতের জাতীয়তা*

কলিকাতায় কৃষিজীবী সম্মেলন।
কংগ্রেসের আদর্শ সম্পর্কে শ্রীসুভাষ বোসের ভাষণ।

সম্মেলনে ভাষণ দানকালে, কর্ণপটাহ বিদারক করতালি ধ্বনির মধ্যে শ্রীসুভাষচন্দ্র বোস বলেন, 'কংগ্রেস সর্বপ্রকার শোষণ বন্ধ করতে চায়, সে শোষণ সরকারই করুক আর কায়েমি স্বার্থের অধিকারীরাই করুক। সমস্ত শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করতে চায় কংগ্রেস। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে-সঙ্গে ভারত অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও লাভ করবে, পৃথিবীর সভ্যজাতি সমূহের পুরোভাগে আবার সে এসে দাঁড়াতে পারবে।...'

বঙ্গদেশের পরিস্থিতি[২]

কাল সকালে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি স্বল্পকালের জন্য ইউরোপের উদ্দেশে রওনা হব। বাংলার পরিস্থিতি আজ এমন যে এত দুঃখ বেদনার মাঝখান থেকে অত্যন্ত কষ্ট করে আমাকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে। কিন্তু আমার অন্য কোনও উপায় ছিল না, যদি যে-সব দায়িত্ব ও কর্তব্য এখন আমাদের সামনে উপস্থিত তার জন্য যথাসম্ভব শীঘ্র আমাকে শারীরিকভাবে নিজেকে তৈরি করে নিতে হয়। আমার কংগ্রেসের বন্ধুদের চাপা-চাপিতেই গত মাসে আমি ঠিক

---

১. ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট, ২৮ অক্টোবর ১৯৩৭ সংখ্যায় প্রকাশিত ১০ই অক্টোবরের একটি বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃত।

২. (সংবাদপত্রে সুভাষচন্দ্র বোসের বিবৃতি। ১৮ নভেম্বর ১৯৩৭)

করি যে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য আমার ডালহৌসি বাসে ছেদ ঘটিয়ে সারা ভারত কংগ্রেস সমিতি-র অধিবেশনের জন্য কলকাতায় যাব। তার পর থেকে নানা কারণে (জন সাধারণ যে-সব কথা জানেন) কলকাতায় আমাকে থেকেই যেতে হয়। তার ফলে আমি দেখছি, আমার শরীর সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনের এই চাপ আর মোটেই সহ্য করতে পারছে না। আমি এই আন্তরিক আশা নিয়ে কাল রওনা হব, নববর্ষের আগমনে আমি দীর্ঘ সাত বছরের ছেদের পর আমার স্বাভাবিক জীবন আবার শুরু করতে সক্ষম হব।

গত মার্চ মাসে মুক্তিলাভের পরেই আমি প্রথম যে-বিবৃতি দিয়েছিলাম, তাতে আমার ভবিষ্যৎ জীবন ও কাজকর্ম কোন-কোন মূলনীতি অনুযায়ী পরিচালিত হবে, তার কথা উল্লেখ করেছিলাম। আমি জোর দিয়ে আবার বলব, বাংলা যদি আবার নিজের গৌরব ফিরে পেতে চায়, তাকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মূলনীতি সমূহ ও কর্মসূচি অনুসরণ করতে হবে। সর্বোপরি, হিংসার পথ বর্জন করা, তার নিন্দা করা প্রয়োজন। অতএব গুপ্ত যে-সব গোষ্ঠী, গুপ্ত ক্রিয়াকলাপ, যদি থাকে চিরতরে সে-সব উচ্ছেদ করা দরকার, একমাত্র তা হলেই আমরা এক অভিন্ন আর্থসামাজিক কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে পারব।

আজ বাঙালি সম্প্রদায়ের কোনও-কোনও অংশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব গভীরভাবে প্রবেশ করেছে। এই বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে আমাদের দেশবাসীকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র কংগ্রেস কারণ এ দেশে কংগ্রেসই একমাত্র জাতীয় সংগঠন। আমি আন্তরিকভাবে আশা ও বিশ্বাস করি, আমাদের অর্থনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে আমরা এগিয়ে যাব। সেই কর্মসূচি সব সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ অতিক্রম করে যাবে, সকলকে ঐক্যবদ্ধ করবে। যে-সব মুসলিম ও তফসিলি জাতিভুক্ত ব্যক্তি এখন পর্যন্ত কংগ্রেস থেকে দূরে আছেন, তাঁদের প্রতি আমার আবেদন, কংগ্রেসে যোগ দিন। কংগ্রেসকে নিজেদের হাতে নিয়ে নেওয়া, নিজেদের সংগঠনে পরিণত করা, এ-কাজ তাঁদেরকেই করতে হবে। তাঁরা যদি সে-কাজ করেন আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে পিছনের বেঞ্চিতে গিয়ে বসব।

মহাত্মাজি যে আটক ব্যক্তিদের ও দণ্ডপ্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির জন্য চেষ্টা করছেন, তার ফল কী হবে। এই অবস্থায় সে-কথা আমার বলার নয়। মহাত্মাজিকে বঙ্গদেশে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা যে গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করেছি, তার দিকেই আমি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। জনসাধারণকে আমি এটুকু বলতে পারি, মহাত্মাজি কলকাতায় আসবার আগে আমি তাঁকে জানিয়েছিলাম, অহিংসার দিক থেকে বাংলার আবহাওয়া আজ এত অনুকূল যা আগে কোনও দিন ছিল না। আমি আন্তরিকভাবে আশা করি, এবং বিশ্বাস করি, এমন কিছু বলা অথবা করা হবে না, যাতে এই আবহাওয়া বিঘ্নিত হয়। অহিংসার আবহাওয়া আমরা বজায় রাখতে পারি কি না তার ওপর নির্ভর করবে রাজবন্দিদের মুক্তির জন্য আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টার সাফল্য। বন্দে মাতরম ।

সম্পাদক সমীপেষু,
হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড

২৩ নভেম্বর ১৯৩৭

মহাশয়,

আপনার পত্রিকায় এ মাসের ১৮ তারিখে ৬ পৃষ্ঠায় আপনি বলেছেন যে সাহিত্যিকদের সঙ্গে (বন্দে মাতরম-এর প্রশ্নে) মহাত্মা গান্ধী দেখা করতে অক্ষম বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এ বক্তব্য সম্পূর্ণ ঠিক নয়।

যেহেতু আমি সাহিত্যিকদের একটি প্রতিনিধি দলকে মহাত্মা গান্ধীর কাছে পাঠাবার প্রস্তাব দিয়েছিলাম এবং পরে আমি ড. সুনীতিকুমার চ্যাটার্জিকে এখনকার মতো সে কাজ না করবার কথা বলেছিলাম, অতএব আমার মনে হয় আমারই উচিত ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করা।

মন্ত্রীরা সকাল ১১ : ৩০ টায় মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করবার সময় নির্দিষ্ট করে ছিলেন, এবং আমাদের ধারণা ছিল সাক্ষাৎকারটিতে মোটামুটি এক ঘণ্টা লাগবে। তাই আমরা ভেবেছিলাম বিকাল ৩ : ৩০ টা মহাত্মা গান্ধীর পক্ষে সুবিধাজনক সময় হবে। ড. চ্যাটার্জিকে সেইমতো জানানো হয়েছিল। নির্ধারিত দিনে (আমার মনে হয় ১৬ তারিখে) দেখা গেল মহাত্মা গান্ধীর রক্তচাপ বেশ বেড়ে গেছে এবং মন্ত্রীরা সময় বদল করে ১২ : ৩০ করলেন। অতএব আমাদের মনে হল মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করে মহাত্মাজি ফিরে এলে ও-রকম বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করবার পক্ষে তিনি বড় বেশি ক্লান্ত থাকবেন। তাই আমি ড. চ্যাটার্জির কাছে প্রস্তাব করলাম, দেখা করার পরিকল্পনাটি আপাতত ত্যাগ করা হোক। ড. চ্যাটার্জি মহাত্মা গান্ধীর অসুস্থতার কথা শুনে অনুগ্রহ করে তাতে রাজি হলেন। তাতে আমি খুশি হয়েছি, কেননা মন্ত্রীদের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে কথা বার্তা তিন ঘণ্টার বেশি চলেছিল, এবং তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। পরের দিনও দেখা করা যায়নি, কেননা দুপুরের ট্রেনে মহাত্মা গান্ধী হিজলির উদ্দেশে কলকাতা ছেড়ে চলে যান।

আপনার
সুভাষচন্দ্র বোস

কার্লসবাড

এবং

চেকোস্লোভাকিয়ায় অন্যান্য উষ্ণপ্রস্রবণে জল চিকিৎসার কেন্দ্র[১]

১৯৩৩ সালের জুলাই মাসে, আমি যখন প্রাগে ছিলাম, চেকোস্লোভাক সরকারের সৌজন্য আমি কার্লসবাড-এর কয়েকটি চিনেমাটির কারখানা পরিদর্শনের সুযোগ পেয়েছিলাম। সরকারই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। যে স্বল্পকাল কার্লসবাড-এ ছিলাম, তার মধ্যে, যার জন্যে কার্লসবাড পৃথিবী বিখ্যাত, সেই উষ্ণপ্রস্রবণগুলি দেখতে পেয়েছিলাম। কার্লসবাড সম্পর্কে আমার আগ্রহ

১. ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৩৭ সংখ্যায় প্রকাশিত।

জন্মাবার আরও কারণ ১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাসে ভিয়েনায় যে অধ্যাপক আমার চিকিৎসা করছিলেন তিনি আমার শরীরের অভ্যন্তরের যন্ত্রণার জন্য কার্লসবাড চিকিৎসার সুপারিশ করেছিলেন। তবে ১৯৩৪-এর সেপ্টেম্বরের আগে আমি সেখানকার বিখ্যাত উষ্ণপ্রস্রবণের জল পান করবার জন্যে যেতে পারিনি।

১৯৩৩-এর অগাস্টে আমি চেকোস্লোভাকিয়ার আরেকটি অবগাহন-স্থান Franzensbad-এ গিয়েছিলাম। জায়গাটি কার্লসবাড থেকে ঘণ্টাখানেকের রাস্তা। সেই সময়ে প্রয়াত শ্রী ভি. জে. প্যাটেল তাঁর হৃদযন্ত্রের অসুখের সেখানে চিকিৎসা করাচ্ছিলেন। Franzensbad অবশ্য কার্লসবাড-এর চেয়ে অনেক ছোট জায়গা, এবং অত আন্তর্জাতিক খ্যাতিও তার নেই। তা হলেও জায়গাটি বেশ সুন্দর। হৃদযন্ত্রের অসুখ, স্ত্রী-রোগ, বাত ইত্যাদির জন্য বিশেষভাবে ভাল। জায়গাটি এক বিস্তীর্ণ সমতলভূমির ওপর গড়ে উঠেছে। সেই কারণে বৃদ্ধ এবং অশক্ত নরনারীর জন্যে বিশেষ উপযোগী।

কার্লসবাড জায়গাটা সে-রকম নয়, পর্বতমালায় বেষ্টিত। শহরের প্রধান স্থানটি উপত্যকায় অবস্থিত, এবং চতুর্দিকে রাস্তা পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেছে। তার দু'পাশে বাড়ির সারি। প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্য এবং স্বাস্থ্যের কারণেও শহরটির অবস্থান খুবই উপযোগী। কার্লসবাডের পুরসভা সুন্দর-সুন্দর রাস্তা তৈরি করেছে, পদচারণার পথও বানিয়ে দিয়েছে। কার্লসবাডকে ঘিরে আছে যে-সব পর্বতশৃঙ্গ, ওই সব রাস্তা দিয়ে তার ওপরে ওঠা যায়। পর্বতচূড়াগুলি, যেমন Dreikreuzberg (তিনটি ক্রস-সম্বলিত পাহাড়) Freundschaftshoshe (বন্ধুত্বের পাহাড়), Hirschensprung (হরিণ-লাফানো পাহাড়), Veitsberg, Aberg, Stifterwarte, প্রভৃতি শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে পায়ে হেঁটে ঘন্টা খানেকের পথ। এবং এর প্রত্যেকটি থেকে সমগ্র শহরটির সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। পাহাড়ের চূড়ায় উঠবার সুন্দর পথগুলির দু'পাশে অল্প দূর অন্তর ক্লান্ত পথচারীদের বিশ্রামের জন্য আসন বসানো আছে। আসনগুলি এত সুন্দর যে দেখলে বসতে ইচ্ছা করে। তা ছাড়া, যে-যে সময়ে পর্যটকরা আসে ওইসব সুদূর পর্বতচূড়ায় কাফে খোলা হয়, সেখানে ক্লান্ত পথচারীরা খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে ক্লান্তি দূর করতে পারে। ইউরোপের জনপ্রিয় পর্যটনস্থলগুলিতে আমোদ-প্রমোদের যে-সব ব্যবস্থা থাকে তা এখানেও আছে, যেমন টেনিস, গল্ফ, নাচ, সিনেমা, থিয়েটার, অশ্বারোহণ, শিকার প্রভৃতি। কিন্তু আমার কাছে কার্লসবাড-এর আকর্ষণের প্রধান কারণ তার যে বৈশিষ্ট্যটি, সেটি হল চারি দিকের সমস্ত পাহাড়চূড়ায় আরোহণের সুন্দর-সুন্দর পথগুলি। কখনও একঘেয়ে মনে হয় না, প্রত্যেক দিন নতুন কোনও রাস্তা দিয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ নতুন দৃশ্যাবলী উপভোগ করা যায়।

কার্লসবাড স্থাপন করেছিলেন সম্রাট চতুর্থ চার্লস (Karl IV) ১৩৪৯ সালে। একটি কাহিনি আছে, যে সম্রাট চতুর্থ চার্লস একদিন কার্লসবাড-এর চতুর্দিকের পাহাড়ে শিকার করছিলেন। হঠাৎ তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল এক প্রকাণ্ড হরিণ। কুকুরগুলো সঙ্গে-সঙ্গে তাকে তাড়া করতে আরম্ভ করল। হরিণটি কুকুরগুলোর তাড়া খেয়ে এক খাড়া পাহাড়ের ওপর থেকে লাফ দিল। একটু পরেই সম্রাট একটি কুকুরের চিৎকার শুনতে পেয়ে ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ের তলায় নেমে এসে দেখলেন একটি উষ্ণ প্রস্রবণে পড়ে কুকুরটি পুড়ে মরে গেছে। এভাবেই, একটি দুর্ঘটনার মাধ্যমে সম্রাট চতুর্থ চার্লস কার্লসবাদ আবিষ্কার করেছিলেন। নব আবিষ্কৃত উষ্ণ প্রস্রবণগুলিকে কেন্দ্র করে, চিকিৎসকদের পরামর্শে সম্রাট রোগ-নিরাময়ের জন্য একটি অবগাহন স্থান স্থাপন করলেন। সেই থেকে কার্লসবাদ (চার্লস-এর, কিংবা তার জার্মান ভাষান্তর কার্ল-এর অবগাহন স্থান) মধ্য ইউরোপের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত জলচিকিৎসা কেন্দ্র। চিরকালই তা বিখ্যাত থাকবে। গ্যেটে কার্লসবাড-এ গিয়েছিলেন অন্তত তেরো বার, তিনি নাকি বলেছিলেন, 'ওই প্রস্রবণগুলিই আমাকে নবজীবন দান করেছে।' অন্য অনেক জল চিকিৎসার কেন্দ্র থেকে কার্লসবাড-এর

পার্থক্য, সেখানে যে-কোনও সময়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো যায়, কেননা উষ্ণ প্রস্রবণগুলি ও অবগাহন কেন্দ্রগুলি সারা বছর খোলা থাকে। কার্লসবাড-এর উষ্ণ প্রস্রবণগুলির জল ক্ষারীয় লবণযুক্ত খণিজ জল যার মধ্যে সোডা সালফেট, সোডা কার্বনেট এবং সোডা ক্লোরেট-এর ভাগই বেশি, তা ছাড়া তাতে লিথিয়াম হাইড্রো-কার্বনেট-এর যে অনুপাত এবং তার যে তেজস্ক্রিয়তা তা সে-জাতীয় অধিকাংশ খনিজ জলে যা থাকে তার চেয়ে বেশি। প্রস্রবণগুলির জল যেমন, তেমন তার থেকে নির্গত কার্বনিক অ্যাসিড সবই তেজস্ক্রিয়।

কার্লসবাডের স্থায়ী জনসংখ্যা প্রায় ষোলো হাজার। কিন্তু মরসুমে প্রায় ৫০,০০০ মানুষ এখানে আসেন। রেকর্ড সংখ্যক অতিথি এসেছিলেন ১৯২৮ এবং ১৯৩১-এ। এই আগমন সংখ্যা ছিল, যথাক্রমে ৬৮,০০০ এবং ৭১,০০০। কিন্তু অর্থনৈতিক মন্দার কারণে, বিভিন্ন দেশের প্রস্রবণগুলির উন্নয়নের জন্য এবং বিভিন্ন দেশীয় সরকারের আত্মনির্ভরশীলতার প্রয়াসে এখানে অতিথি সমাগম সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। ১৯৩৩ সালে এই সংখ্যা ছিল ৩৮,০০০। সবচেয়ে কম ছিল ১৯১৯ সালে। মাত্র ১৫,০০০। চেকোস্লোভাকিয়ার কাছে কার্লসবাডের অন্যতম গুরুত্ব হল এখানকার চিনেমাটির শিল্পের জন্য। চেকোস্লোভাকিয়া এর জন্যই বিখ্যাত। তবে সারা পৃথিবী কার্লসবাডকে চেনে তার উষ্ণ প্রস্রবণের জন্যই।

কার্লসবাদে উষ্ণ প্রস্রবণ ১৬টি। তার জল পানও করা হয়, তাতেও অবগাহন করাও হয়। নীচে কয়েকটি প্রস্রবণের বর্ণনা দেওয়া হল:

Sprudel নামে প্রস্রবণটি রাজকীয়ভাবে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে—এ ছবি কার্লসবাডের প্রতীক। তার জল (৭২° সেন্টিগ্রেড) দেড়শো বছরের বেশি সময় শুধু অবগাহনের জন্যই ব্যবহার করা হত, যতদিন না ১৫২০ সালে Dr. Wenzel Payer পান করবার জন্যও সে-জলের ব্যবস্থা দিলেন। Sprudel থেকে প্রতি মিনিটে বেরোয় ২০০০ লিটার উষ্ণ জল অর্থাৎ সারা দিনে ২৯ লক্ষ লিটার। তাতে থাকে ১৯০০০ কিলো দ্রবীভূত লবণ। বাৎসরিক চুক্তির ৪০ লক্ষ বোতল, ১১/২ দিনে উৎপন্ন হয়। সর্বাপেক্ষা অধিক চাহিদার সময় প্রতি দিন পান করা হয় ২৩,৫০০ গেলাস জল, যা উৎপন্ন হয় ২ মিনিটে। Sprudel যে বিপুল পরিমাণ উৎপাদন করে তা সমস্ত অবগাহন স্থানের চাহিদা পূরণ করে। Sprudel লবণ প্রতি বৎসর উৎপন্ন হয় ১০০,০০০ কিলোর বেশি। প্রতি ঘণ্টায় Sprudel দেয় ২৫০ কিলো কার্বনিক গ্যাস।

Sprudel পরেই সবচেয়ে শক্তিশালী প্রস্রবণ The Muhlbrunn, যার উৎপাদন মিনিটে ১৭.৫ লিট্টার, তাপমান ৫৩.৭° সেন্টিগ্রেড। পৃথিবীতে Muhlbrunn-এর জল পান করা হয় বছরে প্রায় ৩০ লক্ষ বোতল। Muhlbrunn-এর বীথিপথের নিকটে দর্শনীয় গ্রীক স্থাপত্য প্রত্যেক আগন্তুকের মন হরণ করে।

'The Schlossbrunn' সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত প্রস্রবণ। উৎপাদন মিনিটে ৪৫ লিটার। তাপমান ৬৩.৩° সেন্টিগ্রেড। 'Schlossberg'-এর পাদদেশে পাথরের মধ্যে একটি ফাটল থেকে উৎসারিত হচ্ছে Marktbrunn। উৎপাদন মিনিটে ৪.৯ লিটার, তাপমান ৪৯.৯° সেন্টিগ্রেড।

'The Kaiser Karl IV' প্রস্রবণ। এটি বহু প্রাচীন, সম্রাট চার্লস IV (১৩১৬-১৩৭০)-এর জীবিত কালের। সম্রাট পায়ের ক্ষতর জন্যে এখানে স্নান করতেন এবং তাতে উপকার পেয়েছিলেন। উৎপাদন মিনিটে ৫.১ লিটার। তাপমান ৫০.৪° সেন্টিগ্রেড। অন্য প্রস্রবণগুলির নাম: Neubrunn, Bernhardsbrunn, The Elisabeth Rosen Quelle, The Kurhausquelle, Parkbrunn, The Russian Kronenquelle, Spitalsquelle, Dorotheensauerling, এবং Eisenquelle.

কার্লসবাড-এ ছ'টি অবগাহনস্থান আছে, সেখানে এইসব স্নানের ব্যবস্থা আছে: Sprudel স্নান, মাড স্নান, কার্বনিক অ্যাসিড স্নান, উষ্ণ-বায়ু স্নান, বৈদ্যুতিক স্নান, Sprudel-বাষ্পীয় স্নান,

Sprudel-অন্ত্র স্নান, Sprudel-কার্বনিক অ্যাসিড স্নান, শুষ্ক-গ্যাস স্নান, মাড-প্যাক স্নান ইত্যাদি।

কার্লসবাড নিম্নলিখিত অসুখগুলির জন্য বিশেষ উপযোগী: পেটের অসুখ, অন্ত্রের অসুখ, যকৃতের অসুখ, পিত্তথলির অসুখ, পরিপাক সংক্রান্ত অসুখ। এ-ছাড়া এই অসুখগুলিতেও কার্লসবাড চিকিৎসায় উপকার হয়: ম্যালেরিয়া-জনিত বিবিধ অসুখ, মূত্রাশয় সংক্রান্ত অসুখ, পুরনো বাত, পেশির ও গ্রন্থির অসুখ, স্ত্রীরোগ, চর্ম-রোগ।

পুরুষ ও নারীরা রাস্তা দিয়ে চলেছে, তাদের হাতে গেলাস, কার্লসবাডের জল খেতে-খেতে যাচ্ছে, এ-দৃশ্য কার্লসবাড-এ অতি সাধারণ। সাধারণত এ-জল পান করতে হয় সকালে একবার এবং বিকালে আরেকবার। এই-সব জলপানের সময়ে অত্যন্ত জনসমাগম হয়। অতিরিক্ত ভিড়ের সময়, অর্থাৎ মে থেকে অগাস্ট, প্রত্যেকটি প্রস্রবণের সামনে পানের জন্যে জল নিতে দীর্ঘ সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। প্রত্যেকটি প্রধান প্রস্রবণে প্রশস্ত বীথিকা আছে। সেখানে খারাপ আবহাওয়ার সময়েও লোকে জল খেতে-খেতে পায়চারি করতে পারে। জল পানের সময়ে এবং তার পরে প্রায় এক ঘন্টা হাঁটার জন্য ডাক্তারেরা পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

বর্তমানে শহর থেকে Freundshoftshohe পাহাড়ের চূড়ায় যাওয়ার জন্য একটি পার্বত্য তারে চালিত রেলপথ আছে। অন্যান্য রেলপথও তৈরি হচ্ছিল, কিন্তু সঙ্কটের জন্য নির্মাণকার্য বন্ধ করে দিতে হয়।

কার্লসবাডের জল এবং কার্লসবাডের লবণ সারা পৃথিবীতে পাওয়া যায়। সে-সব জল ও লবণ কার্লসবাডের টাটকা জল ও লবণ, যা প্রস্রবণ থেকে নিয়ে গরম-গরম খাওয়া হচ্ছে, তার মতো অত কার্যকর না হলেও উপকারী।

কার্লসবাড অবশ্যই ফ্যাশনেবল শহর এবং সেখানকার হোটেলগুলি বিলাসবহুল ও ব্যয়বহুল। তবে যদি কেউ অনাবশ্যক ব্যয়বাহুল্যের মধ্যে না যেতে চায়, সে সস্তাতেও আরামে থাকতে পারে। যেমন Schlossberg-এর Kurhaus Konigin Alexandra, যেখানে আমি ছিলাম, বেশ আরামপ্রদ, তার খাবার-দাবারও ভাল, অথচ খরচ বেশি নয়। প্রত্যেক ঘরে কল খুললেই ঠান্ডা-গরম জল, হোটেল গরম রাখার কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা আছে। কার্লসবাড-এ এরকম জায়গা অনেক আছে। একমাত্র যে অসুবিধাটি বিদেশিদের ভোগ করতে হয়, সেটা হল একটি বিশেষ কর, তার নাম Kurtaxe, যার হার নির্ভর করে আগন্তুকের সামাজিক অবস্থান ও সম্পদের ওপর। করটি ন্যায়সঙ্গতভাবে ধার্য করা হয় না, এবং কমাবার জন্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রায়ই লড়াই করতে হয়।

কার্লসবাডের আশে পাশে আরও অনেক উৎকৃষ্ট জলচিকিৎসার জায়গা আছে, যেমন, Marienbad এবং St. Joachimsthal। সে-সব জায়গাতেও আমি গিয়েছি। কার্লসবাডের কাছে কয়েকটি রেডিয়াম-খনি আছে। St. Joachimsthal-এর রেডিয়াম প্রস্রবণগুলি নিরাময়-ক্ষমতার জন্য সুপ্রসিদ্ধ।

এখন প্রশ্ন, এই সব জলচিকিৎসা কেন্দ্রগুলি থেকে আমরা কী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। আমাদের শিখবার অনেক কিছু আছে। ভারতে শুধু যে পর্বত ও সমুদ্রতীরস্থ ভ্রমণস্থলই অনেক আছে তা নয়, অনেক উষ্ণ প্রস্রবণও আছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে সে-সব জায়গাকে বিকশিত করে তোলা, যাতে সারা দেশ থেকে ভ্রমণকারীরা সেখানে আকৃষ্ট হবে, সে-কাজ খুবই কম হয়েছে। এর প্রধান কারণ অবশ্য সরকারের ঔদাসীন্য, চোকোস্লোভাকিয়ায় কিন্তু সরকার ওইসব বিকশিত করার কাজে বিশেষ আগ্রহী। যেমন কার্লসবাডের যত আগন্তুক অন্তত দশদিন সেখানে থাকবেন, তাঁরা সবাই ফিরে যাওয়ার

সময়ে রেল ভাড়ায় ৫০ শতাংশ ছাড় পাবেন। ভারতে সরকার এবং পুরসভাগুলি যে জনপ্রিয় 'রিসর্ট'গুলি বিকশিত করবার জন্য তাঁদের কর্তব্য করবেন, সে আশা করবার আগে আমাদেরকে জনমত জাগ্রত করতে হবে। এইসব স্থানের প্রত্যেকটি, বিদেশ থেকে ভ্রমণকারী আকর্ষণ করে নিজের দেশের সম্পদ বাড়াতে পারে। দেশের জনগণকে নবজীবন দান ছাড়াও এই অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যটিও সাধিত হতে পারে। আমরা কি আমাদের দেশে এ-রকম কিছু করতে পারি না? ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য যে-সব সরকারি পরিকল্পনা, তার মধ্যে ভারতের স্বাস্থ্যপুনরুদ্ধারের কেন্দ্রগুলি ও জলচিকিৎসার কেন্দ্রগুলির বিকাশও থাকা প্রয়োজন।

নির্ঘণ্ট

অখিলবাবু ৫৯, ৬৬
অগ্নিহোত্রী ১১৩, ১১৭-১১৮
অজিতকুমার দে ৫৬, ৬২
অটোয়া চুক্তি ১৯৯
অনিলচন্দ্র গাঙ্গুলি ১৬৯
অমরকৃষ্ণ ঘোষ ১৪৫
অমিয় চক্রবর্তী ৭৩, ৭৯, ৯৯, ১১১, ১১৮, ১২০
অমৃতবাজার পত্রিকা ৪২, ২১৯
অরবিন্দ ঘোষ, শ্রী ৫
অল ইন্ডিয়া স্ট্যাটিসটিক্যাল সোসাইটি ১৯
অলডাস হাক্সলি ১৫৮
অশোক ৩৭, ৬৩, ১৭৫
অস্ট্রিয়া ২১, ৩৪, ৩৯, ১১২, ১২৭, ১৩৯, ১৫০, ১৮২, ১৮৪, ২০৪-২১১, ২১৪, ২৪৩, ২৯৪, ২৯৮
অস্ট্রেলিয়া ২৪০, ৩০৫
অ্যাগনেস স্মেডলি ৪৫
অ্যাগ্রেরিয়ান ২০৬, ২০৯
অ্যাঙ্গোরা ৫৪
অ্যাডভান্স পত্রিকা ১০১
অ্যালেক্স লিন, মি. ১৩৩
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস ৩, ৫

আই. আই. লিগ ৪২
আইরিশ পিপল পত্রিকা ১২৩
আইরিশ প্রেস ৩২, ৪২, ১২৩, ১৫৫
আঁদ্রে জিদ ১০৯, ১২৫
আঁদ্রে ম্যালরক্স ১২৫
আনন্দবাজার পত্রিকা ৪৩, ৪৪, ৭৫, ১৪০
আনাফ্রেড রোজেনবার্গ, হের ৪৯
আফগানিস্তান ২২০
আবদুর রহিম ২৮৩
আবিসিনিয়া ৮৬, ২৩৩-২৩৮, ২৪০-২৪৪, ২৯৫-২৯৭
আমস্টারডাম ১৮৬
আমানুল্লা, রাজা ২২০
আমেদাবাদ *দেখুন* আহমেদাবাদ ৪৭
আমেরিকান আয়রন অ্যান্ড স্টিল ইন্সটিটিউট ২৪৮
আয়ারল্যান্ড ৩১-৩২, ৮০, ৯৭, ১০৬, ১১২, ২০৪, ২৫৬-২৫৭, ২৬১-২৬৩
আর্থার অ্যাভালন ১৪১
আলফ্রেড টিরনয়ার ১১
আলেকজান্দ্রা ১১৪
আহমেদাবাদ ২৫৩

ই. উডস ২৬, ৭১, ৮০, ৯৭, ১০৩, ১০৬-১০৭, ১১৬, ১২৩, ১৩২, ১৩৪, ১৫৫, ১৭৫, ১৮৪
ইউক্রেন ২৯৯
ইউনাইটেড প্রেস ২২৫, ৩১৭
ইউনিভার্সিটিস রিপাবলিকান ২৫৭
ইংল্যান্ড ৩২, ৮৬, ৯৭, ১৫১, ১৬১, ১৮৪, ১৮৬, ২৬৮
ইটারনাল সিটি ৭০
ইতালি ৮৬, ৮৯, ১২৭, ১৮১, ২০৪-২০৫, ২১৪, ২৩৫-২৪৪, ২৯৪-২৯৭, ৩০১, ৩০৩
ইন-জু-কেঙ ৩১০
ইনসব্রুক ৭৪
ইন্ডিয়া কমিটি ৪৫
ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব ডয়েশ অ্যাকাডেমি ৯১
ইন্ডিয়ান সার্কেল ২৯
ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন ২৫৬
ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টস কনফারেন্স ৩৫
ইন্দো-আইরিশ লিগ *দেখুন* আই. আই. লিগ ৭১, ৮১, ৯৭
ইন্দো-চেকোস্লোভাক সোসাইটি ৬৭-৬৮, ৭৭, ৮৫, ১০২, ১২৮
ইয়ুং, ড. ১৪১, ১৪৮
ইস্তানবুল ৫৩-৫৪

উইনস্টন চার্চিল ৩০০

উইমেনস ইন্টারন্যাশনাল লিগ ১০৯, ১১৯
উইলিংডন, লর্ড ৯০
উদয়শঙ্কর ১১৩-১১৪, ১১৭-১১৮

এ. কে. ফজলুল হক ৭৬, ১০১
এক্সপোর্ট ইন্সটিটিউট ১০২
এডেন ২১৮-২১৯
এন. কে. বোস, শ্রী এবং শ্রীমতী ৩৭
এনডা ১৫৫, ১৭৬
এন. বি. সাকলাতওয়ালা ৯২
এম. এ. আনসারি, ড. ২৮৯
এম. এফ. নোকরাশি, মি. ২২৪
এমিলি শেঙ্কল ৬৮
এরিট্রিয়া ২৯৬
এলাহাবাদ ১৫৮, ১৬২
এশিয়াটিক স্টুডেন্টস কংগ্রেস ৩৫-৩৬
এ. সি. এন. নাম্বিয়ার ৫৭, ৬৪
এ. সি. ব্যানার্জি ১৭৮
এস. এ. ব্রেলভি, শ্রী ২১৫

ওটো ফ্যালটিস ৩৪
ওয়াটারলু ১০৭, ১০৯
ওয়ারস ১৫-১৭, ২৯, ৪৫-৪৭, ২০২, ২৫৪
ওয়াল্টার স্মাইলস, স্যার ২৭০
ওরিয়েন্টাল ইন্সটিটিউট ২৯, ৩৫, ৪৬
ওরিয়েন্টাল সোসাইটি ২৫৪
ওরিয়েন্টুরিস্ট লিমিটেড ১৭৯

কমলা নেহরু, শ্রীমতী ৯৬
কমার্শিয়াল গেজেট ৭, ১৬৭
কর্ক ১০৯
কাউল, ড. ১০৫
কাজিনস, মিসেস ৪২
কাটিয়ার, ড. ৩৯, ৬৯, ৭৭
কান্তিলাল পারেখ ২-৫, ২৩, ৪৭
কামাল পাশা ২৮৩
কায়রো ১১৪, ২২১, ২২৪
কার্লসবাড ৬১, ৬৩, ৬৫-৬৬, ৭৭, ২২৫, ২৩৩, ৩২১-৩২৪
কার্সিয়াং ১৪৭, ১৭৬
কিটি কুর্টি ৪৪, ৯৮, ১৪০, ১৪২, ১৪৮, ১৫১, ১৬১, ১৬৫
কিনান, মি. ৯৩, ২৪৫-২৪৭, ২৫৩
কুওমিনটাং ৩০৮
কৃপালনি, মি. ১৪৬
কে. এফ. নারিম্যান ২১৫
কোভ ১০৬-১০৭
কোলোন ১০৯
ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন ১৬৭-১৬৮
ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট ১৫৩, ৩১৯, ৩২১
ক্রিশ্চিয়ান সোশ্যাল ২০৬-২০৭, ২০৯, ২১৪
ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৭০

গান্ধী *দেখুন* মহাত্মা গান্ধী ৪৪
গান্ধী-আরউইন চুক্তি ১৯১, ১৯৩
গান্ধীজি *দেখুন* মহাত্মা গান্ধী ১৮৩
গায়রোলা ১০৪-১০৫, ১১৪, ১১৭, ১৬০
গিদ্দাপাহাড় ১৭৬
গিরিজাপ্রসন্ন সান্যাল ১৪৩
গোকুলচাঁদ, মি. ৭৮
গোপাল সান্যাল ৬২
গোয়েরিং, জেনারেল ৪৯
গ্রিস ২৯৪, ৩০১-৩০৩

চাচার ৩১০
চালিহা, মি. ৮০
চিন ৩০৫-৩১৩, ৩১৬
চিয়াং- কাই-শেক, মার্শাল ৩০৮, ৩১২
চু-এন-লাই ৩১২
চেকোস্লোভাকিয়া ১৬, ২৩, ৫৭, ৫৯, ৬৩, ৮৯, ১০২, ১৩৯, ২৯৪, ২৯৮-২৯৯, ৩০০, ৩০২, ৩২১-৩২২

জওহরলাল নেহরু, পণ্ডিত ৪৩, ৮৩, ৮৬, ৯৬-৯৭, ১১২, ১২১, ১৩৭, ১৭৬, ২৫০-২৮৮
জন, মি. ৯৩-৯৪
জব্বলপুর ১৪৫
জর্জ ডা সিলভা ১৪২, ১৪৪-১৪৫
জাগ্রেব ৫৫
জাপান ১৩০
জামশেদপুর ৯৩-৯৪, ২৪৫, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫৩
জার্মান অ্যাকাডেমি ৯০
জার্মান ওরিয়েন্ট অ্যাসোসিয়েশন ৯০

জার্মানি ২৩, ৪৮-৫০, ৫৮, ৮৮-৯০, ১১৯, ১২৯, ১৩০-১৩১, ১৪৮, ২০৪-২০৮, ২৪৩, ২৫৬, ২৫৮, ২৯৪-২৯৯, ৩০০-৩০৩, ৩০৬
জিব্রালাটার ২৯৬-২৯৭
জুতশি, মি. ১৮৩
জুরিখ ২৩, ৭৫, ১৪১, ১৫১-১৫২
জে. এন. টাটা ২৪৫
জে. টি. সান্ডারল্যান্ড ৮, ৭১, ৮২
জে. ধর্মবীর, শ্রীমতী ১৭৮, ১৮২
জেটল্যান্ড, লর্ড ৯১
জেনেভা ২১-২৪, ২৯-৩০, ৩৭, ৪৫, ৭৪, ৭৬, ২২৮, ২৩৯, ২৭০-২৭১, ২৭৩
জেনোয়া ৬৯, ১০৭, ১৪৩
জেহোল ৩১০

টাইমস অব ইন্ডিয়া ২৫৯
টাইমস, পত্রিকা ৬২, ৯৫, ১০১, ২১৪, ২৪২
টাইরল ৭৪, ৭৯, ৮২
টাউনেন্ড, মি. ২০৪
টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি ৯৪, ২৪৭-২৪৯, ২৫০, ২৫২
টি ও'ক্যারল, মি. ২৫৭
টেগোর, ড. *দেখুন* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৭৬
টেরেন্স ম্যাকসুইনি ৩১
টোকিও ৩১৫
ট্রটস্কি ২৯৪
ট্রিবিউন পত্রিকা ১৮২
ট্রিয়েস্টে ১০৫

ডয়েশ অ্যাকাডেমি ৫৮, ১৩০-১৩১
ডলফাস, হের ২০৯, ২১৪
ডাবলিন ৮০, ৯৭, ১০৩, ১০৫, ১০৭-১১১, ১১৬, ১১৮-১১৯, ১৮৪-১৮৫, ২৫৬
ডালহৌসি ১৫৫-১৬০, ১৬৩, ১৬৮-১৭০, ১৭২, ১৭৪-১৭৫, ৩০৩, ৩২০
ডি ভ্যালেরা, প্রেসিডেন্ট ১০৩, ১০৯, ১৮৪, ২৮২
ডিয়েকহফ, মি. ৯৫-৯৬
ডেনেরি, ড. ১০৯
ডেভ, প্রেসিডেন্ট *দেখুন* ডি. ভ্যালেরা, প্রেসিডেন্ট ১৮৫
ডেমেল, অধ্যাপক ৮৩, ১৭৯, ১৮৩
ডেলি মেল পত্রিকা ৪৯
ডেলি হেরাল্ড পত্রিকা ২১৩
ডোজেন্ট পিল্লাট ৭৮
ড্রেসডেন ৫৭-৫৯

তিব্বত ৩১৪
তুরস্ক ৫৪, ২১৬, ২৯৮, ৩০১
তুষারকান্তি ঘোষ ১৩৭, ১৪৫
ত্রিপুরা ১৭৭

থিয়েরফেল্ডার, ড. ৮৮, ৯৫, ১২৯

দার্জিলিং ১৩৭-১৪৮, ১৫৫
দি ইনসাইড অব বেঙ্গল পলিটিক্স ১০১
দি ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল ১৯২০-৩৪ ৭০-৭২
দিলীপকুমার রায় ১
দিল্লিচুক্তি ১৯১-১৯২
দীপনারায়ণ সিং, শ্রী ২১৫
দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ২৮৯
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ৫৯, ৯৩, ১৮৯, ২৫০, ২৬৭
দ্য ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট ২৯১-২৯২
দ্য নেশন ৩১১
দ্য মডার্ন রিভিউ ২০৪, ২১৮, ২২৮
দ্রেভেত, মাদাম ১০৯

ধর্মবীর, মিসেস ১৬০

নলিনী সরকার ৬৫
নাওমি সি. ভেটার ১১-১৯, ২০-৩০, ৩৪-৩৫, ৩৮-৩৯, ৪১, ৪৮, ৫২-৫৫, ৬২, ৬৪, ৬৭, ৬৯, ৭৪-৭৯, ৮২-৮৪, ৮৭, ৯৫, ১০৬, ১০৮, ১১১, ১১৫, ১২৪, ১৩২, ১৩৫, ১৩৯, ১৪৯, ১৫৩, ১৫৭, ১৮০
নাৎসি ২০৫, ২০৭, ২০৯-২১১ ২১৪, ২৯৫, ২৯৮, ৩০১-৩০২
নানকিং ৩০৮, ৩১০, ৩১৪-৩১৫
নাপোলি ১৮০
নাম্বিয়ার, মি. ১০২, ১০৪, ১২৮
'নিউ লিডার' ২৩৫-২৩৭
নিউম্যান, অধ্যাপক ৬২
নিখিল সেন, শ্রী ৫
নিস ৩৫
নেপলস ৬৯-৭০, ১৮০, ১৮৬, ২১৯-২২০
নেলী সেনগুপ্তা, শ্রীযুক্তা ২৮

নেসিম পাশা ২২৪
নেহরু, শ্রী *দেখুন* জওহরলাল নেহরু ৪৪, ৮৭, ১১১, ১১৫-১১৬
নেহরু, পণ্ডিত *দেখুন* জওহরলাল নেহরু ২৫৮
নেহরু, মিসেস/ শ্রীমতী *দেখুন* কমলা নেহরু, শ্রীমতী ৭৭, ৮৩-৮৪, ৮৬-৮৭, ১১৫, ১১৮
ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ১০৩
ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট পার্টি ৮৮, ১৩০

পঞ্চম জর্জ, রাজা ৯১
পঞ্জাব ১৫৫-১৫৬, ১৬০, ১৬৩, ১৬৮-১৭০, ১৭২, ১৭৫, ২৬৪, ২৬৬, ৩১৭, ৩১৯
পাঁচথুপি ১৫১, ১৬৩
পিকিং ৩১০
পিপিং ৩১৫
পিল্লাট, ড. *দেখুন* ডোজেন্ট পিল্লাট ৭৯
পু ই, সম্রাট ৩১০
পুনা ১৩৬, ১৩৯
পোল্যান্ড ১৫, ২৩, ৪৫-৪৬, ৮৯, ২৪৩, ২৫৪, ২৯৮-২৯৯, ৩০০-৩০২
ঁপ্যাটেল *দেখুন* ভি. জে. প্যাটেল ৯৬
প্যাটেল, শ্রী *দেখুন* ভি. জে. প্যাটেল ২০-২৫, ২৭-২৯
প্যারিস ১০২, ১০৫, ১০৭-১০৮, ১১২, ১১৪, ১১৮-১১৯
প্যালেস্টাইন ১৬০
প্রভুদয়ালবাবু ৫৬, ৬৩
প্রাগ ১৪, ১৭, ৫০, ৫৭, ৫৯, ৭৭, ১০২, ১১২, ১৮৬, ২০২
প্রাহা ১০২, ১৭৫
প্রিয়নাথ সেন, বাবু ৬০
প্লোসকাল, মি. ১০২

'ফরওয়ার্ড' ৬২, ৯৩
ফরিদপুর ১৭৭
ফিউলোপ মিলার, মিসেস ৩১, ৬৯, ৮৭, ১৪৬-১৪৭, ১৫০
ফিজিক্যাল কালচার ইন্সটিটিউট ৪৬
ফিলজফিক্যাল কংগ্রেস ৬৪
ফু শো ই, জেনারেল ৩১০
ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টস অ্যাব্রড ৮৯
ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টস ইন ইউরোপ ৩৬

ফ্যালটিস, মি. ১০৪-১০৫
ফ্রয়েড ১৪৮, ১৫২, ১৬২
ফ্রান্স ৩১, ১২৫, ২৯৪-২৯৫, ২৯৯, ৩০২
ফ্রান্সিস জাজতি, অধ্যাপক ৩১
ফ্রি প্রেস ৩, ৫
ফ্রি প্রেস জার্নাল ৪২
ফ্রেঞ্চ লিগ অব হিউম্যান রাইটস ১৬২
ফ্র্যানজেনসবাড ১৯, ২৩

'বন্দেমাতরম' ১৭৬-১৭৭
বম্বে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস ৫
বলডুইন, মি. ২৪০
বল্লভভাই প্যাটেল, সর্দার ২৮৮
বাকিংহাম প্যালেস ৯১
বারদৌলি ১৮৯
বার্গসঁ ১৬৯
বার্লিন ১৭-১৯, ২৩, ৪৮-৪৯, ৫০-৫১, ৭৭, ৯৬, ৯৮, ১০৯, ১১২, ১১৯, ১৪২, ১৫২, ১৬০, ২০২, ২৫৬
বি. সি. রায়, ড. ৬৬
বিজয়কুমার বসু, শ্রী ৩০৩
বিবেকানন্দ ৯১
বিভাবতী বোস/বসু ৩৭, ১৩
বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, শ্রী ২৮৯
বুখারেস্ট ৫৩-৫৪
বুদাপেস্ট ৩১, ৩৮, ৫২-৫৫, ১১৭-১১৮
বুলগেরিয়া ২৯৪, ২৯৮, ৩০৩
'বেঙ্গলি' ২৭০
বেনেস, ড. ১৬, ১০২
বেলগ্রেড ৫৪-৫৫
বেলজিয়াম ১০২, ২৯৯, ৩০১
ব্যাডগাসটেন ৮৩, ১০৯, ১১১, ১১৭, ১৩২-১৩৩, ১৩৬, ১৬০, ১৭৯-১৮৪,
ব্যাডেনউইলার ৮৩-৮৪, ৮৯, ৯৭
ব্রাসেলস ১০৯,১১২
ব্রিটিশ কনসাল ১২৪
ব্রিটিশ কাউন্সিল ১২০-১২৩
ব্র্যানডেনবার্গ ১০৪-১০৫
ব্লেয়ার, মি. ১৪৭

ভন হাভে, মি. ৫১
ভবভূতি ১১৬

ভি. জে. প্যাটেল, শ্রী *দেখুন* ভিঠলভাই প্যাটেল ৮, ২৬, ৯৮, ২৬১, ২৮৩, ২৮৯
ভি. লেসনি, অধ্যাপক ২৯, ৫৮, ৬৬, ৬৮, ৮৫, ১০২, ১৫৬, ১৭৫
ভিঠলভাই প্যাটেল ১৩৭, ২১৫, ২৭১
ভিয়েনা ২, ৪, ৬, ৭, ১০, ১৩, ১৮, ২৩, ৩৫-৩৬, ৪৭, ৫০, ৫২-৫৬, ৬৪-৬৫, ৭১, ৭৩-৭৪, ৭৭-৭৮, ৮৪, ১০২, ১০৪, ১১৪, ১২০-১২৪, ১৩৯, ১৪৩-১৪৪, ১৪৮, ১৫০, ১৫৮, ১৭৯, ১৮৬, ২০২, ২০৭, ২১১-২১৩, ৩২২
ভুলাভাই দেশাই, শ্রী ১৩৬
ভেটার, ড. প্রেসিডেন্ট ২৯, ৩৪, ৩৯, ৫৫, ৬৪, ৬৮, ৭৭, ৭৮, ৮৩, ৯৫, ১১০, ১২৪-১২৫
ভেটার, মিসেস *দেখুন* নাওমি সি. ভেটার ১০৫
ভেনিস ২-৫, ১৪৩, ১৮৬
ভেনেজিয়া ২
ভোলানাথ দত্ত ৫৬
ভ্যানসিটার্ট ৩০০

ম. রলাঁ *দেখুন* রোমাঁ রলাঁ ২২৯-২৩২
মঙ্গোলিয়া ৩০৯, ৩১৪
মডার্ন রিভিউ *দেখুন* দ্য মডার্ন রিভিউ ১২৫, ২৪৫, ২৫৪, ২৯৪, ৩০৪
মতিলাল নেহরু, পণ্ডিত ৬৩, ৮৬, ৯৩, ১৮৯, ২৬৭
মদনমোহন মালব্য ২১৯
'মর্নিং পোস্ট' ২৩৭
মহাত্মা গান্ধী ২৮, ৪৩, ৪৯, ৬১, ৬৩, ৬৫-৬৬, ৭৩, ৯৩, ৯৬, ১১৩, ১৩৬, ১৫৮, ১৮৮, ১৯০-১৯১, ২১৯, ২২৪, ২২৯, ২৩১, ২৫০, ২৬৮, ২৭১, ২৭৩, ২৮৮, ৩২০-৩২১
মাইলস লক হ্যাম্পসন, স্যার ২২৪
মাক্রাম ত্রবেইদ, মি. ২২৪
মাঞ্চুকুও ৩০৮-৩১০, ৩১২, ৩১৪
মাঞ্চুরিয়া ৩০৮, ৩১২
মাথুর মি. ১০৪
'মাদার ইন্ডিয়া' ২৭০
মাদ্রাজ ১৮৯
মানচেন ৪৯, ৭৫
মানডাল, ডা. ১৬৪
মারকুইস অব জেটল্যান্ড ১৮১
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩১১-৩১২
মার্সাই ২৯, ১৮৬
মাসওয়া ১৩৫
মিউনিক ১৯, ৩৬, ৪৭, ৫৮, ৯১, ১৩০, ২৬৮
মিচালস্কি, অধ্যাপক ৪৬
মিলান ৩৮, ৪০
মিলার, মিসেস *দেখুন* ফিউলোপ মিলার ১৬০
মিশর ১৩৫, ২২১-২২৪
মিশিগান ৭১
মুর্শিদাবাদ ১৫১, ১৬৩
মুসোলিনি, সেনর ৩৫, ৩৬, ২২০, ২৩৬-২৩৮, ২৮৩, ২৯৬
মুসৌরি ১৩৭
মুস্তাফা এল-নাহাস পাশা ২২৪
মেক্সুকুও ৩১৪
মোয়ার, মিস ২৭০
ম্যাকব্রাইড, মাদাম ৪১-৪২, ৭১, ৮১, ৯৮, ১১৭
ম্যাকসুইনি, মিস ১১৬
ম্যাগিওরি র‍্যাপিকাভোলি ১৮০, ১৮৫
ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান ৮৬, ১৬০, ২০৩, ২০৫, ২১৩, ২৪৪, ২৬৩

যতীন দাস ৩১
যারবেদা ১৩৯
যারবেদা কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার ১৩৬
যুগোস্লাভিয়া ২৯৪-২৯৫, ২৯৮, ৩০০-৩০১, ৩০৩
যোধপুর ১৭৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬০, ৬৮, ১৪৯, ১৭৫, ২৭৩
রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বাবু ১৩৬, ২৮৮
রামমনোহর লোহিয়া ১৬২, ১৬৮
রায়, ডা. ৯৬
রাশিয়া ৮৭, ১৫৩, ২০৪
রুজভেল্ট, মি. ২৪৬-২৪৭
রুমানিয়া ২১৬, ২৯৪, ২৯৮, ৩০১-৩০৩
রোচোয়ানস্কি, মি. ৩৪, ৩৯
রোম ৩৫-৩৬, ৪০, ১৮৬, ২২০
রোমাঁ রলাঁ, মঁসিয়ে ৭২-৭৩, ৭৬, ১১১, ১২৬-১২৭, ২২৮
রোমাঁ রলাঁ, মাদাম ১২৭-১২৮, ২২৯
র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড, মি. ২০০

লক্ষ্ণৌ ১১৩, ১৫৪, ১৬৬, ২৫৮,
লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস ১১৯, ১২২

লন্ডন ৩২, ৩৬, ৫২, ৯১, ৯৭, ১৮৪-১৮৫, ২১৩, ২৩৬
লন্ডন টাইমস ৭৬, ২০৫, ৩০৮
লয়েড ট্রিয়েসটিনো ৩, ৬৯, ১০৫, ১০৯-১১০, ১১৫, ১২৪, ১৪৪, ২১৮
লালজি ৬৩
লাহোর ১৫৫, ১৫৮-১৫৯
লিগ অব হিউম্যান রাইটস ১১০
লিথুয়ানিয়া ২৯৯
'লিবার্টি' ৬২-৬৩
লিবিয়া ২৯৬
লীলা ১৫৪, ১৫৭, ১৬৬, ১৭৩, ১৭৯
লুসান ১১১-১১২, ১১৬, ১১৮-১১৯, ২৬১
লেনিন ২৮৩, ২৯৪
লেবার অ্যাসোসিয়েশন ৯৩-৯৪
লেসনি, অধ্যাপক ৫৯, ৭৭, ৭৯, ১২৮
লেসেপস, ইঞ্জিনিয়ার ২২৫
ল্যাঙ্কাশায়ার ২৪৪

শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, শ্রীযুত ৩১৮
শরৎচন্দ্র বোস/বসু, শ্রীযুক্ত ৭১, ১৩৩, ১৪৩, ১৪৬, ১৭৩, ১৮৭
শিংগান ৩১৪
'শৃঙ্খলিত ভারত' ৩৯
শেঙ্কল, মিস *দেখুন* এমিলি শেঙ্কল ১২৬, ১৬০
শের সিং, মি. ৫৭
শোলাপুর ২৫৩
শ্যামাদাস কবিরাজ ৪০
শ্রীশচন্দ্র চ্যাটার্জি ১৭৩
শ্রীহট্ট ১৭৭

সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ৫৯, ৬৫-৬৬
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ৬, ২৭, ৪২, ৫৬, ১০০, ১৪০
সন্তোষকুমার বসু ৭, ৯, ১২, ১৪, ২৭, ৪৫, ৫০, ৯০, ১০১, ১৬৭, ১৭২
সন্তোষকুমার সেন ১০৪-১০৫, ১১২-১১৪, ১১৭, ১২৬, ১২৯, ১৩৪, ১৪৩, ১৬০
সম্মুখম চেট্টি ২৮৩
সাইমন কমিশন ১৮৯-১৯০
সাং চে উয়াং, জেনারেল ৩১০
সাংহাই ৩১০, ৩১৫
সান্ডারল্যান্ড, মি./ড. *দেখুন* জে. টি. সান্ডারল্যান্ড ২৬, ২৮-২৯, ৩৯, ৪৫
সার্বিয়া ২৯৪
সালজবুর্গ ৭৪, ৭৬
সি. আর দাশ, মি. *দেখুন* দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ৬৩
সি. আর. প্রুয়েফার ৪৮, ৭০
সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স ৪২
সীতা ধর্মবীর ১৫৪-১৫৫, ১৬৪, ১৬৬, ১৭৩-১৭৪, ১৭৮-১৭৯, ১৮৩
সীতারাম সাকসেরিয়া ১৪৭
সুইজারল্যান্ড ২, ২১, ২৫, ৩১, ৪৫, ১৪১, ১৫২, ২২৮, ২৯৯
সুইয়ান ৩১৩
সুইস রিভিয়েরা ২২৮
সুধীরকুমার বসু, ড. ১০২, ১৬৩
সুনীতিকুমার চ্যাটার্জি, ড. ৩২১
সুনীলমোহন ঘোষ মৌলিক ৩৩, ৪০, ৮১, ৯৬, ১২৫, ১৫১, ১৬৩, ১৭৭
'সুভাষ সি. বোস, থ্রু কংগ্রেস আইজ' ২৯৪, ৩০৪
সুয়েজ ক্যানাল ১৩৪
সুরমা দে ৩৮
সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, স্যার ২০৪
সেট ওয়াটসন ১১০
সেলিগ, ড. ৭৩
সৈদ বন্দর ৫, ১৩৩, ১৩৫, ২২৪
সোফিয়া ৫৩, ৫৫
সোভিয়েত রাশিয়া ২৯৪, ২৯৮, ৩০১, ৩০৫-৩০৬, ৩০৯, ৩১১, ৩১৪
স্ট্যালিন ২৮৩, ২৯৪
স্পা ১০৬, ১০৯
স্পেন ২৯৭, ৩০২
স্বামী বন ৯০
স্বামী বিবেকানন্দ *দেখুন* বিবেকানন্দ ৭৩, ২৭৩
স্যানকি, লার্ড ২০০
স্যামুয়েল হোরে, স্যার ২৩৯

হফগাসটেন ৭৯, ৮৩, ৮৭
হরিশচন্দ্র সিংহ, ড. ১৯
হাঙ্গেরি ৩১, ২৪৩, ২৯৪, ৩০৩
হারগ্রোভ, মিসেস ৭৯, ৮৩, ১২৪, ১৩৯, ১৫৯
হিটলার, হের ৪৯, ৯১, ১১৯, ১৩০-১৩১, ২৪০, ২৯৭-২৯৯, ৩০২-৩০৩
হিন্দুস্থান টাইমস ৪২

হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড ৩২১
হিরোতা ৩০৭-৩০৮, ৩১০
হোমি, মি. ৯২-৯৩, ২৫১
হোরাপ, মিসেস/মাদাম ৩৮, ৪২
হেইমহর ২০৫-২০৯, ২১১-২১৪
হ্যাভার ১০৫, ১০৭, ১০৯
হ্যারল্ড ল্যাস্কি, মি. ২১৩
হ্যারিম্যান, মি. ৫
হ্যালিফ্যাক্স, লর্ড ৩০০

Alsace—Lorraine ২৯৯
American Express ৫
An Phoblacht ৪২
'Annals of an Active Life' ১৩৩
Anschluss ২৯৮
Antwerp ১০৭, ১০৯
Arbeiter Zeitung ২১১
Askanasy, Mrs ১৫৩, ১৫৮

Balkan Entente ৩০১
Basch, Mon ১০৯-১১০, ১২৫
'Bengali' দেখুন 'বেঙ্গলি' ৭৫-৭৬, ৭৮, ২৬৮
Bernerd Shaw ৬১
Bircher Benner ১৫১
Blum, Mon ১০৯
Briffault ১৫৮

C. G. Jung ১৪১
Calcutta (Municipal) Corporation ২০৩
Chancellor Schussing ১৫০, ১৫৩
Codreamu ৩০২
Cromwell ৬

Das dritte Reich ২৯৮
Das Haus ৪৯
De Valera Mr./President *দেখুন* ডি. ভ্যালেরা, প্রেসিডেন্ট ২৬১-২৬২, ২৬৯
Deutsche Nachrichtenburo ১৩০

'Europa' ১৫৮
'Everybody Loves Music' ২৬৮
'Eyeless in Gaza' ১৫৯

Felicein Challeye ১০৯

Fey, Major ২১৪
Fianna Fail ১৭৬, ২৬২-২৬৩
Franco ২৯৬-২৯৭, ৩০৩
Frankfurter Zeitung ৮৯
Freiburg ৮৬

Garibaldi ৭
Geneva ৭৫
Giornale d' Italia ২২০
Glaubensbeurgung ১৪২
Gonne Macbride, Madame ৩২
Gottingen ১৪২
Government of India Act *1935* ২৮৩
Guernut Mon/Mr. ১০৯, ১১১, ১২৫

H. G. Wells ৮০
Hauer, Professor ৭৮, ১৪২
Heimwehr *দেখুন* হেইম্হর ১৩৯
Henlien party ৩০০
Hofburg ১৩৯

'India in Bondage' ৩৯, ৪৫
'India Speaks' ২৬৮
Indian Chamber of Commerce and Industry ২৫৬
International Committee for India ২৭৩
'Interpretation of Dreams' ১৪৮
Irish Press ২৫৭
Iron Guard ৩০২
Islamic Association ২৫৬
Italian Tyrol ২৯৯

Kolnische Illustrierte ৪৯
Kolnische Zeitung ৪৯
Koralle ৪৯
Kossuth ৭৮

Lansbory, Mr. ২৪৪
Laval ৩০১
Laval-Mussolini pact ২৯৫
'Le Matin' ১০৯
Li Shouhsein ৩১৪
Little Entante ২৯৮, ৩০০-৩০১

9 788177 567267